তত্ত্ব-প্রকাশিকা।

অর্থাৎ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসেবক

মহাত্মা রামচন্দ্র প্রণীত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির,

যোগোদ্যান, কাঁকুড়গাছী হইতে

স্বামী যোগবিনোদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন

"কালিকা-যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৭৭ রামকৃষ্ণাব্দ।

সন ১৩১৮ সাল।

[মূল্য ২৲ দুই টাকা। ডাঃ মাঃ ।০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

—o—

আমার হৃদয়-ভাণ্ডার-স্থিত রত্ন-রাজি হইতে, আজ তত্ত্ব-প্রকাশিকা-রূপ কিঞ্চিৎ রত্ন, সাধারণের সুখের নিমিত্ত প্রদত্ত হইল। প্রভু আমায় যে রত্ন দিয়াছেন, তাহা অক্ষয় এবং অসীম ; দস্যু চোরের অধিকারবহির্ভূত, সুতরাং আমি ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও না দিলে, কাহারই তাহা প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। ইতিপূর্ব্বে এই রত্নের কিয়দংশ সাধারণের নিমিত্ত বাহির করিয়াছিলাম, তাহাতে অনেকের আগ্রহ দেখিয়া, বর্ত্তমান আকারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি।

একথা অনেকেই বুঝিয়াছেন যে, প্রভুর উপদেশগুলি নানাভাবে রঞ্জিত, তাহার কারণ এই, যেমন আকাশের জল যে আধারে পতিত হয়, সেই আধারের বর্ণে তাহা পরিণত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত এক দ্রব্য ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইতে দেখা যায়। প্রভুর উপদেশগুলি সেই জন্য আমার শিক্ষানুযায়ী আমি ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছি।

অনেকের সংস্কার এই যে, জড়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম-বিজ্ঞান পরস্পর অনৈক্য। যদিও মনো-বিজ্ঞানের কতকটা আদর আছে বটে, কিন্তু জড়-বিজ্ঞানের আদৌ স্থান নাই। প্রভুর উপদেশসমূহ এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য ভাবে গঠিত হইয়াছে। তাহার কথাগুলি অনেক স্থলে অতি সামান্য শব্দের দ্বারা ব্যক্ত হইয়ছে বটে. কিন্তু তাহার ভাবার্থ বহির্গত করিতে সময়ে সময়ে আমাদের বিজ্ঞানাদির অতি গুরুতর সূত্র ধরিয়া মীমাংসা করিতে হইয়াছে। তাহাতে যে আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা আপাততঃ পাঠক পাঠিকার গর্ভস্থ রহিল।

আমাদের যে প্রকার সময় পড়িয়াছে, তাহার হিসাব করিয়াই পুস্তকখানি সাজান হইয়াছে, এই নিমিত্ত ঈশ্বর নিরূপণ হইতে, ঈশ্বর লাভ এবং সামাজিক অবস্থাদি বিষয়ক উপদেশগুলিও যথাযথরূপে বিন্যস্ত হইল। পুস্তকখানির কলেবর নিতান্ত বৃদ্ধি হওয়ায়, আমি অনেক বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি।

উপাখ্যানের সূচী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য মহাত্মা রামচন্দ্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচরণ ভরসা।

—০—

স্তোত্র।

(১)

জয় জয় রামকৃষ্ণ পতিত পাবন।
পূর্ণ ব্রহ্ম, পরাৎপর পরম কারণ॥
যুগে যুগে অবতরি, পতিত উদ্ধার।
দেশ কাল পাত্রভেদ করিয়া বিচার॥
অগাধ সলিলে প্রভু মীনরূপ ধরি।
পরম কৌতুকে বেদ উদ্ধারিলে হরি॥
কে বুঝিবে তব লীলা লীলার আধার।
মেদিনী উদ্ধার হেতু বরাহ আকার॥
কূর্ম্মরূপ ধরি হরি ধরণী ধরিলে।
নৃসিংহ মূরতি ধরি ভক্তে বাঁচাইলে॥
রাজপুত্র রূপে তুমি ক্ষাত্রিয় আলয়।
রামরূপ ধরি হরি হইলে উদয়॥
সংসারের পরিণাম কিবা চমৎকার।
জীব শিক্ষা হেতু তাহা করিলে বিস্তার॥
সংসারের সুখ সদা চপলা প্রমাণ।
বিধিমতে দেখাইলে ওহে সনাতন॥
অপূর্ব্ব রাম নাম ভবে আনি দিলা।
যে নামে ভাসিল জলে মহাগুরু শিলা॥
সংসার জলধি তলে প্রস্তরের প্রায়।
জীবে মনরূপ শিলা সদা পড়ি রয়॥
রাম নাম যেই মুখে করে উচ্চারণ।
তাহার পাষাণ মন ভাসয়ে তখন॥
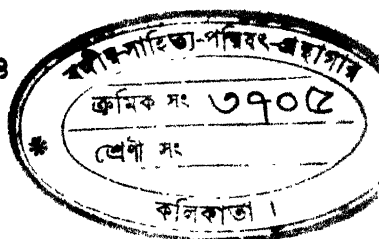
কৃষ্ণ অবতার কালে আশ্চর্য্য মিলন।
যোগ ভোগ এক সূত্রে করিলে বন্ধন।
ভাব, প্রেম আদি যত ভক্তির বিকাশ।
সংসার ভিতরে তাহা করিলে প্রকাশ॥
কৃষ্ণ নাম দু-অক্ষর যে বলয় মুখে।
দারাদি বেষ্টিত থেকে দিন কাটায় সুখে॥
বিচিত্র প্রেমের ভাব হৃদয়ে সঞ্চার।
কৃষ্ণ নাম মাহাত্ম্যতে হয় যে তাহার॥
পরম প্রেমের খেলা প্রকৃতি সহিত।
ধারণা করিতে তাহা জীব বিমোহিত॥
পুরুষ প্রকৃতি দোঁহে হয়ে একাকার।
শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার হ'লে পুনর্ব্বার॥
কৃষ্ণ নাম সাধনের প্রণালী সুন্দর।
প্রকাশে জীবের হ'লো কল্যাণ বিস্তর॥
নামে হয় মহাভাব জীব অগোচর।
সে ভাব লভিল আহা! সংসার ভিতর॥
এবে নব অবতার রামকৃষ্ণ নাম।
যে নামে কলির জীব যাবে মোক্ষধাম॥
নব রূপে নব ভাব তরঙ্গ ছুটিল।
নব প্রেমে জীবগণ বিহ্বল হইল॥
আহা! কিবা নব শিক্ষা দিলে ভগবান্।
তোমায় বকলমা দিলে পাবে পরিত্রাণ॥
ইহাতে অশক্ত যেবা দুর্ব্বল অন্তর।
তাহার স্বতন্ত্র বিধি হ'ল অতঃপর॥
যাহার যাহাতে রুচি যে নামে ধারণা।
তাহার তাহাই বিধি তাহাই সাধনা॥
হর হরি কালী রাধা গৌর নিতাই।
আল্লা তাল্লা ঋষি খৃষ্ট দরবেশ গোঁসাই॥
ভাবময় নিরঞ্জন ভাবের সাগর।
যাহার যে ভাবে ইচ্ছা তাহাতে উদ্ধার॥

আপনি সাধক হ'য়ে সাধকের হিত।
বিধিমতে সাধিলেন উল্লাসিত চিত॥
দয়ার মূরতি ধরি, অবতীর্ণ ভবে।
কলির জীবের দুঃখ আর নাহি রবে॥
রামকৃষ্ণ সারাৎসার, নাহি অন্য গতি আর
নাম বিনে নাই রে সাধন।
জপ নাম, বল নাম, অবিরাম অবিশ্রাম।
কররে নাম সুধা পান॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যাবে, প্রেম ভক্তি উথলিবে,
হেরিবে আপন ইষ্টদেবে।
ভুবন মোহন রূপ, অপরূপ যেই রূপ,
নাম গুণে তাহাও দেখিবে॥
কর সবে নাম সার, ত্যজ বিষয় অসার,
রবে আর কত দিন ভুলে।
বল সবে রামকৃষ্ণ, গাও সবে রামকৃষ্ণ,
মাত সবে রামকৃষ্ণ বলে॥
পূর্ণব্রহ্ম নরহরি, ধরাধামে অবতরি,
রামকৃষ্ণ বল বাহু তুলে।
পাইবে অপারানন্দ, ঘুচিবে মনের দ্বন্দ্ব,
ভাবের কপাট যাবে খুলে॥
অদ্বৈত গৌর নিতাই, তিনে মিলি এক ঠাই,
দেখরে ভাবের হাটে খেলে।
রামকৃষ্ণ সুধানিধি, পান কর নিরবধি,
নাম রসে ভাস কুতূহলে॥

দেবদেব মহাদেব সর্ব্বারাধ্য পরাৎপর।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ১
পতিতানাম্ হিতার্থায় নররূপ ধরোহভবঃ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ২॥
ত্বমেবাদিরনাদিস্ত্বং সর্ব্বসাক্ষী ত্বমেব হি।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ৩॥
ত্বং জলং ত্বং স্থলং ত্বং ব্যোম বায়ুর্বৈশ্বানরস্তথা।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ৪॥
স্থূলো সূক্ষ্মোহনন্তশ্চ ত্বং হি কারণকারণং।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ৫॥
পুরুষঃ প্রকৃতি ত্বংহি স্বপ্রকাশো চরাচরে।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ৬॥
ত্বং হি জীবস্বমূর্ত্তিজ্ঞঃ স্থাবরাঞ্চাপি জঙ্গমম্।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ৭॥
লীলাজাতোহসি নিত্যোহসি নিত্যলীলাবহিঃস্থিতঃ
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ৮॥
অব্যক্তস্ত্বমচিন্ত্যস্ত্বং সত্যং জ্ঞানং ত্বমেব চ।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ৯॥
ত্বং হি ব্রহ্মা চ বিষ্ণু ত্বং হি দেবো মহেশ্বরঃ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ১০॥
কালী দুর্গা ত্বমেবাসি ত্বং চ রাসরসেশ্বরী।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ১১॥
মীনঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ রূপাণ্যন্যানি তে বহিঃ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্॥ ১২॥
ত্বং হি রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বামনাকৃতিরীশ্বরঃ।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ১৩॥
নানকস্ত্বং যীশু ত্বং চ শাক্যদেবো মহম্মদঃ
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহিমে চরণাম্বুজম্॥ ১৪॥
শচীসুতোহসি ত্বং দেব নামধর্ম্মপ্রকাশকঃ।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে॥ ১৫॥

রামকৃষ্ণেতি প্রখ্যাতং নবরূপং প্রকল্পিতং।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্ ॥ ১৬ ॥
ধর্ম্মং কর্ম্ম ন জানামি শাস্ত্রজ্ঞানবিবর্জ্জিতঃ।
নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে ॥ ১৭ ॥
দয়াবতার হে নাথ পাপিনাং ত্বং সমাশ্রয়ঃ।
নমস্তে রামকৃষ্ণায় দেহি মে চরণাম্বুজম্ ॥ ১৮ ॥
অজ্ঞানকূপমগ্নস্য অন্যা নাস্তি গতির্ম্মম।
দেহি দেহি কৃপাসিন্ধো দেহি মে চরণাশ্রয়ম্ ॥ ১৯ ॥

---

(৩)

ওঁকারবাচ্যং স্ববিকাশমাগুং
নিত্যং বিশুদ্ধং ত্রিগুণৈ র্বিমুক্তং।
সাক্ষিস্বরূপং জগতাং জনেশং
শ্রীরামকৃষ্ণং সততং নমামি ॥

রাগাদিশূন্যং করুণাধিবাসং
জ্ঞানপ্রকাশং ভবপাশনাশং
আনন্দরূপং মৃদুমঞ্জুহাসং
শ্রীরামকৃষ্ণং সততং স্মরামি ॥

ময়ং ভবাব্ধাবভিতারয়ন্তং
স্বাঙ্কং নয়ন্তং দুরিতং চরন্তং
ভক্তার্ত্তিভারং কৃপয়া হরন্তং
শ্রীরামকৃষ্ণং শরণং ব্রজামি ॥

কৃচ্ছ্রং তপোযজ্ঞমহং ন জানে
মন্ত্রং ন যন্ত্রং স্তবনঞ্চ কিঞ্চিৎ।
জানে সদাহং শরণং বরেণ্যং
হে দীনবন্ধো তব পাদযুগ্মম্ ॥

ষড় বৈরিণো মে প্রসভং প্রমত্ত
মাতঙ্গবন্মাং নিয়তং তুদন্তি।
হা দেবদেবেশ জগন্নিবাস
দাসোঽস্মি তে মাং পরিপন্থ রক্ষ ॥

নাহং প্রযাচে মণিরত্নপূর্ণং
হর্ম্ম্যং মনোজ্ঞং সুরবৃন্দসেব্যং।
মেরোঃ সমানং রজতং সুবর্ণং
কান্তাং সুরম্যাং ভুবি সর্ব্বরাজ্যম্ ॥

যদ্‌যোগিবৃন্দা জনহীনদেশে
মগ্নাঃ সমাধৌ পরিচিন্তয়ন্তি।
যাচে ত্বহং তে ভুবনৈকনাথ
ব্রহ্মাদিবন্দ্যং চরণারবিন্দম্॥

নৈবেব জানাসি মহেশ্বরোঽসি
দীনাতিদীনশ্চ পদাশ্রিতোঽহং।
সংযচ্ছ তন্মে স্বকৃপাগুণেন
ভক্তিং তদীয়ামচলাং বিশুদ্ধাম্।

মন্দঃ প্রমত্তো গুণবিত্তিহীনঃ
কথং নু বেদ্মি স্তবনং তবাহং।
স্তুত্বা যথা ত্বাং করুণৈকসিন্ধো
প্রাপ্স্যামি তন্মাং প্রবিধেহি শিক্ষাম্॥

নমামি নিত্যং তব পাদযুগ্মং
ধ্যায়ামি নিত্যং তব পূর্ণরূপং।
করোমি নিত্যং কমলাঙ্ঘ্রি পূজাং
নাথ ত্বদন্যচ্ছরণং ন জানে॥

তত্ত্ব-প্রকাশিকা।

অর্থাৎ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ।

ঈশ্বর নিরূপণ।

১। কর্ত্তা ব্যতিরেকে কর্ম্ম হইতে পারে না। যেমন, নিবিড় বনে দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। মূর্ত্তি প্রস্তুতকর্ত্তা তথায় উপস্থিত নাই, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। সেই প্রকার, এই বিশ্ব দর্শন করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে জ্ঞাত হওয়া যায়।

পরমহংসদেবের এই উপদেশের দ্বারা কার্য্য কারণের ভাব আসিতেছে। কার্য্য হইলেই কারণ আছে। যেমন বৃষ্টি। এ স্থলে মেঘ কারণ এবং বৃষ্টিকে তাহার কার্য্য কহা যায়। মেঘ ব্যতীত বৃষ্টি কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না এবং বৃষ্টি হইলে তাহার কারণ মেঘ অবশ্যই থাকিবে।

যেমন, মনুষ্য দেখিলে তাহার পিতা মাতা আছে বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

২। মনে করিবামাত্র ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় না। তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। রজনীযোগে অগণন নক্ষত্রের দ্বারা গগণ-মণ্ডল বিমণ্ডিত হইয়া থাকে, কিন্তু দিবাভাগে সেই তারকাবৃন্দ দৃষ্ট হয় না বলিয়া কি তারাদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইবে না?

স্থির হইয়াছে, সূর্য্যের প্রবল রশ্মির দ্বারা আমাদের দৃষ্টিহীনতা জন্মে, সুতরাং তারা দেখিতে পাওয়া যায় না।

৩। দুগ্ধে মাখন আছে। কিন্তু দুগ্ধ দেখিলে মাখন আছে কি না অনুমান করা বালকের বুদ্ধির অতীত। বালক বুঝিতে পারিল না বলিয়া দুগ্ধকে মাখন বিবর্জ্জিত জ্ঞান করা উচিত নহে। যদ্যপি মাখন দেখিতে বা ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কার্য্য চাই। দুগ্ধকে দধি করিতে হইবে, পরে তাহা হইতে মাখন প্রস্তুত করা যায়। তখন তাহা ভক্ষণে পুষ্টিলাভ করা যাইতে পারে।

ঈশ্বরপথে যাঁহারা অদ্যাপিও পদবিক্ষেপ না করিয়াছেন, তাঁহারা বৃদ্ধ হইলেও বালক অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে শৈশব জ্ঞান করিতে হইবে। বালকের নিকট সকল বিষয়ই অন্ধকারময়। যাহা শিক্ষা করিবে, তাহাই জানিতে পারিবে। কার্য্য না করিলে বস্তু লাভ হইবার উপায় নাই।

৪। সমুদ্রে অতলস্পর্শ জল। ইহাতে কি আছে এবং কি নাই, তাহা কেহ স্থির করিয়া বলিতে সক্ষম নহে। মনুষ্যের দ্বারা তাহা স্থির হইল না বলিয়া কি সমুদ্রে কিছুই নাই বলিতে হইবে? যদ্যপি কেহ তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সমুদ্রতটে পরিভ্রমণ করে, তাহা হইলে সময়ে সময়ে কোন কোন মৎস্য কিম্বা জলজন্তু অথবা অন্যান্য পদার্থ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা। নতুবা গৃহে বসিয়া সমুদ্রের বিচার করিলে কি ফল হইবে?

৫। লীলা অবলম্বন না করিলে নিত্য বস্তু জানিবার উপায় নাই।

এই পৃথিবীই লীলা স্থল। যদ্যপি তাঁহাকে জানিতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর বিষয় জ্ঞাত হওয়া উচিত। আমরা কি, আমাদের শরীর কিরূপে গঠিত হইয়াছে, কি কৌশলে পরিচালিত হইতেছে এবং ইহার পরিণামই বা কি হইয়া থাকে—ইত্যাকার বিচার করিতে থাকিলে, অবশেষে একস্থলে উপস্থিত হওয়া যায়, যথায় ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি হইতে পারে না। এইরূপ বিচার কেবল মনুষ্যদেহ ব্যতীত জগতের প্রত্যেক পদার্থের দ্বারা সমাধা

হইতে পারে। যথা, প্রথমে স্থূল, পরে সূক্ষ্ম,তৎপরে কারণ, পরিশেষে মহাকারণে উপনীত হইলে, ঈশ্বর নিরূপিত হইয়া থাকে।

৬। কোন ব্যক্তির অতি মনোহর উদ্যান আছে। একজন দর্শক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, ইহার কোন স্থানে আম্রের সার, কোথাও বা লিচু, পেয়ারা, গোলাপজাম প্রভৃতি বৃক্ষ সকল যথানিয়মে বিন্যস্ত রহিয়াছে। কোথাও বা গোলাপ, বেল, জাতী, চম্পক প্রভৃতি নানা জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া দিক্‌সমূহ সুবাসিত করিতেছে। কোথাও পিঞ্জরাবদ্ধ পিককুল সময়োচিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ-সুখ পরিবর্দ্ধিত করিতেছে, কোথাও বা ব্যাঘ্র, ভল্লূক, হস্তী প্রভৃতি ভীষণ জন্তু সকল অবস্থিতি করিতেছে ও স্থানে স্থানে নানাবিধ পুত্তলিকা সংস্থাপিত রহিয়াছে। দর্শক উদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিয়া কি মনে করিবে? তাহার কি এমন মনে হইবে যে, এই উদ্যান আপনি হইয়াছে? ইহার কি কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা নাই? তাহা কখন হইবার নহে। সেই প্রকার এই বিশ্বোদ্যানে, যে স্থানে যাহা স্বাভাবিক বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, তাহা বাস্তবিক স্বভাব-প্রসূত নহে, বিশ্বকর্ম্মার স্বহস্তের সৃজিত পদার্থ।

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অতি সুন্দররূপে উপলব্ধি হইবে। যাঁহারা পদার্থদিগের উৎপত্তির কারণ স্বভাবকে কহিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এই প্রকার সিদ্ধান্ত সীমাবিশিষ্ট। কারণ, মনুষ্যদিগের মন বুদ্ধি ইহার অতীতাবস্থায় গমন করিতে অসমর্থ। তাঁহারা নিজে অসমর্থ হইয়া আপন ক্ষুদ্র জ্ঞানপ্রসূত মীমাংসাই জগতের চরম জ্ঞান বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন, ইহা যারপরনাই বালকের কার্য্য।

পরমহংসদেবের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, উদ্যানে পরিভ্রমণকালীন উদ্যানস্বামীকে তথায় অনুসন্ধান করিলে কদাপি সাক্ষাৎকার লাভ হইবে না। আমবৃক্ষের নিকটে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না, অথবা

কোন জন্তুর কুটীরে তাঁহার দর্শন লাভ হইবে না, কিম্বা প্রস্তরময়ী পুত্তলিকাও তাঁহাকে প্রদর্শন করাইতে পারিবে না। যদ্যপি উদ্যানস্বামীর নিকটে গমন করিবার বাসনা হয়, তাহা হইলে যে স্থানে তিনি বাস করেন, সেই স্থানে গমন করা বিধেয়।

৭। এই বিশ্বোদ্যান দেখিয়াই লোকে বিমুগ্ধ হইয়া যায়। এক পুত্তলিকা, এমন কি যোগী ঋষির পর্য্যন্ত মন আকর্ষণ করিয়া বসিয়া আছে, সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। উদ্যানাধিপতির দর্শনের জন্য কয়জন লালায়িত?

পরমহংসদেব পুত্তলিকাশব্দে কামিনী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ, মনুষ্য হইতে অন্যান্য জন্তু পর্য্যন্ত সকলেই স্ত্রীজাতির মোহে অভিভূত হইয়া আছে। বিশেষতঃ মনুষ্যেরা কামিনীর প্রতি এতদূর আসক্ত যে, তাহারাই যেন তাহাদের ধ্যান, জ্ঞান এবং অর্চ্চনার বিষয় হইয়া আছে। সুতরাং, সেই স্থানেই মনের গতিরোধ হইয়া রহিল।

উদ্যান অর্থাৎ জগৎ-কাণ্ড দেখিয়াই সকলে নির্ব্বাক হইয়া যায়। কেহ পদার্থবিজ্ঞান, কেহ গণিত, কেহ জোতিষ, কেহ দেহ-তত্ত্ব এবং কেহ বা অন্যান্য শাস্ত্রবিশেষ লইয়া জীবনাতিবাহিত করিয়া ফেলিতেছে। উদ্যানস্বামী বা ঈশ্বর লাভ করিতে হইবে, একথা কাহারও মনোমধ্যে স্বপ্নেও সমুদিত হয় না। সুতরাং, কি প্রকারে ঈশ্বর নির্ণয় হইবে?

৮। ঈশ্বর মন বুদ্ধির অতীত বস্তু এবং তিনি মন বুদ্ধিরই গোচর হইয়া থাকেন। যে স্থানে মন বুদ্ধির অতীত বলিয়া কথিত হইয়াছে, তথায় বিষয়াত্মক এবং যে স্থানে উহাদের গোচর কহা যায়, তথায় বিষয়বিরহিত বলিয়া জানিতে হইবে।

বিনা বিচারে বা জগতের শাস্ত্রাদি না জানিয়া যে মন দ্বারা আমরা স্বভাবকে বিশ্ব-প্রসবিনীপদে ব্যক্ত করিয়া থাকি, তাহাকে বিষয়াত্মক মন কহে। এবং অবিশ্বাসী হইয়া শাস্ত্রাদি বিচার দ্বারা যে সিদ্ধান্ত লাভ করা যায়, তাহাকেও বিষয়াত্মক মনের কার্য্য কহা যায়। সেই জন্য যাঁহারা এই মন দ্বারা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা তাহাতে বিফল-মনোরথ হইয়া থাকেন। ঈশ্বর নিরূপণ করিতে হইলে, সরল বিচার এবং শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে

হইবে, কিন্তু কেবল বিচার এবং শাস্ত্রাদি পাঠ করিলেও হইবে না, মূলে বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন।

যাঁহারা শাস্ত্রবাক্যের সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দেহ না করিয়া সরল বিশ্বাসে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই ক্ষেত্রে চতুর ব্যক্তি। তাঁহারা অনায়াসে অল্প সাধনেই শান্তি নিকেতনে প্রবেশ করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা অবিশ্বাস মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিচার, তর্ক, যুক্তি, মীমাংসা ও বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ পূর্ব্বক ঈশ্বর নিরূপণ করিতে অগ্রসর হন, প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রতিপাদন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, সুতরাং তাঁহাদের অপেক্ষা দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। কারণ, মনুষ্য কখন এক জন্মে জড় জগতের প্রত্যেক শাস্ত্র শিক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। একখানি পুস্তক পাঠ করিলেও হইবে না, একটী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে আদি কারণের কোন জ্ঞান হইতে পারে না। প্রত্যেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা চাই। তাহাদের লইয়া পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষা ফলের ধর্ম্মবিশেষ অবগত হওয়া চাই, তাহা হইলে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা কাহার ভাগ্যে সংঘটিত হইবার নহে। একে উপযুক্ত উপদেষ্টাভাবে শাস্ত্রের জটিলতা বিদূরিত হয় না, তাহাতে নিজের অবিশ্বাস-রূপ আবরণ দ্বারা জ্ঞানচক্ষুর দৃষ্টি-রোধ জন্মাইয়া বসিয়া আছি; সুতরাং শাস্ত্র-মর্ম্ম কোন মতে জ্ঞানগোচর হইতে পারে না। যাহা কিছু শুনি বা দেখি, তাহা অজ্ঞানের অধিকারভুক্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বর নিরূপণ করিতে হইলে বিশ্বাসী হওয়া কর্ত্তব্য। বিশ্বাসী হইয়া কিরূপে শাস্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইতেছে।

শাস্ত্র কাহাকে কহে? শাস্ত্র অর্থে নিয়ম অর্থাৎ যে সকল গ্রন্থে আমাদের দেহ সম্বন্ধীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের শাস্ত্র কহে। পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের নানাবিধ অর্থ বহির্গত করিতে পারেন; এমন কি শ, আ, এ, স্ত্র এবং র'র ব্যাকরণ ও অভিধান মতে প্রত্যেক অক্ষরের বর্ণন্মার গুণে স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারেন। যদ্যপি অলঙ্কার এবং বর্ণনার চাতুরী পরিত্যাগ করিয়া তাৎপর্য্য বহির্গত করা যায়, তাহা হইলে শাস্ত্রার্থে "নিয়ম" এই শব্দটী প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এক্ষণে নিয়ম বলিলে কি বুঝিতে হইবে? যে পদার্থ যেরূপে কার্য্য করিয়া থাকে, সেই কার্য্যপ্রণালীকে নিয়ম কহে। যেমন চক্ষের দ্বারা পদার্থ নির্ব্বাচনের নাম দর্শন, কিন্তু কর্ণের দ্বারা এ প্রকার কার্য্য সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহা তাহার নিয়ম নহে।

অথবা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা শব্দানুভব করিয়া থাকি, তাহা চক্ষু কিম্বা নাসিকা দ্বারা হইবার নহে। অতএব দর্শন করা চক্ষুর নিয়ম, শ্রবণ করা কর্ণের এবং আঘ্রাণ কার্য্য সম্পন্ন করা নাসিকার নিয়ম। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই নিয়মের পারিপাট্য দর্শনপথে পতিত হইয়া থাকে। দিবসের পর রাত্রি সমাগত হইতেছে। দিবাকরের প্রবল রশ্মি কখন সুধাকরের করজালের সদৃশ হয় না। হিমাচলের অনন্ত শৈত্যভাব বিলয় প্রাপ্ত হইয়া উষ্ণপ্রধান দেশের দুঃসহনীয় উত্তাপ আপনি উদ্ভূত হইয়া যাইতেছে না। আম্র বৃক্ষে আম্র ব্যতীত পিয়ারা কিম্বা সুপারি উৎপন্ন হয় না। সুবর্ণ ধাতু লৌহ পদার্থে অথবা তাম্র কিম্বা দস্তা ধাতুতে পরিণত হইতেছে না। গুরুপদার্থ বায়ুতে প্রক্ষিপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ ভূতলে আকৃষ্ট হইয়া যায় এবং লঘু পদার্থের ঊর্দ্ধ গমন কেহই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ নহে। বায়ুর সম-শীতোষ্ণ ভাবের বিপর্য্যয় ঘটিলে ঝড় বৃষ্টি অনিবার্য্য হইয়া উঠে। জীবমণ্ডলীর প্রশ্বাস বায়ু ভুবায়ুতে বিক্ষিপ্ত হইলে উদ্ভিদ্‌গণ কর্ত্তৃক তাহা তৎক্ষণাৎ বিসমাসিত হইয়া উভয় শ্রেণীর জীবন রক্ষার উপায় হইতেছে। শরীরবিধানের হ্রাসতা নিবন্ধন ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং ইহার জলীয়াংশের ন্যূনতা সংঘটিত হইলে পিপাসা বোধ হইয়া থাকে। এইরূপে জগতে প্রত্যেক বস্তু স্ব স্ব নিয়মে বা স্বভাবানুযায়ী কার্য্য করিতেছে।

মনুষ্যেরাও পদার্থবিশেষ। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। জড় এবং চেতন। দেহ অর্থাৎ অস্থি, মাংস, শোণিত ইত্যাদি জড় পদার্থ এবং দেহী অর্থাৎ যাহা দ্বারা জড় পদার্থ সচেতন রহিয়াছে, তাহাকে আত্মা বা চৈতন্য কহা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য পদার্থদিগের ন্যায় মনুষ্যেরাও নিয়মাধীন। এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে মনুষ্যের অবস্থারও বিশৃঙ্খল ঘটিয়া থাকে। সুতরাং সেই নিয়মাবলী অবগত হওয়া প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য এবং তাহাকেই শাস্ত্র কহে।

যেমন মনুষ্যদেহ দ্বিবিধ, তেমনই শাস্ত্রও দুই প্রকার। দেহ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম স্বাভাবিক নিয়মের দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা এক শ্রেণীর শাস্ত্র এবং দেহী বা আত্মা সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রকার শাস্ত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যদিও দেহ ও দেহী পরস্পর বিভিন্ন প্রকার বলিয়া কথিত হইল, কিন্তু একের অবর্ত্তমানে দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব অন্তর্হিত হইয়া যায়। সেইজন্য দেহ ও দেহীর একত্রীভূতাবস্থায় বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। দেহের বিকৃতাবস্থা উপস্থিত হইলে দেহী বিকৃত না হউন, কিন্তু বিকৃতাঙ্গের নিকট নিস্তেজ এবং নিষ্ক্রিয়, অথবা দেহী দেহ ত্যাগ করিলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিকার প্রাপ্ত না হইলেও তাহাদের কার্য্য

স্থগিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত দেহ ও দেহী আপনাপন কার্য্য হিসাবে স্ব স্ব প্রধান হইয়াও উভয়ে উভয়ের আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব শাস্ত্র দুই প্রকার। ১ম জড়শাস্ত্র এবং ২য় চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক শাস্ত্র। * যে শাস্ত্র দ্বারা দেহ এবং ইহার সহিত বাহ্য পদার্থের সম্বন্ধ শিক্ষালাভ করা যায়, তাহাকে জড়শাস্ত্র বলা যায়, এবং চৈতন্য ও দেহ-চৈতন্যের জ্ঞানলাভের উপায় পদ্ধতিকে আধ্যাত্মিক শাস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

জড় শাস্ত্র।

আমরা যে দিকে যাহা দেখিতে পাই, স্পর্শ শক্তি দ্বারা যাহা কিছু অনুভব করিতে পারি, ঘ্রাণ কিম্বা আস্বাদন দ্বারা যে সকল জ্ঞান জন্মে, তৎসমুদায় জড় পদার্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পদার্থ। এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন, যাহার গুরুত্ব, আয়তন এবং স্থান-ব্যাপকতা শক্তি আছে, তাহাকেই পদার্থ বলে। পদার্থ তিন প্রকার। কঠিন, তরল এবং বাষ্প। যথা কাষ্ঠ, লৌহ, মৃত্তিকা, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি কঠিন; জল সুরা, দুগ্ধ, পারদ ইত্যাদি তরল; এবং বায়ু বাষ্পীয় পদার্থ। পদার্থদিগের এই প্রকার বিভাগকে স্থূল বিভাগ বলে। কারণ কঠিন, তরল বা বাষ্পীয়াবস্থা পদার্থদিগের অবস্থার কথা মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ জল গৃহীত হইল। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা হউক, প্রকৃত পক্ষে জল কি পদার্থ। যদ্যপি জলকে এক প্রকার স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গণনা করা যায়,তাহা হইলে ইহার অবস্থা কখন পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যাইবে না। কিন্তু স্বভাবতঃ তাহা হয় না, উহা ত্রিবিধাকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জলের কঠিনাবস্থা বরফ, তরলাবস্থা জল এবং জলীয়াবস্থা বাষ্প। এই স্বাভাবিক দৃশ্য আপনার গৃহে বসিয়া সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। জল জমিয়া বরফ হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে সাধারণ লোকেরা জানিত না। কিন্তু এক্ষণে কলের বরফ প্রচলিত হওয়ায় বোধ হয় সে ভ্রম গিয়াছে। আকাশ হইতে যখন বরফ খণ্ড বৃষ্টির সহিত ভূমিতে পতিত হয়, তাহাই জলের কঠিনাবস্থার দৃষ্টান্ত। একখণ্ড বরফ শুষ্ক পাত্রে কিঞ্চিৎ কাল রাখিয়া দিলে কঠিন ভাব বিলুপ্ত হইয়া জলের আকার ধারণ করিয়া থাকে। এ কথাও সাধারণের

* এই পৃষ্ঠা হইতে ৪৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত জড়শাস্ত্র ও চৈতন্যশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। যাহারা বিজ্ঞান পাঠ করেন নাই, এরূপ অনেক পাঠকের এই কয়েক পৃষ্ঠা কঠিন বোধ হইয়া থাকে, তাঁহারা সমগ্র পুস্তক পাঠের পর এই কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন।

নিকট নূতন নহে। যখন আমরা বরফজল পান করি, তখন পাত্রের বহির্ভাগে যে জলবিন্দু সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পের ঘনীভূতাবস্থা মাত্র। ভক্ষ্য দ্রব্য পাককালীন পাত্রোত্থিত ধূম নির্গমন সকলেই দেখিয়া থাকেন। শীতকালে জলাশয় প্রভৃতি স্থান হইতে এবং মূত্রত্যাগ-কালীন ও প্রশ্বাস বায়ুর সহিত ধূমোৎপন্ন হয়, তাহাও প্রত্যক্ষ কথা। এই ধূম প্রকৃত পক্ষে জলীয় বাষ্প নহে। ইহা ঘনীভূত বাষ্প বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল কণা। জলীয় বাষ্প সম্পূর্ণ অদৃশ্য পদার্থ। জল জমিয়া বরফ হয়, একথা যদ্যপি কেহ প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন, অতি স্বল্পায়াসে তাহা সম্পাদিত হইতে পারে। দুই ভাগ বরফ এবং এক ভাগ লবণ মিশ্রিত করিয়া একটী পাত্রে রাখিয়া দিলে তাহার বহির্ব্বাগে বায়ুর জলীয় বাষ্প কঠিন হইয়া যাইবে। এই মিশ্রিত পদার্থের মধ্যে জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া দিলে অধিক পরিমাণে বরফ প্রস্তুত করা যাইতে পারে কিন্তু এ পরীক্ষা নিতান্ত আয়াস সাধ্য। এক্ষণে দৃষ্ট হইল যে, পদার্থরাই কখন কঠিন, কখন তরল এবং কখন বাষ্পীয়াবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। এই জন্য পদার্থদিগের এই প্রকার বিভাগ সম্পূর্ণ স্থূল কথা। পদার্থদিগের এ প্রকার রূপান্তর হইবার কারণ কি? উপরোক্ত দৃষ্টান্তে যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা জলের অবস্থান্তর করা হইয়াছে, তাহাতে উত্তাপের কার্য্যই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। বরফ বায়ুতে দ্রবীভূত হইয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, বায়ুস্থিত উত্তাপ বরফে সংযুক্ত হইয়া উভয়ে সমভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জলে অগ্ন্যুত্তাপ প্রদত্ত হইলে ধূম নির্গত হয়, তথায়ও উত্তাপই কার্য্য করিতেছে এবং ইহাদের শীতল পদার্থ দ্বারা তাপ অপহরণের ন্যূনাধিক্য হইলে, যেমন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, জলও বরফ হইয়া যায়।

এক শ্রেণীর পদার্থবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, পদার্থেরা অণু এবং পরমাণু দ্বারা গঠিত। মৌলিক পদার্থদিগের সূক্ষ্মতম অংশকে পরমাণু (Atom) এবং মৌলিক পদার্থের দুইটী কিম্বা ততোধিক পরমাণু একত্রিত থাকিলে অথবা যৌগিক পদার্থদিগের সূক্ষ্মতম বিভাগকে অণু (Molecule) কহে। পরমাণু কিম্বা অণু কি প্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট এবং তাহাদের আকৃতি কিরূপ,তাহা কেহই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ নহে; সুতরাং ইহারা সম্পূর্ণ আনুমানিক সিদ্ধান্তের কথা। অণু এবং পরমাণু বাস্তবিক আনুমানিক বিচার দ্বারা সাব্যস্থ হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অতি সুন্দর কারণ এবং

যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যৌগিক পদার্থ উৎপন্নকালীন মৌলিক বা রূঢ়পদার্থেরা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে (Weight) এবং আয়তনে (Volume) সংযুক্ত হইয়া থাকে। এই নিয়ম এতদূর স্বক্ষ্ম এবং পরিপাটী যে, তাহা দেখিলে মনুষ্যেরা হতবুদ্ধি হইয়া আইসে। আমরা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। যদ্যপি বিদ্যুৎ সঞ্চালন দ্বারা জল বিসমাসিত করা যায়, তাহা হইলে দুই প্রকার বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বাষ্পদ্বয়ের মধ্যে একটী অপেক্ষা অপরটী আয়তনে দ্বিগুণ। এই দ্বিগুণ আয়তনের বাষ্পটী অগ্নি সংস্পর্শে হীনপ্রভশিখায় জ্বলিয়া যায় এবং দ্বিতীয় বাষ্প নিজে দগ্ধ না হইয়া সংস্পর্শিত দীপশিক্ষার উজ্জ্বলতর দীপ্তি প্রদান করিয়া থাকে। যে যে প্রকারে জল বিসমাসিত করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে, সেই সেই প্রকারে ঐরূপ বাষ্পদ্বয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর যে স্থানে যাঁহারা পদার্থ-বিজ্ঞানালোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই স্থানেই জল হইতে পূর্ব্বকথিত ধর্ম্মবিশিষ্ট বাষ্পদ্বয় তাঁহারাও প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করা যায়; এবং আমরাও তাহাই এই কলিকাতায় বসিয়া দেখিতেছি। পুনরায় যখন ঐ বাষ্পদ্বয় একত্রে মিশ্রিত করিয়া বিদ্যুৎ অথবা অগ্নি সংযোগ করা যায়, তাহারা তৎক্ষণাৎ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে। এই পরীক্ষার ভাবোজ্জ্বল করিবার জন্য উল্লিখিত বাষ্পদ্বয় স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করিয়া সমান আয়তনে গ্রহণ পূর্ব্বক তাড়িতাঘাত করিলে জলোৎপন্ন হইয়া থাকে এবং কিয়ৎপরিমাণে অসংযুক্ত বাষ্প অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, অবশিষ্টাংশ বাষ্পের দাহিকা শক্তি আছে, সুতরাং ইহা দ্বিতীয় প্রকার বাষ্প। দুই আয়তনের বাষ্পকে হাইড্রোজেন (Hydrogen) এবং এক আয়তনের বাষ্পকে অক্‌সিজেন (Oxygen) কহে। হাইড্রোজেন এবং অক্‌সিজেন উভয়েই রূঢ় বা মৌলিক পদার্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যদ্যপি ওজন করিয়া দুইসের হাইড্রোজেন এবং ১৬ সের অক্‌সিজেন মিশ্রিত করিয়া অগ্নি দ্বারা সংযোগ সাধন করা যায়, তাহাহইলেও জল প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং এক বিন্দু মাত্র বাষ্প অবশিষ্ট থাকে না। কারণ এক সের হাইড্রোজেন আয়তনে যাহা হইবে, সেই আয়তনের অক্‌সিজেন ওজনে ১৬ সের হইয়া থাকে। যেমন দুইটী একসের পরিমিত পাত্রে একটী জল এবং দ্বিতীয়টী পারদ দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া ওজন করিয়া দেখিলে একসের জলের গুরুত্ব অপেক্ষা পারদ ১৩,৫৯

গুণ বৃদ্ধি হইয়া যাইবে। আমরা যে ছষট্টিটী (৬৬) রূঢ় পদার্থদিগকে পৃথিবী নির্ম্মাণের আদি কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, তাহারা প্রত্যেকে এই রূপে নিয়মাধীন হইয়া রহিয়াছে। হাইড্রোজেন সর্ব্বাপেক্ষা লঘু এবং ইহার সহিত তুলনা দ্বারা অন্যান্য রূঢ় পদার্থদিগের পরমাণবিক গুরুত্ব নিরূপিত হইয়াছে; যথা হাইড্রোজেন বাষ্প, বায়ুর গুরুত্ব এবং উত্তাপের যে অবস্থায় যে পাত্রে ওজনে এক সের হইবে, সেই অবস্থায় অক্সিজেন ১৬সের, নাইট্রোজেন ১৪ সের, পারদ ২০০ সের, লৌহ ৫৬ সের, রৌপ্য ১০৮সের, এবং কয়লা ১২সের হইয়া থাকে। যেমন কঠিন মিছরিকে সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া অণুবীক্ষণ সহকারে বিভাগ করিয়া দেখিলেও, এক এক অংশকে মিছরী বলিতে হইবে এবং তথায় মিছরীর সমুদয় ধর্ম্মই বর্ত্তমান থাকিবে। যদ্যপি এই মিছরীকে এক মণ জলে দ্রবীভূত করা যায়, তাহা হইলে ইহার একবিন্দুতেও মিছরীর সত্ত্বা দৃষ্টিগোচর হইবে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তাহার দৃষ্টান্ত।

পদার্থদিগের পরিমাণাধিক্যাবস্থায় যে সকল ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, অণু বা পরমাণুর অবস্থায় সেই সকল ধর্ম্মের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। ইহা স্থির করিবার জন্য নানাপ্রকার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। একদা একগ্রেণ মৃগনাভি ওজন করিয়া তুলাপাত্রেই সংরক্ষিত হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে সেই গৃহটী মৃগনাভির সৌরভে আমোদিত হয়, কিন্তু ওজনের কিছুমাত্র কমবেশী হয় নাই। এই পরীক্ষা দ্বারা পদার্থ সকল যে অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশে থাকিয়া আপনাপন ধর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতে পারে, তাহা প্রকাশিত হইতেছে। সেই সূক্ষ্মাংশসমূহ এত সূক্ষ্ম এবং এতদূর মনুষ্য আয়ত্তাতীত যে, তাহা পারমাণ করা দুঃসাধ্য।

যদিও পদার্থদিগের সূক্ষ্মতম অংশকে অণু এবং পরমাণু বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাহারা আমাদের সম্পূর্ণ অদৃশ্য বস্তু। অণু কিম্বা পরমাণু বলিয়া পদার্থদিগের কোন অবস্থা আছে কি না, তাহাও বলা যায় না। কারণ আমরা পদার্থদিগকে যে অবস্থায় পরীক্ষা পূর্ব্বক দর্শন ফল দ্বারা কোন বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি, উহা প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক অবস্থায় কতদূর সত্য হইবার সম্ভাবনা, তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও অতি অল্প। যাঁহারা পদার্থের পরমাণু স্বীকার করেন, তাঁহারা এই মতের পোষণার্থ বলিয়া থাকেন যে, এক আয়তন (Volume) পদার্থ যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক

পরমাণুতে অবস্থিতি করিয়া থাকে, অন্যান্য পদার্থেরও সেই আয়তনে সেই পরিমাণে পরমাণু প্রাপ্ত হওয়া যায়। একথা যদিও পরীক্ষায় দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু পরমাণু সকল যে কত সংখ্যায় আছে, তাহা নিরূপণ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আমাদের এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, পদার্থেরা অবস্থাবিশেষে যে কি কি আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত নহি। মনুষ্যদিগের সাধ্য কতদূর এবং পরীক্ষাই বা কি পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা, তাহা বৈজ্ঞানিকের নিকট অবিদিত নাই। যে পরীক্ষা দ্বারা যে ঘটনা সাধন করা যায়, তাহাই পদার্থের প্রকৃত অবস্থা, কিম্বা কতকগুলি পদার্থের সংযোগ দ্বারা ঐ প্রকার ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা এ ক্ষেত্রে নির্ণয় করণার্থ প্রয়াস পাইবার আবশ্যক নাই। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমরা যাহা স্থূলে অবলোকন করিয়া থাকি এবং সহজে অনুধাবন করিতে সমর্থ হই, তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া থাকেন যে, পরমাণু গোলাকার পদার্থ। ইহারা পরস্পর একত্রিত হইয়া অবস্থিতি করে, যাহাকে অণু বলে। মধুমক্ষিকাদিগের মধুক্রম যে প্রকার দেখায়, পদার্থদিগের অনুও তদ্রূপ। যেমন মধুক্রমের গহ্বরগুলি প্রাচীর দ্বারা পরস্পর পৃথক হইয়াছে, তেমনই একটী পরমাণু হইতে অন্য পরমাণু সকলের মধ্যদেশ শূন্য থাকে; ইহাকে "ইণ্টার মোলিকিউলার স্পেস" (intermolecular space) কহে, উহা নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। জল তরল পদার্থ, আমরা চক্ষের দ্বারা ইহার অণুদিগকে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অথবা মধ্যদেশে যে শূন্য স্থান রহিয়াছে, তাহাও কাহার বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। কিন্তু যদ্যপি একটী নলাকার পাত্রে কিয়দংশ জল এবং অবশিষ্টাংশ সুরা দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া উহার মুখাবরণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে কিয়ৎপরিমাণে শূন্যস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পরীক্ষা দ্বারা জল এবং সুরা উভয়ের মধ্যেই শূন্য স্থান প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ তাহা না হইলে নলের যে স্থান পূর্ব্বে পরিপূর্ণ ছিল, তাহা কিরূপে শূন্য হইয়া আসিল। এই প্রকার মধ্যদেশীয় স্থান অন্যান্য পদার্থদিগের অণুর মধ্যেও রহিয়াছে। পরমাণুদিগের এক প্রকার আকর্ষণীয় শক্তি আছে, এই আকর্ষণী শক্তি দ্বারা একটী পরমাণু আর একটী পরমাণুকে আকর্ষণ করিয়া রাখে। এইরূপে এক জাতীয় পরমাণু অযুক্তাবস্থায় পৃথিবীর সর্ব্বত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া

থাকিতে পারে। অণুমধ্যে যে স্থান কথিত হইয়াছে, তাহাই পদার্থের অবস্থা পরিবর্ত্তনের নিদান। যখন কোন অণুতে উত্তাপ প্রয়োগ করা যায়, তখন ইহার মধ্যস্থান বিস্তৃত হইতে থাকে, সুতরাং পরমাণুদিগের পরস্পর আকর্ষণী সম্বন্ধও নষ্ট হইয়া আইসে। এই প্রকার পরিবর্ত্তনকে পদার্থদিগের কঠিন, তরল এবং বাষ্পাবস্থা প্রাপ্ত হইবার কারণ বলিয়া কথিত হয়। কঠিনাবস্থায় পদার্থদিগের অণু কিম্বা পরমাণুগণ নিতান্ত সন্নিহিত থাকে। তরল হইলে তাহারা অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী হইয়া যায় এবং এই অবস্থার আতিশয্য হইলে তাহাকে বাষ্প কহা যায়। দুই কিম্বা চারিটী সম গোলাকার পদার্থ একত্রিত করিলে কেহ কাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া স্বতন্ত্রাবস্থায় অবশ্যই থাকিবে। এই গোলাদিগের আয়তন পরিমাণ করিয়া দেখিলে একটী নির্দ্দিষ্ট চতুষ্কোণ হইবে। যদ্যপি ইহাদের মধ্যে অন্য পদার্থ প্রবিষ্ট করা যায়, তাহা হইলে গোলারা পূর্ব্বাবস্থা বিচ্যুত হইয়া পরস্পর দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িবে এবং পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট চতুষ্কোণ বিপর্য্যয় হইয়া যাইবে। পদার্থতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা পদার্থদিগের ত্রিবিধাবস্থার কারণ এইরূপে নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব,যে পদার্থেরা যে অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, তাহা সেই অবস্থা সম্বন্ধে সত্য বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে ; কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে যাহাকে আমরা যে নাম প্রদান করিয়া থাকি, তাহার প্রকৃত পক্ষে সে নাম নহে। আমরা জলের ত্রিবিধাবস্থা দেখিতেছি। এস্থানে ইহার কোন অবস্থাটীকে প্রকৃত অবস্থা কহিব ? বলিতে গেলে প্রত্যেক রূপেই অবস্থা বিচারে সত্য এবং তাহার অবস্থান্তর ভাব হৃদয়ে সমুদিত হইলে কোনটীকে প্রকৃত বলা যাইতে পারে না। পৃথিবীর যাবতীয় জড় পদার্থদিগকে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম রূঢ় বা মৌলিক, দ্বিতীয় যৌগিক এবং তৃতীয় মিশ্র পদার্থ। মনুষ্য-দিগের সাধ্যসঙ্গত পরীক্ষা দ্বারা যে পদার্থ হইতে, সে পদার্থ ব্যতীত দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় প্রকার পদার্থ বহির্গত করিতে না পারা যায়, তাহাকে রূঢ় বা মৌলিক পদার্থ কহে। যথা স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ইত্যাদি। যদ্যপি সুবর্ণ ধাতুকে অত্যধিক পরিমাণে অগ্ন্যুত্তাপ প্রদান অথবা কোন প্রকার পদার্থ সংযোগে রূপান্তর করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে ইহার অস্তিত্বের কিছুমাত্র বিকৃত ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। সুবর্ণ দ্রবীভূত করিলে নিকৃষ্ট ধাতুবিবর্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধাবস্থা লাভ করিয়া থাকে। পারদ কিম্বা গন্ধকাদি দ্রব্যের সহিত

ইহাকে মিশ্রিত করিলে যদিও বাহ্য রূপান্তর সংঘটিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু এই সকল মিশ্র পদার্থ হইতে অতি সহজ উপায়ে উহাকে পৃথক করিয়া পুনরায় পূর্ব্বরূপ সুবর্ণ ধাতুতে পরিণত করা যাইতে পারে। রূঢ় পদার্থদিগের সংযোগসম্ভূত পদার্থসমূহকে অথবা যে সকল পদার্থ হইতে দুই বা ততোধিক রূঢ় পদার্থ মনুষ্যায়াসে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে, তাহাদের যৌগিক পদার্থ বলা যায়। যথা হিঙ্গুল, ফটকিরি, নিশাদল, সোরা, গো, মনুষ্য, গৃহ, বৃক্ষ, ইত্যাদি। পারদ এবং গন্ধকের যৌগিকবিশেষের নাম হিঙ্গুল; এলিউমিনাম, পটাসিয়াম (এক প্রকার ধাতু) এবং গন্ধক, অক্‌সিজেন বাষ্পসংযোগে ফটকিরি উৎপন্ন হয়; পটাসিয়াম ধাতু, নাইট্রোজেন এবং অক্‌সিজেন বাষ্প দ্বারা সোরা প্রস্তুত হয়; নাইট্রোজেন, হাইট্রোজেন এবং ক্লোরিণ বাষ্পত্রয় নিশাদলের উপাদান কারণ। পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় পদার্থ অন্য কোন রূঢ় পদার্থদিগের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। কোন পদার্থ অন্য কোন পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিলেই যে যৌগিক পদার্থ সৃষ্ট হইয়া যায়, তাহা নহে; ইহাকে মিশ্র পদার্থ কহে। পদার্থেরা মিশ্রিত হইলে কোন সময়ে তাহাদের সংযোগ হইয়া থাকে এবং কখন বা না হইবার সম্ভাবনা। যেমন চূণের সহিত সোরা মিশ্রিত করিলে যৌগিকের কোন লক্ষণ দেখা যায় না, কিন্তু হরিদ্রার সহিত যে ঘোর পাটল বর্ণ উৎপন্ন করিয়া দেয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। পদার্থদিগের সংযোগ বিয়োগের বিবিধ নিয়ম উল্লিখিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ বর্ণনা অনাবশ্যক। কিন্তু যে সূত্রগুলি বিশেষ প্রয়োজন, তাহা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। পদার্থেরা যখন তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকে, তখন তাহারা কখন সমান ওজনে কিম্বা কখন দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ এবং অন্য সময়ে, ততোধিক আয়তনে সংযুক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যদ্যপি একটী রূঢ় পদার্থ আর একটী রূঢ় পদার্থের সহিত আয়তন কিম্বা ওজনবিশেষে সংযুক্ত হইয়া যৌগিকবিশেষ উৎপন্ন করিয়া থাকে, এই যৌগিক পদার্থ যখন প্রস্তুত করা যাইবে, তখনই উহাদের পরিমাণের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না এবং যদিই পরিমাণের তারতম্য করা যায়, তাহা হইলে সেই যৌগিকবিশেষ কখনই সৃষ্টি হইবেনা। যেমন দুই আয়তন হাইড্রোজেন এবং এক আয়তন অক্‌সিজেন বাষ্প দ্বারা জল প্রস্তুত হইয়া থাকে। অথবা ১৬ ভাগ অক্‌সিজেন, এবং ২ ভাগ হাইড্রোজেন ওজন পূর্ব্বক পরস্পর সংযোগ সাধন করিলেও জল উৎপন্ন হয়। যদ্যপি এই পরিমাণ অন্যথা করিয়া দুই আয়তন হাইড্রোজেনের

স্থানে এক আয়তন কিম্বা তিন বা চারি আয়তন গৃহীত হয়, অথবা অক্সিজেনের সম্বন্ধেও ঐ প্রকার বিপর্য্যয় করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্ব কথিত এক আয়তন অক্সিজেন এবং দুই আয়তন হাইড্রোজেনের মধ্যে সংযোগ সাধন হইয়া অবশিষ্ট বাষ্প স্বাভাবিকাবস্থায় থাকিয়া যাইবে। ওজন সম্বন্ধেও ঐরূপ। যখন কোন যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তখন তাহার গুণের সহিত উপাদানদিগের গুণের সম্পূর্ণ প্রভেদ হইয়া পড়ে। যেমন চূণ হরিদ্রার যৌগিক পদার্থের সহিত চূণের কিম্বা হরিদ্রার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কখন রূঢ় পদার্থেরা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাকে রাসায়ণিক সংযোগ বলে। সংযোগ সাধনের জন্য কখন কখনও তড়িৎ, উত্তাপ এবং সময়ান্তরে অন্য প্রকার ব্যবস্থা করিতে হয়। যেমন জল প্রস্তুত করিতে হইলে মিশ্রিত বাষ্পদ্বয়ে, হয় অগ্নি কিম্বা তড়িৎ সংযোগ ভিন্ন সংযোগ হয় না। যখন রূঢ় পদার্থদিগকে একত্রিত করিয়া রাসায়ণিক সংযোগ সংঘটিত না করা যায়, তখন তাহাকে মিশ্রিত পদার্থ কহে। যেমন বারুদ। ইহা সোরা, গন্ধক এবং কয়লা চূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত হয়; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অগ্নি সংস্পর্শিত হয়, তখনই উহাতে রাসায়ণিক সংযোগ উপস্থিত হইয়া প্রকৃত যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। মিশ্রিত পদার্থের স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত ভূবায়ু। ইহা যৌগিক নহে।

ভূবায়ু অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। মিশ্র এবং যৌগিক পদার্থদ্বয় মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইলে ইহার উপাদানদিগের কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কিন্তু মিশ্র পদার্থে তাহা বর্ত্তমান থাকে। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, যৌগিক পদার্থ উৎপন্নকালীন পরিমাণ কিম্বা আয়তন বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে, কিন্তু মিশ্র পদার্থে তাহার কোনরূপ নিয়ম নাই।

পদার্থদিগকে পদ্ধতি পূর্ব্বক বিচার করিতে হইলে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ানুসারে, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ ও তৎযৌগিকাদি পর্য্যন্ত চলিয়া যাইলে ঈশ্বর নিরূপণ পক্ষে সুবিধা হইয়া থাকে।

স্থূলের স্থূল। প্রত্যেক পদার্থে বিভিন্নতা দর্শন। যেমন মনুষ্যদিগকে বিচার করিলে ইহাদের স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত করিয়া পরস্পর পৃথক জ্ঞান করা হইবে। সেইরূপ গো, অশ্ব, উদ্ভিদ, মৃত্তিকা, ধাতু ইত্যাদি বিবিধ জাতীয় পদার্থদিগকে বিবিধ অবস্থায় বিভাগ করিয়া যেরূপে অধ্যয়ন করা যায়, তাহাকে স্থূলের স্থূল কহে।

স্থূলের সূক্ষ্ম। পদার্থের আকার, প্রকৃতি এবং বর্ণাদি প্রভেদের দ্বারা যেরূপ স্বাতন্ত্র জ্ঞান হয়, তাহা অতিক্রম করিয়া এক শ্রেণীতে পরিগণিত করাকে স্থূলের সূক্ষ্ম কহে। যেমন মনুষ্যদিগকে একজাতীয় জীব জ্ঞান করা। যদিও তাহারা স্থানবিশেষে আকৃতিবিশেষ ধারণ করিয়া থাকে; কিন্তু দেহের সমষ্টি লইয়া বিচার করিয়া দেখিলে কাহার সহিত কাহারও প্রভেদ হইবে না। কাফ্রি জাতি অতিশয় কদাকার মসিবর্ণবিশেষ; ইহুদী তদ্বিপরীত; খোট্টা, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, উড়িয়া, ইংরেজ, কাবুলী, চীন, মগ ইত্যাদি জাতিবিশেষে সম্পূর্ণ প্রভেদ রহিয়াছে। এমন কি ইহাদের দেখিলেই কে কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু যখন হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি পরীক্ষা করা যায়, তখন সকলেরই এক প্রকার বলিয়া প্রতীতি জন্মে। তন্নিমিত্তই এই বিভাগকে স্থূলের সূক্ষ্ম বলা হইল। অন্যান্য পদার্থদিগকেও এইরূপে বিচার করা যাইতে পারে। যেমন নানা-জাতীয় গো, অশ্ব, এক জাতিতে গণনা হইয়া থাকে।

স্থূলের কারণ। প্রত্যেক জাতীয় পদার্থেরা স্বীয় স্বীয় প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা পরস্পর প্রভেদের হেতু নিরূপিত হইয়াছে। যথা, মনুষ্য কখন গো, অশ্ব কিম্বা গর্দ্ধভের ন্যায় হইতে পারে না; কিম্বা ইহারা মনুষ্য আকৃতি ধারণ করিয়া মনুষ্যোচিত কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না।

স্থূলের মহাকারণ। প্রত্যেক শ্রেণীর উৎপত্তি একই প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। যেমন যে দেশীয়, যে জাতীয়, যে প্রকার মনুষ্যই হউক, তাহাদের উৎপত্তির কারণে কাহারও প্রভেদ নাই। অন্যান্য পদার্থদিগেরও সেইরূপ জানিতে হইবে।

সূক্ষ্মের স্থূল। পদার্থদিগের উপাদানসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে তাহাদের কোন প্রকার প্রভেদ লক্ষিত হয় না। যথা, মনুষ্য দেহের উপাদান অস্থি, মাংস, শোণিত, নানাবিধ আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক যন্ত্র (organ) ও অন্যান্য গঠনাদি সকলেই এক প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। হিন্দুর শোণিত মুসলমান দিগের অথবা অন্য কোন জাতীয় শোণিতের সহিত কোন প্রভেদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যকৃৎ, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্ এবং চক্ষু ও কর্ণাদি কাহার স্বতন্ত্র আকৃতিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সূক্ষ্মের সূক্ষ্ম। পদার্থেরা যে সকল গঠন দ্বারা গঠিত হয়, তাহাদের ধর্ম্মও এক প্রকার। যেমন শোণিতের দ্বারা দেহের যে সকল কার্য্য সাধিত হয়, তাহা

সর্ব্বত্রেই সমভাবে কার্য্যকারিতা হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইংরাজদিগের শরীরে শোণিত থাকিয়া যে কার্য্য করে, একজন নিতান্ত অসভ্য জাতির শরীরে শোণিত থাকিয়াও অবিকল সেই প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে। এইরূপে যকৃৎ, প্লীহা বা অন্যান্য যন্ত্রদিগেরও একই প্রকার ধর্ম্ম সকল জাতিতেই প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

সৃষ্টের কারণ। পদার্থদিগের মধ্যে যে সকল উপাদান অবস্থিতি করে, তাহাদের উৎপত্তি নির্ণয় করিয়া দেখিলে এক জাতীয় কারণ বহির্গত হইয়া থাকে। যে সকল পদার্থদিগের সংযোগে শোণিত প্রস্তুত হয়, তাহার ন্যূনাধিক্য কখনই হইতে পারে না, অর্থাৎ শোণিতের নির্ম্মায়ক পদার্থ এক প্রকার এবং এক পরিমাণে সর্ব্বত্রে অবস্থিতি করে।

সৃষ্টের মহাকারণ। যে সকল পদার্থ নির্ম্মায়কপদার্থরূপে অন্যান্য যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহাদের ধর্ম্মের অর্থাৎ গুণের কখন তারতম্য হইতে পারে না। যেমন যকৃৎ কিম্বা মস্তিষ্ক অথবা চা খড়ি যে সকল পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাদের ধর্ম্ম একই প্রকার। যদ্যপি ইহাদের ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই বিশেষ প্রকার যৌগিক পদার্থ কখন উৎপন্ন হইবে না। যেমন চূণের সহিত হরিদ্রা মিশ্রিত করিলে পাটল বর্ণ উৎপন্ন হয়; কিন্তু যদ্যপি কিঞ্চিৎ পরিষ্কার চূণের জল লইয়া তন্মধ্যে কোন প্রকার নলাকার পদার্থ দ্বারা ক্রমাগত ফুৎকার প্রদান করা যায়, তাহা হইলে ঐ স্বচ্ছ চূণের জল দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ হইয়া যাইবে। এই বিকৃত চূণ যদ্যপি সম্পূর্ণ রূপে বিকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে হরিদ্রার সহিত মিশ্রিত করিলে পূর্ব্ববৎ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। অথবা চা খড়িতে নেবুর রস প্রদান করিলে উহা ফুটিতে থাকিবে। যদ্যপি নেবুর রস সোডার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই জল চা খড়িতে পুনরায় প্রদান করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বরূপ স্ফুটনকার্য্য হইবে না। এইজন্য পদার্থদিগের উৎপাদক পদার্থদিগেরও ধর্ম্ম সম্বন্ধে একতা সংরক্ষিত হইয়া থাকে বলিয়া স্থির করা যায়।

কারণের স্থূল। পদার্থদিগের কারণ অবলম্বন করিয়া পরীক্ষা করিলে ইহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা প্রাণী, উদ্ভিদ এবং পার্থিব জগৎ। প্রাণীজগতের মধ্যে অসীম প্রকার জন্তু, পক্ষী, সরীসৃপ, কীট ও পতঙ্গাদি দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, উদ্ভিদ এবং মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু, অধাতু, জল ইত্যাদি পার্থিব শ্রেণীর মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে।

কারণের সূক্ষ্ম। ইহারা পুনরায় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা জড়, জড়চেতন এবং চেতন। যে সকল পদার্থেরা স্ব ইচ্ছায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে না পারে, তাহাদের জড় কহে। যেমন উদ্ভিদ, জল, মৃত্তিকা, প্রস্তর ইত্যাদি। যে সকল জড় পদার্থ ইচ্ছাক্রমে পরিচালিত হইতে পারে, তাহাদের জড় চেতন বলে। প্রাণী-জগৎ তাহার দৃষ্টান্ত। কারণ ইহা কিয়ৎকাল চেতন এবং কিয়ৎ-কাল অচেতন বা জড়বৎ হইয়া থাকে। যে পদার্থের অস্তিত্ব বিহীন হইলে, জড়-চেতন পদার্থেরা জড়াকার ধারণ করে, তাহাকে চেতন পদার্থ জ্ঞান করা হয়।

কারণের কারণ। এই সকল পদার্থদিগকে বিশ্লেষণ করিলে দুই বা ততো-ধিক পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা প্রাণী-দেহে জড় এবং চেতন পদার্থ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যখন ইহাদের চৈতন্য পদার্থ অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন জড় দেহ হইতে নানাজাতীয় পদার্থ বহির্গত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ কতকগুলি কঠিন, কতকগুলি তরল এবং কতকগুলি বাষ্পীয় পদার্থ। সুতরাং প্রাণীদেহ চতুর্ব্বিধ স্বতন্ত্র পদার্থের সমষ্টি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। উদ্ভিদ ও পার্থিব পদার্থেরাও বিশিষ্ট হইলে, কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়াকারে পরিণত হইয়া যায়। সেই জন্য জগতের পদার্থদিগকে যৌগিক বলে।

আমাদের বিচার এইস্থানে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। প্রথম, এই যৌগিক জড়পদার্থদিগের উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করা এবং দ্বিতীয়, চেতন ভাগের হেতু উদ্ভাবন করা।

এক্ষণে বিচার করিতে হইবে যে, প্রাণীদেহে যে সকল যৌগিক পদার্থ আছে, চেতন ভাগ কি তাহাদের কার্য্য অথবা তাহা বাস্তবিক স্বতন্ত্র বস্তু? মনুষ্যদেহ চারিভাগে বিভক্ত। যথা মস্তক, বক্ষঃস্থল, উদর এবং হস্তপদাদি। মস্তকে—নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, মুখ; বক্ষঃস্থলে—স্তন এবং উদরনিম্নে—জন-নেন্দ্রিয় ও গুহ্যস্থান; হস্ত পদাদিতে অঙ্গুলি। ইহাদের অভ্যন্তরে নানাবিধ যন্ত্রাদি সংরক্ষিত আছে। যথা মস্তকে মস্তিষ্ক; মেরু গহ্বরে মেরু মজ্জা; বক্ষে হৃদ্‌পিণ্ড, ফুস্‌ফুস্; উদরে পাকাশয়, যকৃৎ প্লীহা, ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্র, মূত্রগ্রন্থি ও মূত্র-স্থলী এবং স্ত্রীজাতিদিগের জরায়ু ও তদ্‌সম্বলিত ডিম্বকোষাদি প্রভৃতি বিবিধ পৃথক পৃথক যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পরে এই সকল যন্ত্রদিগের কার্য্য-প্রণালী অনুশীলন করিতে যাইলে, ইহাদের সকলকেই স্ব স্ব প্রধান বলিয়া জ্ঞান হইবে। যেমন বাহিরের ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পৃথক পৃথক কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে, যথা চক্ষে দর্শন, কর্ণে শ্রবণ, নাসিকায় আঘ্রাণ এবং জিহ্বায়

আস্বাদন। এই কার্য্যগুলি বাস্তবিক স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদিতেও সেই প্রকার বিভিন্ন কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে।

উপরে কথিত হইয়াছে যে, মনুষ্যশরীরে তিনটী গহ্বর এবং তন্মধ্যে যথাক্রমে যন্ত্রাদিও সংস্থাপিত আছে। এই তিনটী বিভাগ কর্ত্তৃক তিন প্রকার কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। আমরা আহার না করিলে বাঁচিতে পারি না, পিপাসায় জলপান না করিলে ব্যাকুল হইতে হয়। এই প্রকার অবস্থা উপস্থিত হইলে হস্ত পদ ও বহিরিন্দ্রিয়দিগের দ্বারা মুখগহ্বর পর্য্যন্ত উহারা আনীত হয়; এই স্থানে বাহ্যেন্দ্রিয়াদির কার্য্য স্থগিত হইয়া যায়। পরে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির কার্য্য আরম্ভ হয়। মুখমধ্যস্থ দন্তপংক্তিদ্বয় কর্ত্তৃক ভক্ষ্য পদার্থ বিচূর্ণিত এবং জিহ্বাদ্বারা তাহা পরিসমাপ্তি ও লালা দ্বারা পিণ্ডাকারে পরিণত হইয়া অন্নবহাপ্রণালী দ্বারা পাকাশয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এই স্থানে যকৃৎ হইতে পিত্তাদি ও পাকাশয়ের অম্ল ধর্ম্মাক্রান্ত নির্য্যাস দ্বারা অন্নাদি পরিপাক পাইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক তথা হইতে কিয়দংশ শরীরে শোণিতোৎপাদনের হেতু শোষিত হইয়া যায় এবং অবশিষ্টাংশ বৃহদন্ত্রের মধ্য দিয়া পুরীষ রূপে বহির্গত হইয়া থাকে। বক্ষঃগহ্বরস্থ হৃদ্‌পিণ্ড বলিয়া যে যন্ত্রটী উক্ত হইয়াছে, তাহা হিসাবমত যেমন আমাদের কলের জল, কল দ্বারা গঙ্গা হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক নানাবিধ প্রণালী দিয়া নানা স্থানে প্রেরিত হয়; হৃদ্‌পিণ্ডও শোণিত সম্বন্ধে সেই প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে। হৃদ্‌পিণ্ড কর্ত্তৃক শোণিত সঞ্চালিত হইয়া উর্দ্ধে মস্তক, মধ্যে বক্ষঃস্থল ও উদর এবং নিম্নে ও পার্শ্বে হস্ত পদাদি সমুদয় স্থানে প্রেরিত হয়। যেমন, কলের জল এক প্রকার নলের দ্বারা সর্ব্বস্থানে প্রেরিত হইলে, তাহার ব্যবহারের পর পুনরায় বিভিন্ন প্রণালী দ্বারা স্বতন্ত্র স্থানে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, শোণিত সম্বন্ধেও সেই প্রকার ব্যবস্থা আছে। যে নল দ্বারা হৃদ্‌পিণ্ড হইতে শোণিত প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহাকে ধমনী কহে; এবং যে নল দিয়া বিকৃত শোণিত অর্থাৎ কার্য্যের পর সঞ্চালিত হইয়া থাকে, তাহাকে শৈরিক শোণিত কহে। কলের জলের আর সংশোধনের উপায় নাই, কিন্তু বিকৃত শোণিত শরীরের মধ্যেই সংশোধন হইবার নিমিত্ত ফুস্‌ফুসের সৃষ্টি হইয়াছে। হৃদপিণ্ডের চারিটী ক্ষুদ্র গহ্বর আছে, দুইটী ধামনিক শোণিতের নিমিত্ত এবং দুইটী শৈরিক শোণিতের নিমিত্ত। শৈরিক শোণিত সর্ব্বস্থান হইতে হৃদ্‌পিণ্ডের গহ্বরবিশেষে সমাগত হইয়া পরে তথা হইতে ফুস্‌ফুসে উপস্থিত হয় ও ভূবায়ুর

সহিত সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভূবায়ুও একটী মিশ্রিত পদার্থ, ইহাতে দুইটী রূঢ় পদার্থ যথা, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন আছে। অক্‌সিজেন এক ভাগ এবং নাইট্রোজেন চারি ভাগ পরিমাণে আছে। এই বায়ুস্থিত অক্‌সিজেন শৈরিক শোণিতের দূষিত পদার্থদিগকে ধ্বংস করিয়া পুনরায় তাহাকে ধামনিক রূপে পরিণত করিয়া থাকে। দূষিত পদার্থনিচয় প্রশ্বাস বায়ুর সহিত বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হয় এবং ধামনিক শোণিত পুনরায় হৃদ্‌পিণ্ডের অপর দুইটী গহ্বরে সমাগত হইয়া পূর্ব্বরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে।

শোণিত দ্বারা সকল যন্ত্রগুলি বলাধান প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা স্ব স্ব কার্য্য করিতে পারদর্শিতা লাভ করে। পূর্ব্বে যে স্নায়ুর কথা বলা হইয়াছে, তাহারা যন্ত্রদিগের কার্য্য করাইবার আদি কারণ। এই অবস্থায় যন্ত্রদিগের কার্য্য পরম্পরা লইয়া বিচার করিলে সকলেরই ভাব স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কারণ পাকাশয়ের কার্য্য এবং মূত্রগ্রন্থির কার্য্য এক নহে। এইরূপ অন্যান্য সমুদয় যন্ত্রের বিষয় জানিতে হইবে।

যন্ত্রদিগের কার্য্য কেবল কার্য্য দেখিয়া স্থির করিতে হয়, নতুবা যন্ত্রের আকার প্রকার দেখিলে কার্য্যের ভাব আসিতে পারে না।

এই কার্য্য লইয়া যদ্যপি আমরা স্থির হইয়া বিচার করিতে থাকি, তাহা হইলে যন্ত্রের কার্য্য ব্যতীত অপর কোন কার্য্য নাই বলিয়া জ্ঞান চক্ষে দেখিতে পাইব।

আমরা এ পর্য্যন্ত মস্তিষ্কের কথা বলি নাই। মস্তিষ্কের কার্য্য অতি জটিল। তবে তাহার যে সকল কার্য্যকলাপ দেখা যায়, তদ্দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হয়, তাহা অবশ্য অস্বীকার করিয়া পলাইবার উপায় নাই।

আমার মন বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, তাহা মস্তিষ্কের কার্য্য কিম্বা চৈতন্য পদার্থের কার্য্য, আমরা পরে তাহার মীমাংসা করিব; কেননা ইহাকে জড়-মস্তিষ্কের কার্য্য বলিলে অনেক সময়ে ভুল হয়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে,স্নায়ু সকল এই মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন হইয়া সকল যন্ত্রের কার্য্যকারিতা সম্পাদন করিয়া থাকে; তাহা বাস্তবিক পরীক্ষার ফল দর্শন পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত হইয়াছে। পক্ষাঘাতাদি রোগ তাহার দৃষ্টান্ত। এ স্থানে অঙ্গের সমুদয় গঠন সত্ত্বেও তাহাদের কার্য্য স্থগিত হইয়া যায়, স্নায়ুবৃন্দ পুনরায় পূর্ব্বপ্রকৃতিস্থ হইলে ঐ ব্যাধিযুক্ত অঙ্গটী আবার স্বীয় কার্য্য করিতে সমর্থ লাভ করিয়া থাকে।

কারণের মহাকারণ। যৌগিক পদার্থের উপাদানের উপাদান নির্ণয় করিয়া দেখিলে পরিশেষে রূঢ় পদার্থে উপনীত হওয়া যায়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, জগতের যাবতীয় পদার্থ ষট ষষ্টি রূঢ় * পদার্থ দ্বারা উৎপাদিত হইয়া থাকে। যে রূঢ় পদার্থ জীবদেহের নির্ম্মায়ক হইয়াছে, সেই রূঢ় পদার্থই উদ্ভিদ্ এবং পার্থিব পদার্থ সংগঠন করিয়া থাকে। যেমন লৌহ যে স্থানে যে আকারে এবং যে কোন সংযোগেই হউক, উহাকে রূঢ়াবস্থায় অর্থাৎ সংযোগ-চ্যুত করিলে লৌহে পরিণত করা যায়। প্রত্যেক রূঢ় পদার্থ সম্বন্ধে এই নিয়ম বলবতী আছে। আমাদের দেহ এবং উদ্ভিদ্ কিম্বা অন্য কোন পার্থিব পদার্থ হইতে, অক্সিজেন বহির্গত করিয়া দেখিলে, তাহাদের কাহারও সহিত কোনও অংশে বিভিন্নতা হইবে না। আকারে, ধর্ম্মে এবং কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে একই প্রকার হইবে। এইরূপে রূঢ় পদার্থ সম্বন্ধে সর্ব্বত্রেই এক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহাকারণের স্থূল। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, পদার্থেরা কঠিন, তরল এবং বাষ্পাদি ত্রিবিধাকারে অবস্থিতি করিয়া থাকে। রূঢ় পদার্থ সম্বন্ধেও এই নিয়ম বলবতী আছে। কারণ ইতিপূর্ব্বে যে সকল রূঢ় পদার্থ বাষ্প বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল, তাহাদিগকে এক্ষণে তরল এবং কঠিনাকারে পরিণত করা হইয়াছে।

শক্তির দ্বারা পদার্থদিগের এই প্রকার রূপান্তর সাধিত হয়। তাহা জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শক্তি নানা প্রকার। সচরাচর উত্তাপ (heat) তড়িৎ (electricity) চুম্বক (magnetism) রসায়ণ শক্তি (chemical affinity) এবং মাধ্যাকর্ষণ (gravitation) প্রভৃতি পঞ্চবিধ শক্তি আছে। এই শক্তিদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা যায়। যথা ভৌতিক (physical) এবং রাসায়নিক শক্তি (chemical)। ভৌতিক শক্তির মধ্যে উত্তাপাদি পরিগণিত এবং রাসায়নিক শক্তি একাকী শেষোক্ত

---

* রূঢ় পদার্থেরা সচরাচর ত্রিবিধাবস্থায় পরিগণিত।

১। বাষ্প—যথা, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিণ ইত্যাদি।

২। তরল—যথা, ব্রোমিণ এবং পারদ।

৩। কঠিন—যথা, কয়লা, গন্ধক, ফস্‌ফরাস, (অস্থিতে অধিক পরিমাণে থাকে) সুবর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, দস্তা, তাম্র, সীসক, পোটাশিয়ম, (ভস্মের উপাদান বিশেষ) সোডিয়ম্, ক্যাল-সিয়ম্ (চূর্ণ) ইত্যাদি।

শ্রেণীতে উল্লিখিত হইয়া থাকে। ভৌতিক শক্তি দ্বারা পদার্থদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু গঠনের বিপর্য্যয় সংঘটিত হয় না। যেমন লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহিতোত্তপ্ত করিয়া পুনরায় শীতল করিলে তাহাদিগের পূর্ব্ব আকৃতির বিশেষ কারণ ব্যতীত কোন প্রকার রূপান্তর হইবার সম্ভাবনা থাকে না। একটী কাচের দণ্ড, পশমি বস্ত্রে ঘর্ষণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ডের সন্নিহিত করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তড়িৎশক্তির দ্বারা পদার্থদিগের এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। তড়িৎ শক্তি নানাবিধ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। লৌহ দ্বারাই চুম্বক শক্তির অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। চুম্বকের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, ইহাকে লৌহ ব্যতীত, অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করিতে দেখা যায় না। চুম্বক শক্তিবিশিষ্ট এক টুকরা লৌহ কিম্বা ইহার তার, সূত্র দ্বারা আবদ্ধ করিয়া অথবা অন্য কোন অবলম্বনে বায়ুতে রাখিয়া দিলে, ইহার অন্তবিশেষ উত্তর এবং দক্ষিণদিকে লক্ষ্য করিবে। যে অন্ত উত্তরদিকে থাকিবে, তাহাকে যতই পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হইবেক, সে কখন দিক্ ভুলিবে না।

যে কোন পদার্থ বায়ুতে প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা বায়ু অপেক্ষা লঘু না হইলে তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে পতিত হইয়া যায়। এই ঘটনাকে মাধ্যাকর্ষণ কহে।

প্রত্যেক পদার্থের অণুর মধ্যে এক প্রকার আকর্ষণীশক্তি আছে, তদ্দ্বারা তাহাদের পরমাণুদিগকে একত্রিত করিয়া রাখে। এই আকর্ষণী শক্তির ন্যূনাধিক্যে পদার্থের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। রাসায়নিক শক্তি দ্বারা পদার্থের আকৃতি এবং গঠনের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, যেমন স্থানান্তরে চূণ ও হরিদ্রার সংযোগোত্থিত যৌগিক পদার্থ উক্ত হইয়াছে। অথবা কড়িতে নেবুর রস প্রদান করিলে ইহা দ্রবীভূত হইয়া যায়। যেমন ভূবায়ু বক্ষঃগহ্বরে প্রবেশ করিয়া, এই শক্তির দ্বারা শৈরিক শোণিতস্থ অঙ্গারের সহিত যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করিয়া থাকে। পৃথিবীতে যে সকল পদার্থের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে, তথায় রসায়ন শক্তি তাহার নিদান বলিয়া কথিত হয়। এই শক্তি ব্যতীত কি জড়, কি জড় চেতন, কোন পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভাবনীয় নহে।

মহাকারণের সূক্ষ্ম। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে, জড় পদার্থ এবং উপরোক্ত ভৌতিক এবং রাসায়নিক শক্তি দ্বারা জগতের যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি হইয়াছে এবং কেহ কেহ তাহা অস্বীকার করিয়া একটী পদার্থ এবং

একটী শক্তি প্রত্যেক পদার্থোৎপত্তির কারণ বলিয়া সাব্যস্থ করেন। পদার্থ সম্বন্ধে বার বার দৃষ্টান্ত দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, তাহারা শক্তির অবস্থা দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন কোন পণ্ডিতেরা সূর্য্য রশ্মি বিশ্লিষ্ট করিয়া বিবিধ রূঢ় পদার্থদিগের সমধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন এবং কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে যে সকল পদার্থ রূঢ় বলিয়া অবধারিত ছিল—যথা জল, বায়ু ইত্যাদি, তাহা অধুনা যৌগিক পদার্থ শব্দে অভিহিত হইতেছে। কে বলিতে পারে যে, কোন্ দিন কোন্ পণ্ডিত বর্ত্তমান রূঢ় পদার্থদিগের যৌগিক ধর্ম্ম আবিস্কার করিয়া রসায়ন শাস্ত্রের পূর্ণ সংস্কার করিবেন। জগতের যৌগিক পদার্থদিগের ধর্ম্ম দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করেন যে, ইহার আদিতে একটী মাত্র পদার্থ আছে। সেই পদার্থের বিবিধ শক্তি যাহা অদ্যাপি অজ্ঞাত রহিয়াছে, তাহা দ্বারা নানাবিধ আকারে সকল্প হইয়া থাকে। হাইড্রোজেন, অকসিজেন ও নাইট্রোজেনাদি রূঢ় পদার্থ সকল দুই বৎসর পূর্ব্বে বাষ্পীয় পদার্থ বলিয়া উল্লিখিত হইত, কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে, তাহাদের প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। হাইড্রোজেনের আকৃতি কঠিন এবং তদবস্থায় ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে ধাতুর ন্যায় শব্দ হইয়া থাকে। যে সকল রূঢ় পদার্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাদের অধ্যয়ন করিতে হইলে হাইড্রোজেনকেই আদি বলিয়া গণনা করা হয়; তাহা ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। হাইড্রোজেনকে পরিত্যাগ করিলে সমুদয় রসায়ন শাস্ত্রই তমসাবৃত হইয়া যাইবে। এই নিমিত্তই হাইড্রোজেন, পদার্থবৃন্দের প্রথম পদার্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যদ্যপি তাহাই হয়, তাহা হইলে শক্তি সংযোগে ইহার দ্বারাই অন্যান্য সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্থ করা না যাইবে কেন? যেমন বীজ হইতে কাণ্ড, প্রকাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পুষ্প ও ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। বীজের সহিত কাণ্ডাদির কোন সাদৃশ্য হইতে পারে না। সাদৃশ্য হইল না বলিয়া স্বতন্ত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। হাইড্রোজেনও সেইরূপ এই জগৎ রচনার বীজ স্বরূপ, কিন্তু পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পদার্থ ব্যতীত বিবিধ শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে; তাহারা কি প্রকার? এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক শক্তি প্রত্যেক স্বতন্ত্র শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে। যথা, রসায়ন শক্তি দ্বারা উত্তাপ ও তড়িৎ, উত্তাপ দ্বারা রসায়ন ও তড়িৎশক্তি, তড়িৎ দ্বারা রসায়ন. উত্তাপ এবং চুম্বক শক্তি দৃশ্যমান হইয়া

থাকে। মাধ্যাকর্ষণ, উত্তাপের ন্যূনাধিক্যের ফল স্বরূপ বলিলে ভুল হইবে না। এই কারণে শক্তি সম্বন্ধেও এক আদি শক্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে। যদ্যপি আমরা রাসায়নিক শক্তি হইতে পরীক্ষা আরম্ভ করি, তাহা হইলে ইহার দ্বিতীয়াবস্থায় উত্তাপ ও আলোক প্রতীয়মান হইবে। এই উত্তাপের অবস্থান্তরে তড়িতের উৎপত্তি হয় এবং তড়িৎ হইতে চুম্বক শক্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে। যখন শক্তি সকলের এই প্রকার ধর্ম্ম জ্ঞাত হওয়া যায়, তখন স্বতন্ত্র শক্তিদিগকে এক শক্তির অবস্থান্তর মাত্র বলিয়া নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও আর একটী প্রশ্ন হইতেছে। যখন শক্তি ব্যতীত পদার্থ ও পদার্থ ব্যতীত শক্তি বুঝিতে পারা যায় না, তখন কেবল আনুমানিক বিচার দ্বারা এই প্রকার মীমাংসা করা নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে প্রত্যক্ষ বিচার আর চলিতে পারে না। কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত যাহা হয়, তাহারই একটী সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হয়। এই নিমিত্ত হয় এক পদার্থ এবং একটী শক্তি অথবা কেবল এক শক্তিই স্বীকার করিতে হইবে।

পদার্থ লইয়া এ পর্য্যন্ত বিচার শক্তি পরিচালিত করিতে পারিয়াছি কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, পদার্থ বাস্তবিক কি পদার্থ? যাহার গুরুত্ব আছে, তাহাদেরই পদার্থ কহা যাইবে অথবা যাহার তাহা নাই, তাহাকেই পদার্থ বলা যুক্তিসঙ্গত। এ মীমাংসা অতি গুরুতর। পদার্থ বলিয়া যাহা কথিত হয়, তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় দৃশ্য বস্তুর নির্দ্দেশক শব্দ মাত্র। যেমন ইতিপূর্ব্বে জলের দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দ্বিবিধ ভাবে অবস্থিতি করে। যথা জল এবং বরফ; কিন্তু ইহাও কথিত হইয়াছে যে, বাষ্প বলিয়া ইহার আর একটী রূপান্তর আছে। বস্তুতঃ জলের এই ত্রিবিধাবস্থায় গুরুত্ব আছে, সুতরাং ইহা পদার্থ। পদার্থ বলিয়া যাহা কিছু আমরা পরিগণিত করিয়া থাকি, তাহা কোথা হইতে এবং কিরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে কোন ধারাবাহিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহা কিছু কথিত হয়, তাহা তদবস্থার কথা মাত্র। সুতরাং আদি কারণ সম্বন্ধে কোন কথাই বলা যাইতে পারে না। যদিও পরীক্ষা এবং বিচার দ্বারা এক পদার্থ এবং এক শক্তি পর্য্যন্ত উপস্থিত হওয়া গিয়াছে কিন্তু তথায় আসিয়াও প্রশ্ন হইবে যে, পদার্থ বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ আছে কি না? আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি, পদার্থের যে কোন প্রকার রূপান্তর বা অবস্থান্তর সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা পদার্থের দ্বারা কখন

সম্পন্ন হইতে পারে না। উত্তাপ শক্তিই তাহার নিদান। জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ অক্‌সিজেন এবং হাইড্রোজেন নামক দুইটী বাষ্পীয় পদার্থে অগ্ন্যুত্তাপ প্রদান করিলে তাহারা পরস্পর মিশ্রিত হইয়া জল উৎপন্ন করিয়া থাকে। যদ্যপি এই জল পুনরায় উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে বাষ্প হয় এবং বাষ্পে অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে অক্‌সিজেন এবং হাই-ড্রোজেন পূর্ব্বাকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। যে অবস্থায় এই পরীক্ষা সম্পন্ন করা যায়, তাহার বিপর্য্যয় করিলে যে কি প্রকার পরীক্ষা ফল হইবে, তাহা আমা-দের পক্ষে চিন্তার বিষয় নহে। কারণ প্রত্যেক পরীক্ষা অসংখ্য কারণের দ্বারা সম্বদ্ধ রহিয়াছে। যে সকল কারণ আমরা এক্ষণে অবগত হইয়াছি, তাহাও সুচারুরূপে শিক্ষা করিবার অধিকার হয় নাই। পদার্থের অবস্থা সম্বন্ধে ভূবায়ু এবং উত্তাপই প্রধান কারণ বলিয়া এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু উত্তাপের শক্তি কি, তাহা কে বলিতে পারেন? আমরা পরীক্ষা করিয়া যাহা দেখিয়াছি, সেই পরীক্ষা ফল, ভিত্তি করিয়া বিচার বুদ্ধি দ্বারা তাহার চরমাবস্থা অনুমান করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা অতিশয় স্থূল মীমাংসা। যে হেতু স্বভাব বলিয়া যাহা জ্ঞান করা যায়, তাহার মূল্য কতদূর? স্বভাব বলি যাহাকে, তাহারই স্থির নাই। স্বভাব বলিলেও জগতের আংশিক ভাব মাত্র বুঝাইয়া দেয়। স্বাভাবি কাবস্থার উত্তাপের কতদূর পরাক্রম, তাহা মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত। উত্তাপের জ্ঞান সূর্য্য হইতে কথঞ্চিৎ লাভ করা যাইতে পারে। যে উত্তাপ পৃথিবীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা তাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছি না। কারণ সূর্য্যের উত্তাপ যাহা, তাহার কোটি অংশের এক অংশও পৃথিবীতে উপলব্ধি করা যায় না। এক্ষণে উত্তাপের দ্বারা পদার্থ সকল যে কি অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা অনুমানের অতীত কথা।

ভূবায়ুর কার্য্য সম্বন্ধে স্থির হইয়াছে যে, পদার্থের প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চ স্থানে ইহার ৭৷৷০ সের গুরুত্ব পতিত হয়। যে পদার্থে উক্ত গুরুত্বের যতগুণ বৃদ্ধি হইবে, সেই পদার্থের আকৃতি তদনুযায়ী রূপান্তর হইয়া যাইবে। ভূবায়ু পদার্থের সর্ব্বদিকেই সঞ্চাপন ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত উত্তাপের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। পরীক্ষায় যাহা দৃষ্ট হয়, সেই জন্য তাহাকেও আংশিক সিদ্ধান্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই আংশিক দর্শন ফলকে নিয়ম (law) কহে; সুতরাং, তাহা অনন্ত হইতে পারে না। কারণ তাহা কোন বিশেষ অবস্থায়, কোন বিশেষ প্রকার কার্য্য করিতে সক্ষম এবং সেই অবস্থার ব্যতিক্রম

ঘটিয়া যাইলে, তাহার কার্য্যও বিপর্য্যয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। উত্তাপের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, ইহা দ্বারা পদার্থ বিস্তৃত অর্থাৎ আয়তনে বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং উত্তাপ হরণ করিয়া লইলে, তাহা সঙ্কুচিত হইয়া যায় ; কিন্তু এই নিয়ম সর্ব্বত্রে প্রযুজ্য হইতে পারে না। জল সম্বন্ধে ইহার নিয়ম বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। জল উত্তপ্ত হইলে বাষ্পাকারে পরিণত হয়। যে সময় ইহাতে স্ফুটন কার্য্য আরম্ভ হয়, তাহাকে ১০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড * কহে। জলের স্ফুটনাবস্থা হইতে তাপ হরণ করিলে, ইহার আয়তন সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। কিন্তু যে সময়ে তাপমানযন্ত্রে 0 চিহ্ন লক্ষিত হয়, তখন জল জমিয়া বরফ হয় এবং উহার আয়তন বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই জন্য শীতপ্রধান দেশে জলাশয়ের উপরিভাগের জল জমিয়া যাইলেও নিম্নে জল থাকা প্রযুক্ত জলজন্তু সকল জীবিত থাকিতে পারে। এই নিমিত্ত স্বাভাবিক নিয়মকেও আংশিক সত্য বলিয়া গণনা করা যায়। যে কোন নিয়ম লইয়া এই প্রকার বিচার করা যায়, তাহা হইতেই অবস্থান্তরে বিপরীত কার্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে। যদ্যপি সমুদয় সূত্র সকল এই প্রকার দোষ সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা কিরূপে অনন্তের মীমাংসা করা যুক্তিসঙ্গত হইবে। পদার্থ এবং উত্তাপ বা শক্তি, মিশ্রিত, ভাবাপন্ন হইয়াও তাহাদের সহসা দুইটী স্বতন্ত্র বলিয়া জ্ঞান করা যায় ; কিন্তু বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিলে এই অনুমান হয় যে, পদার্থ বলিয়া যাহা প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা বাস্তবিক শক্তির বিকাশ মাত্র। জল যখন বরফ, তখন তাহা জলেরই অবস্থা বলিয়া যদিও উল্লিখিত হয় বটে, কিন্তু তাহা উত্তাপের অবস্থার ফল এবং বাষ্পাকার ধারণ করিলে তথায়ও উত্তাপই আদি কারণ থাকে। উত্তাপ পরিত্যাগ করিলে জল থাকিতে পারে কি না, অথবা জল পরিত্যাগ করিলে, উত্তাপ থাকিতে পারে কি না, তাহা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, জড় পদার্থের মূলে কি আছে, তাহা স্থির নির্ণয়

---

* তাপমান যন্ত্র (thermometer) দ্বারা উত্তাপ পরিমাণ করা যায়। ইহা নানাবিধ কিন্তু একপ্রকার তাপমান যন্ত্র আছে, যাহা কৈশিক ছিদ্র বিশিষ্ট কাচের নলের মধ্যে পারদ ধাতু প্রবিষ্ট করিয়া প্রস্তুত করা যায়। ইহা বিবিধ নামে অভিহিত। যথা সেণ্টিগ্রেড, ফ্যারাণহীট এবং রোমার। সেণ্টিগ্রেড তাপমান যন্ত্রের ১০০ মাত্রায় জল স্ফুটিত হইয়া থাকে ; ফ্যারাণহীটে ২১২ এবং রোমারে ৮০। এই বিভিন্ন মাপ দেখিয়া জলের স্ফুটনাবস্থার কোন প্রভেদ হয় না, এ কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

করিতে হইবে। রূঢ় পদার্থ হইতে অগ্রসর হইতে হইলে, শক্তির অধিকারে যাইতে হয়। শক্তিরা বহু ভাবাপন্ন হইয়াও এক কারণে তাহাদের প্রত্যেকের উৎপত্তি হওয়া সম্ভাবনা, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে, শক্তি কি বস্তু?

শাস্ত্রকারেরা অনুমান করেন যে, পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানে এক প্রকার পদার্থ আছে, যাহাকে আমরা ব্যোম * শব্দে অভিহিত করিলাম। ইংরাজীতে ইহাকে ইথার (ether) কহে।

ব্যোম বা আকাশ পর্য্যন্ত উঠিয়া, মনুষ্যের বুদ্ধি এবং জ্ঞান পরাভূত হইয়া ইহাকে সকল পদার্থের মূলাধার বলিয়া স্বীকার করে। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতেছে যে, এই ব্যোম পর্য্যন্তই কি সীমা? ব্যোম কি অনাদি? তাহার

---

* আমাদের দেশে পঞ্চভূতের কথা প্রচলিত আছে, যথা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম, যাহা হইতে যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন। এ মতটী ইউরোপে পুরাতন কালে গ্রাহ্য হইত। আধুনিক বিজ্ঞানালোকে দেখা যাইতেছে যে, যে পঞ্চভূতের কথা কথিত হইত, তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ ক্ষিতি শব্দে পৃথিবী বা মৃত্তিকা; ইহা এক জাতীয় অর্থাৎ রূঢ় ধর্ম্মাবলম্বী নহে। ইহা নানাপ্রকার রূঢ় পদার্থ মিশ্রণে যৌগিকাবস্থায় অবস্থিতি করে, সুতরাং ভূত বা আদি কারণ বলায় ভুল হইয়া থাকে। অপ্ সম্বন্ধেও তদ্রূপ, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তেজকে ভূত বলায় দোষ জন্মিয়াছে, যেহেতু ইহা শক্তিবিশেষ; কোন প্রকার পদার্থ নহে। মরুৎ বায়ু তাহাও আমরা বলিয়াছি যে, ইহা যৌগিকও নহে, মিশ্র পদার্থ; ব্যোম বা আকাশ তাহার কথাই নাই, আকাশ কিছুই নহে, তাহা পদার্থ বা ভূত হইতে পারে না।

আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা আপাততঃ ইংরাজদিগের নিকট, সুতরাং তাঁহাদের মীমাংসার উপর কলমবাজী করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু আমরা কোন কথা না বুঝিয়া মতামত প্রকাশ করিতে পারি নাই। অতএব এই বিষয়টী লইয়াও আমরা কিছু চিন্তা করিয়াছি, চিন্তার ফল যাহা, তাহা এইস্থানে লিপিবদ্ধ করা গেল।

ইংরাজী বৈজ্ঞানিক মীমাংসা যাহা, তাহা আমরা জড়শাস্ত্রে আভাস দিয়াছি। বিচার করিতে গেলে তাহা হইতে কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং কেবল বিশ্বাস করিয়া লইতে হয়।

যৌগিক পদার্থ হইতে রূঢ় পদার্থে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু তথা হইতে আর গমনের উপায় নাই বা পরীক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। তখন রূঢ় পদার্থ লইয়া বিচার ঐ স্থানেই বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। শক্তির কথা বর্ণনা করা কাহারও শক্তিতে সংকুলান হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক মীমাংসা দ্বারা প্রকৃত পক্ষে সন্তোষ লাভ করা যায় না। কিন্তু দেখা যাক, আমাদের পঞ্চভূতের ভিতর কোন বৈজ্ঞানিক সারতত্ত্ব নিহিত আছে কি না?

কি কোন কারণ নাই? কথিত হয় যে, ব্যোম স্পন্দিত হইয়া, আধারবিশেষের দ্বারা বিবিধ শক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। এই ভাবে ব্যোমই আদি কারণ; কিন্তু তাহা হইলে জড়েরই রাজ্য হইত। পৃথিবীতে যখন জড়-চেতন পদার্থ দেখা যাইতেছে, তখন কেবল জড় স্বীকার করিয়া পলাইবার উপায় নাই। এই নিমিত্ত ব্যোমের আদি কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

মহাকারণের কারণ। এক্ষণে কথা হইতেছে, মহাকারণের সূক্ষ্মকে ইথার (ether) বা ব্যোম বলিয়া যাহা কথিত হইল, তাহাকে শক্তিরই আদি কারণ বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন কিন্তু পদার্থের আদি কারণ নির্ণয় হইতেছে না, এই নিমিত্ত শক্তি হইতেই পদার্থ এবং উহা নিজের ব্যোমপ্রসূত হইয়া থাকে। এক্ষণে ব্যোমের উৎপত্তি কি রূপে সাধিত হইয়া থাকে, তাহা নির্ণয় করা মহাকারণের কারণ অন্তর্গত। আকাশ কথাটী প্রথমতঃ সম্পূর্ণ আনুমানিক জ্ঞান মাত্র। ইহাকে কেবল জ্ঞানে বুঝিতে পারা যায় বটে কিন্তু বিজ্ঞানে হইতে পারে না। ব্যোমের পর আর কথা নাই আর বাক্য নাই, আর ভাব নাই, আর বলা কহা কিছুই নাই। এক পক্ষে আকাশের ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, আর এক পক্ষে তাহাও আছে। উর্দ্ধে যাইতে হইলে আর কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু নিম্নে আসিলে ক্রমান্বয়ে স্থূলের স্থূল কার্য্যে উপস্থিত হওয়া যায়। অতএব এই আকাশের অন্য কোনরূপ ধর্ম্ম প্রাপ্ত না হইয়া, কেবল মাত্র একপ্রকার জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা উপলব্ধির বিষয় বটে। এই জ্ঞানই ব্যোমের উৎপত্তির কারণ।

এক্ষণে বিচার করিতে হইবে যে, জ্ঞান হইতে ব্যোমের উৎপত্তি কিরূপে সাধিত হয়? এই জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান নহে। এই জ্ঞানকে চিৎশক্তি কহে।

সচরাচর আমরা পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থা বুঝিয়া থাকি। তদ্বিষয়ে কাহার ভ্রম জন্মিতে পারে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও পদার্থের ত্রিবিধ অবস্থা বর্ণনা করেন। আমাদের বোধ হয়, আর্য্যেরা এই ত্রিবিধাবস্থায়, পার্থিব ব্যতীত পদার্থদিগকে, প্রথম বিভাগ রূপে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ক্ষিতি অর্থাৎ পদার্থের কঠিনাবস্থা, অপ অর্থাৎ তরলাবস্থা, মরুৎ অর্থাৎ বাষ্পীয়াবস্থা, তেজ অর্থাৎ শক্তি এবং ব্যোম অর্থাৎ আকাশ। এই পঞ্চ বিভাগের দ্বারা সমুদয় জড় জগৎ সাব্যস্ত হইতেছে। ফলে জড় জগৎ এই স্থানেই সমাপ্ত হইল। ইংরাজী মতেও তাহাই করা হয়, কিন্তু তাঁহারা অদ্যাপি, হিন্দু আর্য্যদিগের ন্যায় সুন্দর রূপে বিভাগ করিতে পারেন নাই, বোধ হয় আর কিছু দিন পরে তাহা দেখা যাইবে। কঠিন, তরল, বাষ্প, তেজ এবং আকাশ বলিলে সমুদয় জড় পদার্থের আদ্যন্ত বুঝিতে পারা যায়। বোধ হয় তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

চিৎশক্তি সচ্চিদানন্দের দ্বিতীয় রূপ। কেন না তিনি সৎ, চিৎ এবং আনন্দ, এই ত্রিবিধ শব্দের একত্রিভূতরূপে বিরাজ করিতেছেন।

ব্যোমের আদিতেও জ্ঞান এবং স্থূলের স্থূলে পর্য্যন্তও জ্ঞান। জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নাই। কে বলিল যে ইহা উত্তাপ? জ্ঞান। কে বলিল যে ইহা অক্সিজেন? জ্ঞান। কে বলিল যে ইহা জল? জ্ঞান। কে বলিল যে ইহা মনুষ্য; জ্ঞান। এইরূপে সকল বিষয়ে জ্ঞানেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত থাকে। অতএব জ্ঞান বা চিৎশক্তিই মহাকারণের কারণস্বরূপ।

মহাকারণের মহাকারণ। পূর্ব্বে কথিত হইল যে, চিৎ বা জ্ঞানই ব্যোমের উৎপত্তির কারণ। এক্ষণে স্থির করিতে হইবে যে, এই জ্ঞান কাহাকে অবলম্বন করিয়া আছে? যখন স্পষ্ট জ্ঞানের কার্য্য সর্ব্বতোভাবে দেখা যাইতেছে, তখন তাহার অবলম্বন অস্বীকার করা যায় না। এই জ্ঞানের কারণ নির্ণয় করাকে, মহাকারণের মহাকারণ কহে।

যাঁহা হইতে এই জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাঁহাকেই জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে। তিনিই সৎ, তিনি না থাকিলে জ্ঞান থাকিত না, যেমন নিদ্রাকালে আমরা অজ্ঞান হইয়া থাকি। তখন আমাদের কোন জ্ঞান থাকে না, তাহা আমরা সকলেই প্রতিদিন অনুভব করিয়া থাকি; কিন্তু আমাদের দেহে চৈতন্য থাকা হেতু জাগ্রতাবস্থায় আবার জ্ঞানের কার্য্য হইতে থাকে। সেই চৈতন্য বা সৎ, জ্ঞানের সময়ে থাকেন এবং যখন জ্ঞান না থাকে, তখনও তিনি থাকেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ বলিয়া কথিত হয়, মানুষ মরিয়া গেলে জ্ঞানের কার্য্য আর হয় না কিন্তু অজ্ঞান হইলে মানুষ মরে না, এই জন্য জ্ঞানের আদিতে আরও কিছু স্বীকার করিতে হয়, তিনিই সৎ বা ব্রহ্ম।

চিৎ বা জ্ঞানের কারণ ভাব যে মুহূর্ত্তে ধারণা হয়, সেই মুহূর্ত্তে আনন্দ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা ফল স্বরূপ জানিতে হইবে। অর্থাৎ স্থূলের স্থূল হইতে ক্রমান্বয়ে বিচার করিতে করিতে, যখন মহাকারণের মহাকারণ পর্য্যন্ত উপস্থিত হওয়া যায়, তখন প্রাণে অপার শান্তি ও সুখানুভব হইয়া থাকে; বিচার বুদ্ধি স্থগিত হইয়া যায়, এবং সঙ্কল্প বিকল্প শেষ হইয়া আসে; সে সময়ে কার্য্য কারণ জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, মনের এই অবস্থা সংঘটিত হইলে তাহাকে আনন্দ কহে।

চৈতন্যশাস্ত্র।

—*—

কারণের কারণে কথিত হইয়াছে যে, মনুষ্যের৷ দুইভাগে বিভক্ত, যথা জড় এবং চেতন। আমরা জড়ভাব লইয়া ক্রমান্বয়ে মহাকারণের মহাকারণ পর্য্যন্ত যাইয়া ব্রহ্মনিরূপণ করিয়াছি। যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই প্রকার বিচার করা হইয়াছে, তাহাকে বিশ্লেষণ (analysis) কহে। চৈতন্য শাস্ত্রা-ধ্যয়ন করিতে হইলে, সংশ্লেষণ (synthesis) প্রক্রিয়ায় বিচার করা কর্ত্তব্য। সৎ বা ব্রহ্ম. জ্ঞানের নিদান স্বরূপ। জ্ঞান হইতে যখন ব্যোম, ব্যোম হইতে শক্তি, শক্তি হইতে রূঢ় পদার্থ এবং রূঢ় পদার্থ হইতে যৌগিকপদার্থদিগের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; তখন এতদ্‌সমুদয় সেই ‘সৎ’ এরই বিকাশ না বলা যাইবে কেন ? যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড হইতে শাখা, শাখা হইতে প্রশাখা, প্রশাখা হইতে পল্লব, তদন্তর ফুল, ফুলের পর ফল, ফলের অভ্যন্তরে শাঁস, তাহার পর বীজ। এই বীজে যে দ্রব্যটী থাকে, তাহার অভ্যন্তরে বৃক্ষের সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিহিত ভাবে অবস্থিতি করে। অর্থাৎ সেই পদার্থটী হইতেই বৃক্ষের নানাবিধ উপাদান ও গঠন জন্মিয়া থাকে। বিচার করিয়া দেখিলে এ কথা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। বীজের অন্তর্গত যে সত্য বা অসত্য আছে, তাহা কাণ্ডের স্থূল ভাবে পরিলক্ষিত হইবে না, তাহা দেখিতে হইলে মহাকারণের মহাকারণে দেখিতে হইবে। অর্থাৎ যাহাকে যে স্থানে দেখা যায়, তাহাকে সেই স্থানেই সর্ব্বদা দেখিতে হইবে। ফলের শাঁস কখন প্রকাণ্ডের বাহিরে কিম্বা অভ্যন্তরে পাওয়া যায় না। তাহা ফলেই অন্বেষণ করিতে হয়। আম গাছ অবলেহন করিলে আম খাওয়া হয় না, কিন্তু আম গাছ এবং আমের সত্ত্বা হিসাবে কেহ বিভিন্ন নহে। যেমন লৌহ অস্ত্রে যে ভাবে রহিয়াছে, হিরাকসে সে ভাবে থাকে না , এখানে সম্পূর্ণ প্রভেদ দেখা যাইতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি অস্ত্রের এবং হিরাকসের লৌহ অদ্বিতীয় নহে ? অস্ত্রে, লৌহ স্ব-ভাবে এবং হিরাকসে যৌগিক অবস্থায় রহিয়াছে। স্ব-ভাব এবং যৌগিকভাব স্থূলে এক নহে ; এই নিমিত্ত প্রভেদ দেখা যায়। অতএব বিচারকালীন এই নিয়মটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিলে কস্মিন্ কালে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে না। অতএব প্রত্যেক পদার্থেরই ‘সৎ’ এর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়।

অনেক স্থূলদর্শী পণ্ডিতেরা, যাঁহাদের সংখ্যা সংখ্যাবাচক শব্দে নির্ণয় করা যায় না, বলেন যে, যদ্যপি সকল বস্তুতে সৎ অথবা ব্রহ্ম থাকেন, তাহা হইলে অন্যায়, অসত্যের ন্যায় কার্য্য হয় কেন? সৎ যিনি তিনি কখন অসৎ নহেন। তিনি মঙ্গলস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার দ্বারা অমঙ্গল বা অজ্ঞানজনক কার্য্যের কখন সম্ভাবনা হয় না। এই প্রস্তাবটী নিতান্ত বালকবৎ অজ্ঞানের উচ্ছ্বাসমাত্র। কারণ যাহারা জড়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, এক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য কিরূপে উৎপাদন হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি আজ বালক, কাল যুবা, পরশ্ব প্রৌঢ়, পরে বৃদ্ধ, তাহা কিরূপে হয়? এই অবস্থান্তর একজনেরই স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু অবস্থা পরম্পরা বিচার করিয়া দেখিলে কখনই মিলিবে না। বালকের অবস্থা বৃদ্ধের সহিত কি প্রকারে সামঞ্জস্য করা যাইবে? অথবা, নাইট্রোজেন নামক রূঢ় পদার্থ টী, যখন অঙ্গার এবং হাইড্রোজেন ঘটিত পদার্থনিকরের সহিত যোগসাধন করে, তখন তাহারা বলকারক পদার্থ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যথা দুগ্ধ, মাংস, ডাল ইত্যাদি। কিন্তু এই নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন এবং অঙ্গার ঘটিত আর একটী যৌগিক আছে, যাহাকে হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিড বলে; তাহার ন্যায় বিষাক্ত পদার্থ জগতে আর আছে কি না বলা যায় না। অতএব পদার্থের দোষ গুণ অবস্থার প্রতি নির্ভর করিতেছে, তাহা জড়-শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে কোনমতে বুঝা যায় না।

প্রাণিজগৎ একপ্রকার পদার্থ দ্বারা গঠিত। কিন্তু যৌগিকাবস্থায়, কি যৌগিকদিগের কার্য্য সম্বন্ধে, কি রূঢ় এবং তদতীতাবস্থায় কুত্রাপি তাহাদের প্রভেদ পরিদৃশ্যমান হয় না। কিন্তু স্থূলের স্থূলে এক বলিয়া কি পরিগণিত করা যাইতে পারে? কখনই নহে। কারণ মনুষ্য এবং গো ও অশ্বের নানাবিধ বিষয়ে মিল আছে, সেই নিমিত্ত মনুষ্য এবং গো অশ্ব এক প্রকার বলা যায় না। যদিও স্থূলের স্থূলে উহাদের পরস্পর পার্থক্য পূর্ণ পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম কারণ এবং মহাকারণাদিতে সকলেই এক এবং অদ্বিতীয়। এই নিমিত্ত এক অদ্বিতীয় সৎ জগতের যাবতীয় পদার্থ এবং অপদার্থের মূলে অবিচলিত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। রামকৃষ্ণদেব তন্নিমিত্তই কহিতেন।

"সাপ হ'য়ে খাই আমি রোঝা হ'য়ে ঝাড়ি।
হাকিম হ'য়ে হুকুম দিই পেয়াদা হ'য়ে মারি॥"

ব্রহ্ম নিরূপণের দুই প্রকার লক্ষণ আছে। উহাকে স্বরূপ এবং তটস্থ লক্ষণ কহে। যেমন জলের মধ্যে সূর্য্য বা চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া প্রকৃত সূর্য্য এবং চন্দ্র নিরূপিত হইয়া থাকে। ছায়া সূর্য্য চন্দ্র এক মতে প্রকৃত নহে, তাহা প্রকৃত বস্তুর ছায়া মাত্র। কারণ তদ্দ্বারা আলোক এবং উত্তাপ নির্গত হইতে পারে না; কিন্তু প্রকৃত সূর্য্য চন্দ্র হইতে তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রূপে ছায়াকে অসৎ বা মিথ্যা কহা যায় এবং এই মিথ্যাভাব যদ্ কর্ত্তৃক পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে, তাহাকে সৎ কহে, অর্থাৎ 'সৎ' এর সত্ত্বা হেতু অসৎ বা মিথ্যাকে 'সৎ'র ন্যায় দেখায়, যেমন মরীচিকা। উত্তপ্ত বালুকা পূর্ণ দীর্ঘ প্রান্তরে, মধ্যাহ্নকালে দূর হইতে বারি ভ্রম জন্মাইয়া থাকে; কিন্তু উহার নিকটে গমন করিলে মরীচিকা বিদূরীভূত হইয়া যায়। এই বারি ভ্রম, বারি আছে বলিয়াই জন্মিতে পারে। বারি না থাকিলে এ প্রকার ভ্রম হইতে পারিত না। এই স্থানে মরীচিকা অসৎ বা মিথ্যা এবং বারি সৎ বা সত্য।

স্থূলের স্থূল হইতে মহাকারণের সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত আমরা এই জড় সংসার নানাবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেখিয়াছি বটে কিন্তু তদ্দ্বারা কি তাৎপর্য্য বহির্গত হইয়াছে? আমরা কোনও পদার্থকে প্রকৃত পক্ষে কোন বিশেষ শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিতে পারি নাই। যখন যাহাকে যেমন দেখাইয়াছে, তখনই তদ্রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে যে তাহা কি, তদ্বিষয় নিরূপন করিতেই মহাকারণ পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হওয়া গিয়াছে ও সে স্থানে আসিয়া বিচার স্থগিত হইয়াছে, এই জন্য তাহাকেই সত্য বলিয়া কথিত হইতে পারে।

"সৎ"এর ধ্বংশ নাই, কিন্তু জগতের পদার্থদিগের এক পক্ষীয় ধ্বংশ আছে। যথা মনুষ্যাদি জন্মায় এবং মরিয়া যায়। এ স্থানে যৌগিকাবস্থায় ধ্বংশ আছে কিন্তু রূঢ় পদার্থদিগের তাহা নাই। অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক সংযোগসম্ভূত কার্য্যটীর বিনাশ হয়, কিন্তু ভূতের নাশ হইতে পারে না। এই দৃষ্টান্তে ভূতেরা সত্য এবং তৎ যৌগিকেরা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করা হইতেছে। যদ্দ্বারা মিথ্যা বস্তু সত্যবৎ প্রতীতি জন্মিতেছে, তাহাকে সৎ কহে। কিন্তু জড় শাস্ত্র দ্বারা আমরা অবগত হইয়াছি যে, রূঢ় পদার্থও শক্তির সহিত তুলনায় অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে; শক্তি জ্ঞানে এবং জ্ঞান 'সৎ' এ পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত স্থূলের স্থূল হইতে মহাকারণের সূক্ষ্মাবধি মিথ্যা বা

মায়া এবং মহাকারণের কারণ ও মহাকারণের মহাকারণ অর্থাৎ চিৎ এবং "সৎ" এর স্বরূপ জ্ঞানকেই স্বরূপ-লক্ষণ কহে। অর্থাৎ যিনি সত্য এবং জ্ঞান স্বরূপ, যিনি উপাধিবর্জ্জিত শুদ্ধাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম। উপাধিবিবর্জ্জিত বলিবার হেতু এই যে, তাঁহার স্বরূপ লক্ষণে অর্থাৎ মহাকারণের কারণ এবং মহাকারণের মহাকারণে, কোন উপাধি বা গুণবাচক আখ্যাবিশেষ প্রদান করা যায় না, এজন্য তিনিই ব্রহ্ম। সৎ বা সত্য, নিত্য, ইহাতে কি উপাধি প্রযুজ্য হইতে পারে? সত্য এবং নিত্য, অসত্য এবং অনিত্যবোধক শব্দের বিপরীত ভাব মাত্র। মিথ্যায় গুণের লক্ষণ আছে। যেমন বরফ, শীতল গুণযুক্ত কিন্তু জলে তাহা থাকে না, বাষ্পের ত কথাই নাই। এস্থানে বরফের এক গুণ এবং জলের আর এক গুণ অবগত হওয়া যাইতেছে। 'সৎ' এর কি গুণ? তাহা আমরা বর্ণনা করিতে অক্ষম, আমরা জানি না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যাহা মিথ্যা নহে, তাহাই সৎ। কতকগুলি গুণের দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। মিথ্যা যাহা নহে, তাহাই সৎ। এই নিমিত্ত ব্রহ্ম গুণবিরহিত ও উপাধিবিবর্জ্জিত।

সৎ বা ব্রহ্ম, তিনি মহাকারণের কারণ-স্বরূপ, গুণের কার্য্য মহাকারণের স্থূলে প্রতীয়মাণ হয়। এই নিমিত্ত তিনি গুণযুক্ত নহেন।

"সৎ"এ গুণ প্রয়োগ হইতে পারে না, তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানের দ্বারা সত্যাভাস হয় মাত্র, কিন্তু উপলব্ধি হইতে পারে না। যাহা উপলব্ধির বিষয় নহে, তাহা গুণযুক্ত হইবে কিরূপে? জ্ঞানেও গুণ নাই, ব্যোমেও গুণ নাই কিন্তু শক্তির উৎপত্তির কারণ ব্যোম, এই নিমিত্ত তাহাও গুণযুক্ত বলা হয়। আমাদের শাস্ত্রে ব্যোমের ধর্ম্ম, শব্দ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। শব্দ অর্থে জ্ঞান, এ স্থলে গুণ বোধক জ্ঞান, এই জন্য তাহাকে সৎ বলা যায় না; কিন্তু 'চিৎ' এর দ্বারা যে সত্য বোধ হয়, তাহা গুণবিরহিত, এই নিমিত্ত তিনি গুণাতীত। সৎকে এই লক্ষণ দ্বারা যখন লক্ষিত করা হয়, তখন উহাকে স্বরূপ লক্ষণ কহে। অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট করিয়া গুণানুসারে স্থূলের স্থূল হইতে মহাকারণের কারণ জ্ঞান লাভ করিয়া, যে সত্য বোধ লাভ করা যায়, তাহাকে স্বরূপ লক্ষণের ফল কহে।

সৎ হইতে পর্য্যায়ক্রমে অবরোহণ করিলে মহাকারণের স্থূলে, গুণের জ্ঞান সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই জ্ঞান বিবিধ বিচিত্ররূপে ক্রমেই প্রতীয়মান হয়, তাহা জড়শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। যথা, শক্তি, রূঢ় পদার্থ এবং তাহাদের

যৌগিক। এই শেষোক্ত অবস্থায় গুণের যে কি পর্য্যন্ত কার্য্য হয়, তাহা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করা যাইতেছে।

গুণই পদার্থ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। গুণ না থাকিলে পদার্থ থাকে না, সেই প্রকার যতক্ষণ জগৎ আছে, ততক্ষণ ব্রহ্মও আছেন। এই লক্ষণকে তটস্থ কহে। তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মের গুণ স্বীকার করিতে হয়। কারণ কথিত হইল যে, পদার্থ থাকিলেই গুণের বিকাশ হইবেই হইবে; কিন্তু তাহা না থাকিলে গুণও থাকিবে না। জগৎ আছে সুতরাং তিনিও আছেন, যখন জগৎ নাই তখন তিনিও নাই। এই লক্ষণে ব্রহ্মকে সগুণ-ব্রহ্ম কহা যায়।

স্বরূপ এবং তটস্থ লক্ষণ কিম্বা অনুলোম এবং বিলোম অথবা বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দুই প্রকার বিচারে, দুই প্রকার মীমাংসা হইয়া থাকে। স্থূলের স্থূল হইতে, মহাকারণের মহাকারণ, এক প্রকার জ্ঞান; মহাকারণ হইতে স্থূলের স্থূল পর্য্যন্ত, আর এক প্রকার জ্ঞান। এতদ্ব্যতীত তৃতীয় প্রকার জ্ঞান আছে, যাহা স্বরূপ এবং তটস্থ লক্ষণের যৌগিকবিশেষ। যথা বৃক্ষ হইতে প্রকাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, ফুল, ফল, শাঁস, বীজ,এবং বীজের শাঁস; ইহাকে বিশ্লেষণ বা স্বরূপ-লক্ষণ-বাচক প্রক্রিয়া কহে। কারণ বীজের শাঁস হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইবার কথা। পরে সংশ্লেষণ বা তটস্থ লক্ষণ দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, বীজ হইতে শাঁস, ফল, ফুল, পত্র, শাখা, প্রশাখা, কাণ্ড, মূল ইত্যাদি। এই স্থানে বৃক্ষের এক সত্বা সর্ব্বত্রে পরিদৃশ্যমান হইতেছে। ইহা কেবল জ্ঞানের কথা নহে। বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, তাহার ভুল নাই; কিন্তু বৃক্ষের শাখা প্রশাখা হইতেও স্বতন্ত্র বৃক্ষ জন্মিতে পারে। যখন বীজ ব্যতীত শাখা প্রশাখায় বৃক্ষের উৎপত্তি হইতেছে, তখন তন্মধ্যে বৃক্ষের এক প্রকার সত্বা অস্বীকার করা যায় না। যেমন মনুষ্য হইতে মনুষ্য হইতেছে, কিন্তু মরা মানুষ কখন জীবিত সন্তান উৎপাদন করিতে পারে না। চৈতন্য বস্তু যাহাতে আছে, তাহা হইতে সচেতন পদার্থের উৎপত্তি হইবার কথা। এই জন্য ব্রহ্মকে সগুণ কহা যায়।

কোন কোন মতে এই সগুণ ব্রহ্মকে ব্রহ্মপদে উল্লেখ না করিয়া, ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করা হয়। ঈশ্বর বলিলে "চিৎ" এর কার্য্য বুঝাইয়া থাকে চিৎ সৎকে অবলম্বন করিয়া আছেন। সুতরাং চিৎ, সৎ নহেন। এ কথা এক পক্ষীয় স্বরূপ-লক্ষণের কথা। "সৎ" আদি কারণ, তাঁহা হইতে যাহা হইয়াছে, হইতেছে, বা হইবে, তাহা তদ্‌কর্ত্তৃক প্রসূত হইতেছে বলিতেই হইবে। কেবল

বিচারের বিভাগ কার্য্যক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারে না। "চিৎ" জড় নহে, তাহা চৈতন্য বস্তু। কেন না চৈতন্য পদার্থ বলিয়া যাহা কথিত হয়, তাহা তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

মহাকারণের স্থূল ও সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত আমরা যেরূপ পরীক্ষা এবং বিচার করিয়া দেখিয়াছি, তাহা দ্বারা চৈতন্যোৎপাদন করা শক্তি, কোন স্থানেই লক্ষিত হয় নাই। চৈতন্য পদার্থ, হয়"চিৎ"এর কিম্বা "সৎ"এর প্রতি নির্ভর করিতে হইবে।

জড় শক্তি অথবা জড় পদার্থদিগের যৌগিকসমূহের চৈতন্যপ্রদায়িনী শক্তি নাই। যে পদার্থ, অর্থাৎ বীর্য্য দ্বারা সন্তান উৎপত্তি হয়, তাহা সজীব চৈতন্যসংযুক্ত পদার্থবিশেষ। উহাদের স্পর্মাটাজুয়া (spermatazoa) কহে। যে ব্যক্তির বীর্য্যে, এই সজীব পদার্থগুলির বিকৃতাবস্থা জন্মে, অথবা যে যোনিতে কোন রোগপ্রযুক্ত তীব্র ধর্ম্মসংযুক্ত কোন প্রকার পদার্থ নির্গত হয়, তথায় এই সজীব কীটেরা মরিয়া যায়। সেই গর্ভে সুতরাং কখন সন্তান জন্মিতে পারে না। অতএব জড়ের দ্বারা চৈতন্য পদার্থ জন্মিতে পারে না। জগতে যখন চৈতন্য পদার্থ রহিয়াছে, তখন মহাকারণের কারণ কিম্বা মহা-কারণের মহাকারণকে, কি জন্য এ স্থানেও নিদান বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না?

যদ্যপি এই কথায় তর্ক উত্থাপন করা যায় যে, মনুষ্যাদি জড়-চেতন পদার্থেরা, এই বিশেষ প্রকার যৌগিকাবস্থার কার্য্যস্বরূপ। আমরা জড় জগতে দেখিতে পাই যে, ইহারা আপনি বর্দ্ধিত হইতে পারে, নানাবিধ রূপা-ন্তর হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্য বা অন্য জীবের ন্যায় ধর্ম্ম-লাভ করিতে পারে না। পাহাড় পর্ব্বত তাহার দৃষ্টান্ত। পাহাড় প্রথমে কিঞ্চিৎ উচ্চ হয়, পরে কাল সহকারে, অত্যুচ্চ পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়া থাকে। লবণ ও মিছরী দানা বাঁধিয়া স্থূলাকার লাভ করিতে পারে, কিন্তু তথায় চৈতন্য পদার্থ জন্মে না। জড় পদার্থে শক্তি সঞ্চালন করিলে, উহারা স্পন্দিত হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত সজীব জীবের ন্যায় হয় না। কলের মানুষ হইতে পারে, কলের জন্তু হইতে পারে, তাহারা কার্য্যবিশেষ সমাধা করিতেও পারে। ফনোগ্রাফে (ইঙ্গিতে) কথাও কয়। ইউরোপে নাকি কলের সাহেব ও বিবি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহারা আলিঙ্গন ও প্রত্যালিঙ্গন করিতেও পারে কিন্তু খায় না, জ্ঞানে কথা কহে না, সন্তান উৎপাদন করে না। জড় শক্তিতে যাহা হইবার, তাহাই হয়, চৈতন্য শক্তির কথা স্বতন্ত্র। অতএব মনুষ্যাদিতে চৈতন্য বস্তু স্বীকার করিতে হয়।

যে বস্তু যে ধর্ম্মাবলম্বী, তাহার কার্য্যও তদ্রূপ। যাহার যে স্থান সে তথায় যাইতেই চাহে। যৌগিক পদার্থ বিকৃত করিলে, রূঢ়াবস্থায় চলিয়া যায়। আমরা বিদেশে যাইলে স্বদেশে যাইবার জন্য ইচ্ছা করি, বাটী হইতে বাহিরে গমন করিলে, পুনরায় বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা হয়। আমাদের দেহে চৈতন্য পদার্থ আছেন বলিয়া অখণ্ড, সৎ-স্বরূপ, চৈতন্যতে গমনের ইচ্ছা হয়। সেই জন্য সংসাররূপ বিদেশে কিছু দিন থাকিয়া, আপন নিত্যধামে যাইবার জন্য সময় উপস্থিত হইয়া থাকে। সে সময় উপস্থিত হইলে আর কাহারও নিস্তার নাই। তখন তাহার ঘর বাড়ী ভাল লাগে না, আপনার দেহ ভাল লাগে না, পরমাত্মা বা "সৎ" এতে চলিয়া যাইবার জন্য একাগ্রতা আসিয়া অধিকার করে। চৈতন্য না থাকিলে চৈতন্যের কথা স্মরণ হইত না।

আমরা যখন নিদ্রা যাই, তখন আমাদের কোন জ্ঞান থাকে না, কিন্তু জাগ্রতাবস্থায় জ্ঞানের কার্য্য হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। চৈতন্যবিহীন অর্থাৎ মরিয়া যাইলে আর তাহাতে জ্ঞানের কিম্বা অন্য কোন কার্য্যই হইতে পারে না। মরা মনুষ্যে জড় শক্তি সঞ্চালিত করিলে, তাহার কার্য্য দেখা যায় কিন্তু মনুষ্য আর জীবিত হইতে পারে না। অতএব মনুষ্যাদি, জড় এবং চেতনের যৌগিকবিশেষ। মনুষ্যদেহ জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত হইয়াছে এবং চৈতন্য বা আত্মা, তাহাতে অধিনায়ক রূপে বিরাজ করিতেছেন।

মনুষ্য দেহে যে চৈতন্য আছেন, তাহাকে সাধারণ কথায় আত্মা এবং মহা-কারণের মহাকারণকে পরমাত্মা কহে।

আত্মার কয়েকটী নাম আছে। যথা জীবাত্মা, লিঙ্গ শরীর এবং হিরণ্যগর্ভ।

আত্মার স্থান মস্তিষ্ক। কারণ,দেহের অন্যান্য স্থানের কার্য্য, বিচার করিলে আত্মার কোন লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যেমন সৎকে, চিৎ বা জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করা যায় অর্থাৎ "সৎ" এর পরিচায়ক চিৎ, তেমনি আত্মার পরিচায়ক জ্ঞান। ফলে "সৎ" ও "চিৎ" এতে যাহা, আত্মা এবং জ্ঞানেও তাহা। আত্মা, জীব-দেহে প্রবেশ করিয়া গুণযুক্ত হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত, শুদ্ধ-জ্ঞানের সহিত কতকগুলি গুণ-রূপ আবরণ পতিত হইয়া মিশ্রিত জ্ঞানের কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে।

মস্তিষ্ক ব্যতীত অন্য স্থানে আত্মার নিবাস নহে, তাহা জ্ঞানের কার্য্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। মনুষ্যের হস্ত পদ, কিম্বা উদর অথবা বক্ষের যন্ত্রবিশেষের পীড়া বশতঃ, বিকৃত ধর্ম্মযুক্ত হইলেও, জ্ঞানের তারতম্য হইতে পারে না; কিন্তু

মস্তিষ্কের ব্যাধি হইলে, জ্ঞানের বিলুপ্ত হওয়া সম্ভব, ফলে তাহা ঘটিয়াও থাকে, এই জন্য আত্মার স্থান মস্তিষ্ক।

মস্তিষ্কের কোন বিশেষ প্রকার স্থানকে যে আত্মা বলে, তাহা আমাদের স্থূল দৃষ্টির অন্তর্গত নহে। যোগাদির প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা তাহা গোচর হইয়া থাকে।

বিচারের সুবিধা এবং কার্য্যবিভাগ হেতু আত্মাকে তিন বা চারিটী অবস্থায় পরিণত করা হইয়াছে। যথা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং কোন কোন মতে চিত্ত শব্দটীও কথিত হয়। এই উপাধিগুলি প্রকৃতপক্ষে আত্মার নহে, তাহা চিৎ বা জ্ঞানের কহা কর্ত্তব্য

আত্মা জীবদেহে সাক্ষী-স্বরূপ অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ তিনি থাকিলেই জ্ঞান থাকিবেই, সুতরাং কার্য্যকালে জ্ঞান কর্ত্তৃকই সকল বিষয় সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে কথিত হইল যে, কার্য্যক্ষেত্রে জ্ঞানের কয়েকটী অবস্থা আছে ; যাহা অবস্থা এবং কার্য্যবিশেষে, বিশেষ প্রকার উপাধি লাভ করিয়া থাকে। অহং এই জ্ঞান, সর্ব্বাগ্রে কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ না পাইলে, মনের কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে না। মনের কার্য্য আরম্ভ হইবামাত্র, যে বিচার দ্বারা কোন মীমাংসা করা হয়, তাহাকে বুদ্ধি কহে। আমাদের শাস্ত্রমতে চিত্ত শব্দটীও প্রয়োগ হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন যে, অনুসন্ধানাত্মিকা বুদ্ধিকে চিত্ত কহা যায়। অর্থাৎ কার্য্যকালীন, এই বৃত্তিটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রথম ভাগটীকে চিত্ত অর্থাৎ কিরূপে সেই কার্য্যবিশেষ সমাধা হইতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান বা নিরূপণ করা এবং দ্বিতীয় বুদ্ধি, সেই কার্য্যটী সম্পন্ন করিবার উপায় স্থির করা ; এই নিমিত্ত ইহাকে নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বলিয়া কথিত হয়। ফলে উহারা মনেরই কার্য্যবিশেষের অবস্থা মাত্র।

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, সৎ এবং চিৎই সচেতন সুতরাং চৈতন্যযুক্ত যাহা কিছু দেখা যায়, তাহাতে সচ্চিৎ ভাবই উপস্থিত হইবে। জড়ের চেতন ভাব নাই, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব কেবল মনুষ্যদেহে কেন, সচেতন পদার্থ অর্থাৎ জড় চেতন বলিয়া যাহাদের বর্ণনা করা হইবে, তাহারা সকলেই "সচ্চিৎ" এর রূপান্তর মাত্র। একথা কার্য্য কারণ সূত্রে স্বীকার করিতে সকলেই বাধ্য, তাহা উপর্য্যুপরি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথিত হইয়াছে। অতএব আত্মা বলিয়া যাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট করা হইতেছে, তিনিই সচ্চিৎ।

যদিও স্থূলের স্থূল হইতে বিচার দ্বারা, জড় পদার্থদিগকে স্বতন্ত্র পদার্থ এবং মায়া বলিয়া বর্ণনা করা হয়, কিন্তু সংশ্লেষণ পদ্ধতি দ্বারা বিচারে তাহাদেরও "সচ্চিৎ"এর অন্তর্গত বলিতে সকলেই বাধ্য হইয়া থাকেন। যাঁহারা তাহা অস্বীকার করেন, তাহা তাঁহাদের এক পক্ষীয় বিচারসম্ভূত মীমাংসা বলিয়া আমরা প্রতিপন্ন করিয়া থাকি। স্থূলের স্থূল হইতে মহাকারণের মহাকারণ পর্য্যন্ত এক পক্ষ বলা হইয়াছে এবং তথা হইতে স্থূলের স্থূল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পক্ষ। এই উভয় পক্ষের সামঞ্জস্য হইলে তবে আমরা যাহা বলিতেছি, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মিবে। রামকৃষ্ণদেব বার বার কহিয়াছেন, কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে অনুলোম এবং বিলোম সূত্র ধরিয়া যাইতে হয়। যেমন থোড়, প্রথমে খোসা ছাড়াইয়া মাঝ পাওয়া যায়, পরে মাঝ হইতে খোসা, তখন খোসারই মাঝ এবং মাঝেরই খোসা, এই ভাব জন্মিয়া থাকে।

জড় পদার্থ মধ্যেও চৈতন্য বস্তু নিহিত আছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। আমরা ভূমিষ্ঠ হইলে আহার করিয়া থাকি, বায়ু সেবন এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যজনক উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক দিন দিন বর্দ্ধিত ও বলবান হইয়া থাকি। কিন্তু যদ্যপি ভূমিষ্ঠকাল হইতে আমাদের আহারাদি বন্ধ করিয়া, কোন আবদ্ধ স্থানে সংরক্ষিত করা হয়, তাহা হইলে কি প্রকার পরিণাম হইবে, সে কথা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যখন কেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তখন তাহার দৈহিক সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এমন কি অবস্থাক্রমে চলচ্ছক্তি কিম্বা বাক্‌শক্তিও স্থগিত হইয়া যায়। পরে আহার এবং বায়ু সেবনাদি দ্বারা, সেই ব্যক্তি পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিতেও পারে। আহার করিলে বল হয়, ইহার অর্থ কি? বল হইলে মন সুস্থ থাকে, মন সুস্থ থাকিলে সকল প্রকার কার্য্যই সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। এ স্থানে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, জড় পদার্থ হইতে বলের উদ্ভাবন হয়, তখন সেই বল কি জড় পদার্থ না চৈতন্য পদার্থ? যদ্যপি জড় বলা হয় অর্থাৎ সেই জড়েরই ধর্ম্ম, তাহা হইলে সেই জড় আর এক সময়ে সেইরূপ কার্য্য করিতে অসমর্থ কেন? যেমন নাইট্রোজেন সম্বন্ধে দুগ্ধ ও মাংসাদি এবং হাইড্রোসিয়ানিক আসিড উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলেই কথা হইতেছে যে, সকলই অবস্থার ফল। আমরাও তাহাই বলিতেছি যে, জড় অবস্থামতে নিষ্ক্রিয় এবং অবস্থামতে পূর্ণ

কার্য্যকারিতা শক্তি লাভ করিয়া থাকে ; অর্থাৎ তাহারা কথন অচেতন আবার কথন চেতন।

বৈজ্ঞানিক মীমাংসামতে বল সূর্য্য হইতে পৃথিবীমণ্ডলে আসিয়া থাকে। যখন সূর্য্যরশ্মি উদ্ভিদমণ্ডলীতে পতিত হয়, উদ্ভিদদিগের পত্র মধ্যস্থিত সবুজবর্ণবিশিষ্ট যে পদার্থ আছে, যাহাকে ক্লোরফিল (chlorophyll) কহে ; এই ক্লোরফিল সূর্য্য রশ্মির দ্বারা বিসমাসিত হইয়া আপন গঠনের অভ্যন্তরে বল সঞ্চিত করিয়া রাখে। সেই বল ক্রমে ফল ফুল ও উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সঞ্চিত করিয়া রাখে। আমরা যখন তাহা ভক্ষণ করি, সেই বল আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। যখন আমরা ইচ্ছা করি, সেই বল কার্য্যে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বল বৃক্ষমণ্ডলীতে নিহিতাবস্থায় পোটেন্স্যাল (Potential) এবং প্রকৃতকার্য্যকালীন অ্যাক্চুঅ্যাল (actual) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যেমন আমার শরীরে এক মণ বল আছে, কিন্তু যতক্ষণ তাহার কার্য্য হয় নাই, ততক্ষণ তাহাকে পোটেন্স্যাল এবং দ্রব্য উত্তোলন করিবামাত্র সেই শক্তি বা বল প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহাকে একৃচুয়্যাল কহে।

কথিত হইল, বল সূর্য্য হইতে আইসে, কিন্তু এস্থানে বলের সীমা হইতেছে না। বল বাস্তবিক সূর্য্য হইতে কিম্বা অন্য কোন স্থান হইতে উৎপন্ন হয়, সে কথা কে মীমাংসা করিতে সক্ষম ? সূর্য্যে বলিলে, আমরা তাহার উত্তাপ লক্ষ্য করিয়া থাকি। উত্তাপের শক্তি বল, কিম্বা উত্তাপের কারণ ব্যোম, বলের কারণ স্বরূপ, অথবা ব্যোমের উৎপত্তির কারণ চিৎ, তথা হইতে বল আসিয়া থাকে ; তাহা সবিশেষ বলা যায় না। যখন কোন দিকে কোন কারণ প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তখন সূর্য্যরশ্মিই বলের কারণ না বলাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এ পক্ষ সমর্থন করিবার কোন উপায় নাই। অথবা জড়ের চৈতন্যপ্রদ বল আছে, স্বীকার করিতে হইবে। এই বলকে চৈতন্যপ্রদ বলিবার হেতু এই যে, আহারাদি ব্যতীত মানুষ মরিয়া যায় এবং বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়।

অনেকে যোগী ঋষিদিগের কুম্ভক যোগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আহার অপ্রয়োজন বলিয়া সাব্যস্থ করিতে পারেন। কিন্তু তথায়ও জড়পদার্থের অভাব প্রতিপাদন করা যায় না। কারণ কুম্ভক অর্থেই বায়ু ধারণ করণ। দ্বিতীয়তঃ, শরীরের মেদমাংসাদি এবং বায়ুস্থিত পদার্থ বিচার দ্বারা, দেহের

সমতা রক্ষা হইয়া থাকে। যেমন উদ্ভিদগণ মাটি ছাড়া জন্মিতে পারে না, কিন্তু তাহাদের এমন অবস্থা আছে, যথায় প্রস্তরের উপরে কেবল বায়ুর দ্বারা তাহা সজীব থাকে। অর্কিড (orchid) জাতীয় উদ্ভিদ তাহার দৃষ্টান্ত। আমরা এতদ্দ্বারা এই প্রতিপন্ন করিতেছি যে, একটা মীমাংসা কোনমতে একস্থানে আবদ্ধ রাখা যায় না। এই নিমিত্ত যাঁহারা অনুলোম এবং বিলোম প্রক্রিয়ায় বিচার করেন, তাঁহারা সকল পদার্থকেই "সচ্চিৎ" এর প্রকাশ বলিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

এক্ষণে সাব্যস্থ হইবে যে, মনুষ্যকে স্থূলে জড়চেতন বলায় কোন দোষ হয় না। জড় শব্দে আমরা ঈশ্বর ছাড়া জ্ঞানকে, চেতন বলিলে কেবল সচ্চিৎ জ্ঞানকে এবং জড়-চেতন বলিলে সর্ব্বত্রে এক জ্ঞান নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।

মনুষ্যেরা সাধারণাবস্থায় জন্মকাল হইতে বাহিরের পদার্থনিচয় দেখিতে শিক্ষা করে, সুতরাং সেই জ্ঞানেই সংস্কারাবদ্ধ হইতে থাকে। ক্রমে বাহিরের বস্তু হইতে আপনার ভিতরে, ঐ ভাব ধারণ পূর্ব্বক তাহা হইতে তাৎপর্য্য বহির্গত করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে। এই ভাবটী স্বভাবসিদ্ধ। বালক চাঁদ দেখিল। আলোকপূর্ণ চাঁদ দেখিয়া বালকের আর আনন্দের অবধি রহিল না। তাহার যখনই বাক্যস্ফূর্ত্তি পাইল, অমনি জিজ্ঞাসা করিল "মা চাঁদ কি?" মা বলিল সোনার থালা। মা কহিল, ছাতের উপর কিম্বা বারাণ্ডার ধারে অথবা পুষ্করিণীর কিনারায় যাইও না। বালক কহিল, কেন যাইব না? মা অমনি বলিয়া দিল, জুজু আছে। অতএব যে কোন পদার্থ আমরা দেখিতে পাই, তাহার ভাব বহির্গত করা, কথিত হইল, মানব প্রকৃতির ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মানুসারে মনুষ্যেরা চালিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান-তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি অনন্ত প্রকার ভাবের গ্রন্থ, পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, চলিয়া আসিতেছে। যে সময়ে, যে জাতি, যে দেশে, যে মনুষ্য জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে বা পরে জন্মিবে, তাহারা সকলেই আপনাপন সময়ে, আপনার দর্শন-প্রসূত মীমাংসা সত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং করিবেন। কি পদার্থ-বিজ্ঞান, কি শরীর-তত্ত্ব, কি উদ্ভিদ-তত্ত্ব, কি প্রাণি-তত্ত্ব, কি ধর্ম্ম-তত্ত্ব, যে কোন তত্ত্ব লইয়া আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহাতেই এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র তাহার বিশেষ প্রমাণ। শাস্ত্রের মর্ম্মে প্রবেশ করিলে কোন প্রভেদ

পাওয়া যায় না, কিন্তু বাহিরে দেখিলে কাহার সহিত মিল নাই বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ইহার তাৎপর্য্য যেরূপে বর্ণনা করা হইল, আমরা তাহাই বুঝিয়াছি।

মনুষ্যেরা বাহিরের ঘটনাপরম্পরা অবলোকন করিয়া আপন মনে আপনার মতে বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়া লয়। এই নিমিত্ত মনুষ্যদিগের মধ্যে দুই প্রকার কার্য্য স্বভাবতঃ রহিয়াছে। এই দ্বিবিধ কার্য্যের তাৎপর্য্য বহির্গত করিলে কি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? শুভ এবং অশুভ অথবা মঙ্গল এবং অমঙ্গল।

সকলেই মঙ্গল বা শুভ কামনা করে, অশুভ বা অমঙ্গল কেহই কামনা করে না। কামনা করা দূরে থাকুক, কাহার ভালই লাগে না। কে সর্ব্বদা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া দিনযাপন করিতে চাহে? কে অনাহারে থাকিতে চাহে? কে অসুখী হইতে চাহে? কেহ নহে। এভাব কি জন্য, তাহার হেতু স্বভাবসিদ্ধ। যদ্যপি পৃথিবীমণ্ডলে যাহা দেখি বা শুনি কিম্বা অনুভব করিয়া থাকি, অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বা মনের সাধারণ বোধক যে কোন পদার্থ আছে, তাহা যদি আমাদের শুভ বা মঙ্গলস্বরূপ হইত, তাহা হইলে আমরা কখন উহা পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর হইতাম না এবং কখন কেহ তাহা করিত না; কিন্তু সে বিষয়ের প্রমাণাভাব। যদিও আমরা সাধারণ মন গ্রাহ্য পদার্থ লইয়া অনেক সময়ে ভুলিয়া থাকি, কিন্তু সেই পদার্থ হইতেই আমরা অসুখী হই, একথা শরীরী হইয়া কেহ অদ্যাপি অস্বীকার করিতে পারে নাই। এই নিমিত্ত, সাধারণ মনগ্রাহ্য পদার্থ অশুভজনক বলিয়া সাব্যস্থ করিতে হয়।

পূর্ব্বে জড় শাস্ত্রের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যখন যে পদার্থ যৌগিক ভাব হইতে বিমুক্তি লাভ করে, সে তৎক্ষণাৎ সন্নিহিত আর একটীর সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রেও উক্ত আছে, যে, পাঞ্চভৌতিক দেহ বিলয় প্রাপ্ত হইলে, তাহারা আপনাপন স্থানে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। যেমন খাদ মিশ্রিত সোনা, হাপরে গলাইয়া ফেলিলে সোনা অপর নিকৃষ্ট ধাতুর মিশ্রণ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। সেইরূপ মনুষ্যদেহে যে চৈতন্য পদার্থ আছে, তাহা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থদিগের দ্বারা কোন মতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। যেহেতু তাহারা অবস্থাবিচারে সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবাপন্ন বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, স্থূল দেহ, স্থূল পদার্থের অনুগামী হইয়া থাকে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্মের, কারণ কারণের এবং মহাকারণ মহাকারণের পক্ষপাতী হইতে দেখা যায়। যেমন পণ্ডিত, পণ্ডিত চাহে; সূর্য্য, সূর্য্য চাহে; মাতাল, মাতাল চাহে; জ্ঞানী, জ্ঞানী চাহে; সতী, সতী চাহে; বেশ্যা, বেশ্যা চাহে; অর্থাৎ যাহার যে প্রকার স্বভাব, সেই স্বভাবের সহিত সম্বন্ধ টানিতে সে ভাল বাসে। মন যতক্ষণ ইন্দ্রিয়দিগের বশবর্ত্তী হইয়া পরিচালিত হইয়া থাকে, ততক্ষণ তাহাকে সর্ব্বদাই অসুখী হইতে দেখা যায়। ইন্দ্রিয় আপন স্বভাবে কোন বস্তু বাছিয়া লইলে, মন সংস্কারবশতঃ তাহা তখন স্বীকার করিয়া লয় বটে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে, তথায় অশান্তি আসিয়া অধিকার করিয়া থাকে; মনের সে কার্য্য আর ভাল লাগে না। তখন ইন্দ্রিয় বার বার সেই পথে লইয়া যাইবার জন্য, আকিঞ্চন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। মনের এই আসক্তি সূক্ষ্ম লক্ষণের দ্বারা অনুমান করিতে হয় যে, মন সম্বন্ধে যাহা শুভ, তাহা উপস্থিত হয় নাই।

আমরা যখন সংসারচক্রে সুখের কামনায় উপবেশন করি, তখন মন সাময়িক সুখভোগে অভিভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু সে সুখ কতক্ষণের জন্য? বরং চপলা চকিতের কাল পরিমাণ করা যায়, কিন্তু সংসার সুখের পরিমাণ করিতে সকলেই অশক্ত। কেহ কি বলিতে পারেন যে, আমি সুখী কিম্বা উনি সুখী? জগতে সুখ নাই বলিলে বেশী বলা হইবে না।

মন যখন শুভ কামনায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বার বার হতাশ হইয়া অবিরত কোথায় সুখ ও শান্তি লাভ করা যায় বলিয়া, স্থূলের স্থূল হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধ সোপানে উঠিতে থাকে, তখন ক্রমে আশার সঞ্চার হয়। পরে আত্মায় উপনীত হইবামাত্র, অবিচ্ছেদে সুখ ও শান্তির অধিকার মনোরাজ্যে বিস্তারিত হইয়া থাকে। সেই জন্য আত্মশুভোদ্দেশী পথের ভিখারীও সম্রাট্ অপেক্ষা সুখী।

জড়-চেতন সম্বন্ধে আরও দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতে পারে। যেমন কোন সুস্বাদু দ্রব্য মুখরোচক হইতে পারে, কিন্তু ভিতর হইতে কে বলিয়া থাকে, তোমার শরীরে উহা অনিষ্ট করিবে। একজন উদরাময়গ্রস্ত ব্যক্তি মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেছে। মিষ্টান্ন তাহার মুখে অতি উপাদেয় বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, কিন্তু পাছে পীড়া বৃদ্ধি হয়, এই আতঙ্কে অধিক ভক্ষণ করিতে পারিতেছে না। আতঙ্ক হইল কেন? মন কহিয়া দিল যে, তাহাতে তোমার অসুখ হইবে।

এইরূপ আত্মসম্বন্ধে যাহার দ্বারা বিচার হয়, তাহাকে চৈতন্য পদার্থ বলিয়া নির্ণয় করা যায়।

মন, এই চৈতন্য পদার্থের শক্তিবিশেষ। ইহা দুই ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে। যখন বাহ্য জগতে অবস্থিতি করে, সেই সময়ে ইহাকে বিষয়াত্মক মন কহে, এই মনের গোচর ঈশ্বর নহেন। কেননা এই মন তখন ঈশ্বর বিমুখ হইয়া রহিয়াছে। মন যখন চৈতন্যের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন তাহাকে বিষয় বিরহিত কহা যায়, সেই মনে ঈশ্বর জ্ঞান জন্মে।

আমরা যখন যে কার্য্য করিব বলিয়া মনোনিবেশ করিয়া থাকি, সেই সময়ে সেই কার্য্য ব্যতীত, অন্যদিকে মনের গতি সঞ্চালন করা যায় না। যদ্যপি কার্য্যবিশেষে মন ধাবিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বের কার্য্যের শৈথিল্য পড়িয়া যাইবে। আমি যদ্যপি 'ক' উচ্চারণ করি, তখন আর 'খ' বলিতে পারিব না, 'ক' ছাড়িয়া 'খ' বলিতে হইবে। যেমন এক পা মাটিতে রাখিয়া অপর পা'টি উত্তোলন করা সম্ভব। এক সময়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে যাওয়া যায় না। সেই প্রকার মনের কার্য্য এক সময়ে দুই প্রকার হইতে পারে না। অতএব মন যখন যে অবস্থায় থাকে, তখন তাহার কার্য্য তদ্রূপই হইয়া থাকে।

মনের কার্য্য পরিবর্ত্তনের নিদান অহঙ্কার। অহং বা আমি, রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ মতে দ্বিবিধ। যথা কাঁচা-আমি এবং পাকা-আমি। কাঁচা-আমি'র কার্য্য পুনরায় ছয়ভাগে বিভক্ত; যথা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য; এবং পাকা আমি, বিবেক ও বৈরাগ্য নামে দুইটী ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যতক্ষণ দেহের প্রতি মন আকৃষ্ট থাকে, ততক্ষণ কাঁচা আমি'র কার্য্য কহে এবং দেহ ছাড়িয়া চৈতন্যে মন স্থাপন করিলে যে কার্য্য হয়, তাহাকে পাকা আমি'র কার্য্য বলে।

যে ব্যক্তির উল্লিখিত কাঁচা আমি যত বৃদ্ধি হয়, তাহাকে সেই পরিমাণে আত্মহারা করিয়া ফেলে, যেমন জড়শাস্ত্রে ছয়ষষ্টি রূঢ় পদার্থকে পৃথিবীর যাবতীয় যৌগিক এবং মিশ্রিত পদার্থের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এই যৌগিকাদি পদার্থদিগেরই সীমা নাই। সেই প্রকার কাম, ক্রোধ আদি ছয়টী রূঢ় কাঁচা আমি হইতে অসীমপ্রকার যৌগিক ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলে এ অবস্থা হইতে পরিমুক্তি লাভ করিবার আর উপায় থাকে না। কিন্তু মনুষ্যদেহ কেবল জড়ভাবে গঠিত নহে, সেই জন্য চৈতন্যের সত্তা হেতু, সর্ব্বদা ভিতর হইতে অমঙ্গল বা পাপ বলিয়া একটা প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে।

কাঁচা আমি'র যতক্ষণ প্রতাপ থাকে, ততক্ষণ এই আভ্যন্তরিক কথা মনের গোচর হইতে পারে না। তাহার হেতু পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। যে মুহূর্ত্তে কাঁচা আমি'র কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া যায়, অমনি ভিতরের শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে, হৃদ্‌পিণ্ড কম্পিত এবং শ্বাসবায়ু যেন নিঃশেষিত হইয়া আসে। তখন পাকা-আমি বলিয়া দেয় যে, আমি কোথায় রহিয়াছি, কি করিতেছি, কি করিলাম, কি হইবে, ইত্যাকার নূতন চিন্তার স্রোত খুলিয়া দেয়। এইরূপে পাকা-আমি'র কার্য্য যখন আরম্ভ হয়, তখনই মন বহির্জ্জগৎ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্জ্জগতে বিচরণ করিতে শিক্ষা করে। অন্তর্জ্জগতে গমন করিলে ক্রমে ঊর্দ্ধগামী হইয়া আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে। ইহাকেই শাস্ত্রে আত্মসাক্ষাৎকার বা স্ব-স্বরূপ দর্শন কহে অর্থাৎ এই দেহের ভিতরে যে চৈতন্য বা আত্মা, জীবাত্মা রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। তখনই দেহ যে জড় এবং চৈতন্যের যৌগিকবিশেষ, তাহা বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, আমরা মনের কয়েকটী অবস্থা অনুমান করিয়া থাকি, যথা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয়। যে পর্য্যন্ত দেহ-জ্ঞান অর্থাৎ দেহ লইয়া বাহ্য জগতের জ্ঞান পূর্ণরূপে থাকে, তখন তাহাকে জাগ্রৎ কহে। এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য থাকে, কিন্তু মনের সঙ্কল্পাদি কখন সম্পূর্ণ করা যায় এবং কখন তাহা যায় না। ফলে, স্বপ্ন এবং জাগ্রতাবস্থায় মন এবং বুদ্ধি জড় পদার্থ লইয়া কার্য্য করে, সুষুপ্তিতে মন সূক্ষ্মভাবে একাকী থাকে। এই সূক্ষ্ম ভাব বিবর্জ্জিত হইয়া মনের যে অবস্থা লাভ হইয়া থাকে, তাহাকে তুরীয়াবস্থা কহে। এক্ষণে কথা হইতেছে, স্বপ্ন এবং জাগ্রতের এক অবস্থা বলিবার হেতু কি?

জাগ্রতাবস্থায় আমাদের মন বুদ্ধি যেরূপে জড় পদার্থ লইয়া কার্য্য করিয়া থাকে, স্বপ্নাবস্থায়ও অবিকল তাহাদের তদ্রূপ কার্য্য হইতে দেখা যায়। অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, জাগ্রতাবস্থায় আমরা আহার করিলে, উদর পূর্ণ হয় এবং শরীর পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় তাহা কখনই হয় না। এ কথা আমরা জাগ্রতাবস্থায় বসিয়া স্বপ্নাবস্থা মীমাংসা করিতেছি, সুতরাং অবস্থান্তরের কথা অবস্থান্তরে আলোচনা করা যাইতেছে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে আহার করিতে থাকে, তাহার কি তখন স্বপ্ন বলিয়া জ্ঞান হয়? তাহার কি তখন জাগ্রতাবস্থা বলিয়া ধারণা থাকে না? এ কথা

প্রত্যেকে আপনার স্বপ্নাবস্থার বৃত্তান্ত বিচার করিয়া লইবেন। যে ব্যক্তি চোর, সে স্বপ্নে পাহারাওয়ালা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। যমদুত দেখিয়া অনেকে আতঙ্কে গোঁ গোঁ করিতে থাকে। অনেকে শত্রুর দর্শন পাইয়া তাহাকে কথন পদাঘাত অথবা মুষ্ট্যাঘাত করিতে যাইয়া, পার্শ্বস্থিত স্ত্রী কিম্বা পুত্র কন্যার দুর্দ্দশা সংঘটনা করেন। এই অবস্থাদ্বয়ের সাদৃশ্য আছে বলিয়া জাগ্রৎ এবং স্বপ্নকে এক বলা যায়।

জাগ্রৎ ও স্বপ্নের একাবস্থা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ এই, একদা কোন কুলমহিলা তাহার স্বামীর নিকটে আসিয়া কহিল, হ্যাঁগা তোমার ন্যায় কঠিন প্রাণ ত কাহার দেখি নাই? স্বামী কহিল, কেন এমন কথা বলিতেছ? স্ত্রী রোদন করিতে করিতে বলিল যে, আমার অমন গণেশের মত ছেলেটী যমের হাতে দিলাম, আমি কেঁদে কেঁদে সারা হইতেছি, পাড়ার লোকেরাও আমার নিকটে কত কাঁদে, হা হুতাশ করে, কিন্তু তুমি এম্‌নি নিষ্ঠুর, একবার কাঁদা কি দুঃখ করা দূরে থা'ক্, সে কথা মুখেও আন না। বলি, এটা তোমার কি রীতি? লোকালয়ে থাক্‌লে, এ সকল ক'ত্তে হয়। স্বামী অবাক্ হইয়া বলিয়া উঠিল, বটে! পুত্রটী মরিয়া গিয়াছে! আমি এ কথার অর্থ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আমি গত রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি সাত পুত্রের বাপ হইয়াছি। সেই ছেলেরা কেউ জজ, কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার; আর আমরা দুইজনে তাহাদের লইয়া কত আনন্দ করিতেছি। আবার এখন তুমি বলিতেছ, একটী পুত্র মরিয়া গিয়াছে। আমি এই দুইটী অবস্থা কোন মতে মিলাইতে পারিতেছি না। এক্ষণে কথা হইতেছে, স্বপ্ন কিরূপে সত্য হইবে? এক ব্যক্তির সেই সাত পুত্র আদৌ হয় নাই; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এ কথা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে, নিদ্রাকালে কে কোথায় থাকে, তাহার কোন জ্ঞান থাকে না। তুমি আমার পার্শ্বে কিম্বা আমি তোমার পার্শ্বে, এ কথা কি কাহার স্মরণ থাকে? স্বপ্নেও এ সকল কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু মন যখন কার্য্য করে, তখন তাহা মিথ্যা বলিয়া জানা যায়। জাগ্রতাবস্থায় যাহাকে মিথ্যা জ্ঞান হইতেছে, স্বপ্নাবস্থায় আবার তাহাকেও তদ্রূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। অনেক সময়ে জাগ্রতাবস্থায় যাহা সম্পন্ন করা যায়, তাহা স্বপ্নাবস্থায় পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, সে সময়ে তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। আবার জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্নে যে সকল আশ্চর্য্য দর্শন অভুতপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে, তখন তদবস্থায় তাহাদিগকে ভুল বলিয়া কথন জ্ঞান করা যায় না;

কিন্তু জাগ্রতাবস্থায় তাহারা আয়ত্তাতীত হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এক কথা বলা যায়।

জাগ্রতাবস্থায়, মনের যেরূপ সময়ে সময়ে কার্য্য হয়, তাহাকে স্বপ্ন না বলিয়া প্রকৃত কথা বলিতে কে চাহেন? অর্থাৎ জাগিয়া স্বপ্ন দেখা সকলেরই কার্য্য। ছেলেটীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বপ্ন উঠিল যে, ইহাকে পণ্ডিত করিব, বিলাতে পাঠাইব, সরকারি ভৃত্যশ্রেণীতে প্রবেশ করাইয়া অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া লইব। তখন জজের পিতা হইয়া বুক ফুলাইয়া চলিয়া বেড়াইব। এই দেশের সমুদয় জমি খরিদ করিয়া জমিদার হইব। এইরূপ নানাবিধ স্বপ্ন দেখা কি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ নহে? জাগ্রতাবস্থায় যাহা ভাবিল, তাহা কি তাহার কার্য্যে পরিণত হইতে পারে? জাগ্রতাবস্থায় যাহা হয়, স্বপ্নেও তাহা হইতে পারে, বরং স্বপ্নের কার্য্য অধিক বিশুদ্ধ। এই কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে বলিয়া উক্ত উভয়বিধ অবস্থাকে স্বতন্ত্র বলিয়া ব্যক্ত করা যায়।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, জাগ্রতাবস্থায় নানাবিধ স্থূলের স্থূল দর্শন করিয়া মনের উপর নানাবিধ আবরণ পড়িয়া থাকে। মন সুতরাং বিবিধ আবরণ দ্বারা আবৃত হইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। যেমন সাদা কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে সকল বস্তুই সাদা দেখাইবে, কিন্তু সাদা, কাল, সবুজ, লাল, হরিদ্রাভাযুক্ত, ভিন্ন ভিন্ন কাচ, স্তরে স্তরে সাজাইয়া তন্মধ্য দিয়া দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে কি প্রকার দর্শন ফল হইবে? মনের উপরেও ঐ প্রকার সংস্কাররূপ আবরণ পতিত আছে। আমরা আবরণ বা সংস্কারের মধ্য দিয়া সর্ব্বদা দর্শন বা চিন্তা করিয়া থাকি, সেই জন্য সে চিন্তার ফল প্রকৃত হইতে পারে না।

স্বভাবতঃ আমরা দেখিতে পাই, যখন কোন বিষয় লইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকি, তখন মনের অবস্থা সাধারণ অবস্থার সহিত তুলনা হইতে পারে না। গভীর চিন্তা না করিলে গভীর তত্ত্ব বহির্গত হইতে পারে না। সে সময়ে মন একভাবেই অবস্থিতি করিয়া থাকে। ফলে তখন তাহার উপর কোন আবরণ অর্থাৎ ভাববিশেষ বা সংস্কারবিশেষ থাকিতে পারে না। তাহারা থাকিলে চিন্তার স্রোত স্থগিত হইয়া পড়িত। সাধারণ কথায় বলে, মন স্থির করিয়া কোন কার্য্য না করিলে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। এক খানি পুস্তক পাঠ করিতে হইলে আর এক খানির কথা মনে আসিলে কোন খানি পড়া হয় না।

মন যখন এইরূপে আবরণ বিক্ষিপ্ত হইয়া কার্য্য করে, তখনই তাহার প্রকৃত কার্য্য হইয়া থাকে। জাগ্রতাবস্থায় থাকিয়াও বহির্জগৎ হইতে এক-দিকে পলায়ন করিতে হয়।

স্বপ্নাবস্থায় স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয় সকল কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত মনের উপর অনবরত আবরণ নিক্ষেপ বা সংস্কার প্রদান করিতে পারে না। এইটী জাগ্রতাবস্থা হইতে প্রভেদের কারণ; কিন্তু জাগ্রতাবস্থায় সংস্কারগুলি যখন মনের ভিতর অধিক পরিমাণে কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, তখন স্বপ্নাবস্থায় সেই সমুদয় ঘটনাপরম্পরা সমুদিত হইয়া অবিকল জাগ্রতা-বস্থার ন্যায় অবস্থা সংঘটিত করিয়া দেয়। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, জাগ্রতা-বস্থায় যাহা লইয়া অধিক চিন্তা করা যায়, স্বপ্নে তাহাই দেখা গিয়া থাকে। এ কথাটী প্রত্যক্ষ বিষয়, তাহার ভুল নাই।

আমরা যখন কোন বিষয় লইয়া সহজে মীমাংসা করিতে অসমর্থ হই, তখনই অধিক চিন্তা আসিয়া থাকে; কিন্তু মনের আবরণ বিধায় তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সহজে বহির্গত হয় না। নিদ্রাকালে মন ইন্দ্রিয়দিগের কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, সেই সময়ে তাহার নিজের সমুদয় বল দ্বারা আপন কার্য্য সমাধা করিয়া লয়। মনের এই সূক্ষ্ম কার্য্যটী যখন কার্য্য করে, তাহাকে স্বপ্ন বলিয়া কহা যায়। অনেকে স্বপ্নে ঔষধি লাভ করিয়া থাকে, অনেকে উৎকট গণিতের মীমাংসা, ঈশ্বর তত্ত্বের নিগূঢ় তাৎপর্য্য আত্মীয় স্বজনের পদোন্নতি কিম্বা মৃত্যু আদি ভাবি দুর্ঘটনার ছবি প্রাপ্ত হইয়া, পরে তদনুরূপ ফল লাভ করিয়াছে। এ কথাগুলি স্থূল দ্রষ্টাদিগের নিকট কোনমতে বিশ্বাসজনক হইতে পারে না। কারণ তাহারা বাহিরের কার্য্যকলাপ ব্যতীত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে না। বাহিরে বসিয়া ঘরের ভিতরের সমুদয় আস্‌-বাব দেখিতে চাহে, এই তাহাদের আব্‌দার। বালক যেমন হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরিতে চাহে। অন্তঃরাজ্যের মীমাংসা বহির্জগতে পরিণত করিয়া সিদ্ধান্ত করাও তদ্রূপ।

জাগ্রতাবস্থায় মনের সহিত ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য হইতে থাকে, নিদ্রাবস্থায় কখন তাহাও হয় এবং কখন মন, ইন্দ্রিয় ব্যতীত কার্য্য করে। ইন্দ্রিয়ের গতি স্থূলে; মনের গতি সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে।

কথিত হইয়াছে যে, মন সকল কার্য্যের নিদান স্বরূপ। যখন স্থূলের কার্য্য করিতে তাহার ইচ্ছা হয়, তখন ইন্দ্রিয় তাহার সহায়তা করিবার নিমিত্ত

হেতুবিশেষ। বহির্জগতের কার্য্য এইরূপে সম্পন্ন হইবার ব্যবস্থা আছে। অন্তর্জগতে যাইবার সময় বহির্জগতের ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য হইয়া থাকে। তথায় ইন্দ্রিয়ের সহায়তা আবশ্যক হয় না। বহির্জগতের ভাব লইয়া অন্তর্জগতের সহিত মিলাইয়া দেওয়া মনের সূক্ষ্ম কার্য্য। প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যের অবস্থা এইরূপ। এই ঘটনা পাত্রবিশেষে এবং অবস্থাবিশেষে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই জন্য অবস্থার প্রতি বিশেষ আস্থা প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে।

নিদ্রা (সুপ্ত) এবং স্বপ্নের যৌগিকে, একটী অবস্থা আছে, অর্থাৎ যখন মনুষ্যেরা নিদ্রিত হইয়াও বাস্তবিক কার্য্য করিয়া থাকে। অনেকে উঠিয়া পুস্তক পাঠ করে, অনেকে স্থানান্তরে গমন করিয়াও থাকে; এ সকল দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। তখন এই অবস্থায় সেই বিশেষ প্রকার কার্য্য ব্যতীত বহির্জগতের অন্য কোন ভাব আসিতে পারে না।

যেমন জড় জগতের বিচার নিষ্পত্তি করিতে হইলে, স্থূলের স্থূল হইতে ঊর্দ্ধগামী হইতে হয়, তখন বাহিরের কার্য্য আর মানসক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে পারে না এবং প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ হইয়া আইসে। মনের অবস্থাও তদ্রূপ। মন যতই বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে অগ্রসর হইতে পারিবে, সে ক্রমে জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি প্রভৃতি ত্রিবিধাবস্থা অতিক্রম করিয়া তুরীয়তে উপস্থিত হইতে পারিলে, তখন তাহার চৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভ হইবে।

মনের ধর্ম্ম বা স্বভাব ত্রিবিধ, যাহাকে সত্ব, রজঃ এবং তমঃ কহে। সাধারণ নিদ্রা অর্থাৎ বহির্জগৎ হইতে ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য স্থগিত হওয়াকে, মনের তমো গুণ কহে। মন যখন সূক্ষ্মভাবে কার্য্য করিয়া স্বপ্ন আখ্যা লাভ করে, তখন রজঃ,সুষুপ্তির অবস্থাটীকে সত্ব কহে এবং শুদ্ধ-সত্ব বলিয়া যে গুণটী রামকৃষ্ণদেব কহিতেন, তাহা আত্মার অতীত, সেই অবস্থার নাম তুরীয়। অর্থাৎ তমোর ক্রিয়া নিদ্রা; রজোর ক্রিয়া ধ্যান ও সত্ত্বের ক্রিয়া ভাব, এবং শুদ্ধ সত্ত্বের ক্রিয়া মহাভাব বা সমাধি। অতএব জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয় মনের অবস্থার বিষয়, তাহাতে ইতর বিশেষ নাই।

৯। আপনাকে জানিলেই ঈশ্বরকে জানা যায়।

ঈশ্বরকে পরমাত্মা কহে, পরমাত্মা হইতে আত্মার উৎপত্তি হয়; এই নিমিত্ত আত্মা বা আপনাকে সাব্যস্ত করিতে পারিলেই, পরমাত্মা বুঝিতে আর ক্লেশ হয় না।

"আমি নাই" এই ভ্রান্তি কাহার কদাচই হয় না, অর্থাৎ আপনার অস্তিত্ব সকলেই যে স্বীকার করিয়া থাকেন, এ কথা বলাবাহুল্য মাত্র। এই জন্যই পরমহংসদেব অগ্রে "আপনাকে" জানিতে কহিয়াছেন। প্রথম, আমি কে এবং কি? দ্বিতীয়, আমাদের উৎপত্তির কারণাদি নির্ণয় করা আবশ্যক। জড় ও চৈতন্য শাস্ত্রের দ্বারা প্রথম প্রস্তাবের মীমাংসা করিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে, আমাদের উৎপত্তির কারণ, পিতা মাতা নিরূপিত হইতেছে। "আমি আছি" এই জ্ঞান থাকিলেই, পিতা মাতাও আছেন, তাহার ভুল হয় না। যে হেতু পিতা মাতাই সন্তানাদি উৎপত্তির স্বাভাবিক কারণ, কিন্তু যদ্যপি পিতা মাতা নিরূপণ করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে প্রথমেই সে ব্যক্তি সাধারণের সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িবে, কারণ পিতা মাতা ব্যতীত যে সন্তান জন্মিতেই পারে না, ইহা সকলেরই বিশ্বাস।

কথিত হইল সত্য যে, পিতা মাতা ব্যতীত সন্তান জন্মিতে পারে না, এ কথা পিতা মাতাই জানেন; সন্তানের তাহা জানিবার অধিকার নাই। কারণ কে কোন সময়ে কিরূপে জননীজঠরে প্রবেশ করিয়া থাকে, অথবা কিরূপে ভূমিষ্ঠ হয়, এ কথা বলিবার যোগ্যতা পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে অদ্যাবধি কেহই লাভ করে নাই। আমরা যাহাকে মা বলি, সে কেবল লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া বলিয়া থাকি। যাহার প্রসূতি সূতিকাগারে মানবলীলা সম্বরণ করে, তাহার মাতৃভাব হয় ধাত্রী কিম্বা অন্য কোন আত্মীয় পালন-কর্ত্রীর উপর জন্মিয়া থাকে। বালক তখন অবোধ, তাহার জ্ঞান যে কি ভাবে থাকে, তাহাও অদ্যাপি স্থির করা যায় নাই। আপনাপন পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিলেই তাহা অবগত হওয়া যাইবে। ইহার মীমাংসা করিতে অধিক দূর গমন করিতে হইবে না।

যদ্যপি অবস্থা গুণেই হউক কিম্বা দোষেই হউক, কাহারও পিতা মাতা নিরূপণ করিতে হয়, সে ব্যক্তি কি প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে? মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন যে, হাঁ বাপু, আমি তোমায় প্রসব করিয়াছি। এস্থলে এই কথার মূল্য কতদূর ঠিক, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। মাতার কথায় বিশ্বাস ব্যতীত আর উপায় নাই। হয়ত তিনি সত্যই বলিবেন, অথবা তিনি কাহার নিকট দত্তকরূপে ঐ সন্তানটী পাইয়াছিলেন, তাহার কারণ কে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে? কথায় বিশ্বাস ব্যতীত প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া প্রমাণাভাব, বরং এ পক্ষে দশজন পরিজন কিম্বা প্রতিবাসিনী সাক্ষ্য প্রদান

করিতে পারে। এই মাতৃপক্ষদিগকে বরং বিশ্বাস সম্বন্ধে, দশটা শোনা কথাও শ্রবণ করা যাইতে পারে কিন্তু পিতা নিরূপণ করা যারপরনাই দুরূহ। অর্থাৎ সে স্থলে মাতার কথায় বিশ্বাস ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। কাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে ব্যক্তি অভ্যাস সূত্রে কহিবে, অমুক আমার পুত্র কিম্বা অমুক আমার কন্যা। তাহাকে শপথ করিয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক যে, তুমি ঠিক করিয়া বল দেখি যে, এই পুত্রটী কি তোমার? সে ব্যক্তির যগুপি এক পরমাণু মস্তিষ্ক থাকে, তাহা হইলে বলিবে যে, আমার বিশ্বাস, অমুক আমার পুত্র। পিতার নিকট এ ক্ষেত্রে কোন প্রত্যক্ষ মীমাংসাও প্রাপ্ত হওয়া যাইল না। মাতাই পিতা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার একমাত্র উপায়। প্রথমতঃ মাতার বিশ্বাস, লোকের কথার উপর নির্ভর করিতেছে, এই বিশ্বাসের উপর বিশ্বাস করিয়া তবে পিতা নিরূপণ করা যায়।

মাতার কথায় বিশ্বাস করিয়া যদিও পিতা স্বীকার করা ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্র দেখিলে, মাতার এই কথার উপর কেবলমাত্র সরল বিশ্বাসই কার্য্য করিয়া থাকে। কারণ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার করিতেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ স্ত্রীটী ভ্রষ্টা। কোন স্থানে স্বামী তাহা জানে. কোথাও তাহা নাও জানিতে পারে। এরূপ স্থলে, যগুপি সেই স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মায়, তাহা হইলে, সচরাচর বাজার হিসাবে বাটীর কর্ত্তাই ছেলেটীর বাপ হইল বটে এবং সন্তান জানিল যে, অমুক আমার পিতা, কিন্তু বাস্তবিক কি ঘটনা যে হইল, তাহা নির্ণয় করিতে উহার গর্ভধারিণীও সক্ষম নহে। বেশ্যার গর্ভজাত সন্তানদিগের ত কথাই নাই। এ স্থলে পিতা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। আমরা বলি যে, যাহারা বাল-বয়স-প্রসূত উদ্ধত স্বভাবে ঈশ্বর নিরূপণ অর্থাৎ তাঁহার প্রত্যক্ষ মীমাংসা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তাঁহাদের যেন নিজ নিজ পিতা মাতা নিরূপণ সম্বন্ধে অগ্রে মনোনিবেশ করেন। সে বিষয়ে যগুপি প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে বাপ মায়ের বাপ মা পর্য্যায়ক্রমে আরোহণ পূর্ব্বক, সর্ব্ব প্রথম বাপ মা যাঁহারা, তাঁহাদের নিরূপণ করা সুলভ হইবে। এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ মীমাংসা দূরে থাক, অপ্রত্যক্ষ মীমাংসাও প্রাপ্ত হইবার এক বিন্দু সম্ভাবনা নাই; কিন্তু এ কথাটী সত্য বটে, প্রাণের আরাম পাইবারও কথা বটে যে, "আমি যখন আছি," তখন আমার বাপ মাও আছেন বা

ছিলেন। মাটি ভেদ করিয়া অথবা নারিকেল গাছে উৎপন্ন হই নাই। এইটা প্রাণের কথা। ব্যক্তিবিশেষ পিতা, বিশ্বাসের কথা মাত্র।

আজকাল এমনি সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, সকল কথারই কূটতত্ত্ব বাহির করিতে অনেকেই পটুতালাভ করিয়াছেন। বিশ্বাস শব্দ উচ্চারণ করিলেই অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া একটা কথা উঠে। আমাদের দেশের বালক মহাশয়েরা এই শব্দটীর বড় গৌরব করিয়া থাকেন। বিশ্বাস কথাটাই অন্ধকারময়, এ কথা বলিলে অন্যায় হয় না। ফলে এই অন্ধকারময় সংসারে তাহাই অবলম্বন করিয়া যাইতে হয়।

পিতামাতার অর্থাৎ উৎপত্তির কারণে, বিশ্বাস—কেবল কথায় বিশ্বাস করিতে হয়। ভ্রষ্টাচারিণীর কথায় তাহার পতি নিজ সন্তান বিশ্বাসে আজীবন পরপাদুকা বহন পূর্ব্বক মস্তিষ্কের স্বেদ ভূমিতে লুটাইয়া তাহাকে লালন পালন করিতেছেন। এ স্থানে বিশ্বাসই মূল। মা চাঁদ চিনাইল, চাঁদ বলিতে শিখিলাম বিশ্বাসে। বড় গাছ লাল ফুল শিক্ষা দিলেন, এ কথা গুলিও শিখিলাম বিশ্বাসে। গুরু মহাশয় 'ক' শিখাইয়া দিলেন, আমরা 'ক' শিক্ষা করিলাম। 'ক' শিক্ষার সময় যদ্যপি তাহার উৎপত্তির কারণ এবং গুরু যাহা কহিতেছেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা, তদন্ত করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে, কস্মিন্ কালে 'ক' শিক্ষা করা আর হয় না; গুরুর কথায় বিশ্বাস করিয়া 'ক' শিক্ষা করা হয়। ফলে আমরা যখন যে কার্য্য করিতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকি, তাহার মূলে বিশ্বাস, বিশ্বাস ব্যতীত কোন কথাই দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমরা যদ্যপি আমাদের কার্য্যপরম্পরা ক্রমান্বয়ে বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে বিশ্বাসের কার্য্য স্পষ্ট দেখা যাইবে। যে গৃহে বাস করি, তাহাতে কোন শঙ্কা উপস্থিত হয় না। কেন হয় না? বিশ্বাস যে, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে না। আহারের সময় স্বচ্ছন্দে তাহা সমাধা করিয়া লইয়া থাকি। তাহাতেও বিশ্বাস হয় যে, কেহ বিষ দেয় নাই। ক্ষৌরকারের হাতে তীক্ষ্ণ ধার-বিশিষ্ট ক্ষুর সত্ত্বেও আমরা নির্ভয়ে গলা বাড়াইয়া দিয়া থাকি, বিশ্বাস এই যে, সে কখন আঘাত করিবে না। এইরূপ যে দিকে যে কোন কার্য্য লইয়া বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহাতেই বিশ্বাসের লক্ষণ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যখন আমরা সকল কার্য্যই বিশ্বাসে করিয়া থাকি, তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশ্বাস না করিব কেন? অতএব মহাজনেরা যাহা কহিয়া থাকেন, সেই কথায় বিশ্বাস করিলেই ঈশ্বর নিরূপণ পক্ষে সুবিধা হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বদা বলিতেন, যেমন

এক ব্যক্তি মাছ ধরিতে ভালবাসে। সে শুনিল যে, অমুক পুষ্করিণীতে বড় বড় মাছ আছে। এই সংবাদ পাইয়া, সে তৎক্ষণাৎ যে ব্যক্তি মাছ ধরিয়াছে, তাহার নিকট গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ ভাই? অমুক পুকুরে নাকি বড় বড় মাছ আছে? সে কহিল, তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহা সত্য। এই কথায় অমনি তাহার বিশ্বাস হইয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে মাছ ধরিবার সমুদয় বৃত্তান্ত অর্থাৎ কিসের চার ফেলিতে হয়, কি টোপে মাছ খায় ইত্যাদি নানা বিষয় অবগত হইয়া মাছ ধরিতে গিয়া বসে। পুষ্করিণীর নিকটে যাইবামাত্র মাচ উঠিয়া আইসে না। তথায় ছিপ ফেলিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। ক্রমে সে মাছের ঘাই ও ফুট দেখিতে পায়; তখন তাহার পূর্ব্বের বিশ্বাস ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পরে যথা সময় মাছ ধরিয়া থাকে। সেই প্রকার মহাজনদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া, ভক্তি চার ফেলিয়া, মন ছিপে, প্রাণ কাঁটায়, নাম টোপ দিয়া, বসিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে যথা সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে।

১০। ঈশ্বর অনন্ত, জীব খণ্ড; অনন্তের সীমা অনন্তবিশিষ্ট জীব কেমন করিয়া সম্পূর্ণ রূপে সাব্যস্থ করিবে? অনন্তের নির্ণয় করিতে যাইলে আপনার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। যেমন নুনের ছবি সমুদ্রের জল পরিমাণ করিতে গিয়াছিল। সমুদ্রে কি আছে, কত জল আছে, অনুসন্ধান করিতে করিতে সে আপনি গলিয়া জলে মিশাইয়া গেল। তখন আর কে সমুদ্রের জল পরিমাণ করিবে। অথবা যেমন পারার হ্রদে সীসার চাপ ফেলিয়া দিলে, সীসার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর থাকে না, উহা পারাতে দ্রবীভূত হইয়া যায়।

জড় শাস্ত্রের স্থূলের স্থূল হইতে মহাকারণের মহাকারণ পর্য্যন্ত উঠিলে যে অবস্থা হইয়া থাকে, রামকৃষ্ণদেবের উপদেশে তাহাই বলা হইয়াছে। ইহা প্রকৃত অবস্থার কথা।

১১। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে, কথায় বিশ্বাস করিতে হইবে। বিশ্বাসেই তাঁহাকে বুঝিতে পারা যায়।

আমারা বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি। এক্ষণে বিশ্বাস কথাটী কি, তাহা বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বিশ্বাস কথাটাই প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তের কথা; আমি একটা আশ্চর্য্য দর্শন করিলাম, তাহা হইতে আমার যে জ্ঞান লাভ হইল, সেই অবস্থাটীকে বিশ্বাস বলে। বিশ্বাস দুই প্রকার; এক প্রত্যক্ষ বিশ্বাস, দ্বিতীয় অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাস। যখন নিজে কোন বিষয় দেখিয়া জ্ঞানলাভ করে, তাহাকে প্রত্যক্ষ বিশ্বাস এবং প্রত্যক্ষ বিশ্বাসীর নিকট শুনিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাস কহে। সাধারণ লোকের যে বিশ্বাস, তাহাকে অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাস কহিতে হইবে। এই অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলিয়া যাইলে, পরে প্রত্যক্ষ বিশ্বাস হইয়া থাকে।

যদিও অপ্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষ শব্দ দুইটী প্রয়োগ করা হইল কিন্তু পৃথিবীতে অনেক সময়ে অনেক বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাস ইন্দ্রিয়গোচর না হইয়া জ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে। যেমন আপন জন্ম বিষয়ের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বিশ্বাস কখন হইতে পারে না, তাহা অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাসেই বিশ্বাস করিতে হয়। এই অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাস করিয়াও যখন তাহার ফল পাওয়া যাইতেছে, তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রথমতঃ অপ্রত্যক্ষ বিশ্বাসে মন স্থির করিয়া দিনকতক অপেক্ষা করিলে, প্রত্যক্ষ বিশ্বাস হইয়া যাইবে।

ব্রহ্ম ও শক্তিতে প্রভেদ কি?

১২। ঈশ্বর এক, তাঁহার অনন্ত শক্তি।

জড়-শাস্ত্রমতে আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীতে একের দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। সূর্য্য চন্দ্র এক, বায়ু এক, জল কিম্বা আকাশ এক। যৌগিক পদার্থ এক, রূঢ় পদার্থ এক, শক্তি এক, ঈশ্বরও এক। মহাকারণের মহাকারণ হইতে অনুলোম বা সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় মন অবরোহণ করিলে, ক্রমে একের বহু ভাব আসিয়া থাকে।

১৩। ঈশ্বর এবং তাঁহার শক্তি বর্ণনা করিতে হইলে, বহু হইয়া পড়ে; যেমন অগ্নি। অগ্নি বলিলে কি বুঝা যায়? বর্ণ, দাহিকা শক্তি এবং উত্তাপ ইত্যাদির সমষ্টিকে অগ্নি বলে; কিন্তু বিচার করিলে অগ্নি এবং আগ্নেয় বর্ণ, অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র নহে, অথবা অগ্নি এবং দাহিকা শক্তি কিম্বা অগ্ন্যুত্তাপ, অগ্নি হইতে পৃথক নহে। অগ্নি বলিলে ঐ সকল শক্তির সমষ্টি বুঝাইয়া থাকে। সেইরূপ অনন্ত শক্তির সমষ্টিকেই ব্রহ্ম কহা যায়, অতএব ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তি অভেদ।

বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণের দ্বারা ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। জড়-বিজ্ঞানে আমরা দেখিয়াছি, যেমন পদার্থ এবং শক্তি অভেদ, অর্থাৎ পদার্থ শক্তি ছাড়া এবং শক্তি পদার্থ ছাড়া থাকিতে পারে না। পদার্থ ছাড়িয়া দিলে শক্তির কার্য্য কখনই প্রকাশিত হইতে পারে না অথবা শক্তি ছাড়িয়া দিলে কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব উপলব্ধি হইতে পারে না। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শক্তির দ্বারা পদার্থেরা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়; তাহা জলের দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই প্রকার ব্রহ্ম এবং শক্তি অর্থাৎ মহাকারণের কারণ এবং মহাকারণের মহাকারণ অভেদ জানিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে কহিয়াছি যে, সৎ এবং চিৎ হইতে, স্থূল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। জগতের উৎপত্তির কারণ চিৎ। এই চিৎ শক্তিকে আদি শক্তি কহে। সৎ "ব্রহ্ম" এবং চিৎ "শক্তি" যাহা অভেদ অর্থাৎ একেরই অবস্থা-বিশেষ মাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

১৪। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, অচল, অটল এবং সুমেরুবৎ। তাঁহার শক্তি দ্বারা জগতের সমুদয় কার্য্য সাধিত হইতেছে। যেমন বৃক্ষের গুঁড়ি একস্থানে অচলবৎ অবস্থিতি করে, কিন্তু শাখা প্রশাখা দিক ব্যাপিয়া থাকে।

যেমন জড়-জগৎ দৃষ্টি করিলে, শক্তিকেই সকল প্রকার কার্য্যের অর্থাৎ পরিবর্ত্তনের নিদান-স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান হয়, পদার্থ উপলক্ষমাত্র থাকে, সেই প্রকার, ব্রহ্ম বা সৎ উপলক্ষ মাত্র, সুতরাং তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় কহা যায় এবং

শক্তির দ্বারা সকল কার্য্য হয় বলিয়া তাঁহাকে জগৎপ্রসবিত্রী বলে। যেমন এক ব্যক্তি লিখিতে পারে, পড়িতে পারে, নাচিতে পারে, গান করিতে পারে, উপদেশ প্রদান করিতে পারে, গাছে উঠিতে পারে, চিত্র করিতে পারে, অর্থাৎ নানাবিধ শক্তির কার্য্য তাহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এ স্থলে, সেই ব্যক্তি এক এবং উপলক্ষবিশেষ, বিবিধ শক্তি তাহাকে অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে। এই ব্যক্তি যেমন শক্তির সহিত অভেদ, সেই প্রকার, ব্রহ্ম এবং শক্তিও অভেদ জানিতে হইবে। যেমন কেবল ব্রহ্ম বলিলে, জগৎ কাণ্ড তথায় থাকিতে পারে না। সৃষ্টি আসিলেই শক্তির কার্য্য বলা যায়। এজন্য রামকৃষ্ণদেব কহিয়াছেন, যেমন জলাশয় স্থির থাকিলে তাহাকে ব্রহ্মের সহিত তুলনা করা যায়; তন্মধ্যে ঢেউ উঠিলে তাহাকে শক্তির কার্য্য কহা যাইবে। অর্থাৎ এক পক্ষে ক্রিয়া এবং এক পক্ষে ক্রিয়াহীন; ফলে অবস্থার কথাই হইতেছে। ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ কহে, সৎ "সত্য" বা "নিত্য", চিৎ "জ্ঞান" এবং আনন্দ "আহ্লাদ", অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য বা নিত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ। অতএব এই ত্রিবিধ ভাবের সমষ্টিই ব্রহ্ম। সৎ "নিত্য" এইটী ব্রহ্মপদ বাচ্য। এ অবস্থাটী বাক্য মনের অতীত। নিত্য এই শব্দটীর কি ভাব এবং আমরা বুঝিই বা কি? অনিত্য বস্তু দেখিয়া আমরা যে ভাব লাভ করিয়া থাকি, তাহার বিপরীত ভাবকে নিত্য কহে, ইহা অনুমান করিবারও নহে। চিৎ অর্থে জ্ঞান, এই চিৎ-শক্তি দ্বারা, জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে। জ্ঞান শক্তিই সর্ব্ব প্রকার সৃষ্টির নিদান স্বরূপ।

১৫। শক্তি ব্যতীত ব্রহ্মকে জানিবার কোন উপায় নাই। অথবা শক্তি আছে বলিয়াই ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়।

ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি আছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং আমরাও তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারি। রামকৃষ্ণদেব ব্রহ্মের অবস্থা নিষ্ক্রিয়, অচল ইত্যাদি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার শক্তি, সমুদয় কার্য্য করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ কি? ব্রহ্ম যগুপি নিষ্ক্রিয় হইলেন, তাহা হইলে শক্তি কার্য্য করিবেন কিরূপে?

আমরা যাহা কিছু বুঝিতে পারি, তৎ সমুদয় শক্তির প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্রহ্মের বিষয় যাহা কিছু অবগত হইতে চেষ্টা পাওয়া যায়,

তাহাতে শক্তিরই কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়; এবং উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম উপলক্ষ বিশেষ, এজন্য ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয় বলা হইয়াছে।

ব্রহ্ম দর্শনে শক্তিরই দর্শন হয়। তথাপি সেই শক্তিকে, ব্রহ্ম শব্দ প্রয়োগ না করিয়া দুইটী স্বতন্ত্র পদ ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য কি? কোন গৃহে একটী ব্যক্তি দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। বাহির হইতে গৃহাভ্যন্তরে কেহ আছে কি না, তাহা কাহার বোধ হইতেছে না। এমন সময়ে সুন্দর সঙ্গীত ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। বহির্দ্দিকে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সেই সঙ্গীত দ্বারা, গৃহের মধ্যে মনুষ্যের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলেন। এ স্থানে শক্তিই সেই ব্যক্তির নির্দ্দেশক হইল। অতএব শক্তির কৃপা না হইলে শক্তিমানের কাছে যাওয়া যায় না।

১৬। অরণ্যে যখন কোন প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তখন তাহার সৌরভ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া সকলের নিকট সমাচার প্রদান করিয়া থাকে। পুষ্প স্বয়ং কোথাও গমন করে না, কিন্তু সে স্থলে সৌরভ-শক্তিই তাহার পরিচায়ক। সেইরূপ শক্তিই ব্রহ্মবস্তু নিরূপণ করিয়া দেয়।

যদি ব্রহ্মদর্শন না করিয়া, শক্তির দ্বারাই ব্রহ্ম নির্ব্বাচন করা যায়, তাহার বিশেষ কারণ আছে। যখন আমরা বিবিধ শক্তির প্রকাশ দেখিতেছি, তখন সেই শক্তি সমূহ কাহাকে অবলম্বন করিয়া আছে? অবলম্বন ব্যতীত শক্তির শক্তি কোথায় স্বপ্রকাশ হইতে পারে? সর্ব্বত্রে উত্তাপ শক্তি আছে, কিন্তু ঘর্ষণ না করিলে তাহা প্রতীয়মান হয় না। অথবা সূর্য্যোত্তাপ, বায়ু এবং নভোমণ্ডলস্থ পদার্থকণা দ্বারা আমরা অনুভব করিতে পারি। এই জন্য শক্তি দর্শনে শক্তিমানের অস্তিত্ব সাব্যস্থ করা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে।

১৭। যে শক্তি দ্বারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে আদ্যাশক্তি বা ভগবতী কহে। কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী তাঁহারই নাম। এই শক্তি হইতেই জড় এবং চৈতন্য-প্রদায়িনী শক্তি জন্মিয়া থাকে। এক বৃক্ষের একটী ফুল হইতে একটী ফল উৎপন্ন হইল। তাহার কিয়দংশ

কঠিন, কিয়দংশ কোমল এবং কিয়দংশ অন্যান্য প্রকারে পরিণত হইয়া যাইল। যেমন বেল। ইহার বহিরাবরক বা খোসা, আভ্যন্তরিক কোমল অংশ বা শাঁস, এবং বিচি ও সূত্রবৎ গঠনগুলি, এক কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই প্রকার চৈতন্যশক্তি হইতে জড়ের উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে।

প্রকৃতপক্ষে চিৎশক্তি হইতে জগতের সমুদায় পদার্থ সৃষ্ট হয় বলিয়া তাঁহাকে মাতৃশব্দে নির্দ্দেশ করা যায়; এবং সৎ বা ব্রহ্মকে পিতা কহে। কখন বা এই চিৎ শক্তি পিতা এবং মাতা উভয়বিধ ভাবেই কথিত হইয়া থাকেন, তাহা ভাবের কথা মাত্র। তাঁহাকে মাতা বলায় যে ফল, পিতা ভ্রাতা কিম্বা ভগিনী অথবা প্রিয় সুহৃদ জ্ঞান করাও সেই ফল হইয়া থাকে।

শক্তি ব্যতীত, ব্রহ্মের অস্তিত্ব জ্ঞান হয় না, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত শক্তিই সর্ব্বাগ্রে আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকেন। যেমন মা'কে ধরিয়া পিতা জানা যায়, সেইরূপ শক্তিকে লাভ করিতে পারিলে, ব্রহ্মকে জানিবার আর চিন্তা থাকে না। শক্তি হইতে ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মিলে, তখন বুঝা যাইবে যে, যাঁহাকে ব্রহ্ম তাঁহাকেই শক্তি কহা যায়। ভাব লইয়া বিচার করিলে অভেদ বলিয়া প্রত্যক্ষ হইবে। যেমন ইতি পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, কোন ব্যক্তির নানাবিধ শক্তি আছে। এক্ষণে শক্তি এবং শক্তি-মান্‌কে বিচার করিলে সেই ব্যক্তিকে পুরুষ বা পুংলিঙ্গবাচক, তদাশ্রিত শক্তি-সমুহ সুতরাং স্ত্রী এবং সেই শক্তিসম্ভূত কার্য্যকে সন্তান কহা যাইবে। যেমন আমি চিত্র করিতে পারি। আমি পুরুষ, চিত্র করা শক্তি আমায় অবলম্বন করিয়া আছে সুতরাং তাহা স্ত্রী বা প্রকৃতি,এবং চিত্রটী উক্ত শক্তি বা প্রকৃতি সম্ভূত, সেই নিমিত্ত উহাকে সন্তান কহা যায়। বিচার বা বিশ্লেষণ করিলে, বাস্তবিক এই প্রকার বিভাগ দেখা যায় বটে কিন্তু সংশ্লেষণ দ্বারা শক্তি এবং শক্তিমান্ অভেদ বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে।

ঈশ্বরের স্বরূপ বা সাকার নিরাকার।

১৮। ব্রহ্মের দুই রূপ। যখন নিত্য, শুদ্ধ, বোধরূপ, কেবলাত্মা, সাক্ষীস্বরূপ, তখন তিনি ব্রহ্মপদ বাচ্য। আর যে সময়ে গুণ বা শক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন, তখন তাঁহাকেই ঈশ্বর কহা যায়।

হিন্দুশাস্ত্র-বিশেষ মতে, ব্রহ্মকে নির্গুণ এবং ঈশ্বরকে সগুণ কহে। যাঁহারা হিন্দুমতে ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁহারা সেই জন্য ঈশ্বরকে গুণযুক্ত বা মায়ারূপী কহিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু রামকৃষ্ণদেব এ মর্ম্মে কোন সময়ে কহিয়াছিলেন—

১৯। ব্রহ্মের প্রকৃত অবস্থা যে কি, অর্থাৎ বাস্তবিক গুণ বিবর্জ্জিত কিম্বা সকল গুণের আকর তিনি, তাহা মনুষ্যেরা কিরূপে নিরূপণ করিতে সক্ষম হইবে। তিনিই সগুণ, তিনিই নির্গুণ এবং তিনিই গুণাতীত। ব্রহ্মও যে বস্তু, ঈশ্বরও সেই বস্তু। যেমন, আমিই এক সময়ে দিগম্বর, আবার আমিই আর এক সময়ে সাম্বর।

যখন আমি উলঙ্গ অবস্থায় অবস্থিতি করি, তখনও যে আমি, পরিচ্ছদাদি দ্বারা আবৃত হইলেও, সেই আমি। বেশ পরিবর্ত্তন কিম্বা তাহা ত্যাগে, আমার কোন বিপর্য্যয় সঙ্ঘটনের হেতু হয় না। যে আমি পূর্ব্বে ছিলাম, এক্ষণেও সেই আমি আছি। যাঁহারা আমাকে জানিয়াছেন, তাঁহারা পরিচ্ছদ দ্বারা আমায় স্বতন্ত্র জ্ঞান করিবেন না। পরিচ্ছদ, বেশ ভূষা, "আমি নহি," তাহা উপাধি মাত্র। যেমন মনুষ্য জাতি। ইংরাজ, মার্কিন, কাফ্রি, হিন্দু কিম্বা যে কোন অসভ্য জাতিই হউক, তাহাদের দেহ এক জাতীয় পদার্থ দ্বারা সংগঠিত এবং এক জাতীয় কৌশলে তাহা সঞ্চালিত হইয়া থাকে। মনুষ্যদিগের এই অবস্থা সর্ব্বত্রে এক প্রকার। কিন্তু উপাধি অর্থাৎ গুণ

ভেদে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক শ্রেণী, এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব প্রধান এবং সকলের সহিত স্বতন্ত্র। গুণ ভেদে কেহ রাজরাজেশ্বর, গুণ ভেদে কেহ প্রান্তরের কৃষক, গুণ ভেদে কেহ দেবতা, গুণ ভেদে কেহ পাষণ্ড, গুণ ভেদে কেহ পণ্ডিত, গুণ ভেদে কেহ মূর্খাধম, গুণ ভেদে কেহ চিকিৎসক, গুণ ভেদে কেহ রোগী। এ স্থানে প্রভেদ কোথায় দৃষ্ট হইতেছে? মনুষ্যে না গুণে? যদ্যপি মনুষ্য দেখিতে হয়, তাহা হইলে রাজা হইতে অতি দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত এক জাতীয় বলিয়া পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু উপাধি দ্বারা দেখিতে হইলে সকলকেই স্বতন্ত্র জ্ঞান হইবে। রাজার সহিত কি ভিক্ষুকের সাদৃশ্য হইতে পারে? সেই প্রকার ব্রহ্ম বলিলে জগতের সকল পদার্থকেই বুঝাইবে; কারণ ব্রহ্মই সকলের আদি। যাহা কিছু হইয়াছে ও হইতেছে, তৎ সমুদয়ের উৎপত্তির কারণ ব্রহ্ম। এই নিমিত্ত সাধকেরা ব্রহ্মময় জগৎ বলিয়া গিয়াছেন ও অদ্যাপি বলিতেছেন। কিন্তু যখন সেই ব্রহ্মকে গুণ-বিশিষ্ট করিয়া অবলোকন করা যায়, তখনই ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে। রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, শিব, ব্রহ্মা সকলেই স্বতন্ত্র। প্রত্যেকের আকৃতি স্বতন্ত্র, প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং কার্য্যকলাপও স্বতন্ত্র। এইস্থানে, ব্রহ্ম গুণ-ভেদে অবয়ব ধারণ করিয়াছেন; সুতরাং সগুণ। এই গুণযুক্ত মূর্ত্তিদিগের আদি কারণ অর্থাৎ গুণত্যাগ পূর্ব্বক বিচার করিলে, তাঁহারা ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকেন। কারণ ব্রহ্ম হইতে শক্তি, শক্তি হইতে রূপ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং রূপের উৎপত্তির কারণ ব্রহ্মকেই জানিতে হইবে।

গুণাতীত সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রদান করা যাইতে পারে না। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা রামকৃষ্ণদেব বুঝাইয়া দিয়াছেন।

২০। ১০টী জলপূর্ণ মৃৎপাত্র অনাবৃত স্থানে সংরক্ষিত হইলে, সূর্য্যোদয়ে ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে সূর্য্যের প্রতি-বিম্ব লক্ষিত হইবে। তখন বোধ হইবে যে, দশটী সূর্য্য প্রবেশ করিয়াছে। যদ্যপি একটী একটী করিয়া সমুদায় পাত্রগুলি ভঙ্গ করা যায়, তাহা হইলে কি অবশিষ্ট থাকিবে? তখন সূর্য্যও থাকে না অথবা পাত্র এবং জলও থাকে না।

জলপূর্ণ পাত্রে যখন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছিল, তখন তাহাকে সগুণ কহা যায়; ইহার পূর্ব্বাবস্থাকে নির্গুণ বলা যাইতে পারে, তখন জল, পাত্র এবং সূর্য্য ছিল। কিন্তু পাত্র ভঙ্গ করিয়া দিলে, গুণাতীতাবস্থায় পরিণত হইয়া গেল; কারণ সে পাত্রে আর সূর্য্যবিম্ব দৃষ্ট হইবে না। যেমন, সমুদ্র হইতে কিয়ৎ পরিমাণ জল স্বতন্ত্র করিয়া কোন পাত্রে সংরক্ষিত হইল। এখন এই জল পাত্রযোগে গুণযুক্ত হইল, কিন্তু তাহাকে পুনরায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে কোন্ জল গৃহীত হইয়াছিল, তাহা পুনরায় স্থিরীকৃত হইতে পারে না। অথবা নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার একত্রে দ্রবীভূত করিলে, কোন্ অলঙ্কারের কোন্ সুবর্ণ, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

ব্রহ্মের রূপ, সাধকের অবস্থার ফলস্বরূপ। অর্থাৎ, সাধক যখন যে প্রকার অবস্থায় পতিত হন, ব্রহ্মকেও তখন সেই প্রকার দেখিয়া থাকেন। সাধক নির্গুণ হইবামাত্র ব্রহ্মও তৎক্ষণাৎ নির্গুণ হইয়া যান। সাধক যখন গুণাতীত, ব্রহ্মও তখন তদ্রূপ হইয়া থাকেন। গুণাতীতাবস্থায় কোন কথা নাই, জানিবার কিম্বা বুঝিবারও কিছুই নাই। সে স্থানে কি আছে, কি নাই, ইহা বোধ করিবার পাত্রও কেহ নাই।

২১। ঈশ্বর সাকার, নিরাকার এবং তিনি তাহার অতীত।

সাকার নিরাকার শব্দ দুইটী আমাদের দেশে অতি বিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। কাহাকে সাকার এবং কাহাকে নিরাকার বলে, তাহা আমরা রামকৃষ্ণদেবের নিকট যে প্রকার বুঝিয়াছি, এস্থলে সেইরূপ বর্ণনা করা যাইতেছে। সাধকেরা যে কোন প্রকারে বা যে কোন ভাবে ঈশ্বর সাধন করিয়া থাকেন, তাহাতেই সাকার নিরাকার এবং তাহার অতীতাবস্থায় কার্য্য হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান প্রচলিত যে কোন ঈশ্বর সাধনপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে উপরোক্ত ত্রিবিধ ভাব জাজ্বল্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের দেবদেবী উপাসনা যদিও সাধারণ লোকে সাকার বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাকে কেবল সাকার বলা যাইতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ আমরা একটী আকৃতি দেখিতে পাই। তাহা কোন জড় পদার্থ নির্ম্মিত হইলেও, সেই বিশেষ প্রকার জড় পদার্থ দর্শন করা উক্ত আকৃতি গঠনের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এক আকৃতি হইতে আপাততঃ

দুইটী ভাব উপস্থিত হইল। যেমন প্রস্তরের শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি। প্রস্তর জড় পদার্থ। যখন শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি দর্শন করা যায়, তখন প্রস্তরের ভাব কখন আসিতে পারে না এবং প্রস্তরের ভাব আসিলে কৃষ্ণের ভাব অপসৃত হইয়া পড়ে। অতএব প্রস্তরের কৃষ্ণ দর্শনকে সাকার এবং তদ্দ্বারা কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে ভাবোদয় হইয়া থাকে, তাহা দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত কিন্তু উপলব্ধি অর্থাৎ মনের আয়ত্তাধীন, তাহাকে নিরাকার এবং কৃষ্ণের আনুপূর্ব্বিক চরিত্র ও শক্তির বিকাশ মানস-পটে অঙ্কিত করিতে করিতে, অসীম ও অনন্ত ব্যাপার আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সাকার কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের লীলা কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার হিসাব করিতে আর কে সক্ষম হইতে পারেন? ইহাকে ঈশ্বরের অতীতাবস্থা বলা যায়। এক্ষণে কৃষ্ণ লইয়া বিচার করিলে, তাঁহার কোন্ অবস্থাটীকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইবে? একটীকে মিথ্যা বা কাল্পনিক বলিলে, অপর-গুলিরও অতি ভীষণাবস্থা উপস্থিত হইয়া যায়; সুতরাং এমন অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের কোন বিশেষ অবস্থায় সম্পূর্ণ নির্ভর না করা বিচক্ষণ লোকের কর্ত্তব্য।

চৈতন্য শাস্ত্রের মীমাংসায় কথিত হইয়াছে যে, এক ঈশ্বর হইতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর অনাদি এবং স্বয়ম্ভু। তাঁহার চিৎশক্তি হইতে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হইয়াছে, তাহা হইলে যাবতীয় পদার্থ বা অপদার্থ, এক বস্তুরই অন্তর্গত হইতেছে। ব্রহ্ম সত্য এবং নিত্য। সত্য এবং নিত্য হইতে অসত্য এবং অনিত্য বস্তুর উদ্ভাবন হওয়া যারপরনাই অদ্ভুত কথা। গঙ্গা হইতে জলো-ত্তলন পূর্ব্বক, হাঁড়ি, কলসি, সরা, ভাঁড়, খুরী, জালা কিম্বা বিবিধ প্রকার ধাতু বা অধাতু নির্ম্মিত পাত্রে সংস্থাপিত হইলে, জলের কি কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে? অথবা সুবর্ণখণ্ড হইতে মস্তক, কর্ণ, বাহু, গ্রীবা, বক্ষঃ, কটি প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গোপযোগী অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিলে, আকৃতি ভেদের জন্য, মূল সুবর্ণের তারতম্য হইবার সম্ভাবনা? সেইরূপ নিত্য বস্তু, যে কোন প্রকারে পরিদৃশ্যমান হউন, তাহার নিত্যত্বের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না।

নিরাকার উপসনা মতেও সাকার, নিরাকার এবং তাহার অতীতাবস্থার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিরাকার উপাসনায় মুখে যদিও সাকার অস্বীকার করা হয়, কিন্তু কার্য্যে তাহা হয় না। সাকারবাদীরা ব্রহ্মের অবতার এবং ভক্তদিগের মনোসাধ পূর্ণ করণার্থ সময়ে সময়ে, তাঁহার যে সকল রূপাদি প্রকটিত হইয়া থাকে, তাহাই পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু নিরাকারবাদী কেবল জড়পদার্থের ভাবাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে

যে নিরাকার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার আদি কারণ জড়পদার্থ, সুতরাং ইহাকেও সাকার কহা যায়। নিরাকার ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, দয়াস্বরূপ ইত্যাদি নানা আখ্যায় অভিহিত। এই বিবিধ "স্বরূপ" বিচারে কি সিদ্ধান্ত ফল হইবে? সত্যস্বরূপ বলিলে আমরা এই জড়জগতে যে কোন পদার্থ দ্বারা সত্য বোধ করিতে পারি, তাহা ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া থাকি। প্রেম, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতিও প্রত্যক্ষ জড়বস্তুর দ্বারা উপস্থিত হয়। যেমন আনন্দ বলিলে জীবনের কোন বিশেষ ঘটনাক্রমে যে অবস্থায় মনের সংকল্প ও বিকল্প বা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিলয় প্রাপ্ত হইয়া এক প্রকার ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাকেই নির্দ্দেশ করা যায়। এই আনন্দ জড়পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইতেছে। প্রিয় পুত্র বা বন্ধু দর্শনে আনন্দ হয়। সুমিষ্ট সুস্বাদু আহারে আনন্দ হয়, সুনির্ম্মল বায়ু সেবনে আনন্দ হয়, ইত্যাদি। অথবা পার্থিব কোন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন বা স্বাভাবিক দৃশ্য দ্বারা আনন্দের উদয় হয়; তথায়ও জড়-বস্তু তাহার কারণ। এতদ্ভিন্ন নিরাকার উপাসনায় যে সকল ভাবের কথা প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহাও জড়পদার্থ সংযুক্ত ভাব। যথা পিতা, মাতা, প্রভু ও বন্ধু কিম্বা অন্য কোন ভাব। এই ভাবও জড়পদার্থগত, তাহার অন্যথা নাই। এই নিমিত্ত নিরাকার-উপাসনা-পদ্ধতিতেও সাকার ও নিরাকার ভাব একত্রে জড়ীভূত রহিয়াছে।

নিরাকার ভাবে অতীতাবস্থাও আছে। যেমন কোন সাধক পিতৃভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, যে পর্য্যন্ত তাঁহার মনে "পিতা" এই ভাব থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে সাকার কহা যায়। কারণ পিতৃভাব জড়পদার্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন ঈশ্বরের প্রতি সেই ভাব বিশেষরূপে সংযুক্ত হইয়া যায়, তাহাকে নিরাকার বলে। সে সময়ে জড় পিতার ভাব অদৃশ্য হইয়া যায়। এই নিরাকার ভাবে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিলে সে ভাবেরও বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন সেই সাধকের অবস্থা সাকার নিরাকারের অতীত।

পূর্ব্বকথিত সাকার উপাসনার ন্যায় নিরাকার ভাব চিন্তা করিয়া দেখিলে, কোন বিশেষ অবস্থার প্রতি সত্যাসত্য নির্দ্দেশ করা যায় না।

মনুষ্যেরা যে পর্য্যন্ত মানসিক চিন্তা দ্বারা অগ্রসর হইতে পারেন, সে পর্য্যন্ত সাকার এবং নিরাকার এই দুটী ভাবই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। চিন্তা করিতে করিতে এমন অবস্থা উপস্থিত হয়, যথায় কিছুই স্থির করা

যায় না। বাক্যে সে ভাব প্রকাশ করা সাধ্যসঙ্গত নহে এবং দৃশ্য জগতেও তত্তৎ প্রসূত ভাবের লেশ মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইবেন। ফলতঃ, ঈশ্বরের সেই অবস্থাকে অতীতাবস্থা বলা যায়।

ঈশ্বর সাকার, নিরাকার এবং তাহার অতীত, অথবা আর যে কি তিনি, তাহা কাহার কর্ত্তৃক সবিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। ইহা মনুষ্যের চিন্তা, যুক্তি ও বিচারের অন্তর্গত নহে।

মনুষ্যদিগের দৃশ্য বস্তু হইতে ভাবের উদ্রেক হয়। দৃশ্য বস্তু সংক্রান্ত শাস্ত্রকে পদার্থ বিজ্ঞান (natural philosophy) এবং যদ্দ্বারা তাহা হইতে ভাব লাভ করা যায়, সেই শাস্ত্রকে মনোবিজ্ঞান (mental philosophy) কহে। পদার্থ এবং মনের মধ্যবর্ত্তীকে (medium) ইন্দ্রিয় (sense) বলা যায়। অর্থাৎ পদার্থেরা ইন্দ্রিয়গোচর হইলে মনের অধিকারভুক্ত হইতে পারে। তদনন্তর যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান কহে। এই জ্ঞান নিরাকার বস্তু, এবং নিরাকারবাদীরাও ঈশ্বরকে জ্ঞানময় বা জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু কোন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সেই পদার্থের প্রয়োজন, মনের প্রয়োজন এবং মধ্যবর্ত্তী ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। এই তিনের সংযোগে জ্ঞান লাভ হয়। মনুষ্যেরা এইরূপে জগতের পদার্থদিগের দ্বারা যে পর্য্যন্ত জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, তাহাতেও সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই। পদার্থ-বিজ্ঞান কিম্বা মনো-বিজ্ঞানের অসীম সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাব বহির্গত হইয়াও, কোন পদার্থের প্রকৃতাবস্থা এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। জড়শাস্ত্রে আমরা বলিয়াছি যে, জল দৃশ্য পদার্থ। ইহার অন্যান্য রূপান্তর আমরা দেখিতে পাই। যথা, বরফ ও জলীয় বাষ্প। এই পদার্থের এই স্থানেই অবসান হইতেছে না। পদার্থ বিজ্ঞান দ্বারা, যে বিশ্লিষ্ট করিয়া দুইটী স্বতন্ত্র ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহারা অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন শব্দে কথিত হইয়াছে, ইহারাও ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ। এ স্থানেও পদার্থ, ইন্দ্রিয়াদি ও মন একত্রে কার্য্য করিয়া জ্ঞান প্রদান করিতেছে। কিন্তু জলের এই দ্বিতীয়াবস্থা হইতে ঊর্দ্ধগামী হইলে আর পদার্থ বোধ থাকে না। তখন কেবল মন এবং ইন্দ্রিয় কার্য্যকারী থাকে। অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের স্বরূপ অবস্থা নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলে, পদার্থ বলিয়া আর উহাদের গণনা করা যায় না। কারণ আমরা যে কোন পদার্থ দেখিতে পাই, তাহা শক্তির বিকাশ

(manifestation of force) মাত্র। শক্তি পদার্থ নহে। কিন্তু তাহারা যখন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের পদার্থ কহা যায়। এ সম্বন্ধে জড়-শাস্ত্রে যথেষ্ট বলা হইয়াছে।

মন এবং ইন্দ্রিয় যখন শক্তিতে অবস্থিতি করে, সেই অবস্থার সহিত নিরাকার ভাবের সাদৃশ্য হইতে পারে। শক্তি অতিক্রম করিয়া, শক্তিমানের ভাব আসিলে, ইন্দ্রিয় ও মনের কার্য্য নিস্তেজ হইয়া আইসে। ইহাকে অতীতাবস্থা বলিলে যাহা উপলব্ধি হয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে সেই প্রকার বুঝিয়া লওয়া উচিত।

চিন্তাশীল ব্যক্তি এই প্রকারে জল বিশ্লিষ্ট করিয়া স্থুল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ পর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক, পুনরায় জলের ভাবে প্রত্যাগমন করিয়া, যখন মনে মনে ভাবিয়া দেখেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, জল সম্বন্ধে কোন্ অবস্থাটীকে সত্য বলিয়া নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। জল হইতে জলের মহাকারণ পর্য্যন্ত এক অবস্থা কিম্বা বস্তুগত কোন বিশেষ তারতম্য আছে, তাহা কাহার সাধ্য স্থির করিয়া বলিবেন?

ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করা তদ্রূপ। ইহার কোন্‌টী সত্য বা মিথ্যা, তাহা নির্ণয় করিতে যাওয়া অতি অজ্ঞানের কার্য্য।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পদার্থ, ইন্দ্রিয় এবং মন, এই তিনের সংযোগ ব্যতীত জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। জ্ঞান লাভ করিয়া তাহা হইতে অন্যান্য জ্ঞান উপার্জ্জন করা যায়।

যখন কোন পদার্থ, দর্শন কিম্বা স্পর্শন অথবা আস্বাদন করা যায়, তখন আমরা কি করিয়া থাকি? পদার্থ ইন্দ্রিয়গোচর হইবামাত্র মন তৎসম্বন্ধে একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া লয়, যাহাকে বিচার বলে। পরে উহা দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহাকে যুক্তি কহে।

মনুষ্যেরা যখন যে কোন কার্য্য করেন, তখনই বিচার এবং যুক্তি ব্যতীত তাহা কদাপি সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যের ইহাই স্বভাবসিদ্ধ লক্ষ্য।

ঈশ্বর সাধনের জন্য যখন কেহ মনোনিবেশ করেন, তখনও তাঁহাকে বিচার এবং যুক্তি অতিক্রম করিয়া যাইতে দেয় না।

বিচার কার্য্য দুই প্রকার, (১) স্থুলের স্থুল হইতে মহাকারণের মহাকারণে, গমন, (২) মহাকারণের মহাকারণ হইতে স্থুলের স্থুলে প্রত্যাগমন। প্রথমকে বিশ্লেষণ (analysis) দ্বিতীয়কে সংশ্লেষণ (synthesis) কহে।

নিরাকারবাদীরা প্রথম শ্রেণীর এবং সাকারবাদীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

নিরাকারবাদীরা জড়পদার্থ অবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বরের ভাব লাভ করেন এবং সাকারবাদীরা ঈশ্বরের ভাব লইয়া জড়ভাবে আসিয়া থাকেন। জড় ভাবে বলিবার হেতু এই যে, সাকারবাদীরা আপনাপন অভিলষিত ঈশ্বরের রূপ লইয়া, শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি ভাবে বিহার করিয়া থাকেন। এই ভাব সকল "জড়পদার্থ" মনুষ্য হইতে লাভ করা যায়, তন্নিমিত্ত উহাদের জড়ভাব বলিয়া কথিত হইল।

সাধারণ লোকেরা মনুষ্যদিগকে চেতন পদার্থ মধ্যে পরিগণিত করেন কিন্তু আমরা তাহা অস্বীকার করি। কারণ মনুষ্যদিগকে জড়চেতন পদার্থের যৌগিক বলিলে ভাবাশুদ্ধি হয় না। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জড়দেহগত ভাব বলিয়া আমরা "জড়" শব্দই প্রয়োগ করিলাম।

যদিও সাকার এবং নিরাকারবাদীদিগের ভাবের প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিলে উভয়ের উদ্দেশ্য একপ্রকার বলিয়া প্রত্যক্ষ হইবে।

সাকারবাদীরা যে রূপবিশেষকে ঈশ্বরের রূপ বলিয়া ধারণা করেন, তাহা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অথবা আনুমাণিক বিষয় কিম্বা কেবল বিশ্বাসের কথা? প্রবর্ত্ত-সাধকের পক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ বিষয় হইতে পারে না, আনুমানিকও নহে। তাহা হইলে নূতন রূপের প্রকাশ হইয়া যাইত কিন্তু বিশ্বাসের কথা, তাহার তিলার্দ্ধ সংশয় নাই। কোন্ যুগে রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাকে অদ্যাপি ঈশ্বর বলিয়া পূজা করা বিশ্বাস বতীত কি হইতে পারে?

কেবল বিশ্বাসের কথা, এই জন্য বলা যায় যে, সাধক যে রামরূপ সর্ব্ব প্রথমেই প্রত্যক্ষ করেন, তাহা মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা বলিতেছেন, এই নব দূর্ব্বাদলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ধনুর্ব্বাণধারী ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র। সাধক কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাই বুঝিলেন এবং তাহাই দেখিলেন। এক্ষণে এ রূপ প্রকৃত রামের রূপের স্বরূপ হইলেও প্রবর্ত্ত সাধক তাহা রামের রূপ বলিয়া দেখেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন, সেই আকৃতি ধ্যান করিতেছেন। এই নিমিত্ত এ প্রকার সাকার সাধনকে নিরাকার সাধন বলা অসঙ্গত নহে।

সাকারে নিরাকার ভাব আমাদের দেবদেবী পূজাতে বিশেষরূপে দেখা যায়। দেবদেবী কোন প্রকার পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত এবং বস্ত্রাদি ও নানাবিধ

অলঙ্কার দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াও যে পর্য্যন্ত তাহাতে দেবতার আবির্ভাব না করা যায়, সে পর্য্যন্ত তাঁহার পূজা হয় না এবং ঠাকুর বলিয়া গণনায় স্থান দেওয়া যায় না। প্রাণপ্রতিষ্ঠাকালে যে দেবতাকে আহ্বান করা হয়, তিনি ইন্দ্রিয়গোচর নহেন। যে অবধি তাঁহাকে উপস্থিত রাখা হয়, তখনও তিনি অলক্ষিত থাকেন এবং স্বস্থানে বিদায় অর্থাৎ দক্ষিণান্তকালেও তাঁহাকে কেহ দেখিতে পান না। বস্তুতঃ তিনি কি আকারে আসিলেন, কি আকারে অবস্থিতি করিলেন এবং পুনরায় কি আকারেই বা চলিয়া গেলেন, তাহা কেহ বলিতে সক্ষম নহেন। সুতরাং তাঁহাকে সাকার বা আকারবিশিষ্ট বলিলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হইবেন। যখন উপরোক্ত সাকার পূজায় যাঁহাকে পূজা করা হইল, তিনি ইন্দ্রিয়গোচর হইলেন না, তখন তাঁহাকে আকার-বিশিষ্ট বলা ন্যায়বিরুদ্ধ কথা। অতএব সাকার মতের উপাসনায় ঈশ্বরের দিক্ হইতে বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। এই মতের সাকার ভাব বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলিলে দেখা যায় যে, ইহার উদ্দেশ্য বস্তু নিরাকার, কিন্তু অবলম্বন জড়পদার্থ, যাহা সাকাররূপে প্রতীয়মান হইতেছেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নিরাকারবাদে অবিকল ঐরূপ ভাব রহিয়াছে; যদ্যপি সাকার নিরাকার শব্দ দুইটী ছাড়িয়া দিয়া অবস্থা চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে সকল বিবাদ ভঞ্জন হইয়া যাইবে।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, সাকার নিরাকার অবস্থার কথা। এবং ইহাতে কথিত হইয়াছে যে, কার্য্যে প্রবর্ত্ত-সাধকের পক্ষে নিরাকার উপাসনাই হইয়া থাকে। যাঁহারা নিরাকারবাদী, তাঁহারা নিরাকারেই জীবন অতি-বাহিত করেন। তাঁহারা মনে মনে এই স্থির করিয়া রাখেন যে, ঈশ্বর নিরাকার, নিরাকার ভিন্ন সাকার নহেন। তাঁহার কোন রূপ নাই, আকৃতি নাই, ইত্যাদি।

নিরাকারবাদীদিগের এই মীমাংসা নিতান্ত বালকবৎ কথা বলিয়া জ্ঞান হয় এবং এ প্রকার সিদ্ধান্ত করাও যারপরনাই বাতুলতা মাত্র। কারণ, ব্রহ্মাণ্ড-পতি সর্ব্বশক্তিমানের শক্তির ইয়ত্তা করা ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে সাধ্যসঙ্গত কি না, তাহা আত্মজ্ঞানী মাত্রেই বুঝিয়া থাকেন। যে জীবের পরক্ষণের পরিণাম অগোচর, যে জীব ব্রহ্মাণ্ডপতির জড়পদার্থ নির্ম্মিত হইয়া জড়জগতের পরাক্রমে প্রতিনিয়ত পরিচালিত হইতেছে, যে জীব অদ্যাপি জড়পদার্থের ইতিহাস

নিরূপণ করিতে পারিল না, সেই জীব ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল। ইহা সামান্য রহস্যের ব্যাপার নহে। সে যাহা হউক, নিরাকারবাদীরা ঈশ্বরকে দেখিতে চাহেন না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুদিগকে তাঁহারা প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহার কারণ কি তাঁহারা বুঝিয়াছেন তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে, আমরা তাহাকে ভ্রম বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। এই নিমিত্ত কস্মিন্‌কালে তাঁহাদের অদৃষ্টে ঈশ্বরের সাকার রূপ দর্শন হয় না।

কথা হইতে পারে যে, প্রবর্ত্ত-সাধক হইতে সিদ্ধকাল পর্য্যন্ত কি, এক ভাবে জীবন কাটিয়া যায়? ভাবের কি উন্নতি হয় না? অবশ্য হইয়া থাকে। নিরাকারবাদের ভাব দৃঢ়ীভূত হয় এইমাত্র। ঈশ্বর অনন্ত, সুতরাং খণ্ড জীবের পক্ষে সে ভাবের অন্ত হইবে কেন? নিরাকারবাদীদিগের উদ্দেশ্য নিরাকার ঈশ্বর। সাধনারম্ভেও নিরাকার, মধ্যে নিরাকার এবং পরিশেষেও নিরাকার। নিরাকার হউন, কিন্তু সাধকের উদ্দেশ্য ঈশ্বর বলিয়া, এ সাধনের ইতর বিশেষ করা যায় না।

সাকারবাদীদিগের সাধন কালে, সাধকের ঈশ্বর উদ্দেশ্য থাকে এবং জড়সম্বন্ধীয় যে কোন পদার্থ দ্বারা, সেই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হউক না কেন, সেই পদার্থবিশেষ উপাসনা করা হয় না। মনে যে ভাব উপস্থিত থাকে, সাধন করিলে তাহাই প্রত্যক্ষ হয়। যেমন তম্বুরায় লাউ এবং তার ব্যবহৃত হয় বলিয়া তদ্দ্বারা সুরবোধ জন্মিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না।

সাকারবাদীদিগের এইরূপে সাধন করিতে করিতে যখন মনের ক্ষুধা প্রাণে যাইয়া মিলিত হয়, তখনই ভগবানের সাকার রূপ ইন্দ্রিয়গোচর হয় এবং ভক্তের অভিলষিত বর প্রদান করিয়া তিনি অদৃশ্য হইয়া যান। পরে ভক্ত যখনই তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি পুনরায় আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

এই সাকার রূপ দর্শন করিবার পর ভক্তের ক্রমে ক্রমে পার্থিব জ্ঞান সঞ্চারিত হইতে থাকে। তখন স্বপনে যেমন কোন অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া নিদ্রাবসানে তাহা কেবল স্মরণ থাকে, এই সাকার রূপ সম্বন্ধেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। সাধকেরা এই অবস্থায় আপনাপন সাকার ঈশ্বরের রূপ সর্ব্বক্ষণ দর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্বভাব উদ্দীপনের জন্য জড়পদার্থ দ্বারা আকৃতি গঠিত করিয়া রাখেন। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "যেমন শোলার আতা দেখিলে সত্যের

আত্মা স্মরণ হয়।” সাকার সাধকের যখন এই প্রকার অবস্থা হয়, তখন তাঁহাকে একপ্রকার নিরাকার সাধকও বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই অবস্থার নিরাকার সাধক, সাধক-প্রবর্ত্ত অর্থাৎ যাঁহার সেই জড়মূর্ত্তির নিত্য রূপ দর্শন হয় নাই এবং নিরাকারবাদীদিগের ভাবের সহিত সম্পূর্ণ প্রভেদ আছে।

নিরাকারবাদীরা বলিতে পারেন এবং বলিয়াও থাকেন যে, ঈশ্বর বাক্য মনের অগোচর, সুতরাং তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যাঁহার এই ধারণা নিশ্চিত-রূপে দৃঢ়ীভূত হয়, তাঁহার পক্ষে ঈশ্বর সাধন করিবার প্রয়োজন কি? তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। অথবা যদ্যপি তাঁহার অস্তিত্বই অস্বীকার করা যায়, তাহাতেই বা আপত্তি কি হইতে পারে? যিনি মনের অগোচর, তিনি তবে গোচর কিসের? সত্য কথা বলিতে হইলে, এ প্রকার মতাবলম্বীদিগের ঈশ্বর সাধনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি আছেন কি নাই, এ সম্বন্ধে কোন স্থিরতা নাই। যাঁহাকে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, কথা কহান যায় না, আহার করান যায় না, এমন কি মনের দ্বারা ভাবনা করাও যায় না; এ প্রকার যে কেহ আছেন, তিনিই ঈশ্বর। এ প্রকার আত্ম-প্রতারণা করা অপেক্ষা সহজ কথায় ঈশ্বর নাই বলিলেই ভাল হয়। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, “বাক্য মনের অগোচর অর্থে বিষয়াত্মক মনের অগোচর, কিন্তু বিষয়বিরহিত মনের গোচর তিনি।” এক্ষণে “মনের গোচর” বলায় ইন্দ্রিয়গোচর ভাব খণ্ডিত হয় নাই। ইন্দ্রিয়গোচর বলিলেই মনের গোচর বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা মনের সংস্কার জন্মে। আমরা পূর্ব্বে তাহা বর্ণনা করিয়াছি।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, “যে সরল মনে, প্রাণের ব্যাকুলতায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য ধাবিত হয়, তাঁহার নিকটে তিনি নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইয়া থাকেন।” অথবা “লোকে বিষয় হইল না বলিয়া তিন ঘটি কাঁদিবে, ছেলের অসুখ হইলে, অস্থির হইয়া বেড়াইবে এবং কত রোদন করিবে, কিন্তু ঈশ্বর লাভ হইল না বলিয়া, কেহ কি একবিন্দু চক্ষের জল ফেলিতে চাহে? কাঁদিয়া দেখ, প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া দেখ, অধিক নহে, তিনদিন মাত্র, তাঁহার আবির্ভাব হয় কি না?”

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে, যাঁহারা ঈশ্বরের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কি ঈশ্বর দেখিতে সাধ হয় না? যাঁহার জন্য বিবেক বৈরাগ্য, যাঁহার জন্য পার্থিব সুখসম্ভোগ আজীবনের জন্য সমুদায় পরিত্যাগ করা হইল, তাঁহার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করা কি মূর্খের কর্ম্ম?

যে সাধকের তীব্র অনুরাগ হয়, ঈশ্বর অদর্শনে যাঁহার প্রাণবায়ু বক্ষঃস্থল হইতে নিঃশেষিত হইবার উপক্রম হয়, তিনিই ঈশ্বরের সাকার রূপ দর্শন করিয়া থাকেন, নতুবা কেবল জপতপে এবং বৈরাগ্য ও সাধন ভজনের আড়ম্বর করিলে তাঁহাকে দর্শন করা যায় না। এই নিমিত্ত নিরাকারবাদীদিগের সাম্প্রদায়িক ভাব ভ্রমাবৃত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়।

সাকারবাদীদিগের সাম্প্রদায়িক ভাবও উপরোক্ত নিরাকারবাদীদিগের ন্যায় ভ্রমসংযুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে। সাম্প্রদায়িক সাকারবাদীরা নিরাকারবাদীদিগের মতকে অগ্রাহ্য করেন এবং কত কটুবাক্যও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই দোষ কেবল এ পক্ষের একাধিপত্য তাহা বলিতেছি না, নিরাকারবাদীরাও সাকারবাদীদিগকে পৌত্তলিক জড়োপাসক বলিয়া যথাবিধি তিরস্কার করিতে কখন বিরত হন না। উভয়পক্ষই এই দোষে অপবিত্র হইয়া রহিয়াছে, তাহার সংশয় নাই। সাকারবাদীরাও অনেক সময়ে উপদেশের অভাবে মনে করেন যে, ঈশ্বর সাকার ভিন্ন নিরাকার নহেন। তাঁহাদের আরও ধারণা আছে যে, বিশেষ সাকার রূপই জগতের একমাত্র ধ্যেয় বস্তু। এই প্রকার কুভাব ধারণা করিয়া তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের যারপরনাই দুর্গতি করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা সাকার নিরাকার সম্বন্ধীয় মতদ্বয় স্বতন্ত্ররূপ বিচার করিলাম সত্য কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের অভিপ্রায়ে, সাকার নিরাকার বলিয়া স্বতন্ত্র উপাসনাপ্রণালী হওয়া উচিত নহে। সাকার নিরাকার এবং তদতিরিক্তাবস্থা বলিয়া যাহাই কথিত হইবে, তাহা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের জ্ঞান করিয়া সকলের নিস্তব্ধ হওয়া কর্ত্তব্য।

সাকার নিরাকার সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, তাহাতে এই প্রতিপন্ন করা হইতেছে যে, প্রত্যেক ঈশ্বর-উপাসককে তাঁহাদের প্রথমাবস্থায় নিরাকার উপাসক কহা যায়। সাকার সাধনের মধ্যদশায় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হয়, তাহাকেই প্রকৃত সাকার বলে। এই সাকার নিত্য, তাহা কাষ্ঠ প্রস্তর কিম্বা ধাতুনির্ম্মিত নহে। অথবা সে মূর্ত্তি মনুষ্যদিগের দ্বারা কল্পিত কিম্বা সৃষ্ট হয় না। সেই মূর্ত্তি আপনি ভক্তসমীপে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

এই সাকার দর্শনের পর ঈশ্বর অন্তর্হিত হইলে, তিনি যে কিরূপে অবস্থিতি করেন, তাহা সাকারবাদী বলিতে অসমর্থ। ইহাকে অতীত কহে, এই অবস্থাকেও নিরাকার বলা যাইতে পারে।

সাকার নিরাকার বুঝাইবার জন্ম, রামকৃষ্ণদেব জলের উপমা দিয়া বলিতেন, "যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, সাকার রূপও তদ্রূপ।"

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জল দ্বিবিধরূপে অবস্থিতি করিতেছে। যথা, জল এবং বরফ। জলীয় বাষ্প ইন্দ্রিয়ের অগোচর। জল যখন বরফ হয় অথবা তাহাকে বাষ্পে পরিণত করা যায়, যখন তাহার আকৃতি এবং প্রকৃতির ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলেও উপাদানের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহাই বলিতে হইবে। যেমন জলীয়-বাষ্প এবং বরফের ধর্ম্মের প্রভেদ আছে, তেমনই নিরাকার এবং সাকার ঈশ্বরের কার্য্যের প্রভেদ অছে। যেমন জলীয় বাষ্প অদৃশ্য পদার্থ; তদ্দ্বারা পিপাসা শান্তি হয় না। কিন্তু জলীয়-বাষ্প বিশ্বাসীর উপলব্ধির পক্ষে ভুল বলা যায় না। নিরাকার ঈশ্বর দ্বারা সেইরূপ হইয়া থাকে। যেমন নিরাকার জলীয় বাষ্প শৈত্য প্রয়োগে ঘনীভূত হইয়া বরফে পরিণত হয়, ঈশ্বর দর্শণেচ্ছা-রূপ প্রগাঢ় অনুরাগ দ্বারা সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ঈশ্বরকে, সাকাররূপে দর্শন করা যায়।

যাঁহারা জল পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা জলের ত্রিবিধ আকারকে ভৌতিকাবস্থা বলিয়া থাকেন। ইহা জলের উপাদানগত ধর্ম্মের কোন কার্য্য নহে। জলের উপাদান কারণ লইয়া বিচার করিলে তাহার সীমা হয় না। তথায় যেমন জলকে অনন্ত এবং বাক্য মনের অতীত বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়, ঈশ্বর সম্বন্ধেও সাকার নিরাকার বলিয়া, তদনন্তর "আর যে কি তিনি, তাহা কে বলিতে পারে?" তাহা কাজেই বলিতে হয়।

অনেকে বলিতে পারেন যে, শাস্ত্রে নিরাকার ঈশ্বরের এত বৃত্তান্ত কিজন্য উল্লিখিত হইয়াছে? তাহা কি মিথ্যা?

আমরা শাস্ত্রকে মিথ্যা বলিয়া অব্যাহতি পাইব না। শাস্ত্র মিথ্যা, একথা কে বলিতে চাহেন? কিন্তু শাস্ত্রে উহা কি জন্য উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সিদ্ধপুরুষ ব্যতীত, অন্য কাহার জানিবার উপায় নাই। আমরা এ সম্বন্ধে যাহা রামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে বুঝিয়াছি, তাহা বর্ণনা করিতেছি।

নিরাকার অর্থে আকারবিবর্জ্জিত। পৃথিবীতে আকারবিশিষ্ট যে সকল পদার্থ আছে, তিনি তাহার অন্তর্গত নহেন। ইহা দ্বারা এই বুঝিতে পারা যায়, যেমন মনুষ্য বলিয়া আকারবিশিষ্ট যে পদার্থ আছে, তাহা তিনি নহেন। অথবা অন্য কোন পার্থিব কিম্বা গগণমণ্ডলস্থ কোন প্রকার পদার্থকে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। দৃশ্য জগতের এই সকল পদার্থদিগের অতীতা-

বস্তার ভাব ধারণা করিতে পারিলে, ঈশ্বরের নিরাকার ভাব লাভ করা যায়। যেমন ঈশ্বর মনুষ্য নহেন, পশুপক্ষী নহেন, কীট পতঙ্গ কিম্বা বৃক্ষ লতা অথবা পর্ব্বত সাগরও নহেন। যখন জড়জগতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় পদার্থনিচয় হইতে আর এক প্রকার অকথ্যভাব মনোমধ্যে উদয় হয়, তাহাকেই নিরাকার ভাব কহে। এক্ষেত্রে যে ভাব আসিল, তাহা পার্থিব পদার্থের দ্বারা উৎপন্ন হইল বলিয়া তাহাকে পার্থিবভাব বলা যাইতে পারে না। কারণ তিনি মনুষ্য নহেন। তবে তিনি কি? মন বুঝিল কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে শব্দ অপারক হইয়া পড়িল। কিন্তু এই অবস্থায় ভগবান্ যদ্যপি একটী নর রূপে স্বপ্রকাশ হন, তাঁহাকে কোন্‌ভাবে গ্রহণ করা যাইবে? তিনি কি আমাদের ন্যায় মনুষ্যশ্রেণীতে পরিগণিত হইবেন? তাহা কখনই নহে। তাঁহাকে মনুষ্যের আকারে দেখা গেল সত্য, মনুষ্যের ন্যায় ভক্তের সহিত ব্যবহার করিলেন বটে, কিন্তু তিনি সাধারণ মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারেন না। কারণ, মনুষ্যেরা যে সকল নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া জীবন ধারণ করে, ভগবানের অবতরণ সেরূপে হয় না। এই নিমিত্ত তাঁহাকে মনুষ্য বলা যায় না। যদিও মনুষ্য বুদ্ধির উপযুক্ত অবস্থানুযায়ী তিনি আপনাকে স্বপ্রকাশ করেন,মনুষ্যেরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের ন্যায় মনুষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা মনুষ্যদিগের মনুষ্যোচিত স্বভাব এবং তাহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত।

ভগবান্ যে কেবল মনুষ্য রূপেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা নহে। কোন্ সময়ে কাহার জন্য, কি রূপে, কি ভাবে,কি আকারে পরিণত হন, তাহা তাঁহার ইচ্ছাধীন কথা, সুতরাং আমরা তাঁহাকে কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট আকারে নিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। যাহা বলিয়া কথিত হইবেন, তিনি তাহা নহেন। মনুষ্য হইতে দেখিলাম বলিয়া তাঁহাকে মনুষ্য বলিবে কে? মনুষ্য বলিলে দ্বিহস্তপদবিশিষ্ট প্রকার জীবকে নির্দ্দেশ করা হয়, ঈশ্বর কি তাহাই? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর বলিলে সৃষ্ট পদার্থের অতীত জ্ঞান উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের আকার কি তাহা স্থির করিতে না পারিলে, কাজেই তাঁহার আকার নাই বলিতে বাধ্য হইতে হয়। যে ভাবে নিরাকারবাদীরা তাঁহাকে নিরাকার বলেন, তাহা তাঁহাদের অবস্থাসঙ্গত বটে কিন্তু বলিবার ভুল। ভুল এই জন্য বলি যে, তাঁহারা ঈশ্বরের সাকার রূপ একেবারে অসঙ্গত এবং অসম্ভব বলিয়া ব্যক্ত করেন। মনুষ্যের অসঙ্গত এবং অসম্ভব কথা, তাঁহার পক্ষে নিতান্তই হাস্যজনক। তিনি কি, ও কি না এবং কেমন, তাহা মনুষ্যের

বুদ্ধি মনের অতীত। এমন স্থলে তাঁহাকে কোন বিশেষ শ্রেণীতে আবদ্ধ করিলে যারপরনাই সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির কার্য্য হয়, এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ নিরাকার শব্দের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ের গোচর করিয়া দেখিলে, রামকৃষ্ণদেব যাহা বলিয়াছেন, "সাকার নিরাকার এবং তাহার অতীত," এই কথা স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর থাকে না।

সাকার নিরাকার লইয়া আমাদের দেশে যে কি গুরুতর বিবাদ ও মতভেদ চলিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন হইতেছে না, এ বিবাদ যে নিতান্ত ভ্রমে হইয়া থাকে, তাহা শুদ্ধ ভক্তেরা বুঝিয়া থাকেন।

যাঁহারা নিরাকার বিশ্বাসী, তাঁহাদের মতে ঈশ্বর সাকার রূপে প্রকাশ হইতে পারেন না। এ প্রকার মত ভ্রমযুক্ত, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই কারণ ঈশ্বরের সাকার রূপ বিশ্বাস করিবার আপত্তি এই যে, সাকার হইলে অনন্তের সীমা হইয়া যায়, সুতরাং সীমাবিশিষ্ট বস্তু কখন ঈশ্বর হইতে পারে না; এক্ষণে কথা হইতেছে,যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে অনন্ত বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, তিনি নিজে অনন্ত না হইলে অনন্তের জ্ঞান কোথা হইতে পাইলেন? মনুষ্য মাত্রেই যদ্যপি সীমাবিশিষ্ট বা খণ্ড বস্তু হয়, তাহা হইলে খণ্ড হইয়া অখণ্ডের ভাব উপলব্ধি করা কদাপি সম্ভাবিত নহে। এই নিমিত্ত আমরা বলি যে, যাঁহারা খণ্ড হইয়া অখণ্ডের কথা কহেন, তাঁহারা নিতান্ত টীয়া পাখির রাধাকৃষ্ণ বুলি বলিতেছেন। অর্থাৎ যাহা বলিতেছ, তাহার ভাব উপলব্ধি হয় নাই। সুতরাং তাহা ভুল। দ্বিতীয় ভুল দেখাইতে গেলে নিরাকার সাধনের উৎপত্তির স্থান স্থির করিতে হইবে। কে বলিল যে, তাঁহার আকার নাই? জড় জগৎ। নিরাকার ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রেম, দয়া, ক্ষমা, রস, তেজ ইত্যাদি কথিত হইয়া থাকে। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, ইহাদের কে দেখাইতেছে? জড় জগৎ কি না? যদ্যপি জড় জগৎ দেখিয়া তাঁহার স্বরূপ সাব্যস্থ করিতে হয়, তাহা হইলে সে সিদ্ধান্ত যে কতদূর ভ্রমপূর্ণ,তাহা পদার্থতত্ত্ববিৎদিগের অগোচর নহে। জড় জগতের আংশিক কার্য্য দেখিয়া যাঁহারা ঈশ্বরের স্বরূপ বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ন্যায় ভ্রমান্ধ আর কাহাকে বলা যাইবে?

তৃতীয় ভুল এই যে, যাঁহারা জড়পদার্থ নির্ম্মিত সাকার মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জড়োপাসক বলিয়া ঘৃণা করা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি।

নিরাকারবাদীদিগের যে প্রকার ভ্রম ঘটিয়া থাকে, অন্যান্য প্রত্যেক সাম্প্র-

দায়িক ভাবেও ঐ প্রকারে সম্পূর্ণ ভ্রমের কার্য্য হইতেছে, তাহা সবিস্তাররূপে উল্লেখ হওয়া এ প্রস্তাবে সম্ভাবনা নাই। যে কেহ সাম্প্রাদিক ভাবে আপনাকে দেখিবেন এবং তাহার সহিত অপরকে মিলাইয়া লইতে চেষ্টা করিবেন, তাহাকেই প্রমাদে পতিত হইতে হইবে। যেমন চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু এক অদ্বিতীয় দেখা যায়, তেমনি ঈশ্বরকে এক জানিয়া আপনাপন ভাবে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলে সকলের সহিত মতভেদের দুঃসহ পূতিগন্ধ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়।

ঈশ্বর সাকার হউন বা নিরাকার হউন, তাহাতে আমাদের কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে? সাকার হন তাহাও তিনি, নিরাকার হন তাহাও তিনি। যে সাধকের ঈশ্বর সম্বন্ধে যে প্রকার ধারণা হইবে, সেই সাধক তদ্রূপই কার্য্য করিবেন। তাঁহার বিশ্বাস অতিক্রম করিয়া তিনি কখন পরিচালিত হইতে পারেন না।

২২। ঘণ্টার ধ্বনির প্রথমে যে শব্দ হয়, তাহাকে ঢং বলে, পরে সেই শব্দ ক্রমে ক্রমে বায়ুতে বিলীন হইয়া যায়। তখন তাহাকে আর কোন শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। যে পর্য্যন্ত উহাকে ব্যক্ত করা যায়, তাহাকে সাকার কহে। বাক্যের অতীত কিন্তু উপলব্ধির অধিকার পর্য্যন্ত নিরাকার; তাহার পরের অবস্থা, বাক্য এবং উপলব্ধির অতীত, ইহাকে তৃতীয়াবস্থা কহা যায়।

এই দৃষ্টান্তে সাকার নিরাকার একই বুঝাইতেছে। ইহা কেবল অবস্থার ভেদ মাত্র। সাকার রূপ কল্পিত এবং নিরাকারই ব্রহ্মের প্রকৃত অবস্থা, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে না।

২৩। ওঁকার উচ্চারিত হইলে ইহার প্রথমাবস্থায় সাকার, দ্বিতীয়াবস্থায় নিরাকার এবং তদ্‌পরে সাকার নিরাকারের অতীতাবস্থা।

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষী সাধকদিগের পথ অতি সুন্দররূপে কথিত হইয়াছে। ওঁকার উচ্চারিত হইয়া শব্দের বিলয় কাল পর্য্যন্ত স্থূলে প্রভেদ দৃষ্ট হইলেও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ত্রিকালে এক ভাবেই লক্ষিত হইতেছে। যখন

ওঁকার কথিত হইল, তদ্দ্বারা ব্রহ্ম বস্তু নির্দ্দেশ করা ব্যতীত বর্ণ বিন্যাস করা অভিপ্রায় নহে। যৎকালে কেবল শব্দমাত্র থাকে, তখনও ওঁকারাবস্থার উদ্দেশ্য ব্যতিক্রম হয় না। তদনন্তর যে অবস্থা সংঘটিত হয়, তাহা অব্যক্ত, সুতরাং তাহার সহিত পূর্ব্বাবস্থার তুলনা হইতে পারে না।

যদিও ওঁকার এবং তদ্‌পরবর্ত্তী শব্দের কোন প্রভেদ না থাকে, তাহা হইলে রামকৃষ্ণদেব এপ্রকার দৃষ্টান্ত কি জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন; এ কথা অনেকের জিজ্ঞাস্য হইবে। সাধকের প্রথমাবস্থায় নিরাকার ভাব ব্যতীত অন্য ভাব থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তবে যে স্থলে সাকার বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহার স্বতন্ত্র হেতু আছে। মনুষ্যের মন কোন প্রকার অবলম্বন ব্যতীত কোন বিষয়ে প্রবেশ করিতে সক্ষম নহে। এ জন্য ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভাবোদ্দীপক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র মন আপনি তাহার ভাব গ্রহণ করিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়া যায়। এই ভাবকে নিরাকার বা যদ্‌কর্ত্তৃক উহার উৎপত্তি হয়, তাহাকে সাকার কহে।

২৪। সাকার নিরাকার সাধকের অবস্থার ফল।

সাধক-প্রবর্ত্ত অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈশ্বর সাধনে নূতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে ব্রহ্মের কোন্ রূপ সঙ্গত? বালক ভাষা শিক্ষা করিবে, তাহাকে তখন উচ্চ গ্রন্থ পাঠ করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। তাহার পক্ষে ক-খ-ই প্রথম শিক্ষা, এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক, উচ্চ গ্রন্থে কি ক-খ নাই? গ্রন্থ মধ্যে ক-খ নানাবিধ আকারে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থে যে ক-খ, ক-খ শিক্ষাকালীনও সেই ক-খ, তাহার কোন প্রভেদ নাই। সাধক-প্রবর্ত্তেরও অবিকল সেই অবস্থা। এই জন্য প্রথমে তাঁহারা জড় রূপ, গাছ, পাথর, সূর্য্য, তারা, বায়ু, হুতাশন উপাসনা করিয়া থাকেন। জড়োপাসনা করা হইল বলিয়া ব্রহ্মোপাসনা হইল না বলা অদূরদর্শী অজ্ঞের কথা। কারণ জড়ের উৎপত্তির কারণ জড় শক্তি, জড় শক্তির উৎপত্তির কারণ চৈতন্য শক্তি, চৈতন্য শক্তির উৎপত্তির কারণ ব্রহ্ম। এই জন্য ব্রহ্ম এবং জড় পদার্থে কোন প্রভেদ নাই।

২৫। যেমন বরফ এবং জল। ইহার দুইটী প্রত্যক্ষ অবস্থা। একটী কঠিন আকারবিশিষ্ট এবং অপরটী তরল ও আকারবিহীন। জলের এই পরিবর্ত্তন উত্তাপ এবং

তাহার অভাব হীন-শক্তি দ্বারা সাধিত হয়। সেই প্রকার সাধকের জ্ঞান এবং ভক্তির ন্যূনাধিক্যে ব্রহ্মের সাকার নিরাকার অবস্থা হইয়া থাকে।

এই স্থানে জ্ঞানকে সূর্য্য এবং ভক্তিকে চন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যে সাধকেরা জ্ঞান বিচার দ্বারা ব্রহ্ম নিরাকরণ করিতে থাকেন, তাঁহাদের মনের অভিলাষ ঈশ্বর লাভ নহে। তাঁহারা মন বুদ্ধির সাহায্যে জড়জগৎ ও তদ্‌প্রসূত ভাব লইয়া সাধ্যসঙ্গত দূরে গমন করিয়া থাকেন। যখন ভাব অদৃশ্য হয়, তখন মন বুদ্ধিও কোথায় হারাইয়া যায়, তাহা আর কাহারও জানিবার অধিকার থাকে না। যে সাধকেরা সেই অবস্থাকে ঈশ্বর বলেন, তাঁহাদের জ্ঞানপন্থী কহা যায়; কিন্তু যাঁহারা এই অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া ঈশ্বর বলিয়া মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য জ্ঞানী-দিগের উদ্দেশ্য হইতে স্বতন্ত্র প্রকার। এই জন্য এই শ্রেণীর সাধকেরা ঈশ্বর দর্শন করিয়া থাকেন; ইহাঁদেরই ভক্ত বলে। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ভক্তিপথেও প্রথম অবস্থার ভাব নিরাকার এবং অবলম্বনসূত্রে সাকার উপাসনা হইয়া থাকে। ভক্তিপথে সাধকদিগের জন্য রূপবিশেষ সংগঠিত হইয়াছে। যথা—কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ, শিব ইত্যাদি। যে সাধক যখন ইত্যাকার রূপ-বিশেষ দ্বারা সাধনা করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার বাস্তবিক উদ্দেশ্য কি? কৃষ্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত দেবতা; এই স্থলে সেই সাধক প্রস্তর ভাবনা না করিয়া ভগবান্‌কেই চিন্তা করিয়া থাকেন। তাহার অবলম্বন সাকার বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ। উদ্দেশ্য যদি শ্রীকৃষ্ণ হন, তাহা হইলে তিনি কোথায়? সাধকের নিকটে তখন উপস্থিত নাই। তথাপি সাধক তাঁহার অস্তিত্ব উপ-লব্ধি করিয়া থাকেন। এই প্রকার মনের অবস্থাকালে প্রস্তরভাব থাকিতে পারে না। সুতরাং এ স্থলেও নিরাকার উপাসনা কহা যায়।

জ্ঞানী সাধকেরা যে অবস্থায় অর্থাৎ মনবুদ্ধি লয় হইয়া যাইলে ঈশ্বর প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, ভক্ত সাধকেরা সেই অবস্থায় জ্ঞান-লাভ পূর্ব্বক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মনের এই সঙ্কল্প হইয়া থাকে যে, তিনি যদ্যপি বাস্তবিক থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাসে যখন ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া প্রাণ ব্যাকুলিত

হয়, তখন তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সাকার সাধারণ সাকার নহে। ইহা ভক্ত সাধকের দ্বিতীয়াবস্থার কথা। কিন্তু উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা যে সাকার কথিত হইয়াছে, তাহা ভক্ত সাধকের প্রথমাবস্থা। এই সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহবিরহিত হইয়া তাঁহার দর্শনের জন্য বাসনা হয়। এই বাসনা যতই প্রবল হইয়া উঠে, তত শীঘ্র ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, তাঁহার নিকট যিনি যাহা প্রার্থনা করেন, তিনি তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য যে সাধক ঈশ্বরের রূপবিশেষ দর্শনাকাঙ্ক্ষী হন, তাঁহার সে সাধ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এ কথা সর্ব্বশক্তিমানের নিকট অসম্ভব নহে।

২৬। ব্রহ্মের সাকার রূপ জড়পদার্থসম্ভূত অর্থাৎ কাষ্ঠ মৃত্তিকা কিম্বা কোন প্রকার ধাতুনির্ম্মিত নহে। তাঁহার রূপ যে কি এবং কি পদার্থ দ্বারা গঠিত হয়, তাহা বচনাতীত। সে পদার্থ জড়জগতে নাই যে, তাহার দ্বারা উল্লিখিত হইবে। "জ্যোতি-ঘন" বলিয়া কথিত হইতে পারে। কিন্তু সে যে কি প্রকার জ্যোতি, তাহা চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতির সহিত তুলনা হইতে পারে না। ফলে তাঁহার রূপ অনুপমেয় এবং বচনাতীত। যদ্যপি তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার তুলনা তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিতে হয়।

পৃথিবীতে যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, তদ্‌সমুদায়ও অতুলনীয়। একটী পদার্থের দ্বিতীয় তুল্য পদার্থ সৃষ্টিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যেমন স্বর্ণের তুলনা স্বর্ণ ই, রৌপ্যের তুলনা রৌপাই, জলের তুলনা জলই, সেই রূপ তাঁহার তুলনা তিনিই ইত্যাদি।

২৭। এই সাকার মূর্ত্তি যে কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচরাধীন, তাহা নহে। সাধক ইচ্ছামত বাক্যালাপ এবং অঙ্গ স্পর্শনাদি করিয়া শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

সাধকের এইরূপ অবস্থা হইলে উন্মত্তের লক্ষণ পায়। তন্নিমিত্ত সাধারণ লোকেরা ঈশ্বর দর্শনকে মস্তিষ্কের বিকারাবস্থা বলিয়া উল্লেখ করেন। এই স্থানে এই মাত্র বলিতেছি যে, কেবল দর্শন হইলে এক দিন সন্দেহ হইত। কিন্তু ইচ্ছামত বাক্যালাপ এবং অঙ্গ স্পর্শনাদি হইলে তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। দর্শন, স্পর্শন, আস্বাদন, শ্রবণ এবং আঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্য মতে পঞ্চবিধ ফল লাভ হয় বটে, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেই স্নায়ু দ্বারা পরিচালিত। স্নায়ু এক জাতীয়, সুতরাং কারণ সম্বন্ধে পঞ্চেন্দ্রিয় স্পর্শন কার্য্যই করিয়া থাকে। সেইজন্য ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ গ্রাহ্য হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি উত্থাপন হইতে পারে।

এই মতালম্বী নৈয়ায়িকেরা যে স্নায়ুর দ্বারা উপরোক্ত মীমাংসা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতানুযায়ী সেই স্নায়ুদের শক্তি সম্বন্ধে আমারা কতদূর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি। যদি এক জনের পক্ষে পঞ্চেন্দ্রিয় ভুল হয়, তাহা হইলে আর এক জনের তাহাতে ভুল না হইবে কেন? কারণ স্নায়ু সকলেরই এক প্রকার পদার্থ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কখনও কখনও কোন স্থানিক স্নায়ুর উত্তেজনা বা কোন প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইলে অস্বাভাবিক কার্য্য হইতে দেখা যায়। যেমন এক প্রকার চক্ষু রোগে আলোক দেখা যায়, অথবা দৃশ্য পদার্থের উপরিভাগে আলোক পতিত করিবার ব্যবস্থা করিলে এক পদার্থ নানাভাব ধারণ করিতে পারে। এস্থানে দর্শেন্দ্রিয়ের দোষ ঘটিবে বটে, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয়কে প্রতারণা করিতে পারিবে না। এই জন্য স্থুল জগতে এক ইন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক ঘটনা হইলেও অপর ইন্দ্রিয় স্বভাবে থাকিতে পারে। স্নায়ুর দৃষ্টান্ত পক্ষাঘাত। কখন একটী অঙ্গ কখন বা একাধিক অঙ্গ পক্ষাঘাত রোগগ্রস্থ হয়; কিন্তু একটী অঙ্গের স্নায়ু বিকৃত হইল বলিয়া, সমুদয় দেহে পক্ষাঘাত হইতেও না পারে; এমন ঘটনাও বিরল নহে।

সাকার রূপ দর্শনকে অনেকে মস্তিষ্কের বিকৃতাবস্থার ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই প্রকার কথা যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার উৎকর্ষতাঃপ্রযুক্ত সংঘটিত হইতেছে, তাহা নহে। প্রাচীন কালেও ভুরি ভুরি ব্যক্তি এ প্রকার বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতও আমরা সর্ব্বস্থানেই দেখিতে পাইতেছি। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, সাকারবাদী এবং বিবাদী দিগের মধ্যে কোন সত্যাসত্য আছে কি না, তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

আমরা যগুপি এক পক্ষের পক্ষপাতী হইয়া পরিচালিত হই, তাহা হইলে আমাদের সেপ্রকার ভাবকে কুসংস্কারাবৃত বলিতে বাধ্য হইব।

সাকারবাদীরা যাহা বলেন, তাহা তাঁহাদের দর্শনের ফল, সাধনের ফল, কার্য্যের ফল, ভগবানে আত্মোৎসর্গ করিবার ফল। সাকারবিবাদীরা যে সকল কারণে প্রতিবাদ করেন, তথায় তাঁহাদের মনের গবেশনার ফল দ্বারা কার্য্য হইতে দেখা যায়; অর্থাৎ বিচার এবং যুক্তি। সুতরাং এ পক্ষের কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যাইবে? তাঁহারা যগুপি সাকারবাদীদিগের পদ্ধতিক্রমে গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও সাকারবাদী হইয়া দাড়ান। এ মর্ম্মে ভূরি ভূরি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানকালেই দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্ম-সমাজ তাহার দৃষ্টান্ত।

সাকারবিবাদীরা কহিয়া থাকেন যে, এক বিষয় লইয়া ক্রমাগত চিন্তা করিলে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়; মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে সুতরাং বিকৃত দর্শন হইয়া থাকে। যেমন বিকারগ্রস্থ রোগী প্রলাপে কত কি দেখে, সে দেখাকে কি প্রকৃত বলা যাইবে? ইংরাজী গ্রন্থে এইমর্ম্মে নানাবিধ তর্ক আছে, তাহা বিচার করিতে যাইলে আমাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইবে এবং তদ্দ্বারা আমাদের কোন লাভ হইবে না। তবে এক কথায় এই প্রকার তর্কের প্রত্যুত্তর যাহা প্রদান করা যায়, তাহাই প্রদত্ত হইতেছে। কথিত হইল যে, যাহা চিন্তা করা যায় তাহার পরিণাম মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া, প্রথমে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। যগুপি কহা যায় যে, চিন্তাবিশেষে সুফল ও প্রকৃত বস্তু লাভ হইয়া থাকে এবং চিন্তাবিশেষে কুফল এবং অপ্রাকৃত বস্তু প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা, এ কথার অর্থ নাই। এক পক্ষ স্বীকার না করিলে কোন পক্ষই আর দাঁড়াইতে পারিবে না।

চিন্তার ফল কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। যগুপি মিথ্যা বস্তু চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে তাহা হইতে সত্য বস্তু কখনই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। আকাশ কুসুম, ঘোড়ার ডিম, ইহা ভাবিলে কি পাওয়া যাইবে? এ প্রকার চিন্তাও ভুল এবং চিন্তার ফল শূন্য; কিন্তু যগুপি পার্থিব কিম্বা আধ্যাত্মিক কোন সূত্র ধারণ পূর্ব্বক গমন করা যায়, তাহার পরিণাম কি হইয়া থাকে? কুফল কখনই হয় না, সুফলেরই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই চিন্তার ফলেই জড় জগতের সমুদয় আবিষ্কার সংঘটিত হইয়াছে ও অগুাপি হইতেছে। জলের উপাদান কারণ অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন, ক্যাভেণ্ডিস এবং ক্যাণ্ডেরেসিয়া

সাহেব মাতৃগর্ভ হইতে শিক্ষা করিয়া আসেন নাই। চিন্তার দ্বারা তাহা সমাধা হইয়াছিল। সেই চিন্তার প্রথম হইতে পরিপক্কতাকাল পর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখিলে তাঁহাদের মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়া অস্বীকার করিবার বিষয় নহে।

সাকারবিবাদীরা যে চিন্তার দ্বারা তাঁহাদের আপন মত সমর্থন করেন, তাহাও চিন্তাপ্রসূত। অতএব চিন্তাও মস্তিষ্কের বিকার কহিতে হইবে। কারণ এই প্রকার চিন্তার প্রথমে মস্তিষ্কের যে প্রকার অবস্থা হয়, পরে সে অবস্থার বিপর্য্যয় না হইলে, নূতন জ্ঞান কেমন করিয়া হইল? সাকার বাদীরাও অবিকল ঐ প্রকার চিন্তা দ্বারা সাকার দর্শন করেন, তাহা মস্তিষ্কের বিকারজনিত নহে। কারণ কথিত হইয়াছে যে, সে দর্শন আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। ভগবান্ স্বয়ং সে রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত সাকার-বিবাদীদিগের মত সম্পূর্ণ ভ্রমযুক্ত বলিয়া নির্ণয় করা যাইতেছে।

কুচিন্তায় মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, তাহার ফল স্বতন্ত্র এবং ঈশ্বর দর্শন করা স্বতন্ত্র কথা। চিন্তার এ প্রকার অদ্ভুত শক্তি আছে যে, তাহা মনুষ্য বুদ্ধির অতীত এবং যে প্রকার অবস্থা সংঘটিত হইলে মনুষ্যের সে অবস্থা হয়, তাহাকে আমাদের ন্যায় চিন্তাবিহীন বিষয়পাগলেরা পাগল শব্দে অভিহিত করেন।

মহামতি আর্কমিডিজের ইতিহাস অনেকে অবগত আছেন। সাইরা-কিউস দেশাধিপতি হিরো দেবতার্চ্চনার নিমিত্ত একখানি বিশুদ্ধ স্বর্ণ মুকুট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মুকুটটী অতি সুন্দররূপে গঠিত হইয়াছিল, কিন্তু কে বলিয়া দিল যে, স্বর্ণকারেরা বিশুদ্ধ স্বর্ণ না দিয়া ইহার সহিত খাদমিশ্রিত করিয়া দিয়াছে! রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া যারপরনাই কুপিত হইলেন এবং কি পরিমাণে খাদ আছে, তাহা নিরূপণ করণার্থ আর্কমিডিজের প্রতি আজ্ঞা প্রদান করেন। মুকুট বিনষ্ট না করিয়া খাদ নির্ণয় করিতে হইবে, এই কথায় আর্কমিডিজের মস্তকে যেন ব্রজঘাত পতিত হইল। তিনি কি করিবেন, কি উপায় অবলম্বন করিলে রাজার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

কিয়দ্দিবস চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিলেন। এক এক বার সেই মুকুট খানি নিরীক্ষণ করেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহা যথা স্থানে রাখিয়া পুনরায় চিন্তাস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া বসিয়া থাকেন। ক্রমে তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইতে লাগিল। কখন কাহাকে কি বলেন, কি করেন,

তাহার কোন প্রকার ব্যবস্থা থাকিত না। লোকেরা তাঁহাকে উন্মাদ রোগাক্রান্ত হইতেছেন বলিয়া সাব্যস্থ করিয়া তুলিলে, একদিন তিনি স্নান করিবার মানসে যেমন জলপূর্ণ জলাধারে নিমজ্জিত হইয়াছেন, অমনি কিয়ৎপরিমাণ জল উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়া গেল। আর্কমিডিজ সেই জল পতিত হইবার হেতু অমনি মানসপটে দেখিতে পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ আনন্দে, "পাইয়াছি, পাইয়াছি," বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে উলঙ্গাবস্থায় রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার এ প্রকার আনন্দ এবং মনের অবস্থা পরিণত হইয়াছিল যে, তিনি উলঙ্গ কি বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জানিবার অবকাশ ছিল না। যে হেতু মনের গোচরাধীন বস্তুরই কার্য্য হয়। মনে যখন যে ভাব থাকে, তখন তথায় সেই ভাবেরই কার্য্য হয়।

সাধারণ লোকেরা সাধারণ মন লইয়া বসতি করেন, তাঁহাদের মন ধন, জন, আত্মীয় ব্যতীত কোন কথাই শিক্ষা করেন নাই, অথবা পূর্ব্বকথিত সাকারবিবাদী ব্যক্তিরা কখন সাকার লাভের পন্থায় পরিভ্রমণ করিয়া কোন কথাই অবগত হন নাই, সুতরাং তাঁহারা সাকার দর্শন সম্বন্ধে সাধারণ অজ্ঞ শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ভাবে উল্লিখিত হইতে পারেন না। তাঁহারা যদ্যপি মনের বল ও শক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, অঘটন সংঘটন করা মনের ধর্ম্ম। অতএব চিন্তার দ্বারা মনের যে কার্য্য হয়, তাহা সুফলপ্রদ, তদ্বিষয়ে কোন ভুল নাই।

২৮। আদি শক্তি হইতে সাকার রূপের উৎপত্তি হয়। কৃষ্ণ, রাম, শিব, নৃসিংহ, দুর্গা, কালী প্রভৃতি যত হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু, কর্ণবিশিষ্ট সাকর মূর্ত্তি জন্মিয়া থাকে, তৎসমুদায় সেই আদি শক্তির গর্ভ-সম্ভূত। এইজন্য সকল দেবতাকে উৎপত্তির কারণ হিসাবে এক বলিয়া কথিত হয়। যেমন এক চিনির রস হইতে নানাবিধ মঠ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অথবা এক মৃত্তিকাকে জালা কলসি ভাঁড়, খুরি, প্রদীপ, হাঁড়ি প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে পরিণত করা যায়। ইহাদের আকৃতি এবং প্রকৃতি লইয়া বিচার করিলে, কাহারও সহিত

কাহারও সাদৃশ্য নাই। জালার সহিত প্রদীপের কি প্রভেদ, তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু উপাদান কারণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

যাঁহারা পদার্থতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন। সামান্য দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাণীদেহ প্রদর্শিত হইতেছে। যে সকল পদার্থ দ্বারা ইহাদের শরীর গঠিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যেকের মধ্যে সমভাবে রহিয়াছে। অস্থি, মেদ, মাংস ও শোণিতের উপাদান কারণ সকলেরই এক প্রকার, তথাপি কাহার সহিত কাহার সাদৃশ্য নাই। মনুষ্য দেহ সকলেরই এক পদার্থে এবং এক প্রকারে সংগঠিত হইয়াও এক ব্যক্তির কার্য্য কলাপের সহিত দ্বিতীয় ব্যক্তির কোন প্রকার সামঞ্জস্য হয় না এবং এক দেশীয় ব্যক্তির অবয়ব বা গঠনাদির সহিত আর এক দেশীয় ব্যক্তির বিশেষ বিভিন্নতা রহিয়াছে। মনুষ্যের সহিত জন্তুদিগের কথা উল্লেখ অনাবশ্যক।

যদ্যপি রূঢ় পদার্থদিগকে লইয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে একটী রূঢ় পদার্থ নানাবিধ পদার্থের নির্ম্মায়ক ঈশ্বর স্বরূপ দেখা যাইবে। ছুরি, কাঁচি, সূচিকা, বঁটী, জাঁতি, অসি, বন্দুক, কামান ও অন্যান্য পদার্থ এবং জীব দেহে অথবা উদ্ভিদ্ কিম্বা পার্থিব জগতে এক জাতীয় লোহ তাহার দৃষ্টান্ত। যদ্যপি উপরোক্ত পদার্থদিগকে স্থূলভাবে দর্শন করা যায়, তাহা হইলে সাদৃশ্য কোথায়? হিরাকস, কামান এবং শোণিত; ইহাদের তুলনা করিলে কেহ কি তিনই এক পদার্থ, এ কথা বিশ্বাস করিবেন? তাহা কখন নহে; কিন্তু যাঁহারা স্থূল ভাব পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ পর্য্যন্ত গমন করিবেন, তাঁহারাই ইহাদের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

সাকার রূপ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। নানাবিধ রূপের নানাবিধ অভিপ্রায়। নানাবিধ সাধকের নানাবিধ ইচ্ছানুসারে এবং নানাবিধ প্রয়োজনে তাহা সংঘটিত হইয়াছে। এইজন্য স্থূল রূপের পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু যদ্যপি এই রূপসমূহের কারণ নিরূপণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে এক স্থানে অর্থাৎ সেই আদি শক্তি ব্যতীত অন্য কোন কারণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না।

যখন রাজা হইতে দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন যে প্রকার প্রভেদ প্রতীয়মান হয়, স্থূল বুদ্ধি অতিক্রম না হইলে, তাহাদের এক প্রকার নির্ম্মায়ক কারণ, এ কথা কোন মতে কাহার বুঝিবার উপায় নাই।

২৯। ঈশ্বর এক, তাঁহার অনন্ত রূপ। যেমন বহুরূপী গিরগিটী। ইহার বর্ণ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কেহ তাহাকে কোন সময়ে হরিদ্রা বর্ণবিশিষ্ট দেখিতে পায়, কেহ বা নীলাভাযুক্ত, সময়ান্তরে কেহ লোহিত বর্ণ এবং কেহ কখন তাহাকে সম্পূর্ণ বর্ণবিবর্জ্জিত দেখে। এক্ষণে সকলে মিলিয়া যদ্যপি গিরগিটীর রূপের কথা ব্যক্ত করে, তাহা হইলে কাহার কথায় বিশ্বাস করা যাইবে? স্থূলে সকলে স্বতন্ত্র কথা বলিবে। যদ্যপি তাহা পার্থক্য জ্ঞানে অবিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত অবস্থায় অবিশ্বাস করা হইল। কিন্তু কিরূপেই বা বিশ্বাস করা যায়? স্থূল দর্শন করিয়া আদি কারণ স্থির হইতে পারে না। এইজন্য গিরগিটীর নিকটে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলে তাহার সমুদায় বর্ণ, ক্রমান্বয়ে দেখা যাইতে পারে, তখন এক গিরগিটীর বিভিন্ন বর্ণ, তাহা বোধ হইয়া থাকে।

এক ঈশ্বরের অনন্ত রূপ দেখিতে হইলে তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা থাকিতে হয়। যেমন সমুদ্রের তীরে বসিয়া থাকিলে তাহার কত তরঙ্গ, ইহাতে কতপ্রকার পদার্থ আছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

রামকৃষ্ণদেবের কথার ভাবে এই স্থির হইতেছে যে, সাধন ব্যতীত ঈশ্বর দর্শন হয় না। কিন্তু আমরা যে সকল মহাত্মাদিগের নিকট নিরাকার ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করি, তাঁহারা "বৃক্ষে না উঠিয়াই এক কাঁদী" করিয়া বসিয়া থাকেন। সাধন করিলেন না, ঈশ্বর দেখিব বলিয়া চেষ্টা করিলেন না, বিনা সাধনে অনন্ত ঈশ্বরকে একেবারে স্থির করিয়া বসিলেন। এপ্রকার সিদ্ধান্তের এক কপর্দ্দকও মূল্য নাই।

৩০। সাধনের প্রথমাবস্থাতে নিরাকার। দ্বিতীয়াবস্থায় সাকার রূপ দর্শন, তৃতীয়াবস্থায় প্রেমের সঞ্চার হয়।

সাধক যখন ঈশ্বর সাধনে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তখন তাঁহার ঈশ্বর দর্শন হইতে পারে না। যেমন, কোন ব্যক্তি কোন মহাত্মার নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ প্রাপ্তির জন্য গমন করিয়া থাকেন। এস্থানে সেই ব্যক্তি অদৃশ্য বস্তু। সাধকের পক্ষেও ঈশ্বর সেই প্রকার জানিতে হইবে। তাহার পর সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করিতে হয়। সাধকের এই অবস্থাকে সাধন বলে। তদনন্তর অভিলষিত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। সেইরূপ, সাধনের পর সাকার মূর্ত্তি দর্শন হয়। মহাত্মার সাক্ষাৎ পাইলে যেমন সদালাপ এবং প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া যায়, ঈশ্বর-দর্শনের পরও তদ্রূপ হইয়া থাকে। এই অবস্থাকে প্রকৃত প্রেম কহে।

৩১। কাষ্ঠ, মৃত্তিকা এবং অন্যান্য ধাতুনির্ম্মিত সাকার মূর্ত্তি, নিত্য সাকারের প্রতিরূপ মাত্র। যেমন স্বাভাবিক আতা দেখিয়া সোলার আতা সৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা জড়মূর্ত্তির উপাসনা করে,তাহারা বাস্তবিক জড়োপাসক নহে। কারণ তাহাদের উদ্দেশ্য জড় নহে। যদ্যপি প্রস্তর কিম্বা কাষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তাহার তাহাই লাভ হইবে কিন্তু ঈশ্বর-ভাব থাকিলে পরিণামে ঈশ্বর লাভই হইয়া থাকে।

যে যাহা মনে করে, তাহার তাহাই লাভ হয়। মনের এই ধর্ম্ম অতি বিচিত্র। যে সঙ্গীত চিন্তা করে, সে বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারে না। মনুষ্য চিন্তা করিলে পর্ব্বতের ভাব আসিতে পারে না। যখন যাহা চিন্তা অর্থাৎ মনোময় করা যায়, তখন তাহাই মনে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সে সময়ে অন্যভাব আসিতে পারে না।

৩২। সাধক যখন সাকার রূপ দর্শন করেন, তখন তাঁহার নিত্যাবস্থা হয়, সে সময়ে জড়পদার্থে আর মন আবদ্ধ থাকে না। কিন্তু সে অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী নহে; সুতরাং তাঁহাকে পুনরায় জৈবাবস্থায় আসিতে হয়। এই সময়ে কেবল তাঁহার নিত্যাবস্থার দর্শনাদি স্মরণ থাকে মাত্র।

যেমন কেহ স্বপ্নাবস্থায় কোন ঘটনা দর্শন করিলে নিদ্রাভঙ্গের পর তাহার সে সকল বিবরণ স্মরণ থাকে। সাধক সেইপ্রকার নিত্যাবস্থায় যে সাকাররূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা লীলাবস্থায় উদ্দীপনের জন্য কোনপ্রকার জড়পদার্থ দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন। এই রূপ দর্শন করিবামাত্র তাহার উপাদান কারণ অর্থাৎ কাষ্ঠ মৃত্তিকা বা ধাতু উদ্দীপন না হইয়া সেই নিত্য বস্তুই জ্ঞান হইয়া থাকে; এস্থলে সাকার নিত্য নহে এবং ভাব লইয়া নিত্যও কহা যায়, কারণ তাহাতে নিত্য সাকারের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; এই নিমিত্ত জড়-সাকার মাত্রই নিরাকার বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

৩৩। সাকার রূপ জ্যোতি-ঘন হইয়া থাকে, তাহাতে কোন প্রকার জড়াভাস থাকে না। যখন কোন রূপের উৎপত্তি হয়, তখন প্রথমে কোয়াসার ন্যায় দেখায়, তৎপরে তাহা ঘনীভূত হইয়া আকারবিশেষ ধারণ করে। সেই মূর্ত্তি তখন কথা কন, অভিলষিত বর প্রদান করেন, পরে রূপ গলিয়া গিয়া ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়।

৩৪। জ্যোতিঘন ব্যতীত অন্য প্রকার সাকার রূপও আছে। মনুষ্যের আকারে কখন কখন ভক্তের নিকটে আবির্ভাব হইতে দেখা যায়।

অনেকে কহিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মদর্শন করিলে আর তাহার সংসারে থাকা সম্ভব নহে। কারণ শ্রুতি বা উপনিষদাদির মতে কথিত হয় যে, যে ব্যক্তির ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহার মনের সংশয় এবং হৃদয়গ্রন্থি প্রভৃতি সমুদয় বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া মায়ার ঘোর কাটিয়া যায়।

এই তর্কের মূলে যে কথা নিহিত আছে, তাহার অন্যথা করা কাহার সাধ্য নাই। ব্রহ্মদর্শনের ফল যাহা, তাহা আমরা পূর্ব্বে নুনের ছবির দৃষ্টান্তে বলিয়াছি, কিন্তু দর্শন কথাটী ব্রহ্মেতে প্রয়োগ হইতে পারে না। যেহেতু তিনি উপলব্ধির অতীত বিষয়। দেখা শুনা, ঈশ্বর বা শক্তির রূপবিশেষের সহিত হইয়া থাকে। কারণ তাঁহাতে ষড়ৈশ্বর্য্য বর্ত্তমান থাকে। যেমন অবতারেরা পূর্ণব্রহ্ম হইয়াও ঐশ্বর্য্য বা শক্তি আশ্রয় করায় লোকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকেন। তাঁহাদের সকলেই দর্শন করেন, কিন্তু সকলেই তাঁহাদের চিনিতে

পারে না। যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে তিনি দয়া করিয়া স্বরূপ জানাইয়া দেন, সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে বুঝিতে বা চিনিতে পারেন। যখন শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, (রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে) তখন কেবলমাত্র সাত-জন ঋষি ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া জানিত না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও তদ্রূপ হইয়াছে, শ্রীচৈতন্য প্রভু প্রভৃতি অবতারদিগের সম্বন্ধেও অবিকল ঐ প্রকার ভাব চলিতেছে। এই নিমিত্ত আমরা বলি যে, ঈশ্বরের রূপ দর্শন করিলেও সংসার যাত্রার কোন ক্ষতি হইতে পারে না।

মায়া।

—*—

৩৫। মায়া শব্দে ইন্দ্রজাল বা ভ্রমদর্শন অর্থাৎ পদার্থের অপ্রাকৃত লক্ষণ দ্বারা যে প্রাকৃতিক জ্ঞানসঞ্চারিত হয়, তাহাকে সাধারণভাবে মায়া কহে, অর্থাৎ যাহা দেখা যায়, সে তাহা নহে। যেমন, জলমধ্যে সূর্য্যদর্শন করিয়া তাহাকেই প্রকৃত সূর্য্য জ্ঞান করা। এস্থলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বকে সূর্য্য বলিয়া স্থির করা হইল। সূর্য্য সম্বন্ধে যাহাদের এই পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকিবে, তাহাদের সে সংস্কারকে ভ্রমাবৃত বা মায়া বলিয়া সাব্যস্থ করিতে হইবে। অথবা যেমন দর্পণে কোন পদার্থ প্রতিফলিত হইলে তাহাকে সত্য বোধ করিলে ভ্রমের কার্য্য হইয়া থাকে; কারণ যাহাকে সত্য বলা হইল, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; উহা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু।

পৃথিবীমণ্ডলে আমরা যে কোন পদার্থ দেখিতে পাই, তাহাও উপরোক্ত সূর্য্যবিম্ব এবং দর্পণ প্রতিফলিত আকৃতিবিশেষ। অর্থাৎ ইহাদের প্রকৃতাবস্থা বলিয়া যাহা সর্ব্বপ্রথমে প্রতীতি জন্মে, বিচার করিয়া দেখিলে তাহা তিরোহিত হইয়া যায়। যেমন মনুষ্য, ইহার প্রকৃতাবস্থা কি? মনুষ্য বলিলে দুই হস্ত

চক্ষু, কর্ণ, পদ এবং মাংস, শোণিত, বসা, অস্থিবিশিষ্ট পদার্থবিশেষ বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকার মনুষ্যকে যদ্যপি ভূবায়ুর সঞ্চাপন * ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র করা যায়, অথবা বায়ুর স্বাভাবিক গুরুত্ব দ্বিগুণ কিম্বা ত্রিগুণ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান মনুষ্যাকার ক্ষুদ্র হইয়া যাইবে। কিম্বা যে চক্ষু দ্বারা আমরা মনুষ্য পরিমাণ করিয়া থাকি, তাহার বিপর্য্যয় করিয়া দেখিলে উহাদের স্বতন্ত্র প্রকার দেখাইবে। যেমন আমরা কোন ব্যক্তিকে গৌরবর্ণবিশিষ্ট দেখিতেছি, যদ্যপি এক্ষণে উহাকে নীলবর্ণের কাচ দ্বারা দর্শন করি, তাহা হইলে তাহাকে নীলবর্ণ দেখাইবে। অথবা পিত্তাধিক্য রোগীর পক্ষে যেমন সকল পদার্থই হরিদ্রাবর্ণ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কোনপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট কাচ দ্বারাই হউক কিম্বা রোগের নিমিত্ত দর্শনেন্দ্রিয়ের বিকৃতাবস্থা নিবন্ধতা প্রযুক্তই হউক, দৃষ্ট পদার্থের প্রকৃত লক্ষণ অবগত হওয়ার পক্ষে দুর্নিবার প্রতিবন্ধক ঘটিয়া যাইতেছে।

মনুষ্যের গঠন ও উপাদান কারণ লইয়া বিচার করিলে কোন ধারাবাহিক মীমাংসা প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। যাহা কথিত হইবে, তাহা ভ্রমাত্মক। কারণ মনুষ্যের উপাদান কারণ বলিলে কাহাকে বুঝাইবে? শরীর মধ্যে যাহা কিছু উপস্থিত রহিয়াছে, তৎসমুদায়কে কারণ বলিয়া পরিগণিত করা কর্ত্তব্য। শারীরিক প্রত্যেক গঠনই যদ্যপি কারণ হয়, তাহা হইলে তাহাদের যে কোন অবস্থান্তরে পরিণত করা হইবে, তাহাতে বিশেষ পরিবর্ত্তন হইবে না, ফলে কার্য্যতঃ তাহা হইতেছে না। মাংসপেশী হউক, শোণিত হউক, আর অস্থিই হউক, তাহারা প্রতিমুহূর্ত্তেই রূপান্তর হইয়া যাইতেছে। মনুষ্যের জন্মক্ষণ হইতে বিচার করিয়া দেখিলে বিন্দুকেই প্রথম সূত্র কহা যাইবে। পরে তাহা হইতে শোণিত, মাংস, অস্থি ও অন্যান্য গঠনাদি উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতঃপর মৃত্যু হইলে ঐ গঠনাদি এককালে অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন তাহার অবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার উপায় থাকে না। মনুষ্যের জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী সময়ে যাহা দৃষ্ট হইল, তাহার পূর্ব্ব এবং পরের বিষয় কিছুই অবগত হওয়া যাইতেছে না। সুতরাং এ প্রকার পদার্থের প্রকৃত অবস্থা কিরূপে কথিত হইবে। মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে

---

* ইংরাজী পদার্থবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, স্বাভাবিক উত্তাপে প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চ পরিমিত স্থানে ভূবায়ুর ৭॥৹সের গুরুত্ব পতিত হইয়া থাকে। যেমন স্প্রীং, ইহাকে সঙ্কাপিত করিলে ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট হইয়া যায়, পুনরায় ছাড়িয়া দিলে দীর্ঘায়তন লাভ করে।

অবশ্যই অন্য কোন রূপে ছিল এবং মৃত্যুর পর অন্য কোন আকারে থাকিবে, তাহা যদিও আমাদের মনের অগোচর ব্যাপার, কিন্তু জ্ঞানচক্ষের দ্বারা তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে উপলব্ধি জন্মিয়া থাকে।

এক্ষণে মনুষ্যের কোন্ অবস্থাকে প্রকৃত বলিতে হইবে, আমরা তাহা স্থিরনিশ্চয় করিতে অসমর্থ।

পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ এইরূপ পরিদৃশ্যমান হইতেছে। তাহাদের সম্বন্ধীয় যে সকল জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে অপ্রাকৃত জ্ঞান কহে। এই নিমিত্ত মায়াবাদীরা পার্থিব পদার্থের সহিত আপনাদিগকেও ভ্রমাত্মক বোধে ঐন্দ্র-জালিক রহস্যের উপসংহার করিয়া থাকেন। এই মায়া শব্দ এ প্রদেশে এত-দূর প্রচলিত যে, সংসারে পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্রের প্রতি প্রেমপূর্ণ ভাবে অব-স্থিতি করিলে মায়িক কার্য্য বলিয়া কথিত হয়। ঈশ্বর জ্ঞানে যাঁহারা ভক্তির উচ্ছ্বাসে বিহ্বল হইয়া পড়েন, তাঁহাদেরও মায়াগ্রস্থ কহে।

৩৬। ব্রহ্মের এক শক্তির নাম মায়া। এই শক্তি অঘটন সংঘটন করিতে পারে।

মায়াশক্তি চিৎশক্তির অবস্থা বিশেষ। চিৎ বা ইচ্ছা কিম্বা জ্ঞানশক্তির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়া যে শক্তি দ্বারা তাহাদের কার্য্য হইয়া থাকে, তাহাকে মায়াশক্তি কহে।

৩৭। মায়া দুইপ্রকার, বিদ্যা এবং অবিদ্যা। বিদ্যা মায়া দুই প্রকার; বিবেক এবং বৈরাগ্য। অবিদ্যা মায়া ছয় প্রকার; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, এবং মাৎসর্য্য।

৩৮। অবিদ্যা মায়া, আমি এবং আমার, এই জ্ঞানে মনুষ্যদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। বিদ্যা মায়ায় তাহা উচ্ছেদ হইয়া যায়।

৩৯। যেমন কর্দ্দমযুক্ত জলে সূর্য্য কিম্বা চন্দ্রের প্রতি-বিম্ব দেখা যায় না, তেমনই মায়া অর্থাৎ আমি এবং আমার জ্ঞান বিদূরিত না হইলে আত্মদর্শন হয় না।

৪০। যেমন, চন্দ্র সূর্য্য উদয় থাকিলেও মেঘাবরণদ্বারা

দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ সর্ব্বসাক্ষীভূত সর্ব্বব্যাপি ঈশ্বরকে আমরা মায়াবশতঃ দেখিতে পাইতেছি না।

আমি এবং আমার, এই জ্ঞানই বাস্তবিক আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমি অমুকের পুত্র. আমি অমুকের পৌত্র, আমি অমুকের শালক, আমি অমুকের জামাতা, আমি পণ্ডিত, আমি রূপবান, আমি ধনী, আমি সাধু, আমি কাহার সহিত তুলনা হইতে পারি? আমার পিতামাতা, আমার ভ্রাতা ভগ্নি, আমার স্ত্রী পুত্র কুটুম্বাদি, আমার ধনৈশ্বর্য্য, ইত্যাকার আমার আমার জ্ঞানে সদাসর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিয়াছি। মনের উপরিভাগে এই প্রকার আবরণের উপর আবরণ পতিত হইয়া রহিয়াছে। ফলে এতগুলি আবরণ ভেদ করিয়া ঈশ্বর দর্শন হওয়া যারপরনাই সুকঠিন। যে দ্রব্য চক্ষের গোচর, কর্ণদ্বারা তাহার সৌন্দর্য্যতা দর্শন সুখ লাভ করা যায় না। অতএব চক্ষুর উপরিভাগে এক শতখানি বস্ত্রাচ্ছাদন প্রদান করিলে সে চক্ষের দ্বারা কিরূপে দর্শন কার্য্য হইতে পারে? মায়াবরণও তদ্রূপ।

যতক্ষণ আমি এবং আমার জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ সকল বিষয়ে স্বার্থসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এই স্বার্থসূত্র বিচ্ছিন্ন করিতে কেহ চেষ্টা পাইল, সুতরাং সে ক্ষেত্রে সমস্ত গোল উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে, আমরা যগুপি তাহা নিরূপণ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে মায়ার অতি অদ্ভুত রহস্য বাহির হইবে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, অপ্রাকৃত-কে প্রাকৃতবোধ জন্মানই মায়ার কার্য্য। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হওয়া ও তপনোত্তপ্ত বালুকাবিশিষ্ট প্রান্তরকে জলাশয় জ্ঞান করা, ইত্যাদি। এক্ষণে কাহার সহিত কি সম্বন্ধ, তাহা একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। মনে কর স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধটী কি? কথা আছে যে, স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গী। কথাটী শ্রবণ করিয়াই লোকের চক্ষুস্থির হইয়া যাইল। কিন্তু কিরূপে স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গী হইল, তাহা ভাবিয়া দেখে কে? যে পুরুষ সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, সে যে পর্য্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ না করে, সে পর্য্যন্ত সংসার পূর্ণ হয় না, এই নিমিত্ত অর্দ্ধাঙ্গী কহা যায়। কিন্তু সে সকল নিতান্ত বাহিরের কথা। ইহাতে তত্ত্বপক্ষের কাহার কোন সংস্রব নাই।

আমরা ইতিপূর্ব্বে কহিয়াছি যে, মনুষ্যেরা জড় এবং চেতন পদার্থদ্বয়ের যৌগিকবিশেষ। এক্ষণে বিচার করা হউক, আমরা জড় কিম্বা চেতন?

অথবা আমরা জড় চেতনের সহিত সম্বন্ধ রাখি? জড়ের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ মৃত্যুর পর আর সেই অর্দ্ধাঙ্গীর দেহ লইয়া থাকিতে পারি না, তাহাকে তখনই পঞ্চীকৃত করা হয়। অর্দ্ধাঙ্গী বলিয়া স্বীকার করা দূরে থাকুক, তাহাকে তদবস্থায় স্পর্শ করিলে পূত-নীরে অবগাহন ব্যতীত আপনাকে শুদ্ধ বোধ করা যায় না। অতএব জড়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই। যাহা বলিয়া থাকি, তাহা তজ্জন্য সম্পূর্ণ ভুল। চৈতন্যের সহিত যদ্যপি সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়, তাহা হইলেও ভুল হইতেছে। কারণ তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া কে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে? দেখে রূপ, দেখে মুখ, দেখে অঙ্গসৌষ্ঠব; চৈতন্য পদার্থ লইয়া কাহার বিচার হইয়া থাকে? অতএব সে কথা মুখে আনাই অকর্ত্তব্য। যদি এ কথা বলিয়া চৈতন্যকে সাব্যস্থ করা হয় যে, মৃত্ত দেহের সহিত কেহ কখনও বিবাহের প্রস্তাব করে না, সে স্থলে চৈতন্যকেই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে আরও আপত্তি উঠিতেছে। চৈতন্যের হস্তপদ নাই, চৈতন্যের দেহ কান্তি নাই। তবে চৈতন্যের অস্তিত্ব হেতু জড়েতে তাহার কার্য্য হয় বটে, ফলে চৈতন্য বলিয়া জড়ের কার্য্যই করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত ইহাও ভ্রমাবৃত বলিয়া কহিতে হইবে। ফলতঃ আমরা প্রকৃতপক্ষে যে কাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকি, তাহার ঠিক্ নাই; সুতরাং এপ্রকার কার্য্যকে মায়ার কার্য্যই বলিতে হইবে।

আমাদের দেশে জ্ঞান প্রধান ব্যক্তিরা জগৎ সংসারকে মায়া বা ভ্রম বলিয়া বাহ্যবস্তু সকল পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ নিজ নিজ দেহ ও তাহার কার্য্যকে মায়ার অন্তর্গত জ্ঞান করেন; সুতরাং তাহাও অলীক বিবেচনায় গণনায় স্থান দিতে তাঁহারা সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা সেই জন্য মনের কার্য্য অর্থাৎ সঙ্কল্প ও বিকল্পের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা রাখিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ উঠে, তাহারা কিয়ৎকাল নানাপ্রকার ক্রীড়া করিয়া পুনরায় অদৃশ্য হইয়া যায়। মনের সঙ্কল্পাদিও তদ্রূপ; অর্থাৎ মনে উত্থিত হয়, মনেই অবস্থিতি করে এবং পুনরায় মনেই বিলীন হইয়া যায়। অতএব মনের সমস্ত কার্য্যের কারণই মন। কিন্তু যাঁহারা দেহের অস্তিত্ব বিশ্বাস করাকে ভ্রম মনে করেন, তাঁহারা সেই কারণেই মনের অস্থিত্ব উড়াইয়া দেন। যদ্যপি মন না থাকে, দেহ না থাকে, তাহা হইলে দৈহিক কার্য্যের প্রতি সত্যজ্ঞান কিরূপে থাকিতে পারে?

জ্ঞানীরা এই কারণ ভিত্তি করিয়া শুভাশুভ ফলের প্রত্যাশা করেন না।

তাঁহাদের সমক্ষে যখন যে কার্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা তখন সে কার্য্য অবাধে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সুতরাং এবম্বিধ ব্যক্তির নিকট শুচী কিম্বা অশুচী বোধ থাকে না, ধর্ম্ম কিম্বা অধর্ম্ম বোধ থাকে না, উত্তম কিম্বা অধম বোধ থাকে না এবং বিষ কিম্বা অমৃত বোধ থাকে না। চলিত হিন্দু-মতে এই প্রকার মায়াজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী-পদবাচ্য হইয়া থাকেন।

এই প্রকার জ্ঞানীরা তাঁহাদের মত শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা মীমাংসা করিয়াও থাকেন। জ্ঞানমতে কথিত হয় যে, ব্রহ্মই সত্য এবং নিত্য বস্তু। তিনিই আদি, স্বয়ম্ভূ এবং অদ্বিতীয়। তিনিই পূর্ণ, অখণ্ড এবং অনন্ত। তাঁহার মায়া-শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে, সুতরাং সৃষ্ট পদার্থ সমুদয় মায়া বা মিথ্যা। যেমন লুতা (মাকড়সা) নিজ শরীর মধ্য হইতে সূক্ষ্ম সূত্র উৎপন্ন করিয়া জাল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে। এ স্থানে লুতা এবং জাল যদিও এক পদার্থ নহে, কিন্তু জালের উৎপত্তির কারণ লুতা, তাহার সন্দেহ নাই। পরে সেই লুতা যখন জাল গ্রাস করিয়া ফেলে, তখন তাহার বিলয় প্রাপ্ত হয় সত্য, কিন্তু লুতার ধ্বংস হয় না। সে জালবিস্তৃতির পূর্ব্বে যেরূপ অদ্বিতীয় ছিল, জাল বিস্তৃতির কালেও তদ্রূপ ছিল এবং জাল অদৃশ্য হইয়া যাইলেও তাহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় না। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। তিনি ত্রিকাল সমভাবে আছেন। জগৎ রচনার পূর্ব্বে যে প্রকার, জগতের মধ্যে যে প্রকার এবং জগতের লয়ান্তেও সেই প্রকার থাকেন, তাহা সন্দেহবিরহিত কথা। জ্ঞানীরা যে সকল প্রমাণ দ্বারা জগৎ মিথ্যা বলেন, আমরা প্রথমে তাহাই অস্বীকার করি এবং তাঁহাদের মীমাংসাও মীমাংসার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ মায়া হইলে, সেই মায়াসংযুক্ত পদার্থ দ্বারা মায়াতীত বস্তু কিরূপে সাব্যস্থ করা ন্যায়সঙ্গত কথা হইতে পারে? যে কোন পদার্থ, এমন কি যিনি বিচার করেন, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যখন স্থির নাই, তখন কাহার মীমাংসা কাহার দ্বারা কে করিবেন? সুতরাং জ্ঞানীদিগের একথা স্থান পাইল না। যেমন তিমিরাবৃত রজনীতে কোন্ বৃক্ষ কোন জাতীয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। যদ্যপি কেহ আপন স্বেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদান করেন, তাহা হইলে সে বিভাগ যে নিতান্ত অসঙ্গত এবং ভ্রমপূর্ণ হইবে, তাহার সংশয় নাই। সেই প্রকার মায়াবৃত সংসারে থাকিয়া মায়িক কার্য্য দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপন করা যারপরনাই মায়ার কার্য্য।

কিন্তু কথা হইতেছে যে, মায়ার কথা উল্লিখিত হইয়া এত বৃহৎ হিন্দু শাস্ত্র সৃষ্ট হইল কেন? এক্ষণে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে হইবে। আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে বলিয়াছি যে, হিন্দুদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রবিহিত কথা, তাহা বিজ্ঞানান্ধদিগের বুদ্ধির অতীত। পদার্থ বিজ্ঞান ও দর্শনাদিতে সম্যকরূপে অধিকারী না হইলে ব্রহ্ম বিদ্যায় প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং পদার্থবিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা দৃশ্য জগতের অন্তস্থল পর্য্যন্ত মনুষ্য জ্ঞানানুসারে গমন করিয়া তদনন্তর ব্রহ্ম দেশে উপস্থিত হওয়া যায়। তখন তথাকার যে সকল কথা উপস্থিত হয়, তাহা তৎকালোপযোগী বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে প্রায়স পাইলে বুঝিবার পক্ষে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে না। এই প্রণালীকে বিশ্লেষণ (analysis) এবং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে জড়জগৎ বুঝাইয়া লওয়াকে সংশ্লেষণ (synthesis) প্রক্রিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া জড় পদার্থ বুঝিয়া লইবার হেতু কি? তাহার কারণ এই যে, আমরা কি পদার্থ, যাহাতে বাস করি এবং যাহা কিছু দেখি কিম্বা অনুভব করি, তৎসমুদয়কে সাধারণ ভাষায় জড়পদার্থ বলিয়া কথিত হয়, সুতরাং এ সকল বিষয় অবগত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এই নিমিত্ত আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, জড় জগৎকে মায়া বলিয়া পরিত্যাগ করা প্রকৃত পক্ষে অসঙ্গত হইয়া যাইতেছে। তবে মায়া শব্দ আসিল কেন? এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, পদার্থ বিজ্ঞান দ্বারা কোন উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে কি না? আমরা যে কোন পদার্থ লইয়া বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ামতে গমন করিয়া থাকি, সেই সকল ভাবেই স্থূলের স্থূল হইতে মহাকারণের মহাকারণ পর্য্যন্ত গতি বিধি করিতে হয় এবং তথা হইতে অবরোহন করিলে পুনরায় স্থূলের স্থূলে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। এই আরোহণ এবং অবরোহণ প্রক্রিয়ার প্রত্যেক সোপানের ভাব লইয়া বিচার করিলে কাহারও সহিত কাহারও সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। যাহাকে যে অবস্থায় দেখা যায়, তাহার অবস্থান্তর করিলেই ভাবান্তর আসিয়া অধিকার করে। ফলে সেই বস্তুর অবস্থাবিশেষকে প্রকৃত বলা যায় না। এই জ্ঞান যখন আরোহণ বা বিশ্লেষণসূত্রে গ্রথিত হয়, তখন মহাকারণের মহাকারণকেই আদি এবং সত্য বলিয়া একমাত্র ধারণা হইয়া থাকে। মায়াবাদী জ্ঞানীদিগের এই অবস্থা; ইহাদের অন্য ভাষায় অদ্বৈত-বাদীও কহা যায়, অর্থাৎ এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। কারণ ব্রহ্মই সত্য

তাঁহার ধ্বংস নাই, রূপান্তর নাই এবং সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার এক ভাব অবিচলিত রূপে উপলব্ধি করা যায়।

কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের মতে কেবল আরোহণ বা বিশ্লেষণ দ্বারা যে মীমাংসা লাভ হয়, তাহা এক পক্ষীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। অবরোহণ প্রক্রিয়া অবলম্বন না করিলে ব্রহ্মের পূর্ণভাব থাকিতে পারে না। তন্নিমিত্ত মহাকারণের মহাকারণ হইতে স্থূলের স্থূল পর্য্যন্ত বিচার করিলে ব্রহ্ম সত্তা সর্ব্বাবস্থায় উপলব্ধি হইবে, তাহা ইতিপূর্ব্বে জড় এবং চৈতন্য শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সাধক এই প্রকার আরোহণ এবং অবরোহণ দ্বারা ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত করেন, তিনি উভয়বিধ ভাবেই এক সত্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই প্রকার ব্যক্তিদিগের মতে প্রত্যেক বস্তুর অবস্থাসঙ্গত ভাবেরও সত্যতা স্বীকার করিতে হয়। যেমন মনুষ্য, যতক্ষণ তাহার সেই রূপ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে সত্য কহা যায়। কারণ সেই দেহের উপাদান কারণসমূহ সত্য, তাহাদের কারণও সত্য। এইরূপে মহাকারণের মহাকারণে যাইয়া উপস্থিত হওয়া যাইবে। সুতরাং সত্য বলিয়া যাহা দর্শন করা যায়, তাহা মিথ্যা হইবে কেন? এস্থলে কাহাকে মিথ্যা কহা যাইবে? উহাদের কারণ সত্য এবং উহাদের কার্য্যও সত্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ আমরা যখন সত্য মিথ্যা জ্ঞান করিতেছি, তাহার সম্বন্ধে কত কথাই কহিতেছি, তখন মনুষ্য কখন মিথ্যা হইতে পারে না। সুতরাং এ পক্ষে মায়া স্বীকার করা যায় না। এই মতাবলম্বীদিগকে প্রকারান্তরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীও কহা যায়।

বিশিষ্টাদ্বৈতমতে আমরা এই শিক্ষা করিয়া থাকি যে, অদ্বৈত বা মায়াবাদীরা সূর্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা ছায়া সূর্য্যকে যেমন মায়া কহিয়া থাকেন, বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ছায়া সূর্য্যের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। যেহেতু সূর্য্য যতক্ষণ আছে, ছায়াও ততক্ষণ আছে; যখন সূর্য্য নাই, তখন ছায়াও নাই। এই নিমিত্ত ছায়ার সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করা যায় না।

এক্ষণে কথা হইতেছে, যদ্যপি দৃশ্যজগতের প্রত্যেক বস্তুর অবস্থাবিশেষ সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাদের কোন্ অবস্থাটীকে মায়া কহা যাইবে?

আমাদের কথিত ভাব দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এক পক্ষীয় ভাবে সত্য জ্ঞানে সীমাবদ্ধ করার নাম মায়া। যখন যাহা দেখিতেছি, বা অনুভব করিতেছি, তাহার সত্যতা বোধ এবং সেই অবস্থার অতীতাবস্থাও আছে, এই জ্ঞান হৃদয়ে জাগরূক থাকিলে, তাহাকে মায়াবিরহিত ভাব কহা যায়।

যেমন, এই আমার স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গী, প্রাণ-স্বরূপা, ইহজগতের একমাত্র আরামের স্থল, ইত্যাকার জ্ঞানকে মায়া কহে। কিন্তু যাহার এপ্রকার ধারণা আছে যে, যাহাকে স্ত্রীপদবাচ্যে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি, সে এই অবস্থামতে সত্য বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যাহা দেখিতেছি, বলিতেছি, তাহা নহে। কারণ তদ্‌সমুদায় অন্যান্য অবস্থার ফলস্বরূপ। এই ভাব যাহার হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তাহার সেই ভাবকে মায়াতীত কহে।

আমরা সদাসর্ব্বদা পৃথিবীর দৃশ্য বস্তুর আকর্ষণে এতদূর অভিভূত হইয়া থাকি যে, তথা হইতে বিচারশক্তি আর এক পরমাণু পরিমাণ স্থানান্তর করিতে ইচ্ছা হয় না। আমার আমার আমার শব্দটী দশ দিকে নাগপাশে বন্ধনের ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাকেই এক পক্ষীয় ভাব কহে। এই মর্ম্মে রামকৃষ্ণদেব কহিয়াছেন, কোন ব্যক্তি এক সাধুর শিষ্য হইতে গিয়াছিল। সাধু সেই ব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রথমে মায়া সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। শিষ্য মায়ার কথা শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। সাধু কহিলেন, দেখ বাপু! তুমি মায়ার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলে যে? শিষ্য কহিল, প্রভু! আপনি কি প্রকার আজ্ঞা করিতেছেন। আমার পিতা, আমার মাতা আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার নহে? তবে কাহার? এ কথা আমি কোন মতে বুঝিতে পারিতেছি না এবং তাহা বুঝিবার জন্য ইচ্ছাও নাই। সাধু কহিলেন, বাপু! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে? শিষ্য কহিল, আমি অমুক শর্ম্মা। গুরু কহিলেন, এই নামটী কি মাতৃগর্ভ হইতে সমভিব্যাহারে আনিয়াছ, না এই স্থানে পিতা মাতা কর্ত্তৃক উপাধিবিশেষ লাভ করিয়াছ? শিষ্য তাহা স্বীকার করিলেন। সাধু কহিতে লাগিলেন, দেখ বাপু, নামটী যেমন উপাধিবিশেষ, তেমনি সকল বিষয়ই জানিবে। তুমি যাহাকে পিতা মাতা বল, স্ত্রী পুত্র বল, সে সকলও উপাধিবিশেষ। কারণ, যাহার সহিত ইচ্ছা, তাহার সহিত ঐ সকল সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক আনন্দ লাভ করা যায়। যাহাকে আজ পিতা মাতা বলিতেছ, কল্য তুমি দত্তকপুত্ররূপে অপরকে পিতা মাতা বলিয়া আত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পার। যে স্ত্রীকে অদ্য অর্দ্ধাঙ্গী কহিতেছ, হয় তাহার পরলোকে, না হয় ব্যভিচারদোষে, অথবা তাহার উৎকট পীড়াদি বশতঃ অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পার। এই নিমিত্ত সাংসারিক সম্বন্ধগুলিকে উপাধিবিশেষ কহা যায়। উপাধি দ্বারা সংসারে থাকাই সাংসারিক নিয়ম। এই উপাধিদিগকে সত্য বোধ করিয়া

নিশ্চিন্ত থাকা মায়ার কার্য্য। উপাধিও থাকিবে এবং তাহা অবস্থাসঙ্গত কার্য্য ব্যতীত কিছুই নহে, এই জ্ঞান যে পর্য্যন্ত লাভ করা না যায়, সে পর্য্যন্ত মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই।

নিজ নিজ স্বরূপ জ্ঞাত হওয়াই সকলেই কর্ত্তব্য। তাহাতে বিস্মৃতি বা বিপর্য্যয় ঘটিলে মায়া কহা যায়। শিষ্য এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, প্রভু! বাস্তবিক কি আমার পরিজনেরা আমার কেহ নহে? তাহারা উপাধি-বিশেষ? গুরু কহিলেন, ইচ্ছা হয় পরীক্ষা করিয়া দেখ। অতঃপর গুরু কহিতে লাগিলেন, দেখ, তুমি আপনার বাটীতে যাইয়া উৎকট ব্যাধির ভাণ-পূর্ব্বক অচেতনাবস্থায় পড়িয়া থাকিবে। সে সময়ে হয়ত তোমার পিতা কত রোদন করিবেন, তোমার মাতা হয় ত মস্তকে ঘটীর আঘাত করিবেন, তোমার স্ত্রী হয় ত উন্মাদিনীপ্রায় হইবেন, কিন্তু কোন মতে সাড়া শব্দ দিও না, যাহা করিতে হয় আমি সমস্তই করিব। শিষ্য বাটীতে আসিয়া বেদনার ছল করিয়া বুক যায়, বুক যায় বলিতে বলিতে হতচেতনবৎ হইয়া মৃত্তিকায় লুটাইয়া পড়িল; চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। পিতা পুত্রের নাম উল্লেখ করিয়া কোথায় আমার বৃদ্ধ-বয়সের অবলম্বন, অন্ধের যষ্টি চলিয়া গেলি বলিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিল; জননী ধূলায় ধূসরিত হইয়া যাদুমণি, গোপাল প্রভৃতি শব্দে রোদন করিতে লাগিল; স্ত্রী লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিয়া স্বামীর বক্ষোপরি পতিত হইয়া, আমায় সঙ্গে লইয়া যাও, কার কাছে রাখিয়া গেলে, ইত্যাকার নানাবিধ কাতর ভাষায় আপন মনোবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল; এমন সময় ঐ সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিপদের সময় সহসা সাধুর আবির্ভাব মঙ্গলের চিহ্নজ্ঞানে সকলেই তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক নানাপ্রকার স্তুতি মিনতি করিতে লাগিল। তখন সাধু গম্ভীর স্বরে কহিলেন, এই ব্যক্তির যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে আরোগ্যের আশা অতিশয় দূরের কথা। অমনি সকলে 'কি হলো রে' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সাধু দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন-পূর্ব্বক কহিলেন, একটী উপায় আছে। পরিজনেরা অমনি সকলে আশ্বাসিত হইয়া কহিল, আজ্ঞা করুন যাহা করিতে হয়,আমরা তাহাতে সকলেই প্রস্তুত আছি। সাধু কহিলেন, যদ্যপি ইহার জীবনের পরিবর্ত্তে অন্য কেহ জীবন বিনিময় করিতে পার, তাহা হইলে এই ব্যক্তি বাঁচিতে পারে, কিন্তু যিনি জীবন দিবেন, তিনি মরিয়া যাইবেন। এই কথা সাধুর মুখবিনিঃসৃত হইবামাত্র সকলে

একেবারে নিরব হইয়া রহিল। আর কাহার মুখে কথা নাই, সকলে আপনাপন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। পিতা কাপড় কসিয়া পরিল, মাতা গাত্রে বস্ত্রাবরণ দিল এবং স্ত্রী চক্ষু নাসিকা পুঁছিয়া ক্রোড়ের সন্তানটীকে লইয়া কিঞ্চিৎ স্থানান্তরে স্তন পান করাইতে আরম্ভ করিল। তখন সাধু কহিতে লাগিলেন, তোমরা কি কেহ প্রাণ বিনিময় করিতে প্রস্তুত নও? পিতা কহিল, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা, বুঝিলেন সাধুজি! আপন কর্ম্ম-ফলে সকলেই পরিচালিত হইতে বাধ্য হয়, যে চুরি করে সেই বাঁধা যায়, আমি কেমন করিয়া প্রাণ দিব? আমার আর পাঁচটী পুত্র আছে। পৃথিবীর নিয়মই এই। মাতা কহিল, ওমা প্রাণ দিবার কথা ত কখন শুনিনি! বাড়ীতে একটা পাখী পুষিলে তার জন্যও প্রাণটা কাঁদে। যাহাকে দশমাস গর্ভে ধারণ করিয়া কত ক্লেশে লালন পালন করিয়াছি, তাহার মৃত্যুতে অবশ্যই প্রাণের ভিতর আঘাত লাগে, সেই জন্য কাঁদিতে হয়! আমি কেন প্রাণ দিয়া মরিয়া যাইব! ছেলের জন্য মা মরে, একথা কখন কোন যুগেও কেহ শুনে নাই। আমার সংসার, কর্ত্তা এখন জীবিত রহিয়াছেন, আমার আরো ত ছেলে বৌ রয়েছে, আমি কি জন্য মরিতে যাইব? এই বলিয়া মাতা তথা হইতে চলিয়া যাইলেন। তদনন্তর স্ত্রী কহিতে লাগিল, আমি প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু না—তাহা পারিব না—আমি আমার মাতার একমাত্র মেয়ে, আমি গেলে আমিই যাইব, ও আবার বিবাহ করিয়া আমার অলঙ্কার বস্ত্র, আমার বিছানা, আমার ঘর তাহাকে দিবে, আমার ছেলেগুলি পর হইয়া যাইবে। আমার স্বামী তাহার স্বামী হইবে, না ঠাকুর, আমি প্রাণ দিতে পারিব না! শিষ্য আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার মায়া-ঘোর ক্রমে কাটিয়া অবস্থান্তরের ভাব আসিয়া অধিকার করিল। সে তখন বুঝিতে পারিল যে, স্থূল সম্বন্ধকে চরম সম্বন্ধ জ্ঞান করাই ভুল, বাস্তবিক তাহাকেই মায়া কহে। সে তখন সিংহের ন্যায় উঠিয়া গুরুর পশ্চাদ্গামী হইল।

সাধণের স্থান নির্ণয়।

৪১। ধ্যান কর্ব্বে, বনে, মনে এবং কোনে।

সাধন সম্বন্ধে পরমহংসদেব মনুষ্যদিগের প্রকৃত্যানুযায়ী অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি যাহার যে প্রকার স্বভাব দেখিতে পাইতেন,তাহার পক্ষে সেই ভাব রক্ষা করিয়া যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, স্থান নির্ব্বাচন কালেও সেই প্রকার সাধকদিগের অবস্থা বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিতেন।

মনুষ্যসমাজ বিশ্লিষ্ট করিলে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় যথা, যে সকল নর নারী অবিবাহিত অথবা বিবাহের পর যাহাদের দাম্পত্যসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং উপায়হীন পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন, অবিবাহিতা কন্যা ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রাদি না থাকে, তাহারা প্রথম শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকে।

যাহাদের স্বামী বা স্ত্রী নাই, কিন্তু পিতা মাতা কিম্বা সন্তানাদি অথবা উভয়ই বিদ্যমান থাকে, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। পিতা মাতা স্বামী স্ত্রী পুত্রাদি পরিপূরিত সাংসারিক নরনারীদিগকে তৃতীয় শ্রেণীতে নিবদ্ধ করা যায়।

এই ত্রিবিধ নরনারীদিগের অবস্থাভেদে সকলপ্রকার কার্য্যেরও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর নরনারীদিগের মধ্যে যদ্যপি কাহার ঈশ্বরোপাসনা করিতে বাসনা হয়, তাহা হইলে তাহাদের সেই মুহূর্ত্তে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া 'বনে' গমন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। রামকৃষ্ণদেব সর্ব্ব প্রথমে বন শব্দ উল্লেখ করায় এই প্রকার ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

যে ব্যক্তি অবিবাহিত অথবা অল্পবয়সে যাহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে, কিম্বা যে স্ত্রীলোক বিধবা হইয়াছে, এ প্রকার লোকে যদ্যপি সমাজে থাকিয়া ঈশ্বর সাধন করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলে প্রলোভন আসিয়া তাহাদের নিজের এবং সমাজের অকল্যাণ উৎপাদনের হেতু হইয়া থাকে।

৪২। যাহারা ঈশ্বর লাভের জন্য সাধন ভজন করিতে চাহে, তাহারা কোন প্রকারে কামিনী কাঞ্চনের সংশ্রব

রাখিবে না। তাহা না করিলে কস্মিন্ কালে কাহারও সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তির উপায় নাই।

ক। যেমন খৈ ভাজিবার সময় যে খৈটী ভাজনা খোলার উপর হইতে ঠিকরিয়া বাহিরে পড়িয়া যায়, তাহার কোন স্থানে দাগ লাগে না; কিন্তু খোলায় থাকিলে তাপযুক্ত বালির সংশ্রবে কোন স্থানে কৃষ্ণবর্ণ দাগ ধরিতে পারে।

খ। কাজল্‌কী ঘর্‌মে যেত্তা সেয়ান হোয়ে, থোড়া বুঁদ লাগে পর্ লাগে। যুবতী কি সাতমে যেত্তা সেয়ান হোয়ে, থোড়া কাম্ জাগে পর্ জাগে। অর্থাৎ কাজলের (কালি) ঘরে যতই সাবধানে বাস করিতে চেষ্টা করা হউক, গাত্রে কালির বিন্দু লাগিবেই লাগিবে। সেই প্রকার যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত অতি সুচতুর ব্যক্তি একত্রে বাস করিলেও তাহার কিঞ্চিৎ কামোদ্রেক হইবেই হইবে।

গ। যেমন আচার বা তেঁতুল দেখিলে অম্ল রোগগ্রস্থ ব্যক্তিরও উহা আস্বাদন করিবার জন্য লোভ জন্মিয়া থাকে। সে জানে যে, অম্ল ভক্ষণ করিলে তাহার পীড়ার বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু পদার্থগত ধর্ম্মের এমনই প্রবল প্রলোভন, যে, তত্রাপি তাহার মনের আবেগ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারে না।

৪৩। যাহারা একবার ইন্দ্রিয় সুখ আস্বাদন করিয়াছে, তাহাদের যাহাতে আর সে ভাবের উদ্দীপন না হইতে পারে, এমন সাবধানে বাস করা কর্ত্তব্য। কারণ, চক্ষে দেখিলে এবং কর্ণে শুনিলে, মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। মনে একবার কোন প্রকার সংস্কার জন্মিয়া গেলে, তাহা তাহার চির জীবনে ভুল হয় না। একদা একটী দাম্‌ড়া গরুকে আর একটী গরুর উপর ঝাপিতে দেখিয়া তাহার কারণ বাহির করায় জানা গেল যে, উহাকে যখন দাম্‌ড়া করা হয়, তৎপূর্ব্বে তাহার সংসর্গ জ্ঞান জন্মিয়াছিল।

ক। কালীবাটীতে একটী সাধু অতি পণ্ডিত, সাধক এবং সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী আসিয়াছিল। পল্লির স্ত্রীলোকেরা যখন গঙ্গার জল আনিবার জন্য তাহার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিত, তখন সে এক দৃষ্টিতে সকলের প্রতি

চাহিয়া থাকিত। এক দিন কোন যুবতীকে দেখিয়া ঐ সাধু নস্য লইতে লইতে বলিয়াছিল, "এ আওরাৎ টো বড়া খোপ্‌সুরত্‌ হ্যায়।" সে যখন এ কথা লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন তাহার মনের বেগ কতদূর প্রবল হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। আর এক সময়ে আর একটী সাধু কোন স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিল। তাহাকে তজ্জন্য তিরস্কার করায় সে বলিয়াছিল যে, "পাপ কি? হইয়াছে কি? সকলই মায়ার কার্য্য! আমি কে, তাহারই স্থির নাই, আমার কার্য্য কেমন করিয়া সত্য হইবে?"

কামিনীত্যাগী মহাত্মারা সমাজের এই প্রকার নানাবিধ বিঘ্ন করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণদেব যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সাধারণে বিদিত আছেন। তীর্থ স্থানে মহিলাগণের সমাগম আছে বলিয়া সন্ন্যাসীরা তথায় আশ্রয় লইতে বড় ভালবাসেন এবং সময়ে সময়ে সন্তান হইবার ঔষধ দিবার ছলনায় গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা কিঞ্চিৎ উন্নত সন্ন্যাসী, তাঁহারা যদিও লোকালয়ে সর্ব্বদা গতি বিধি না করেন, কিন্তু স্ত্রীলোক পাইলে তাঁহাদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া যায়। কোন সময়ে আমাদের পরিচিত কোন সন্ন্যাসিনী এক সাধু দর্শন করিতে যান। সন্ন্যাসিনী সাধুর নিকট প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইতে না হইতেই অমনি সাধু তাঁহাকে বলিলেন, "কেঁও সেবা মে আওগি?" অর্থাৎ আমার সেবায় আসিবে? আর একটী কামিনীত্যাগী সাধু বাল্যাবস্থা হইতে কতই কঠোর সাধন করিয়াছিলেন। কখন বৃক্ষশাখায় পদদ্বয় বন্ধন পূর্ব্বক হেট মুণ্ডে থাকিয়া, কখন গ্রীষ্মকালের প্রখর সূর্য্যোত্তাপে চতুর্দ্দিকে অগ্নিকুণ্ড করিয়া তন্মধ্যে বসিয়া, পৌষ মাসের শীতে জলমধ্যে সমস্ত রজনী গলদেশ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন। এই সাধন ফলে তাঁহার কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। কলিকাতায় তুলাপটীর কোন শিখ্‌ নিঃসন্তান ছিল, তিনি তাহার প্রতি কৃপা করিয়া পুত্র হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার একটী পুত্র সন্তান জন্মে। শিখ্‌ তদবধি তাঁহাকে ঈশ্বর তুল্য জ্ঞান করিত। এমন কুমার সন্ন্যাসী ও সাধক লোকালয়ে সর্ব্বদা বাস করায় কামিনী ও কাঞ্চনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি এক্ষণে কোন দেবালয়ের মোহন্ত হইয়াছেন। তাঁহার বাৎসরিক ১৪০০০ টাকা আয় আছে। তিনি যে উদ্যানে পর্ণ কুটীরে বাস করিতেন, তথায়

এক বৃহৎ সাহেবী ঢংয়ের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তৎপল্লিস্থ কোন দরিদ্র গৃহস্থের কন্যাকে উপপত্নিস্বরূপ রাখিয়া সন্তানাদির মুখ দর্শন করিয়াছেন।

কামিনী অপেক্ষা কাঞ্চনের আসক্তি অতি প্রবল। সর্ব্বাগ্রে কাঞ্চন আসিয়া প্রবেশ করে, পরে কামিনী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। কামিনীকাঞ্চনত্যাগী অনেক সাধু এইরূপে পতিত হইয়া গিয়াছেন। যতদিন তাঁহারা সংসারের ছায়ায় না আসিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহাদের কোন বিভ্রাট ঘটে নাই। কোন কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী সাধু ভারতবর্ষের যাবতীয় স্থান ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে তাঁহার কি গ্রহবৈগুণ্য হইল, কলিকাতার সন্নিহিত কোন দেবালয়ে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। ক্রমে পাঁচ জন লোক যাতায়াত করিতে লাগিলেন। সাধু মধ্যে মধ্যে ঔষধাদি দিতে আরম্ভ করিলেন। ঔষধের লোভে অনেকে যাতায়াত আরম্ভ করিল। এইরূপে কিছু উপার্জ্জন হইতে লাগিল। পাঁচ জনের পরামর্শে এই সহরে আসিয়া সন্ন্যাসীর ভেক পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিকিৎসক হইয়া দাঁড়াইলেন।

ঈশ্বর সাধন করিবার জন্য লোকালয়ে সন্ন্যাসী হইয়া বাস করিয়া ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী বলিয়া ঘোষণা করা, যাহার পর নাই অস্বাভাবিক এবং বিড়ম্বনা ও সামাজিক বিভীষিকার নিদান-স্বরূপ কথা। যাঁহারা ঈশ্বর সাধন করিবেন, তাঁহাদের মস্তিষ্ক সবল এবং পূর্ণ রাখিতে হইবে। মস্তিষ্ক বলবান থাকিলে তবে মনের শক্তি জন্মিবে। মনের শক্তি হইলে ধ্যান করিবার যোগ্যতা লাভ হইবে। সুতরাং যাহাতে মস্তিষ্ক এবং মন দুর্ব্বল ও অযথা ব্যয়িত না হয়, তাহাতে অতি সাবধান হইতে হইবে। এই নিমিত্ত কামিনী কাঞ্চনের অতি দূরে অবস্থান ব্যতীত অব্যাহতি লাভের উপায়ান্তর নাই।

কামিনীকাঞ্চনের রাজ্যে বসিয়া সন্ন্যাসী হওয়ার অর্থ কি? এ স্থলে না হয় স্থূলে দৈহিক কোন কার্য্যই হয় না কিন্তু মনকে শাসন করিবে কে? মনে অন্য কোন ভাবের উদয় না হইতেও পারে, কিন্তু কামিনী-ত্যাগী বলিয়া কামিনীকে মনে স্থান দিলেও কামিনী-ত্যাগী হওয়া হয় না। কারণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনের কিয়দংশ ভাগ ইহাতে ব্যয়িত হইয়া যায়। সুতরাং ধ্যানের প্রত্যবায় ঘটিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ। সাংসারিক ব্যক্তিদিগের প্রতি যে দ্বেষ ভাবের উত্তেজনা হয়,

তাহাতেও তাহাদের মনের কিয়দংশ অপহৃত হইয়া যায়, সুতরাং সাধনের বিঘ্ন জন্মে।

তৃতীয়তঃ। অর্থোপার্জ্জন না করায় পরের দয়ার ভাজন হইবার জন্য যাহার নিকট ভিক্ষার প্রত্যাশা থাকে, তাহার মন রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। তাহাতে মনের কিয়দংশ খণ্ডিত হইয়া যায়। সুতরাং সাধকের দিন দিন ক্ষতি হইতে থাকে।

চতুর্থতঃ। লোকালয়ে থাকিলে নানাবিধ অভাব বোধ হইয়া থাকে। তজ্জন্য হয় ঘরে ঘরে ভিক্ষা, না হয় গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি করিতে হয়। অথবা সুবিধামত চাক্‌রী জুটিলে তাহাও দশ দিন চেষ্টা করিয়া দেখিতে হয়। এইরূপে মনের ভাব ক্রমেই হ্রাস হইয়া আইসে। সুতরাং পূর্ণ মনের কার্য্য ভগবানের ধ্যান, তাহা কোন মতে হইতে পারে না। এই নিমিত্ত রাম-কৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "এমন ঘরে যাও, যে ঘরে যাইলে আর ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিতে হইবে না।"

পঞ্চমতঃ। মস্তিষ্কের শক্তির জন্য উপরোক্ত অযথা চিন্তা করা ব্যতীত রেত ধারণ করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। এই রেত পতন নিবারণের জন্য কামিনী-ত্যাগ। কারণ, যতই রেত পতন হয়, মস্তিষ্ক ততই দুর্ব্বল হইয়া আইসে, মানসিক শক্তিও সেই পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যোগী হইতে হইলে প্রথমে ধৈর্য্যরেতা হইতে হইবে। পরে দ্বাদশ বৎসর ধৈর্য্যাবস্থায় থাকিলে তাহাকে ঊর্দ্ধরেতা কহা যায়। ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারিলে মেধা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তখন জ্ঞান লাভ এবং ধ্যান করিবার যোগ্যতা সঞ্চারিত হয়। সংসারে থাকিলে রেত পতন হওয়া নিবারণ করিবার শক্তি কাহার আছে? স্ত্রী-সহবাস করা অনেকের ইচ্ছা সত্ত্বেও ঘটিয়া উঠে না। অনেকের ইচ্ছা নাও থাকিতে পারে, কিন্তু স্বপ্নদোষ নিবারণ করিবে কিরূপে? এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "যদ্যপি একহাজার বৎসর রেত ধারণ করিয়া একদিন স্বপ্নে তাহা পতিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সমুদয় যোগ ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।"

যোগসাধনপরায়ণ ব্যক্তিরা নির্ব্বাণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্থূল জগতের প্রত্যেক পদার্থকে মায়া বা ভ্রম বলিয়া জ্ঞান করেন। দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্যের প্রতিও তাঁহাদের বিশ্বাস থাকে না। তৎপরে মন, বুদ্ধি এবং অহংকার। ইহারাও

স্থূল দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের কার্য্যও ভ্রমপূর্ণ হইবার সম্ভাবনা জ্ঞান করেন। অতএব, ধ্যানে সিদ্ধ হইবার জন্য যোগীদিগের ন্যায় পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন, বুদ্ধি এবং অহংকার বা চিত্তনিরোধ করিতে না পারিলে সন্ন্যাসীর সং-সাজা মাত্র হইয়া থাকে; আর এই সকল কার্য্য করিতে হইলে সুতরাং সংসার পরিত্যাগ করিয়া এমনস্থলে যাইতে হইবে, যথায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচর হইবার কোন পদার্থ না থাকে। অথবা মন, বুদ্ধি ও অহংকার প্রকাশ পাইবার কোন সুযোগও উপস্থিত না হয়। এরূপ হইলে একদিন এমন ব্যক্তি নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইয়া তুরীয়াবস্থা লাভ করিতে কৃতকার্য্য হইবেন। অনেকের স্মরণ হইতে পারে, ভূকৈলাসের রাজা কর্ত্তৃক সুন্দরবন হইতে যে যোগী আনীত হন, তিনি এই শ্রেণীর সাধক এবং সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার একেবারে নিরোধ হইয়াছিল। তাঁহাকে কখন জলমধ্যে নিমজ্জিত, কখন মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত, এবং কখন তাঁহার গাত্রে লোহিতোতপ্ত অগ্নি সংস্পর্শন করিয়া দিয়াও কোন মতে বহিশ্চৈতন্য সম্পাদিত হয় নাই। যোগীদিগের পরিণাম এই প্রকার, সুতরাং তাহা প্রাপ্তির স্থান বন।

৪৪। যেমন, দুর্গ মধ্যে থাকিয়া প্রবল শত্রুর সহিত অল্প সেনা দ্বারা দীর্ঘকাল যুদ্ধ করা যায়। তাহাতে বলক্ষয় হইবার আশঙ্কা অধিক থাকে না এবং পূর্ব্ব সংগৃহীত ভোজ্য পদার্থের সাহায্যে অনাহারজনিত ক্লেশ অথবা তাহা পুনরায় সংগ্রহ করিবার আশু চিন্তা করিতে হয় না। সেই প্রকার সংসারে থাকিলে সাধন ভজনের বিশেষ আনুকূল্য হইয়া থাকে।

এই মত দ্বিতীয় শ্রেণীর মনুষ্যদিগের পক্ষে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই শ্রেণীর নর-নারীরা ভগবান্ কর্ত্তৃক পাশব্য-ক্রিয়া হইতে পরিমুক্ত হইয়াছে সুতরাং রেতঃ-পতন ও স্নানবীয় অবসাদন বশতঃ তাহাদের মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য হইতে পারে না। ফলে, ইহারা ধ্যান বা মস্তিষ্ক চালনা কার্য্যে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইতে পারে।

৪৫। নির্লিপ্ত ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

যাঁহাদের প্রাণে ঈশ্বরের ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে, ঈশ্বর লাভ করিবার জন্য যাঁহারা অস্থির হইয়াছেন, কিন্তু পিতা মাতা অথবা সন্তানের ঋণ মুক্ত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে নির্লিপ্ত ভাবে সংসার যাত্রা সম্পাদন করিয়া যাওয়া রামকৃষ্ণদেবের অভিপ্রায়। তাঁহাদের মনে মনে এই বিচার থাকা আবশ্যক যে, কার্য্যের অনুরোধে তাঁহাদিগকে সংসারে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে। যখনই সময় আসিবে, ভগবান্ তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এমন ব্যক্তিরা নির্জ্জন স্থান পাইলে অমনই ধ্যানে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

৪৬। যেমন গৃহস্থের বাটীর দাসীরা সংসারের যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকে,সন্তানদিগকে লালন পালন করে, তাহারা মরিয়া গেলে রোদনও করে, কিন্তু মনে জানে যে, তাহারা তাহাদের কেহই নহে।

নির্লিপ্ত ভাবের সাধকেরাও তদ্রূপ। ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জন ও সকলের সেবা করিতে হয় মাত্র, কিন্তু জানা আবশ্যক যে,তাহাদের আত্মীয় ঈশ্বর ; এই নিমিত্ত যে সময়ে সংসারের কার্য্য হইতে কিঞ্চিৎ অবসর পাইবে, অমনি নিভৃতে যাইয়া ধ্যানযুক্ত হইতে হইবে।

যাহারা স্ত্রী কিম্বা স্বামী অথবা উপায়হীন পিতা মাতা পরিত্যাগ করিয়া সাধনের নিমিত্ত বনগামী হয়, তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইবার পক্ষে বিঘ্নই ঘটিয়া থাকে। যদ্যপি কোন রূপে কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহাকে পুনরায় সংসারে প্রত্যাগমন করিতে দেখা যায়। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ;—

৪৭। যখন কেহ কোন সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে যায়, তখন তাহাকে তাহার পিতা মাতা বা স্ত্রী পুত্রাদির কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। যাহার কেহ না থাকে, অর্থাৎ সকল বন্ধন পূর্ব্বে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করা হয়।

৪৮। সংসারে সকলের সহিত সম্বন্ধ আছে এবং তজ্জন্য সকলের নিকটেই ঋণী থাকিতে হয়। এই ঋণ মুক্তির ব্যবস্থাও আছে। উপায়হীন পিতা মাতার মৃত্যু-

কাল পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ হয় না এবং সঙ্গতিপন্ন কিম্বা অন্যান্য পুত্র কন্যা থাকিলেও তাঁহাদের সম্মতি প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। যে পর্য্যন্ত দুইটী পুত্র না জন্মে, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীর ঋণ বলবতী থাকে। সন্তান জন্মিলে স্ত্রীর ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, কিন্তু সন্তানের ও স্ত্রীর জীবন রক্ষার জন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা না করিলে ঋণ মুক্তির বিঘ্ন জন্মিয়া থাকে।

এই স্থানে আমরা এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলাম, ঈশ্বর সকলের রক্ষাকর্ত্তা, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। রামকৃষ্ণদেব তাহাতে বলিয়াছিলেন যে, "যখন পুষ্করিণীতে সোল মাছের ছানা হয়, তখন সে ঝাঁকের নীচে নীচে থাকিয়া তাহাদের রক্ষা করে, কিন্তু যদ্যপি কেহ সেই মাছটীকে ধরিয়া লয়, তাহা হইলে সেই ছানাগুলি বিছিন্ন হইয়া পড়ে। তখন অন্য মৎস্য কিম্বা জলচর জীব তাহাদের গ্রাস করিয়া ফেলিলে তাহাদের রক্ষা করিবার কেহ থাকে না। ইহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিলক্ষণ ক্ষতি হইল, তাহার সন্দেহ নাই। তেমনই তোমরা সংসার সৃষ্টি করিলে, তোমরা সন্তানোৎপাদন করিলে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের তোমরা চেষ্টা না করিয়া তাহা ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া দিবে? ইহা অতি রহস্যের কথা! একদিন কোন ব্যক্তির উদ্যানে একটী গাভী প্রবেশ করিয়া কতকগুলি গাছ বিনষ্ট করিয়াছিল। উদ্যানস্বামী তাহা জানিতে পারিয়া ক্রোধ সহকারে যেমন লগুড়াঘাত করিল, গাভী অমনি মরিয়া গেল। উদ্যানস্বামী তখন কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইল এবং গো-বধ পাপ হইল বলিয়া তাহার অনুশোচনাও আসিল। কিয়ৎকাল পরে মনে মনে বিচার করিতে লাগিল যে, আমি কি গাভী হননকর্ত্তা? আমি কে? হস্ত প্রহার করিয়াছে, হস্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র; তিনি এ পাপের ফলভোগ করিবেন। এই বলিয়া আপনাকে আপনি গোবধ পাপ হইতে মনে মনে ধৌত করিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণের এই প্রকার মীমাংসা দেখিয়া, ইন্দ্র একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ পূর্ব্বক সেই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া উদ্যান কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহাশয়! আহা, কি সুন্দর উদ্যান! কি মনোহর বৃক্ষাদি! আহা, এমন নন্দনকাননতুল্য উদ্যানের স্বামী কে? আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। উদ্যানস্বামী আহ্লাদে

মাতিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ আমার বাগান, আমি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছি।" ব্রাহ্মণ তখন কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, মহাশয়! সকলই আপনার হইল, আর গোহত্যার পাপটাই কি ইন্দ্রের হইবে?

স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া সাধনের জন্য বন গমন করণ প্রসঙ্গ হিন্দু শাস্ত্রে একেবারেই বিরল। পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্তানের বনে গমন করাও শ্রবণ করা যায় না। কেবল ধ্রুব এক মাত্র দৃষ্টান্ত। তিনি মাতার আজ্ঞা না লইয়া সাধনের নিমিত্ত বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেও পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। যাঁহাদের স্ত্রী এবং স্বামী নাই কিন্তু সন্তানাদি আছে, তাঁহাদের পক্ষে "কোনে" অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানই যথেষ্ট। সকলের প্রাপ্ত ঋণের অংশ আদায় দিয়া অবশিষ্ট সময় সকলের নিকট হইতে অপসৃত হইয়া আপনাপন অভীষ্টদেবে মনোযোগ করিতে পারিলে সময়ে সিদ্ধ মনোরথ হইবার পক্ষে কোন ব্যতিক্রম সংঘটিত হইতে পারে না।

৪৯। **মনই সকল কার্য্যের কর্ত্তা। জ্ঞানই বল, অজ্ঞানই বল, সকলই মনের অবস্থা। মনুষ্যেরা মনেই বদ্ধ এবং মনেই মুক্ত, মনেই অসাধু এবং মনেই সাধু, মনেই পাপী এবং মনেই পুণ্যবান। অতএব, মনে ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিতে পারিলে পূর্ণ সাংসারিক জীবদিগের পক্ষে অন্য সাধনের আর অপেক্ষা রাখে না।**

(ক) কোন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছিল। এমন সময়ে তথায় দুইটী ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। কিয়ৎকাল উপবেশন করিবার পর তন্মধ্যে একজন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল যে, ছাই ভাগবৎ শুনিয়া আর আমাদের কি হইবে? বাজে কথায় সময় নষ্ট না করিয়া ততক্ষণ আনন্দ করিলে যথেষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহা শুনিল না। প্রথম ব্যক্তি বন্ধুর প্রতি বিরক্ত হইয়া বারাঙ্গনার নিকট চলিয়া গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট বসিয়া তত্ত্বকথা শ্রবণ করিতে করিতে মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, এতক্ষণ বন্ধু কত আনন্দই সম্ভোগ করিতেছে, কতই রসরঙ্গের তুফান উঠিতেছে, তাহার সীমা নাই, আর আমি এই স্থানে বসিয়া কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুনিতেছি, তাহাতে কি লাভ হইবে? প্রথম

ব্যক্তি যদিও বেশ্যার পার্শ্বে যাইয়া শয়ন করিল বটে, কিন্তু সে অত্যন্ত সুখের সুখ নিমেষমধ্যেই অন্তর্হিত হইয়া যাইলে দ্বিতীয় ব্যক্তির শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কথা অনুভব করিয়া আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে লাগিল। সে ভাবিল যে, এতক্ষণ হয়ত শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত সমাপ্ত হইয়া বাল্যলীলা বর্ণনা হইতেছে। নামকরণ কালে, গর্গ মুনির সম্মুখে যখন বালক কৃষ্ণ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ করিয়া বিষ্ণুরূপে উদয় হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে কতই আনন্দ হইয়াছিল। আহা! এতক্ষণে হয়ত জনে জনে তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছেন। সে এইরূপে চিন্তা করিতে লাগিল। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই দুই ব্যক্তি দুই স্থানে থাকিয়া মনের অবস্থা গুণে যে বেশ্যার পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিল, তাহার শ্রীমদ্ভাগবতের ফল লাভ হইয়া গেল এবং যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের নিকটে বসিয়া রহিল, তাহার বেশ্যাগমনের পাপ জন্মিল।

(খ) কোন দেশে এক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী এক শিবালয়ে বাস করিতেন। শিবালয়ের সম্মুখে এক বেশ্যার বাস ছিল। সাধু সর্ব্বদাই সেই বেশ্যাকে ধর্ম্ম কর্ম্মে মনোনিবেশ করিবার উপদেশ দিতেন। বেশ্যা কিছুতেই আপন বৃত্তি ছাড়িতে পারিল না। সাধু তদ্দর্শনে অতি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বলিল, দেখ্ তোর পাপের ইয়ত্তা নাই। তুই যে সকল পাপ করিয়াছিস্ ও অদ্যাপি করিতেছিস্, তাহা গণনা করিলে তোর ভীষণ পরিণাম ছবি আমার মানসপটে সমুদিত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, এ পাপ কার্য্য হইতে বিরত হ'! বেশ্যার প্রাণ সে কথা বুঝিল এবং মনে বড় সাধ হইল, ভগবান্ কি এমন দিন দিবেন যে, আর তাহাকে উদর পোষণের জন্য জঘন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে না! কিন্তু অবস্থা তাহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। পাঁচজনে তাহার এতই নিগ্রহ করিয়া তুলিল যে, তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক লোকের মনোসাধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইতে হইল। সাধু এই প্রকার বিপরীত ঘটনা দর্শন পূর্ব্বক মনে মনে যারপরনাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং যত ব্যক্তি আসিতে লাগিল, তাহার সংখ্যা করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ঐ প্রস্তরসংখ্যা স্তূপাকার হইয়া পড়িল। একদিন বেশ্যা প্রাসাদের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এমন সময়ে সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ্ তোকে তৃতীয় বার

বলিতেছি, এমন পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া হরির নাম অবলম্বন কর্? নতুবা এই দেখ্, অল্প দিবসের মধ্যে তুই যখন এত পাপ করিয়াছিস্, তখন ভাবিয়া দেখ, তোর আজীবনের সমুদয় পাপের জমা করিলে কি ভয়ানক হইবে! এই বলিয়া সেই প্রস্তররাশি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। বেশ্যা ঐ প্রস্তররাশি দেখিয়া একেবারে ভয়ে আকুলিত হইয়া পড়িল। তখন তাহার মনে হইল যে, আমার গতি কি হইবে? কেমন করিয়া উদ্ধার হইব? শ্রীহরি কি আমার প্রতি দয়া করিবেন না? পতিতপাবন তিনি, আমার মত পতিতের কি গতি হইবে না? তদবধি তাহার প্রাণে ব্যাকুলতার সঞ্চার হইল। সে সর্ব্বদা হরি হরি বলিয়া ডাকিতে লাগিল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তথাপি পুরুষ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। যখনই তাহার ঘরে লোক আসিত, সাধু অমনই একটী প্রস্তর আনিয়া উহার পাপসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন। এবং বেশ্যা সেই সময়ে মনে মনে হরিকে আপন দুঃখ এবং দুর্ব্বলতা জানাইত। সে বলিত যে, হরি! কেন আমায় বেশ্যাবৃত্তি দিয়াছ, কেন আমায় বেশ্যার গর্ভে সৃষ্টি করিয়াছ, কেন আমায় এমন অপবিত্র করিয়া রাখিয়াছ এবং কেনই বা আমায় উদ্ধার করিতেছ না। এই বলিয়া আপনাপনি নীরবে রোদন করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইবার পর, এমনই ভগবানের আশ্চর্য্য কৌশল যে, একদিনে ঐ বেশ্যা এবং সন্ন্যাসীর মৃত্যু সময় উপস্থিত হইয়া যাইল। তাহাদের সূক্ষ্ম-শরীর লইয়া যাইবার জন্য, যমদূত ও বিষ্ণুদূত উভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। যমদূত যাইয়া সন্ন্যাসীর পদযুগল সুদৃঢ় করিয়া বন্ধন করিল এবং বিষ্ণুদূত বেশ্যার সম্মুখে যাইয়া বলিল, মা! এই রথে আরোহণ কর, হরি আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন।

বেশ্যা যখন রথারোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতেছে, পথিমধ্যে সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সন্ন্যাসী বেশ্যার এ প্রকার সৌভাগ্য দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, এই কি ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার! আমি চিরকাল সন্ন্যাসী হইয়া সংসারে লিপ্ত না হইয়া কঠোরতায় দিন যাপন করিলাম, তাহার পরিণাম যমদূত যন্ত্রণা? আমি সংসার-নিগড় ছেদন করিয়াছিলাম, কি যমদূতের দ্বারা বন্ধন হইবার জন্ত? আর ঐ বেশ্যা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বেশ্যাবৃত্তি করিয়াছে, কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহার কি না বৈকুণ্ঠে গমন হইল? হায়! হায়! ভগবানের একি অদ্ভুত বিচার! বিষ্ণু-

দূত কহিল, যাহা বলিলে তাহা সকলই সত্য। ভগবানের সূক্ষ্ম এবং অদ্ভুত বিচার, তাহার কি সন্দেহ আছে? যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমনই লাভ হইয়া থাকে। তুমি একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমাদের দুই জনের মধ্যে কে হরিকে ডাকিয়াছে? তুমি বাহ্যিক আড়ম্বর করিয়াছ, সন্ন্যাসের ভেক করিয়া লোকের নিকট গণ্যমান্য হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলে, কল্পতরু ভগবান্ সে বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু তুমিত তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হও নাই? ব্যাকুল হওয়া দূরে থাক, একদিন ভুলিয়াও তাঁহাকে চিন্তা কর নাই। তাহাও যাক্। তুমি মনে মনে কি করিয়াছ, তাহা কি স্মরণ আছে? যে বেশ্যাকে বেশ্যা বলিলে সে যতদূর পাপাচরণ করিয়াছে বলিয়া তুমি প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াছিলে, প্রকৃতপক্ষে সে বেশ্যাবৃত্তি তোমারই হইয়াছে। কারণ বেশ্যা বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে বলিয়া, তাহা তুমিই চিন্তা করিয়াছ। বেশ্যা স্থূল দেহে বেশ্যাবৃত্তি করিয়াছে, তাহাতে আমাদের অধিকার নাই। তাহার গতি ঐ দেখ কি হইতেছে! কুকুর শৃগালে ভক্ষণ করিতেছে। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর লইয়া আমাদের কার্য্য, তাহা হরি-পাদপদ্মে শরণাগত হইয়াছিল, সুতরাং হরি-ধামে তাহার বাসস্থান না হইয়া আর কোথায় হইবে? তোমার স্থূল দেহ পবিত্র ছিল, তাহার পবিত্র গতি হইতেছে। বেশ্যার ন্যায় শৃগাল কুকুরের তাহা ভক্ষণীয় না হইয়া সন্ন্যাসীরা মিলিত হইয়া জাহ্নবী সলিলে নিক্ষেপ করিয়া দিতেছে এবং সূক্ষ্ম শরীরে বেশ্যাবৃত্তি করায় বেশ্যার গতি যমযন্ত্রণা পাইতে হইতেছে। বল সন্ন্যাসী বল? ইহা কি ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার নহে?

৫০। যেমন সমুদ্রে জাহাজ পতিত হইলে জল হিল্লোলের গত্যনুসারে তাহা পরিচালিত হইতে বাধ্য হয়, কিন্তু তন্মধ্যস্থ কম্পাসের উত্তর দক্ষিণমুখী সূচিকা কখন আপন দিক্ পরিভ্রষ্ট হয় না।

এ স্থানে মন, কম্পাসের সূচিকা এবং হরিপাদপদ্ম দিক্ বিশেষ। সংসার সমুদ্রের ন্যায় এবং হরিষ ও বিবাদ তাহার তরঙ্গনিচয়। যে ব্যক্তি সংসারের তরঙ্গে থাকিয়াও ঈশ্বরের প্রতি মনার্পণ করিতে পারে, সে ব্যক্তির সংসারের মধ্যে থাকায় কখন মুক্তি লাভের পক্ষে বিঘ্ন হয় না। সেই নিমিত্ত এমন ব্যক্তির সংসার ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে সাধন করিবার জন্য ধাবিত হইবার

প্রয়োজন হয় না। কেবল হরিপাদপদ্মে অথবা জগদীশ্বরের যে কোন নামে বা ভাবে মনার্পণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। সাংসারিক মনুষ্যেরা ধ্যান করিবে, তাহার সময় কোথায়? ভগবান্ তাহাদের নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি পাশ ছেদন না করিয়া দিলে জীবের সামর্থ্যে তাহা সঙ্কুলান হয় না।

৫১। যে জীব সংসারে থাকিয়া মনে মনে একবার হরি বলিয়া স্মরণ করিতে পারে, ভগবান্ তাহাকে শূর বা বীর ভক্ত বলেন।

একদা নারদের মনে ভক্তাভিমান হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ নারদ! অমুক গ্রামে আমার একটী পরম ভক্ত আছে, তুমি যাইয়া একবার তাহাকে দর্শন করিয়া আইস। নারদ প্রভু আজ্ঞা শিরোধার্য্য জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ভক্তগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, একজন কৃষক স্কন্ধদেশে লাঙ্গল স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীহরি স্মরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল। নারদকে কোন কথা না বলায়, তিনি উক্ত কৃষকের গৃহে প্রবেশ না করিয়া বহির্ভাগেই অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় কৃষক গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং স্নানাদি করিয়া আর একবার শ্রীহরির নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক আহার করিল। পরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় ক্ষেত্রে যাইবার সময় আর একবার শ্রীহরি বলিল, এবং সায়ংকালে গৃহে পুনরাগমন করিয়া শয়ন করিবার সময়ে শ্রীহরি বলিয়া নিদ্রা যাইল। নারদ এই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ভগবান্ কি আমায় এই দেখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন? তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

পরদিন কৃষকের আদ্যন্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ নারদকে একটী মৃণ্ময় পাত্র পরিপূর্ণ দুগ্ধ প্রদান করিয়া বলিলেন, নারদ! তুমি এই দুগ্ধ পাত্রটী লইয়া সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আইস। সাবধান, যেন দুগ্ধ উচ্ছ্বলিত হইয়া পড়িয়া না যায়। নারদ যে আজ্ঞা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক যথা সময়ে প্রত্যাগমন করিয়া ভগবান্‌কে সমুদয় বৃত্তান্ত প্রদান করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নারদ! বল দেখি, অদ্য আমাকে কয়বার স্মরণ করিয়া-

ছিলে? নারদ বলিলেন, না প্রভু! আপনাকে একবারও স্মরণ করিতে পারি নাই। দুগ্ধের দিকেই আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল। অন্য মন হইলে পাছে দুগ্ধ পড়িয়া যায়, সেই জন্য আমি কোন দিকে মনোনিবেশ করিতে পারি নাই। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, নারদ! তোমার ন্যায় বীর ভক্ত এক পাত্র দুগ্ধের জন্য আমায় বিস্মৃত হইয়াছিল, আর সেই কৃষক সংসার রূপ বিশ মণ বোঝা লইয়া তথাপি আমায় দিনের মধ্যে চারিবার স্মরণ করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রধান ভক্ত কে?

৫২। যাহারা সন্ন্যাসী হইয়াছে, সংসারের বন্ধন হইতে আপনি মুক্ত হইয়াছে, তাহারা বনে যাইয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত হইবে, ইহা বিচিত্র কথা নহে। কিন্তু যাহারা স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, পিতা, মাতা প্রভৃতির সমুদায় কার্য্য করিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে, তাহাদের প্রতি ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃপা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

(ক) যেমন লেখা পড়া শিখিলে পণ্ডিত হয়, তাহার বিচিত্র কি? কিন্তু কালীদাসের ন্যায় হঠাৎ বিদ্যা হওয়া ঈশ্বরের করুণা।

(খ) এক ব্যক্তি অদ্য অতি দীন হীন রহিয়াছে। কল্য কোন ধনীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া একেবারে আমীরের তুল্য হইয়া পড়িল।

(গ) সাংসারিক জীবেরাও কোন্ সময়ে ভগবানের দয়া লাভ করিয়া যে হঠাৎ সিদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এ প্রকার অবস্থা শত শত বর্ষ সাধনেও হইবার নহে।

যাহারা ভগবানের কৃপার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে, তাহাদের নিয়ম বিধি কিছুই নাই। ভিক্ষুকের কি নিয়ম হইতে পারে? তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের এই জন্য সাধন ভজনের কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না। তাহারা ভগবানের পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ভাবে আবশ্যক মত কার্য্য করিয়া যায়।

৫৩। অনেকে বলে যে, একটা মন কেমন করিয়া সংসার এবং ঈশ্বরের প্রতি এককালে সংযোগ করা যাইবে?

ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। অভ্যাস করিলে সকলই সম্ভবে।

(ক) যেমন ছুতরদের স্ত্রীলোকেরা চিড়া কুটিবার সময়ে একমনে পাঁচটী কর্ম্ম করিয়া থাকে। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা চিড়া উণ্টাইয়া দেয়, তাহাতে মনের কিয়দংশ সম্বন্ধ থাকে। বাম হস্ত দ্বারা একবার ক্রোড়স্থ সন্তানের মুখে স্তনার্পণ করে ও মধ্যে মধ্যে ভাজনা খোলায় চালগুলি উণ্টাইয়া দেয় ও উম্নুন নিবিয়া যাইলে তুসগুলি উম্নুনের মধ্যে ঠেলিয়া দিতে হয়, ইহাতেও মনের সংযোগ প্রয়োজন। এমন সময় কোন খরিদদার আসিলে তাহারও সহিত পাওনা হিসাব করে। এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার একটী মন কিরূপে এতগুলি কার্য্য এক সময়ে করিতে পারিতেছে। তাহার ষোল আনা মনের মধ্যে বারো আনা রকম দক্ষিণ হস্তে আছে। কারণ যদ্যপি অন্যমনস্কবশতঃ হস্তের উপর ঢেঁকি পড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সকল কার্য্য বন্ধ হইবে এবং অবশিষ্ট চারি আনায় অন্যান্য কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব অভ্যাসে কি না হইতে পারে? ঘোড়া চড়া অতি কঠিন, কিন্তু অভ্যাস হইলে তাহার উপরও অবলীলাক্রমে নৃত্য করিতে পারা যায়।

আমাদের দেশের যে সকল লোকেরা এপ্রকার সংস্কারাবৃত হইয়াছেন যে, সংসারে থাকিয়া কোন ব্যক্তিরই ধর্ম্মোপার্জ্জন হইতে পারে না, তাঁহারা রামকৃষ্ণদেবের সাধনের স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে উপদেশগুলি পাঠ করিতে বিরত হইবেন না। কাহাদের পক্ষে বন গমন প্রয়োজন এবং কাহাদের পক্ষেই বা নিষিদ্ধ, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। একজন যাহা করিবে অপরকেও যে তাহাই করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রভৃতি ইদানীন্তন সিদ্ধপুরুষেরা সকলেই সংসারে ছিলেন। সকলেরই স্ত্রী পুত্র ছিল, এমন কি রামপ্রসাদের বৃদ্ধাবস্থায় একটী কন্যা সন্তানও জন্মিয়াছিল। ইহা দ্বারা তাঁহার পতন হইবার কথা শ্রবণ করা যায় না, বরং একদা স্বয়ং ব্রহ্মময়ী তাঁহার তনয়া রূপে অবতীর্ণ হইয়া বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব নিজে সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী হন নাই। তিনি লোকালয়ে আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও স্ত্রীর মধ্যে থাকিয়া যে প্রকার সাধন ভজন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহারও অগোচর নাই। এ কথা বলিতেছি না

যে, তিনি যে ভাবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন সেইরূপ সকলে কার্য্য পরিচালিত করিতে পারিবেন। তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন,তাহার আভাস লইয়া আমরা সকলে ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিব। তিনি বলিতেন, "ষোল-টাং বলিলে তোমরা এক-টাং শিক্ষা করিবে।" রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ এই যে, সংসারে থাকিয়া সাংসারিক কার্য্যাদি অবস্থাসঙ্গত সাধন পূর্ব্বক ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত হইবে। পরে যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাহার সমুদয় বন্ধন আপনি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। সময়ের কার্য্য সময়ে সম্পন্ন করিয়া লয়। অনেকে এই উপদেশের বিকৃত অর্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, অগ্রে সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু উপদেশের সে ভাব নহে। সংসার পরিত্যাগ করা উদ্দেশ্য নহে, উদ্দেশ্য ভগবান্‌কে লাভ করা। ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে আপনাকে ক্রমে ক্রমে প্রস্তুত করিতে হয়, এই সাধনে যে কত দিন অতিবাহিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা কে বলিতে পারেন? সাধনের প্রথমাবস্থায় সংসারে থাকিলে বিশেষ কোন ক্ষতি না হইয়া বরং বিলক্ষণ লাভেরই সম্ভাবনা। তখন সংসারে থাকিয়া যে একেবারে সাধন হইতে পারিবে না, একথা স্বীকার করা যায় না। যাহার মন যে কার্য্য করিতে চায়, তাহার প্রতিবন্ধক জন্মাইতে কাহারও অধিকার নাই। যেমন—

৫৪। কোন স্ত্রীলোক ভ্রষ্টা হইলে সে গৃহের যাবতীয় কার্য্য করিয়াও অনবরত তাহার উপপতিকে হৃদয়ে চিন্তা এবং ইচ্ছামত সময়ে তাহাকে আপনার নিকটে আনিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারে। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসার প্রতিবাদ করিতে অসমর্থ।

৫৫। অবস্থাসঙ্গত কার্য্য না করিলে তাহাকে পরিণামে ক্লেশ পাইতে হয়। যেমন—

(ক) ফোটক হইলে তাহাকে তখনি কর্ত্তন করিয়া দেওয়া উচিত নহে। তাহার যখন যে প্রকার অবস্থা হইবে, তখন তাহাকে তদ্রূপ ব্যবহার করিতে হইবে। কখন গরমজলের সেক, কখন বা পুল্টিস দিতে হয়, কিন্তু যখন

উহা পরিপক্ক হইয়া মুখ তুলিয়া উঠে, তখন তাহাকে কর্ত্তন করিয়া দিলে উপকার ব্যতীত অপকারের সম্ভাবনা থাকে না।

(খ) যেমন ক্ষত স্থানের মামড়ী ধরিয়া টানিলে উহা ছিন্ন ভিন্ন হয় এবং তজ্জন্য শোণিত শ্রাব হইয়া থাকে কিন্তু কালাপেক্ষা করিয়া থাকিলে যে অবস্থায় শরীর হইতে উহা বিযুক্ত হইবার সময় হইবে, তখন আপনিই পতিত হইয়া যাইবে।

(গ) অনেকে অন্নকষ্টে পরিবার প্রতিপালন করা সুকঠিন বিবেচনায় গৃহ ত্যাগ করিয়া সাধনের ছলনায় লোক প্রতারণা করিয়া থাকে। তাহারা মুখে বলে যে, সংসার অসার; স্ত্রী পুত্র কে? পিতা মাতা কে কাহার? ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ব্যবস্থা করিবেন, কিন্তু এ কথা বিশ্বাসে বলে না। তাহারা সুবিধা পাইলে অর্থ লোভ ছাড়ে না, উত্তম আহারের বিশেষ পক্ষপাতী এবং সুবিধা মত বিষয় কর্ম্ম হইলেও তাহা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

(ঘ) অনেকে গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং বিদেশে একটা চাকরীর সংস্থান করিয়া পরিবারকে পত্র লিখিয়াছে যে, তোমরা চিন্তিত হইও না, আমি শীঘ্র কিছু টাকা পাঠাইয়া দিব।

(ঙ) এই শ্রেণীর লোকেরা অতি হীন বুদ্ধির পরিচায়ক। তাহারা যে ক্লেদ ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাই আবার উপাদেয় বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লয়।

৫৬। যাহার এখানে আছে, তাহার সেখানে আছে। যাহার এখানে নাই, তাহার সেখানে নাই।

সংসারে থাকিয়া যে কেহ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি করিতে শিখিল, তাহার সর্ব্বস্থানেই সমভাব, কিন্তু সংসারে যাহার কিছু লাভ হইল না, তাহার পক্ষে অতি ভীষণ পরিণাম, তাহার সন্দেহ নাই। ভাব শিক্ষার স্থান "সংসার," পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, স্ত্রী, পুত্রাদি হইতে শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর, এই পঞ্চবিধ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, তাঁহারা যদ্যপি কোন ভাবে ঈশ্বরকে লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের সংসার ত্যাগ করিয়া যাওয়া চলিবে না, কিন্তু যদ্যপি অনন্ত চিন্তায় নির্ব্বাণ মুক্তি লাভের প্রত্যাশা থাকে, তাহা হইলে বনই তাঁহাদের

নিমিত্ত এক অদ্বিতীয় স্থান। এই শ্রেণীরা জ্ঞানী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীরা ভক্তি মতের নরনারী। দ্বিতীয়েরা ঋণ পরিশোধান্তে একদিন ভক্তিমত ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইতে পারেন, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীদিগের পক্ষে একেবারে ভক্তি পথের পথিক না হইলে গত্যন্তর নাই। তাহাদের এখানেও (সংসার) ভাব এবং সেখানেও (ঈশ্বর) ভাব। যে ব্যক্তি এই ভাব যে পরিমাণে লাভ করিতে পারিবেন, সেই ব্যক্তি সংসারে বসিয়া ঈশ্বরকে সেইরূপ প্রাপ্ত হইবেন।

সংসার ব্যতীত ভক্তি মতের কার্য্য হইতে পারে না, তাহার হেতু এই যে, ভক্তি অর্থে সেবা। যথা, কখন ঈশ্বরকে ভোজ্য পদার্থ প্রদান, কখন বা ব্যজন ও পদসেবা করণ, তাহা লোকালয় ব্যতীত কোথায় সুবিধা হইবে?

সাধন প্রণালী।

৫৭। যাহার যে প্রকার স্বভাব, তাহার সেই স্বভাবানুযায়ী সাধন করা কর্ত্তব্য।

সাধকেরা অবস্থাভেদে তিনভাগে বিভক্ত, যথা, সাধন প্রবর্ত্ত, সাধক এবং সাধন-সিদ্ধ।

সাধন-প্রবর্ত্ত। জীবগণ ঈশ্বর লাভের জন্য যে সময়ে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে সাধকের প্রথম অবস্থা অথবা সাধন-প্রবর্ত্ত কহে। এই সময়ে সদসৎ বিচার পূর্ব্বক কর্ত্তব্য স্থির করা যায়, যাহাকে শাস্ত্রে বিবেক বৈরাগ্য কহে।

জীবগণ চতুর্দ্দিকে অগণন পদার্থনিচয় অবলোকন করিতেছে। সংসারে আপনার আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতি বহুবিধ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইয়া

তাহাদের কার্য্য পালন করা জীবনের কার্য্য জ্ঞানে ধাবিত হইতেছে। সংসার সংগঠন, তাহার পুষ্টিসাধনের উপায় এবং যাহাতে তাহা সংরক্ষিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে ব্যাপৃত হইতেছে। এই সকল কার্য্য সাধারণ পক্ষে জীবদিগের মধ্যে লক্ষিত হয়। তাহারা যখন এই সকল অবস্থায় উপর্য্যুপরি হতাশ হইয়া শান্তিচ্ছায়া অনুসন্ধান করিয়া থাকে, তখনই তাহাদিগকে ঈশ্বর পথের পথিক কহা যায়।

বিবেক ও বৈরাগ্য, সাধনের প্রথম উপায়। ইহা অবলম্বন ভিন্ন ঈশ্বর লাভের দ্বিতীয়পথ অদ্যাপি উদ্ভাবন হয় নাই এবং তাহা কদাপি হইবারও নহে। এইজন্য প্রত্যেক প্রকৃত ধর্ম্মে সম্প্রদায়ে বৈরাগ্যের প্রশস্তশাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

মনুষ্যদেহের অধীশ্বর মন। মন যে কি প্রকার অবয়ববিশিষ্ট অথবা এককালীন গঠনাদি বিবর্জ্জিত, কিম্বা কোন পদার্থ নহে, তাহা স্থির করিয়া দেওয়া অতিশয় কঠিন। কেহ মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং কেহ বা তদ্‌পক্ষে সন্দেহ করিয়া থাকেন। যাঁহারা মন স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন যে, ইহা এক প্রকার স্বতন্ত্র পদার্থ, মস্তিষ্কের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই, কিন্তু যাঁহারা মনের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারা মস্তিষ্কের কার্য্যকেই মন বলেন এবং তাঁহাদের মীমাংসার বিশেষ বৈজ্ঞানিক কারণও প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

যখন শব ছেদ করিয়া মস্তিষ্ক পরীক্ষা করা যায়, তখন ইহার গঠনের যে সকল অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কারণ জীবিত সময়ের অবস্থা মৃতাবস্থার সহিত কদাপি সমান হয় না। মস্তিষ্কের কার্য্য দর্শনার্থ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নানাবিধ নিকৃষ্ট পশুদিগের জীবিতাবস্থায় মস্তিষ্কপরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু তদ্দৃষ্টেও তাঁহারা কোন বিশেষ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই।

মস্তিষ্ক কোমল পদার্থ। (যাঁহারা ছাগাদির মস্তিষ্ক দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাহা অনুমান করিতে পারিবেন) ইহাকে কর্ত্তন করিলে দুই প্রকার বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আভ্যন্তরিক প্রদেশ, শ্বেতবর্ণ এবং বহির্দ্দিক পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের এই পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট অংশকে বুদ্ধি বা জ্ঞানের স্থান কহে। স্নায়ুদিগের * উৎপত্তির স্থান মস্তিষ্ক এবং

* ইংরাজী নার্ভস্ (Nerves) কহে। দেহের যাবতীয় কার্য্য ইহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। সাধারণ পক্ষে, কার্য্যবিশেষে ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। একশ্রেণী স্নায়ুদ্বারা

মেরুমজ্জা*। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, অঙ্গ সঞ্চালন প্রভৃতি যাবতীয় দৈহিক ক্রিয়া, ইহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

যদিও আমরা স্থূলে দেখিতে পাইয়া থাকি যে, স্নায়ু সকল বস্তুবিচারের একমাত্র উপায়, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে তাহা কিছুই স্থির করা যায় না। আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে নানাবিধ পদার্থের নানাবিধ ভাব অবগত হইতেছি। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা মনুষ্য, গো, অশ্ব, বৃক্ষ, অট্টালিকা প্রভৃতি নানাপ্রকার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। শ্রবণেন্দ্রিয় শক্তির সহকারে বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহাদের পার্থক্য অনুভব হইতেছে। স্পর্শন দ্বারা কঠিন,কোমল, উষ্ণ, শীতল, মিষ্ট, তিক্ত, কষায় ইত্যাদি পদার্থের অবস্থানিচয় উপলব্ধি হইতেছে। যদ্যপি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা স্নায়ুদিগের এই সকল ক্রিয়া অবলোকন করা যায়, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কারণ বহির্গত হইয়া যাইবে।

নিদ্রিতাবস্থা তাহার দৃষ্টান্ত। এ সময়ে প্রায় সকল ইন্দ্রিয়ই নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে, কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন যে, স্নায়ু সকল সেই স্থানে তৎকালীন অদৃশ্য হইয়া যায়? তাহা কদাপি নহে। স্নায়ু সকল জাগ্রতাবস্থায় যে স্থানে যে প্রকৃতিতে অবস্থিতি করে, নিদ্রিতাবস্থায়ও সেইরূপে থাকিয়া যায়। তবে সে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বৈপরীত্য সংঘটিত হইবার কারণ কি?

যাঁহারা মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা এই স্থানে মনের শক্তি উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, মন সকল কার্য্যের অধিনায়ক; জ্ঞান তাহার অবস্থার ফল এবং স্নায়ু ও অন্যান্য শরীর গঠন তাহার কার্য্যের সহকারী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। একথা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কারণ যে সকল দৈহিক ঘটনা আমরা সদাসর্ব্বদা দেখিয়া থাকি, তাহা বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিলে পূর্ব্ব কথিত মত অস্বীকার করা যায় না।

বিবেক বৈরাগ্যের সহিত আমাদের দেহের সম্বন্ধ কি, তাহা অগ্রে অবগত হওয়া আবশ্যক।

সঞ্চালন ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহাকে মোটার নার্ভ (Moter Never) বলে। এবং দ্বিতীয় প্রকার স্নায়ু দ্বারা স্পর্শ শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাকে সেন্সরি নার্ভ (Sensory Nerve) কহে।

* ইহাকে স্পাইনেল কর্ড (Spinal cord) বলে। এই অংশকে মস্তিষ্কের প্রবর্দ্ধিত অংশ বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন।

আমাদের দেহ লইয়া বিচার করিয়া দেখিলে মনকেই সকল কার্য্যের আদি কারণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। অতএব এই স্থানে মন লইয়া কিঞ্চিৎ বিস্তৃত রূপে আলোচনা করা যাইতেছে।

যখন আমরা কোন পদার্থ স্পর্শ করি, স্পর্শন মাত্রেই তাহার অবস্থা উপলব্ধি হইয়া আইসে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা হউক, এই ঘটনায় কাহার কি কার্য্য হইল।

পদার্থ স্পর্শিত হইবামাত্র তথাকার স্নায়ুমণ্ডল সেই স্পর্শন সংবাদ মনের নিকট প্রেরণ করে, অথবা মন শরীরের সর্ব্বত্রে রহিয়াছে বলিয়া তাহারই নিজ শক্তি দ্বারা অবগত হয়, ইহা অগ্রে স্থির করিতে হইবে। যদ্যপি প্রথম মত স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে স্নায়ুদিগের দৌত্যক্রিয়া সপ্রমাণ হইতেছে, কিন্তু যে সময় মন অন্য প্রকার একাগ্রভাব বশতঃ বিমনাবস্থায় থাকিলে স্নায়ু সকল বার্ত্তাবহায় অসমর্থ হয়, তখন দ্বিতীয় মত বলবতী হইয়া যায়, যতই দর্শন করা যায়, যতই পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ততই শেষোক্ত ভাবই প্রবল হইয়া উঠে।

যখন আমরা কোন বিষয় লইয়া পূর্ণ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া যাই, তখন চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল উত্থাপিত হইলেও তাহা মনের সম্মুখে আসিতে পারে না; অথবা অঙ্গ স্পর্শজনিত ভাব বুঝিতেও অপারক হইয়া থাকে। যখন আমরা কোন দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই সময়ে চক্ষুর অবস্থাক্রমে নানাবিধ পদার্থের আভাস পতিত হইলেও মন সংস্পর্শিত পদার্থবিশেষ ব্যতীত কাহার অবয়ব বিশেষরূপে দর্শন হয় না। অনেকে জানিতে পারেন, যখন কেহ কোন দিকে চাহিয়াছি অন্য কোন বিষয় চিন্তা করেন, তখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়া যাইলেও তাহার জ্ঞান হয় না।

বোধ হয় সকলেই জানেন যে, পুস্তক পাঠকালে মন সংযোগ ব্যতীত একটী কথাও স্মরণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল কারণে মনের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বত্রেই স্বীকার করিতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মন যাহাই হউক, কিন্তু ইহার স্থান মস্তিষ্ক কারণ ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের দ্বারা এক প্রকার সাব্যস্থ হইয়াছে যে, যাহার মস্তিষ্ক সুস্থাবস্থায় থাকিয়া অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব লাভ করে, তাহার মানসিক শক্তি বাস্তবিক উন্নত হইয়া থাকে। এই প্রকার মস্তিষ্কে পাণ্ডুবর্ণ-বিশিষ্ট পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে। যকৃৎ প্লীহা বা হৃৎপিণ্ড কিম্বা অন্য

কোন প্রকার যন্ত্রাদি হইতে যে মনের উৎপত্তি হয় না, তাহা বিবিধ রোগে নির্ণয় হইয়া গিয়াছে। যখনই মস্তিষ্কে কোন প্রকার অস্বাভাবিক ঘটনা উপস্থিত হয়, তখনই মনের বিকৃতাবস্থা ঘটিয়া থাকে; ইহা সকলেরই জ্ঞাত বিষয়। এজন্য মনের স্থান মস্তিষ্ক অর্থাৎ মস্তিষ্কের ক্রিয়াকেই মন কহা যায়।

যদ্যপি মস্তিষ্কের অবস্থাক্রমে মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা হইলে মস্তিষ্ক লইয়া আমাদের প্রথম কার্য্য আসিতেছে।

বাল্যাবস্থা হইতে আমরা যতই বয়োবৃদ্ধি লাভ করিতে থাকি, আমাদের শরীরের গঠন ও আকৃতিও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া আইসে। যে অঙ্গ যে প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে, তাহার কার্য্যও সেই প্রকার হইবে। এইজন্য অবস্থা মতে ব্যবস্থারও বিধি রহিয়াছে।

বাল্যাবস্থায় মস্তিষ্ক অতিশয় ক্ষুদ্র থাকে। ইহার বিবিধ শক্তিসঞ্চালনী অংশ সকল সুতরাং দুর্ব্বল বলিয়া কথিত হয়। কোন কোন পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে বালকের মস্তিষ্ক পূর্ণাকৃতি লাভ করিয়া থাকে এবং কেহ বা তাহা পঞ্চম বৎসর হইতেই পরিগণিত করেন। আমাদের দেশ এই শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী। কারণ শিশু পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলেই তাহার বিদ্যারম্ভ করিবার জন্য ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে।

যদিও মস্তিষ্ক পঞ্চম হইতে অষ্টম বৎসরে পূর্ণবিস্তৃতি লাভ করে বটে, কিন্তু বাস্তবিক পূর্ণবিস্তৃতিকাল পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত নিরূপিত হইয়াছে। এই সময়ে যাহার মস্তিষ্ক যে পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহার অতীতাবস্থা আর প্রায়ই সংঘটিত হইতে দেখা যায় না, কিন্তু তদনন্তর চত্বারিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সময় পূর্ণ মস্তিষ্কের গুরুত্ব পাঁচ সের হইতে ছয় সের পর্য্যন্ত কথিত হয়। ইহার পর হ্রাসতার সময়। কথিত আছে যে, চল্লিশ বৎসর হইতে প্রতি দশ বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে মস্তিষ্ক বিধানের হ্রাসতা জন্মিয়া থাকে।

মস্তিষ্কের যখন এইরূপ অবস্থা হইল, তখন তাহার অবস্থানুযায়ী মনের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তাহার সন্দেহ নাই। এই জন্য যে যে কারণে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল এবং অযথা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া না পড়ে, তদ্বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখা বিধেয়। এই প্রকার কারণ-জ্ঞানকে বিবেক বৈরাগ্য কহে।

বিবেক বৈরাগ্য শব্দদ্বয় নানাস্থানে নানাভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের সূক্ষ্ম কারণ বহির্গত করিয়া দেখিলে, বুঝা যায় মনের অখণ্ডভাব সংরক্ষিত করাই একমাত্র অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য।

বিবেক বৈরাগ্যের সাধারণ অর্থ এইরূপে কথিত হয়। যথা বিবেক অর্থে সদসৎ বিচার এবং বৈরাগ্য অর্থে বর্ত্তমান অবস্থা পরিত্যাগ বা তদ্বিষয়ে অনাসক্তি হওয়াকে কহে।

পৃথিবীতে কোন্ বস্তু সৎ এবং কোন্ বস্তু অসৎ, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে প্রত্যেক পদার্থ লইয়া আদ্যন্ত বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কারণ কোন বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে এবং কাহার সহিত কোন সম্বন্ধই নাই, তাহা স্থূলভাবের কথা নহে।

যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই বা সম্ভোগ করিয়া থাকি,তাহা চরম জ্ঞান করিয়া মনকে একেবারে উহার প্রতি আবদ্ধ রাখাকে মায়া বা ভ্রম কহে। এই মায়াবুদ্ধি তিরোহিত করা বিবেকাবলম্বনের শাস্ত্রীয় অভিপ্রায়। কারণ পদার্থগণ যে অবস্থায় যেরূপে আমাদের সমক্ষে প্রতীয়মান হয়, তাহা বাস্তবিক তাহার প্রকৃত অবস্থা নহে। জড়শাস্ত্রে আমরা জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা পরিষ্কার করিয়া উল্লেখ করিয়াছি। যখন দৃশ্য পদার্থদিগের এই প্রকার জ্ঞান জন্মে, তখন মন স্থূলবোধ অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্মভাবে গমন করিয়া থাকে। সেই কার্য্যপ্রণালীর নাম বিবেক এবং পরিবর্ত্তিত অবস্থাকে বৈরাগ্য কহে।

আমরা এই স্থানে বিবেক, বৈরাগ্য এবং মায়া এই ত্রিবিধ শব্দের ভাবার্থ আরও বিশদরূপে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কারণ ইহাই ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার প্রথম সোপান।

সকলেই শ্রবণ করিয়া থাকেন যে, বৈরাগ্য ভিন্ন তত্ত্বকথা উপলব্ধি বা জ্ঞানোপার্জ্জন হইতে পারে না এবং সেই জন্য সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে গমন ও তীর্থে বাস করিবার প্রথা হইয়াছে। বৈরাগ্যাশ্রম যে কেবল স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করাকেই বলে, অথবা বিষয়াদি জলে নিক্ষেপ করিতে পারিলেই তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়, কিম্বা কৌপীন পরিধান করিয়া ভস্মরাশি দ্বারা অঙ্গ বিভূষিত করিতে পারিলেই বৈরাগী হওয়া যায়, তাহা কদাপি নহে। মনের অখণ্ডভাব রক্ষা করাই বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য বলিয়া ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। স্বভাবতঃ মনুষ্যেরা জড়তত্ত্ব না জানিয়া লোকের কথাপ্রমাণ কখন এ পথ, কখন ও পথে ধাবিত হইয়া নানাবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিতে থাকে।

যদ্যপি কেহ তাহাদের প্রকৃত ভাবি পথ পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহাদের বিপথ ভ্রমণ হেতু অনর্থক ক্লেশ পাইতে হয় না।

মনুষ্যেরা ভূমিষ্ঠ হইবার পর মাতা অথবা অন্যজন দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের বাহ্য জগতের জ্ঞানসঞ্চার হইবামাত্র মাতা কিম্বা ধাত্রীর প্রতি প্রথম দৃষ্টি পতিত হয়। তাহাদের ক্ষুধায় আহার, শয়নে রক্ষণাবেক্ষণ, মলমূত্র ত্যাগ করিলে পরিষ্কৃতকরণ, পীড়ায় কাতর হইলে সেবা শুশ্রূষা, মাতা ব্যতীত আর কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল কারণে মাতার প্রতি ভালবাসার সূত্রপাত হয়। ক্রমে পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, তদনন্তর স্ত্রী,(স্ত্রী হইলে পতি) পুত্রাদি ও অন্যান্য আত্মীয় এবং সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করণোপযোগী নানাপ্রকার পদার্থের প্রতি মনের আসক্তি জন্মিয়া থাকে।

মনুষ্যেরা যখন জগতের স্থূলভাব লইয়া অবস্থিতি করেন, তখন স্থূলের কার্য্যই প্রবর্দ্ধিত হয় এবং তাহাদেরই ইহপরকালের একমাত্র আত্মসম্বন্ধীয় উপায় এবং অবলম্বন জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন।

যাঁহারা সংসারাশ্রমে এই প্রকার স্থূলভাবে মনোনিবেশ পূর্ব্বক দিনযাপন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের যদ্যপি কোন সূত্রে কারণ-বোধ উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাদের পূর্ব্ব ঘটনাসমূহ স্বপ্নভঙ্গের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। তখন তাঁহারা জ্ঞান-দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন যে, যাহাদের লইয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে ভবিষ্যৎ ভাবনা এককালে জলাঞ্জলি দিয়া সময়াতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার সহিত সম্বন্ধ কোথায়? মাতাজ্ঞানে যাহার প্রতি সমুদয় প্রীতিভক্তি সমর্পিত হইয়াছিল, তিনিই বা কোথায়? অন্যে যেমন আপনার কার্য্যের ফল আপনি সম্ভোগ করিয়া থাকেন, তিনি তেমনি তাঁহার কার্য্যের ফল তিনিই সম্ভোগ করিবেন, ইত্যাকার সূক্ষ্মজ্ঞানের প্রবল পরাক্রমে স্থূল জগতের প্রত্যেক পদার্থ চূর্ণীত হইয়া আইসে। সুতরাং মায়া বিদূরিত হয়। এই প্রকার সূক্ষ্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিলে মনের পূর্ব্ববৎ আসক্তি এককালে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং এই অবস্থাকে সাধারণ কথায় বৈরাগ্য কহে। সেইজন্য যাঁহাদের বৈরাগ্য হয়, তাঁহাদিগকে সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের প্রতি তাঁহাদের আসক্তি ছিল, তাহা এক্ষণে আর থাকিতে পারে না। যেমন মত্তকরীর বন্ধন দশা বিমুক্ত করিয়া দিলে কোন দিকে ছুটিয়া যায়, তেমনই আসক্তিবিমুক্ত জীবগণ, মুক্তাবস্থায় জীবন সুশীতলকারী অলৌকিক বায়ু

সেবন করিয়া পাছে অদৃষ্টগুণে পূর্ব্বাবস্থায় পুনর্ব্বার পতিত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় দেশ ছাড়িয়া জনপদপরিশূন্য স্থানে আশ্রয় লইয়া থাকেন। ইহাকেই প্রকৃত বৈরাগীর লক্ষণ বলে।

অখণ্ড মন প্রস্তুত করিতে হইলে ইহাকে জড়জগতের কোন বিষয়ে ব্যয়িত করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ যাহাতে মন নিবিষ্ট হইবে, তাহার ভাব গ্রহণ করিতে ইহার কিয়দংশ সংলগ্ন হইয়া অবশ্যই থাকিবে। এইরূপে যখন ভাবের পর ভাব প্রাপ্তির জন্য কার্য্যের পর কার্য্য করিতে থাকা যায়, তখন কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের চরমাবস্থায় গমন করিতে অশক্ত হইয়া পড়ে। যেমন বালকেরা পাঠশালায় দশখানি পুস্তক এককালীন পাঠ করিতে পারে না, তাহারা বৎসরান্ত পর্য্যন্ত ক্রমাগত অধ্যয়ন করিয়া কোন পুস্তকের বিংশতি পৃষ্ঠা এবং কোন পুস্তকের বা শত পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করিতে পারে। বহুসংখ্যক পুস্তক এককালে পাঠ করিতে না দিয়া একসময়ে যদি একখানির ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে ইহার পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীতে মনুষ্যদিগের যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা বিচার দ্বারা বিদূরিত করিয়া এক ঈশ্বরের দিকেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। কারণ যতই স্থূলপদার্থ পরীক্ষা করা হয়, ততই তাহার নির্ম্মায়ক কারণ বহির্গত হইয়া এক চরম কারণে মন স্থগিত হইয়া যায়। পরীক্ষাকালীন প্রত্যেক কারণ বহির্গমনের সহিত তদ্পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হইতে সুতরাং মনকে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হয়। জড়শাস্ত্র মতে কথিত হইয়াছে, এই কার্য্যকে বৈরাগ্যের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত বলিয়া উক্ত হইতে পারে। যেমন চাখড়ি। ইহা এক প্রকার শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট কঠিন পদার্থ। যখন আমরা ইহার বহির্ভাগ দর্শন করি, তখন তাহাকে সম্পূর্ণ স্থূলদৃষ্টি কহে। অতঃপর বিচার আরম্ভ হইল। চা-খড়ি কি পদার্থ? খড়ি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সংস্কার বা জ্ঞান সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বিতীয় প্রকার বিচারে সিদ্ধান্ত হইল যে, অঙ্গার, অক্সিজেন এবং চূণ ধাতু, ইহার উপাদান কারণ। যখন এই প্রকার জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক ঐ সকল উপাদানদিগের কারণ নির্ণয়াভিলাষী হইয়া ক্রমে সূক্ষ্ম বিচারের পথ আশ্রয় করা যায়, তখন আরোহণ সূত্রে মহাকারণের মহাকারণ পর্য্যন্ত উপস্থিত হওয়া যায়।

অতএব খটিকা যে অবস্থায় ব্যবহৃত লইয়া থাকে, কিম্বা আমরা লইয়া পরীক্ষা করিয়া থাকি, তাহা চরমাবস্থার আকৃতি কিম্বা গঠন নহে। সুতরাং

খটিকা বলিলে যাহা আমরা বুঝিয়া থাকি, তাহাকেই আমাদের চরমজ্ঞানের প্রাপ্ত বস্তু বলিয়া কদাচ স্বীকার করা যায় না।

যখন বিবেকের * সহায়তা গ্রহণ করা যায়, তখন এই ভাব উদ্দীপন হইয়া থাকে, নতুবা অন্য উপায়ে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। চা-খড়ির দৃষ্টান্তে যে প্রকার বিচারপ্রণালী কথিত হইল, অন্যান্য জড় এবং জড়চেতন পদার্থ-দিগকে বিচার করিলে, অবিকল ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে জড়শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

৫৮। সত্ব, রজঃ এবং তমঃ, এই ত্রিগুণে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

৫৯। এই গুণত্রয় পরস্পর সংযুক্ত হইয়া নানাবিধ যৌগিক গুণ উৎপাদন করিয়া থাকে। যেমন সত্বের সহিত রজঃ মিশ্রিত হইলে সত্বরজঃ; রজঃ ও তমঃ সংযোগে রজস্তমঃ এবং সত্ব ও তমঃ দ্বারা সত্বতমঃ ইত্যাদি।

যে সকল ব্যক্তির স্বভাব যে গুণ প্রধান, সেই সকল ব্যক্তির সেই সকল লক্ষণ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্যান্য যৌগিক গুণের যে গুণ প্রধান, তাহারই আধিক্য এবং সংযুক্ত গুণের আভাসমাত্র বিভাসিত হইয়া থাকে।

---

* আমরা বলিয়াছি যে, বিবেক অর্থে সদসৎ বিচার। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সৎ শব্দে উত্তম, এবং অসৎ শব্দে নিকৃষ্ট। জগতে ঈশ্বরই সৎ, আর যাহা কিছু সৃষ্ট পদার্থ, ইহারা অসৎ। এই জন্য বৈরাগীরা সংসারাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকেন। কার্য্যপদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া আমরা বৈরাগীদিগের কোন দোষ প্রদান করিতে অশক্ত, কিন্তু তাঁহারা সচরাচর বৈরাগ্যের যে অর্থ করিয়া থাকেন, তাহা আমাদের হৃদয়গ্রাহী নহে। কারণ সৎ হইতে যাহা উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা অসৎ হইতে পারে না। এক বৃক্ষে মিষ্ট এবং কটু, দুই প্রকার ফল কদাচ ফলিয়া থাকে। আমরা সদসৎ অর্থে সত্যাসত্য বলি; অর্থাৎ যে পদার্থ আমরা দেখিতেছি, তাহার সত্যাসত্য কি? যাহা দেখিতেছি, তাহাই সত্য কিম্বা তাহার স্বতন্ত্র অবস্থা আছে। এই প্রকার প্রশ্ন উত্তোলন পূর্ব্বক প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া তাহার চরমফল লাভ এবং তাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া যে পর্য্যন্ত মহাকারণের মহাকারণে বিলয় প্রাপ্ত না হইয়া যায়, সে পর্য্যন্ত বিবেক বৈরাগ্যের উপর্য্যুপরি কার্য্য হইয়া থাকে।

৬০। যে ব্যক্তির আত্মাভিমান, আত্ম-গরিমা প্রকাশ না পায়, সর্ব্বদাই দয়া দাক্ষিণ্যাদির কার্য্য হয়, রিপুগণ প্রবল হইতে না পারে, আহার বিহারে আড়ম্বর কিম্বা হতাদর না থাকে, স্বভাবতঃই ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিকী রতি-মতি থাকিতে দেখা যায়, তাহাকে সত্ব-গুণী বলিয়া পরিগণিত করা হয়।

৬১। রজোগুণে আত্মাভিমান পরিপূর্ণ থাকে। কোন কোন রিপুর পূর্ণ ক্রিয়া, আহার বিহারে অতিশয় আড়ম্বর, ঈশ্বরের প্রতি সাময়িক রুচি, কিন্তু তাহা আপন ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া থাকে।

৬২। তমোগুণে রজোর সমুদয় লক্ষণ পরিপূর্ণ রূপে দেখা যায় এবং তদ্ব্যতীত রিপুগণেরও পূর্ণ কার্য্য হইয়া থাকে।

কথিত হইল যে, সত্ব, রজঃ এবং তমঃ, প্রভৃতি আদি গুণত্রয় এবং তাহাদের যৌগিক গুণ দ্বারা স্বভাব গঠিত হইয়া থাকে। এই গুণ সকল কাহার আয়ত্তাধীন নহে। যখন যাহাতে যে গুণ প্রবল হয়, তখন তাহাতে সেই গুণের কার্য্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা যখন স্বধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া আপন স্বভাব স্থির করিতে অগ্রসর হন, তখন তাঁহারা স্পষ্ট দেখিয়া থাকেন যে, প্রকৃতির অধীশ্বরে প্রকৃতপক্ষে গুণই রহিয়াছে।

যেমন এক পদ উত্তোলন পূর্ব্বক আর এক স্থানে দৃঢ়রূপে সংস্থাপন না করিয়া দ্বিতীয় পদ উত্তোলন করা যায় না, সেই প্রকার এক গুণের ক্রিয়া হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে আর একটী গুণ অবলম্বন করা বিধেয়।

যে ত্রিবিধ গুণ উল্লিখিত আছে, তাহাদের মধ্যে সত্বই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য যাঁহারা রজঃ-তমোগুণপ্রধান প্রকৃতবিশিষ্ট, তাঁহারা আপনাপন্ন স্বভাবের গুণ বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য সত্বেরই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায় মাত্রেই সাত্বিক ভাবে দিন যাপন করা বিধি রহিয়াছে।

যদ্যপি তমোগুণী কিম্বা রজঃগুণী সত্বভাব লাভ করেন, তাহা হইলেই যে জীবনের চরম এবং ধর্ম্মের চূড়ান্ত হইয়া গেল, এমন নহে। তামসিক এবং

রাজসিক ক্রিয়ায় যে সকল অনিষ্ঠাচরণ হইবার সম্ভাবনা, সত্বেও অবিকল সেই প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। যেমন রজস্তমঃ দ্বারা আপনাকে অভি-মানী,সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং সকল বিষয়ে আত্মম্ভরীতায় পূর্ণ ক্রিয়ার পাত্র করিয়া ফেলে, সেই প্রকার সত্বতেও দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা কিঞ্চিৎ সংযমী কিম্বা রজস্তমঃ কার্য্যের কিয়দংশ ন্যূনতা করিয়া আনিতে পারিয়াছেন, তখনই তাঁহাদের মনে অন্যের প্রতি ঘৃণা এবং অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন, কেহ মৎস্য মাংস ভক্ষণে বিরত হইয়া মৎস্য কিম্বা মাংস ভোজীদিগকে অধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত করেন এবং অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এই কথা বলিয়া আস্ফালন করিয়া থাকেন। যাঁহারা সুরাপান কিম্বা মাদক দ্রব্যের ধূমপান হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের তখন সুরা অথবা মাদক ধূমপায়ী-দিগকে মুক্তকণ্ঠে পশু প্রকৃতিবিশিষ্ট বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতে দেখা যায় না।

অনেকে এই প্রকার সত্বগুণীদিগকে সত্বের তমঃ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বিবেক অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন প্রকৃতি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যত্নবান হইয়া সদসদ্ বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই কার্য্যের প্রাবল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে; সুতরাং যে কার্য্যের অবলম্বন করা হয়, তাহারই ফল দ্বারা প্রকৃতি পরিশোধিত এবং উন্নত হইয়া আইসে। এই কার্য্যকলাপকে ধর্ম্মশাস্ত্রে "কর্ম্ম" কহে। "কর্ম্ম" বিবিধ এবং অসীম। যাগ, যজ্ঞ, পূজা, দান, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি অনন্ত প্রকার কর্ম্মের ব্যবস্থা রহিয়াছে। মনুষ্য সীমায় আবদ্ধ। সুতরাং কর্ম্ম দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভ করা নিতান্ত অসম্ভব। হয় ত কেহ কোন কর্ম্মের প্রারম্ভেই গতাসু হইবেন, কেহবা আরম্ভেই, কেহ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এবং কেহ বা তাহার পূর্ণকাল পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। কর্ম্ম করিয়া প্রকৃতি শোধন, সেই জন্য যার-পর-নাই কঠিন।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে পৃথিবী চারিভাগে বিভক্ত। যথা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি। সত্যযুগে মনুষ্যেরা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেন। তাঁহাদের শারীরিক সুগঠন এবং শক্তি থাকায় দুঃসাধ্যজনক কার্য্যেও পশ্চাৎ দৃষ্টি করিতেন না। তাঁহারা জড়জগৎ এবং স্ব স্ব প্রকৃতি অধ্যয়ন পূর্ব্বক যোগাদি কর্ম্ম দ্বারা স্বভাবকে স্বভাবে আনয়ন করিতে প্রয়াস পাইতেন এবং সেই জন্য কুম্ভকাদি যোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। জড়জগৎ হইতে মনকে স্বতন্ত্র করাই

যোগের উদ্দেশ্য। কুম্ভকাদি যোগের প্রক্রিয়া অতি দুরূহ এবং সেইজন্য অদ্য আমরা তাহার অতি সামান্য ক্রিয়াবিশেষ সাধন করিতে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি।

ত্রেতা বা দ্বিতীয় যুগে, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা প্রকৃতি সংগঠন করিবার বিধি নির্দ্দিষ্ট ছিল। যজ্ঞাদির প্রক্রিয়ায় বিস্তর কার্য্য এবং যজ্ঞ ফল ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করিতে হইবে, এই চিন্তা মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিয়া ধ্যানের ফলই প্রকারান্তরে ফলিয়া যাইত, অর্থাৎ মনোমধ্যে অন্যভাব প্রকাশ করিয়া তাহার অবস্থান্তর সংঘটন করিতে পারিত না।

দ্বাপরে বা তৃতীয় যুগের কর্ম্ম, পরিচর্য্যা বা সেবা। এই সময়ে সাকার মূর্ত্তির পূজা এবং গুরুর প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি করাই একমাত্র উপায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল।

সাকারমূর্ত্তি বা গুরুর প্রতি * একেবারে ঈশ্বর জ্ঞানে মনার্পণ করা হইত, সুতরাং পরিণামে ঈশ্বরই লাভ হইয়া যাইত।

কলি বা চতুর্থ অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগে, জগদীশ্বরের নামে মনোনিবেশ করিয়া রাখিতে পারিলেই কালে অভীষ্ট সিদ্ধির হানি হইবে না। যে কোন কার্য্যেই হউক, অথবা যে কোন ভাবেই হউক, সকল সময়েই যদ্যপি ঈশ্বর জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে এপ্রকার মনের কখন অন্যভাব দ্বারা বিকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই।

---

* অবতার বা মনুষ্য পূজা, যাহা এদেশে প্রচলিত থাকায়, আমাদের মনুষ্য পূজক (man worshipper) বলিয়া অনেকেই অবজ্ঞা করিয়া থাকেন ; যাঁহারা অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে কতকগুলি কুসংস্কারাবৃত হইয়াছেন। তাঁহারা যাহা শ্রবণ করেন, যাহা একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন, তাহাই বেদবাক্য এবং জগতের অপরিবর্ত্তনীয় সত্য ঘটনা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। একবার নিজের মন বুদ্ধি সঞ্চালন করিয়া যদ্যপি বুঝিতে চেষ্ঠা করেন, তাহা হইলে সকলকেই মনুষ্যপূজক না বলিয়া থাকা যাইবে না। কারণ যাহা আমাদের নয়নে পতিত হয়,সেই পদার্থই আমরা যে প্রকৃত পক্ষে দেখিয়া থাকি, তাহা নহে; যে বস্তুতে নয়ন এবং মন পতিত হয়, তদ্‌বৃত্তান্তই আমরা জ্ঞাত হইতে পারি। একবার যদ্যপি কোন পদার্থ দর্শন কিম্বা শ্রবণ অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা মনোময় হইয়া যায়, তাহা পুনরায় ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য ব্যতীত কেবল মন দ্বারা সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। যাহা মনে উদয় হইবে, তাহাই লাভ করা যায়, এইজন্য মনে ঈশ্বরভাব থাকিলে, তাহা যাহাতেই প্রয়োগ হউক—জড় পদার্থেই হউক, অথবা মনুষ্যাদিতেই হউক—পরিণামে ঈশ্বর লাভ হইবে।

উপরি উক্ত চারি প্রকার যুগের স্বতন্ত্র কর্ম্মপ্রণালী জীবের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার অতি সুন্দর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। সত্যতে যে ফল আপন প্রয়াসে এবং কার্য্য দ্বারা লাভ করিতে পারা যাইত, তদ্‌পরবর্ত্তি যুগত্রয়ে তাহা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া আসিল, সুতরাং উদ্দেশ্যানুরূপ ফল লাভের অবস্থামত কর্ম্মও উদ্ভাবনা হইয়া গেল। যুগ পরিবর্ত্তন অর্থাৎ পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্ত্তন হেতু, তাহার মধ্যস্থ যাবতীয় পদার্থের অবস্থান্তর সম্ভাবনা এবং অবস্থাসঙ্গত কার্য্য প্রণালী প্রচলিত করাও সেইজন্য স্বাভাবিক নিয়ম।

সকল কার্য্যের উদ্দেশ্যই প্রকৃতি গঠন, যুগধর্ম্মের দ্বারা তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। প্রকৃতি গঠন করা কর্ম্মের কর্ম্ম নহে, কিন্তু তাহা না করিলেও হইবার নহে। কর্ম্মই প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের নিদান। যে কর্ম্মের চরম জ্ঞান ঈশ্বর, সে কর্ম্মে ঈশ্বরই লাভ হইবে এবং যে কর্ম্মে কেবল কর্ম্মবোধ অথবা ঈশ্বরবিরহিত জড়-ভাব থাকিবে তথায় ঈশ্বর লাভ যে হইবে না, একথা কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই।

আমরা যদ্যপি কর্ম্ম লইয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে স্বভাবতঃ গুণত্রয়ের কার্য্যবিশেষে উহা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে। রাজসিক এবং তামসিক কার্য্যে ঈশ্বর লাভ হয় না। সাত্ত্বিক কার্য্য স্বাভাবিক মাধুর্য্য-ভাবে পরিপূর্ণ; তন্নিমিত্ত সত্ত্বগুণযুক্ত কার্য্যেই ঈশ্বর লাভের আনুকূল্য করিয়া থাকে, কিন্তু কেবল কার্য্যের প্রতি মন আবদ্ধ রাখিলে উদ্দেশ্য বিকৃত হইয়া যায়। এ স্থানে উদ্দেশ্য কার্য্য, ঈশ্বর নহে, সুতরাং সত্ত্বগুণ সম্বন্ধীয় কার্য্য ঈশ্বর লাভ হইবার আশা বিদূরিত হইতেছে। যেমন, দান কার্য্য দ্বারা প্রকৃতিকে দয়া নামক সত্ত্বগুণ বিশেষ দ্বারা অভিষিক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, জগতের সমুদয় দুঃখ ও দুঃখীর ক্লেশ অপনীত করিয়া, কেহ কি দয়ার পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? অথবা কেহ চেষ্টা করিলে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন? কখনই না। বরং, এত প্রয়াসের ফলস্বরূপ অশান্তি আসিবার সম্ভাবনা; কিম্বা বিচারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকাণ্ড এবং ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্য বুঝিয়া তখন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর না করিলে শান্তি সঞ্চার হইবার উপায়ান্তর থাকে না। কখন বা আপনার শক্তিসঙ্গত কার্য্যকে বিশ্বের অনন্ত তুলনায় যথেষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক, আত্মাভিমানে অর্থাৎ তমোভাবের আবির্ভাব দ্বারা মন অভিভূত হইয়া যায়। এই প্রকার প্রত্যেক সাত্ত্বিক কার্য্যের পরিণামে দুই অবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে।

যদ্যপি কার্য্যের ফল এই প্রকারে পর্য্যবসান হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি গঠন করিবার পক্ষে বিষম প্রত্যবায় বটে। মনের এই দুরাবস্থা হইতে পরিত্রাণের উপায় ঈশ্বর-ভাব। এইজন্য যুগধর্ম্মের প্রত্যেক কর্ম্মের ফল বা উদ্দেশ্য ঈশ্বরে নিক্ষিপ্ত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

মনুষ্যেরা স্বধর্ম্মাচরণে লিপ্ত হইয়া যখন বিচার পূর্ব্বক কার্য্য কারণ জ্ঞান দ্বারা এই ভাব ধারণ করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার কর্ম্ম ফল বা কর্ম্ম ঈশ্বরেই প্রয়োগ করিয়া যেমন পুত্তলিকারা মনুষ্যদিগের ইচ্ছাক্রমে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত, অবস্থান্তরিত এবং ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার তাঁহাকে (ঈশ্বর) যন্ত্রী এবং আপনাকে যন্ত্রবিশেষ জ্ঞান করিয়া প্রশান্ত হৃদয়ে অবস্থান করিয়া থাকেন।

৬৩। যে ব্যক্তি যে গুণ প্রধান, তাহার তদ্রূপই কার্য্য হইয়া থাকে। এই গুণভেদের জন্য প্রত্যেক্ ব্যক্তির কার্য্যের সহিত প্রত্যেকের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এই নিমিত্ত সাধন কার্য্যে এক প্রণালীমতে সকলকে নিবদ্ধ রাখা যায় না।

মনুষ্যেরা যেমন দিন দিন নব নব ভাব শিক্ষা করিয়া ক্রমান্বয়ে মানসিক উৎকর্ষ লাভ করে, সাধন সম্বন্ধেও তদ্রূপ। যাহা যাঁহার ইচ্ছা, যে প্রক্রিয়া যাঁহার হৃদয়গ্রাহী হইবে, তাহাই যে তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে যেমন বর্ণপরিচয় হওয়া আবশ্যক এবং উহাই প্রথম অবলম্বনীয়, তেমনই সাধনের বর্ণমালা শিক্ষা না করিলে পরিণামে সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। যেমন ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কাহার নিকট দুই চারিটা শ্লোক অভ্যাস করিয়া মূর্খ সমাজে পণ্ডিত বলিয়া প্রতিষ্ঠান্বিত হন, সাধকশ্রেণীর মধ্যে স্বেচ্ছাচারী সাধকদিগের অবস্থাও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

সাধারণ পক্ষে সাধকেরা ত্রিবিধ শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীবিভাগ কেবল তাঁহাদের অবস্থার কথা। যেমন বিদ্যালয়ে নিম্ন শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত বালকের বিভিন্ন অবস্থার বিষয়, সাধকদিগের সাধন ফলেও সেই প্রকার হইয়া থাকে।

ঈশ্বর নির্ণয় করা, সাধকের প্রথম সাধন। যদিও সাধন প্রবর্ত্তাবস্থায়

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস না হইলে এতদূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, কিন্তু সে বিশ্বাস কেবল শাস্ত্রের লিখন এবং সাধুদিগের বচন দ্বারা জন্মিয়া থাকে।

ঈশ্বর নিরূপণ করিতে হইলে সাধকের প্রথম কার্য্য সৃষ্টি দর্শন। কারণ যদ্যপি কেহ কপিল কিম্বা কনদ অথবা বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কীর্ত্তি দেখিলেই সে সন্দেহ দুরীকৃত হইবে। সাঙ্খ্য-দর্শন প্রণেতা কপিল, কনদ কর্ত্তৃক বৈশেষিক-দর্শন এবং যোগবাশিষ্ট রামায়ণ বশিষ্ঠের পরিচায়ক; অথবা যদ্যপি কোন ব্যক্তির মহত্ব বা নীচাশয়তা নিরূপণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার বিবিধ গুণ বা দোষ কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। সুতরাং সেই ব্যক্তির কার্য্য আসিল, অর্থাৎ তিনি যে সকল সৎ বা অসৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অনুশীলন দ্বারায় সেই ব্যক্তিরই দোষ গুণ প্রকাশ হয়, ফলে তদ্দ্বারা তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়। এই নিমিত্ত ঈশ্বর নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে সৃষ্টি-দর্শন বা অধ্যয়ন করা সাধকের সর্ব্ব-প্রথম কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে।

ঈশ্বর আছেন কি না তাহা কে বলিতে পারেন? শাস্ত্রে দেখা যায় যে, তিনি বিশ্বেশ্বর এবং বিশ্ব-সংসার তাঁহারই সৃজিত, সুতরাং তিনি আছেন। সাধকেরাও সেই কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, কার্য্য থাকিলেই কারণ থাকিবেই থাকিবে, অর্থাৎ ধূম দেখিতে পাইলে অগ্নি অনুমিতি হবে, তাহার সন্দেহ নাই।

কার্য্য কারণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান অতি সহজেই উপার্জ্জন করা যায়। কারণ কর্ত্তা ব্যতীত কর্ম্ম হইতে পারে না। সেই জন্য যখন জগৎ রহিয়াছে, তখন ইহার সৃজনকর্ত্তা অবশ্যই আছেন, তাহার ভুল নাই।

এইরূপে জগদীশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে বিচার কার্য্য আরম্ভ হয়। অর্থাৎ তাঁহার প্রকৃত অবস্থা কি? তিনি বাস্তবিক ক্ষীরোদ-সাগরে বটপত্রস্থিত দুগ্ধপায়ী বালকরূপে অবস্থিতি করিতেছেন অথবা গোলোকে রাধাকৃষ্ণ রূপে বিরাজিত, কিম্বা নিরাকার, বাক্য মনের অগোচর দেবতা? তিনি বৃক্ষবিশেষ, প্রস্তরবিশেষ, জলবিশেষ, গিরিবিশেষ অথবা মনুষ্যবিশেষে সংগঠিত, কিম্বা এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য প্রকার অবস্থা আছে, ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া সাধকের দ্বিতীয় সাধন।

ঈশ্বর নির্ণয়কালীন যে কার্য্যকারণ উল্লিখিত হইয়াছে, এখানেও তাহাই

অবলম্বনীয়। কারণ, ঈশ্বরের কার্য্য ব্যতীত আর আমাদের কিছুই নাই। অতএব এই কার্য্য বা সৃষ্টি বিষমাসিত করা অদ্বিতীয় উপায়।

সৃষ্টি দ্বারা জড় ও জড়-চেতন পদার্থদিগকে বুঝায়। বৃক্ষ, জল, প্রস্তর, মনুষ্য, ইত্যাদি ইহাদের অন্তর্গত। এই পদার্থ সকল চিরস্থায়ী নহে। বৃক্ষ, অদ্য ফল ফুলে শোভিত, কল্য নীরস, পরদিবস ভস্মাকারে পরিণত। মনুষ্য প্রভৃতি সকল পদার্থই তদ্রূপ, কিন্তু যে আদি কারণে পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, তাহা ত্রিবিধাবস্থায় এক ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত জগতের উপাদান কারণ বা সৃষ্টিকর্ত্তাকে নিত্য, সত্য, অনন্ত এবং সৃষ্ট পদার্থ ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য বস্তু বলিয়া জ্ঞান করা হয়।

যখন এই প্রকারে এক নিত্য বোধ জন্মে, যখন জগৎ মিথ্যা বা মায়ার কার্য্য বলিয়া ধারণা হয়, তখন সেই সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের চরম সাধন নির্ব্বাণ। অর্থাৎ যে নিত্য পদার্থ হইতে মায়িক, জড়-চেতন দেহ লাভ হইয়াছে, তাহা বিচার দ্বারা জড়ে জড়-পদার্থদিগকে পরিণত করিলে সুতরাং চৈতন্যও আদি চৈতন্যে বিলীন হইয়া যাইবে।

মন ও বুদ্ধি স্বাভাবিকাবস্থায় দেহ অভিমানে অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়া থাকে। যখন এই মন দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট হয়, তখন তাহার অবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞান থাকিতে পারে না। যেমন, গভীর নিদ্রা আসিলে একেবারে আত্মবোধ বিলুপ্ত হইয়া যায়। কখন নিদ্রা আসিল এবং কতক্ষণ তাহার অবস্থিতি ও কোন সময়ে পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে, তাহা নিদ্রাগত হইবার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী সময় জ্ঞান ব্যতীত নিরূপণ করা যায় না। নির্ব্বাণ কালেও অবিকল সেই অবস্থা লাভ হইয়া থাকে।

এই শ্রেণীর সাধকদিগকে সৎপথাবলম্বী বলে। ইহাদের এক সত্য এবং নিত্য জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য্য নহে। সৎপথাবলম্বীরা এই প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া তাহা সাধন দ্বারা জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

কথিত হইল যে, "সৎ" মতাবলম্বীরা জগৎকে মায়া এবং অনিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, সুতরাং সংসারে লিপ্ত না হইয়া, আত্মা পরমাত্মাতে বিলীন করিবার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া থাকেন। দেহ হইতে আত্মা স্বতন্ত্র করিতে হইলে মন সংযম আবশ্যক। মন সংযমের নিমিত্ত পার্থিব সমুদায় পদার্থ

হইতে বিচ্ছিন্ন মন হওয়া কর্ত্তব্য, সুতরাং তথায় বৈরাগ্য আসিল। পরে আপন দেহ হইতেও মনকে স্বতন্ত্র করা অনিবার্য্য হইয়া আইসে।

যখন এই সাধন উপস্থিত হয়, তখন যে সকল দৈহিক ক্রিয়া, ভোজন, উপবেশন, শয়ন, শ্বাস, প্রশ্বাস, ইত্যাদি দ্বারা মনের চাঞ্চল্য হইবার অবশ্য সম্ভাবনা, তৎসমুদয় ক্রমে ক্রমে আয়ত্তে আনিবার জন্য নানাবিধ কার্য্য হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত যোগীরা হঠযোগ ও গণেশক্রিয়াদি দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে দেহ শুদ্ধ করিয়া থাকেন।

যোগশাস্ত্র মতে দেহ শুদ্ধ করিবার জন্য, অষ্টাঙ্গ যোগের উল্লেখ আছে। যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা শরীর নিরোগী হয় এবং সমাধি কালে অনন্তে মন বিলীন হইয়া নির্ব্বাণাবস্থা লাভ হইয়া থাকে।

সৎ-পথ দ্বারা সাধকের যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেবল একমাত্র জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞান কার্য্য কারণ দ্বারা উপস্থিত হইয়া থাকে। নতুবা তাঁহাদের অন্য কোন প্রকারে প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত থাকে না, তাঁহারা এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে নিরাকার, অজ্ঞেয়, সাক্ষী-স্বরূপ, কেবলাত্মা, বাক্য ও মনের অতীত তিনি, ইত্যাকার আখ্যা দ্বারা উল্লেখ করিয়া থাকেন।

যখন যে সাধকের এই অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই তাঁহাকে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী কহা যায়। সৎ-পথাবলম্বীরা ধর্ম্ম কর্ম্মের এই স্থানেই চূড়ান্ত জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত সৎ-পথাবলম্বীদিগের নিকট বৈদান্তিক মতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।

চিৎ-পথ বা জ্ঞানমার্গ। এই মতেও কার্য্য কারণ সূত্র অবলম্বন করা হয়, কিন্তু সৎ-পথাবলম্বীদিগের ন্যায় ইঁহারা কার্য্য বা সৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া কারণের পক্ষপাতী নহেন, কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয়; যদ্যপি কারণের নিত্যত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কার্য্যেরও নিত্যত্ব অস্বীকার করিবার হেতু কি? নিত্য হইতে অনিত্য বস্তু সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই। হয় সকলই নিত্য বলিতে হইবে, না হয় সকলই অনিত্য বলা কর্ত্তব্য। সৎ-মতে জগৎকে অনিত্য বা মায়া বলিয়া পরিত্যাগ করেন, চিৎ-মতে তাহার প্রতিবাদ করা হয়; কারণ যদিও জগৎ জড় এবং জড়-চেতন পদার্থের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হয় এবং স্থূল দর্শনে তাহা সিদ্ধান্তও করা যায়, কিন্তু জড়ের

ধ্বংস কোথায় ? পদার্থ অবিনাশী, ইহা প্রত্যক্ষ মীমাংসা। যদ্যপি জড় পদার্থ অবিনাশী হয়, তাহা হইলে ইহাকে নিত্য বলিয়া অবশ্যই পরিগণিত করিতে হইবে, সুতরাং সৎ-মতে জগৎ মিথ্যা বলিয়া যাহা কথিত হয়, তাহা খণ্ডন হইয়া যাইতেছে।

এই স্থানে সৎ-মতে আর একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে। এ প্রকার বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যের নিত্যত্ব কোথায় ? অদ্য এক ব্যক্তি জীবিত রহিয়াছে, কল্য সে আর নাই; এ স্থানে সেই ব্যক্তিকে নিত্য বলিয়া কিরূপে প্রতিপাদিত করা যাইবে ? নিত্য হইলে তাহার অন্তর্দ্ধান হওয়া উচিত নহে কিন্তু চিৎ-পথাবলম্বীরা বলিলেন যে, অন্তর্দ্ধান হইল কে ? মনুষ্যেরা স্থূলে—জড় এবং চেতন পদার্থের যৌগিকবিশেষ; জড় পদার্থ নিত্য, চৈতন্যও নিত্য; তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে অনিত্যত্ব কোন স্থানে হইবে ? আমি অদ্য যে জড়-চেতন পদার্থের দ্বারা সংঘঠিত হইয়াছি, জীবনান্ত হইলেও সেই জড়-চেতন পদার্থের দ্বারা সংগঠিত হইবে, তবে আমার ধ্বংস হইল কিরূপে ? কিন্তু একটী কথা আছে। যে আমি অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষ এক্ষণে আছি, সেই আমি পুনরায় হইব কি না, তাহা কেহ বলিতে সক্ষম নহেন, কারণ পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত সকলেই বিস্মৃত হইয়া যান। চিৎ-পথাব-লম্বীরা এই স্থানে মায়া কহিয়া থাকেন, অর্থাৎ সকলই সত্য, তথাপি এই গোলযোগ কোন মতে সাব্যস্থ হইবার নহে। যেমন মনুষ্য মাত্রেই এক-জাতীয় জড়-চেতন পদার্থ দ্বারা সংগঠিত হইয়াও সকলেই বিভিন্ন প্রকারে দৃষ্ট হইতেছে। ইহাকেই লীলা বা ভগবানের কুটিল সৃষ্টি কৌশল কহা যায়।

"চিৎ" মতে এই জন্য লীলা অবলম্বন করা সাধকদিগের অভিপ্রায়। যাহা কিছু সৃষ্ট পদার্থ, সকলই মহাকারণের মহাকারণ ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা জ্ঞান করেন। ভগবান্ হইতে যাহাদিগের সৃষ্টি, তাহারা সকলেই নিত্য এবং তাহা অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে তন্নিমিত্ত তাহাকে জড়োপাসনা কিম্বা মায়িক ভাব বলিয়া ঈশ্বরবিরহিত কার্য্য হইতে পারে না।

চিৎভাবের সাধকদিগের চরম উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, তাঁহার প্রতি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ইত্যাদি যে ভাব যাঁহার প্রবল, তাঁহারা তাহা দ্বারা তাঁহাকে সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, চিৎমতেও কার্য্য কারণ ভাব অবলম্বনীয়। সৎ মতে সাধক জড়ের কারণ পর্য্যন্ত গমন করিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিবার

উপায় উদ্ভাবন করেন, কিন্তু চিৎমতে তাহা নহে। এই মতাবলম্বীরা জড়-ভাব বা সৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া মহা-চৈতন্যে বা পরমাত্মার সহিত আপন চৈতন্য বা আত্মা সংযোগ করিয়া না দিয়া, সেই চৈতন্য রা[illegible] ভাবের ক্রীড়া আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। কেহ মাতৃভাবে তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রার্থনা করেন, কেহ তাঁ[illegible] স্তন্যসুধা পান ক[illegible]িবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন, কেহ [illegible] [illegible]র্শন করিয়া [illegible] ভাবে [illegible]র্থা করেন, কেহ বা গোপাল মূর্ত্তিতে ম[illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible]তে মধুর ভাবের ক্রীড়া করিয়া জীবন সার্থক করিয়া থাকেন।

আনন্দ পথ। চিৎপথের চরমাবস্থায় অর্থাৎ ভগবানের দর্শন লাভের পর ভক্তদিগের যে অনির্ব্বচনীয় ও অভূতপূর্ব্ব সুখোদয় হয়, তাহাকে আনন্দ কহে। আনন্দ পথ সেই জন্য দুই প্রকার। জ্ঞানানন্দ ও বিজ্ঞানানন্দ।

চিৎ-পথের চরমাবস্থায় উপনীত হইয়া রূপাদি সন্দর্শনে যে আনন্দ উপলব্ধি হয়, তাহাকে বিজ্ঞানানন্দ কহে এবং জড় চৈতন্য অর্থাৎ আমাদের স্বাভাবিকাবস্থায় চৈতন্যভাবে পুস্তক পাঠ কিম্বা বিজ্ঞানী সাধুদিগের নিকট শ্রবণ করিয়া যে আনন্দ লাভ করা যায়, তাহাকে জ্ঞানানন্দ বলিয়া কথিত হয়। যেমন, প্রস্তরের শ্রীকৃষ্ণ রূপ দেখিয়া অথবা মৃণ্ময়ী দুর্গা অর্চ্চনা দ্বারা আনন্দ লাভ করা যায়। সচরাচর আনন্দ মত দ্বারা এই প্রকার মূর্ত্তির উপাসনা বুঝাইয়া থাকে।

ঈশ্বরের একটী নাম সচ্চিদানন্দ। অর্থাৎ সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। সৎ শব্দে নিত্য, সত্য; চিৎ শব্দে জ্ঞান এবং আনন্দ শব্দে সুখ অথবা সঙ্কল্প এবং বিকল্পের বা প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির মধ্যবর্ত্তী অবস্থাকে কহা যাইতে পারে। যে ত্রিবিধ সাধন উল্লিখিত হইল, তাহা এই ভগবানের নাম দ্বারা অভিহিত হইতেছে।

সৎ, চিৎ এবং আনন্দ মতের অগণন সাধন প্রক্রিয়া আছে এবং সকল উপাসকই আপনাপন মতের উৎকর্ষ স্থাপন করিয়া থাকেন। সৎপথবালম্বীরা চিৎ এবং আনন্দ মতকে একেবারে গণনার অতীত করিয়া দেন; কিন্তু তাঁহাদের ইহা যা'রপরনাই ভ্রমের কথা। এই শ্রেণীর লোকেরা ঈশ্বর সাধনের প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন বলিয়া সাব্যস্থ করা যায়। কারণ নিরাকার সাধন প্রথমাবস্থার কথা। ইহা সাকার নিরাকার প্রবন্ধে সুদীর্ঘরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। আর যদ্যপি অব্যক্ত, অজ্ঞেয়, মনের

অতীত পদার্থই ঈশ্বরের অভিজ্ঞান হয়, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব একই কথা। যদ্যপি অপ্রাপ্য বস্তুই তিনি হন, তাহা হইলে সাধনের প্রয়োজন কি ? এবং ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিবার ফল কিছুই নাই।

যদ্যপি কেবল শান্তির নিমিত্ত ধর্ম্ম হয়, যদ্যপি মানসিক অবিচ্ছেদ সুখলাভই একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সংসারে সেইরূপ মন সংগঠন করিলে অসুখের কোন কারণ হইতে পারে না। সাংসারিক সুখের বিরাম আছে, বিচ্ছেদ আছে ; এইরূপ যদ্যপি কথিত হয়, তাহা হইলে মনের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল বলিতে হইবে। এক বস্তুতে দীর্ঘকাল তৃপ্তিলাভ হয় না, সুতরাং সর্ব্বদা নব নব ভাব আবশ্যক। এই রূপে মনের ধারণা জন্মাইতে পারিলে বিপদাগমনে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

ধর্ম্ম-শাস্ত্র পুস্তক নহে, রহস্য বা উপন্যাস নহে, ইহা প্রকৃত জীবনের সাধন কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে ; সুতরাং তাহার বিপরীত অর্থ ও ভাব প্রকাশিত হইতেছে।

সৎ, চিৎ ও আনন্দ পথ প্রকৃত পক্ষে কেহই স্বতন্ত্র নহে। উহা সাধকদিগের অবস্থার বিষয়। যেমন কোন ব্যক্তি কোন সাধু কিম্বা কোন মহাত্মার নাম শ্রবণ করিলেন। সাধু বা মহাত্মা এক্ষণে ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে অদৃশ্য বস্তু। অদৃশ্য হউক কিন্তু গুণাগুণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার অস্তিত্ব বোধ হইবে। সাধকের এই অবস্থাকে সৎ বলে। পরে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক যখন সাক্ষাৎকার হয়, তখন সাধকের সাধনাদির ফল, সিদ্ধাবস্থা লাভ করা বা চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান কহে। তদনন্তর বাক্যালাপ বা প্রয়োজন কথন। ইহাকে আনন্দ অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সঙ্কল্পিত হইয়াছিল, তাহা সেই মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইয়া যাইল ; তাৎপর্য্য এই, সাধন সম্বন্ধে প্রথমে ঈশ্বর দর্শনের জন্য সঙ্কল্প, তদ্‌পরে সাধন, সর্ব্বশেষে দর্শন এবং আনন্দ লাভ ; কিন্তু সৎ, চিৎ, আনন্দ, স্বতন্ত্র পন্থা বলিয়া পরিগণিত করিলে প্রকৃত ঘটনা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

"সৎ" মতে যাহা কথিত হইল, তাহাতে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ তিনি আকারবিহীন, অজ্ঞেয়, সাক্ষীস্বরূপ ও মন বুদ্ধির অতীত। অতএব এস্থানে ঈশ্বর লাভ হইবার কোন উপায় নাই। যদ্যপি অদৃশ্য অজ্ঞেয় বস্তুতে ঈশ্বর জ্ঞান করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার হেতু কি প্রদত্ত হইবে ? যাহা বুঝিব না, দেখিব না, তাহা বিশ্বাস করিব কেন ? এইজন্য সৎপথাবলম্বীরা যে নিরাকার ঈশ্বরের বৃত্তান্ত বলিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের

বলিবার এবং বুঝিবার দোষ। ঈশ্বর নিরাকার কিম্বা অজ্ঞেয় অথবা জীবের পরিণাম নির্ব্বাণ কি না, তাহা যাঁহারা সাধন করেন, উহা তাঁহারাই অবগত হইতে পারেন।

৬৪। যে ব্যক্তি যে ভাবে, যে নামে, যে রূপে, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর জ্ঞানে সাধন করিবে, তাহার ঈশ্বর লাভ হইবেই হইবে।

ঈশ্বর অনন্ত। তাঁহার ভাবও অনন্ত। এক একটী জীব সেই অনন্ত-দেবের অনন্তভাবের দৃষ্টান্তস্বরূপ। এই নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তির ভাব বিচার করিয়া দেখিলে, তাহাতে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে।

রামকৃষ্ণদেব এই কথা দ্বারা কি সুন্দর মীমাংসাই করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সাধন লইয়া চির-বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, কেহ তন্ত্রোক্ত সাধনের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া থাকেন, কেহ বেদান্ত মতের সাধনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, কেহ খৃষ্টান অথবা মুসলমান মতের সাধনই উত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং কেহ বা সকল ধর্ম্মের সার একীভূত করিয়া তাহাই সাধন করা সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান বলিয়া বিবেচনা করেন। যাঁহারা এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মতের পোষকতা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত রামকৃষ্ণদেবের মতের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য প্রত্যক্ষ হইতেছে। কারণ তাঁহার মত পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, "যাহার যে প্রকার 'ভাব',তাহাতে যদ্যপি এক ঈশ্বর বলিয়া তাহার ধারণা থাকে,তবে সেই প্রকার ভাবেই তাঁহার ঈশ্বর লাভ হইবে।" একথা অতি উচ্চ, সম্পূর্ণ হিন্দুশাস্ত্রসঙ্গত এবং যা'রপরনাই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভাব-সংযুক্ত কথা, তাহার কোন ভুল নাই।

অনেকে এই কথায় আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, "সকল মত সত্য নহে, বিশেষতঃ হিন্দুদিগের পুরাণ তন্ত্রাদি কাল্পনিক, বহু ঈশ্বরবাদব্যঞ্জক মত। তাহাতে বিশ্বাস করিলে কি প্রকারে ঈশ্বর লাভ হইবে? কারণ রূপাদি জড় পদার্থ-সম্ভূত। পুরাণ মতে সাধন করিলে জড়োপাসনা হইয়া যায়। জড়ের দ্বারা চৈতন্য লাভ হইতে পারে না।" পৌরাণিক সাকার সাধন মতের বিরুদ্ধে এইরূপ নানাপ্রকার বাদানুবাদ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং আজ কাল এ সম্বন্ধে নব্য শ্রেণীদিগের বিশেষ কুদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। যাঁহারা উপরোক্ত বিরোধী শ্রেণীর অন্তর্গত, তাঁহাদের জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ,কারণ জড়োপাসনা বলিয়া যাহা কথিত হয়, তাহা অপেক্ষা

ভাবান্তরের কথা আর কি হইতে পারে? উপাসনা করে কাহার? জড়-পদার্থের কিম্বা যাঁহার সেইরূপ, তাঁহার? যেমন, কৃষ্ণ উপাসনা। প্রস্তরের কৃষ্ণ উপাসনা করা হইতেছে। এস্থানে উদ্দেশ্য প্রস্তর, না কৃষ্ণ? প্রস্তর কখনও কৃষ্ণ নহেন। কৃষ্ণও প্রস্তর নহেন? প্রস্তর প্রস্তরই, কৃষ্ণ কৃষ্ণই, এই নিমিত্ত "যে এক ঈশ্বর বোধে" নিজ নিজ ভাবে ঈশ্বর সাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহার ঈশ্বর লাভ অবশ্যই হইয়া থাকে এবং সেইরূপ সাধনাই প্রকৃত সাধনা।

৬৫। মত পথ। যেমন এই কালী-বাটীতে আসিতে হইলে কেহ নৌকায়, কেহ গাড়ীতে এবং কেহ হাঁটিয়া আসিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পথে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি পরিশেষে একস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা যে ঈশ্বর লাভ হইয়া থাকে, তাহা সকলেরই এক।

সাম্প্রদায়িক মতের বিবাদ এই নিমিত্ত অতি অজ্ঞানের কথা। রামকৃষ্ণ-দেবের অভিপ্রায়ে, 'মতই পথ' অর্থাৎ যাহার যে ভাব, সেই ভাব পথ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকট গমন করিতে পারা যায়। এক্ষণে মত লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিলে পরিণাম ফলটা কি দাঁড়াইবে? অর্থাৎ উভয়েরই পথে দাঁড়াইয়া বিবাদ করা হইবে মাত্র। ইহাদের মধ্যে কেহই গন্তব্য স্থানে গমন করিতে পারিবেন না। "কালী বাটীতে" যাইতে হইবে, এই উদ্দেশ্য যাহার থাকিবে, তাহার পথের বিবাদে প্রয়োজন কি? পথ ত কালী-বাটী নহে।

এক্ষণে কথা হইতে পারে যে, যে পথে গমন করিলে "কালী-বাটীতে" গমন করা যাইবে, পথিক সেই পথে যাইতেছে কি না? দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইলে, ধাপার পথে গমন করিলে চলিবে না। এই নিমিত্ত, গন্তব্য স্থানের প্রশস্ত পথ স্বতন্ত্র। এ কথা সত্য, তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু উপমায় "কালী-বাটীর" ভাব মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহার দক্ষিণেশ্বরের "কালী-বাটীতে" যাইবার ইচ্ছা হইবে, তিনি যে কোন পথেই আসিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। যেমন কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইলে, সরকারী পাকা রাস্তা দিয়া নির্ভয়ে গাড়ী পাল্কী করিয়া

যে সময়ে ইচ্ছা, অনায়াসে গমন করা যাইতে পারে। এ পথটী অতি সুন্দর আর এক ব্যক্তি বালী হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন, তাঁহার পক্ষে কোন্ পথ অবলম্বনীয়? তিনি যদ্যপি গঙ্গা পার হইয়া যান, তাহা হইলে ৫ মিনিটে কালী-মন্দিরে যাইতে পারিবেন. কিন্তু গঙ্গা পার হইবার নানাবিধ প্রতিবন্ধক আছে। গাড়ী পাল্কী চলে না এবং পদব্রজে যাওয়াও যায় না। কলিকাতা-বাসীদিগের সহিত এই পথ মিলিল না। এক্ষণে বালীনিবাসীদিগের কি কলিকাতায় আসিয়া কালীবাটীতে যাইতে হইবে? তাহা হইলে তাহার যে কালী দর্শন হইবে, নদী পার হইয়া আসিলে কি সেই কালী দর্শন হইবে না? অবশ্যই হইবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞ লোকের কথায় নিজ পথ পরিবর্ত্তন করে, তাহা হইলে কেবল অনর্থক ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে এবং মন্দিরে গমনের কালবিলম্ব হইয়া যাইবে। যাঁহারা এ-মত ও-মত করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের এই প্রকার দুর্গতিই হয়, অর্থাৎ বালী হইতে কলিকাতা যগুপি তিন ক্রোশ হয় এবং কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বর তিন ক্রোশ হয়, তাহা হইলে সমষ্টিতে ছয় ক্রোশ পথ হইতেছে, কিন্তু বালী হইতে দক্ষিণেশ্বর এক পোয়া মাত্র। এক্ষণে জমা খরচ কাটিলে এই মূর্খ পথপরিবর্ত্তকের কপালে ৫।৬ ক্রোশ পথ অনর্থক ভ্রমণ করিয়া ক্লেশ পাইতে হইল। কেহ বলিতেও পারেন যে, "একা নদী বিশক্রোশ", কিন্তু আমরা বলি পারের কর্ণধার আছে। যদ্যপি একথা বলা যায়, সকল সময়ে কর্ণধার প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং ঝড় তুফানে নৌকা চলিবার উপায় নাই। আমরা বলি যে, সে সময়ে তাহার জন্য কলের জাহাজ প্রেরিত হইতে পারে। বিশেষতঃ সর্ব্বশক্তিমানের নিকট অসম্ভব কি? মনুষ্যের পক্ষে যাহা অসাধ্য অসম্ভব, সর্ব্বশক্তিমানের নিকট তাহা নহে। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং যে স্থানে, যে কেহ, যে ভাবে, যাহা করিতেছেন, বা যাহা কিছু বলিতেছেন, তাহা তাঁহার দৃষ্টির অন্তরাল হইতেছে না। তিনি অন্তর্যামী, যে কেহ মনে মনে অন্তরের মধ্যে যাহা কিছু ভাবনা করিতেছেন, ঈশ্বরের সম্বন্ধীয় হউক, কিম্বা তাহা নাই হউক, সে সকল কথা তাঁহার অগোচর হইবার নহে। তিনি ভাবময়। যে স্থানে যে কোন ভাবের কার্য্য হইতেছে, কিম্বা তাহার সূচনা হইতেছে, সে স্থানেও তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার কাহারও অধিকার নাই। তবে কি জন্য, যে কোন ভাবে, যে কোন নামে, যে কোনরূপে তাঁহাকে ডাকিলে সাধকের মনোরথ পূর্ণ না হইবে?

৬৬। মুক্তিদাতা এক জন। সংসারক্ষেত্রে যাহার যখন বিরাগ জন্মে, অন্তর্যামী ভগবান্ তাহা জানিতে পারেন এবং তিনি সেই সাধকের ইচ্ছাবিশেষে ব্যবস্থা করিয়া দেন।

৬৭। কলিকালে ঈশ্বরের "নাম"ই একমাত্র সাধন।

৬৮। অন্য অন্য যুগে অন্য প্রকার সাধনের নিয়ম ছিল। সে সকল সাধনে এ যুগে সিদ্ধ হওয়া যায় না, কারণ জীবের পরমায়ু অতি অল্প, তাহাতে মালোয়ারী (ম্যালেরিয়া) রোগে লোকে জীর্ণ, শীর্ণ; কঠোর তপস্যা কেমন করিয়া করিবে? এই নিমিত্ত নারদীয় ভক্তি মতই প্রশস্ত।

রামকৃষ্ণদেব দেশ কাল পাত্রের প্রতি যে লক্ষ্য রাখিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। প্রকৃত মহাপুরুষ দিগের এইটীই বিশেষ লক্ষণ। তাঁহারা প্রকৃতির (Nature) বিরুদ্ধে কখন কোন কার্য্য করিতে পারেন না। কারণ, মনুষ্য-স্বভাব এবং প্রকৃতি, এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তাহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বিলক্ষণ অবগত আছেন। মহাপুরুষেরা বিজ্ঞান শাস্ত্র পাঠ না করিয়া নিজ দর্শন ফলে এ সমস্ত স্বতঃই শিক্ষা করিয়া থাকেন।

যাঁহারা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের পোষকতা করেন, যাঁহারা স্বধর্ম্ম, স্ব-জাতীয় রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়া, বিজাতীয় ভাবে দীক্ষিত হইতে প্রশ্রয় লইয়া থাকেন, তাঁহাদের এই নিমিত্ত স্বভাব বিকৃতির ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে, যে কুলে বা জাতিতে কিম্বা যে দেশে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই কুল, জাতি, দেশের এবং নক্ষত্র রাশিচক্রের তাৎকালীক অবস্থাক্রমে তাহার শরীর ও স্বভাব নিঃসন্দেহে গঠিত হইয়া থাকে। যেমন আমরা যখন পৃথিবীবক্ষে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি, তখন আমরা এক অবস্থায় থাকিতে পারি। আমি অদ্য যেরূপে রহিয়াছি, কল্য তাহাই ছিলাম এবং আগামী কল্যও বোধ হয় তাহাই থাকিব। আমার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সংঘটন হইতেছে না। এস্থানে আমার শরীর মন, দেশ কালের অনুযায়ী সমভাবে থাকিতে পারিল। এক্ষণে দেশ কাল পরিবর্ত্তন করিয়া দেখা হউক; শরীর মনের কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে কি না?

যদ্যপি পৃথিবী হইতে ৩০ ক্রোশ ঊর্দ্ধ দেশে গমন করা যায়, তথায় শ্বাস প্রক্রিয়ার বিপর্য্যয় উপস্থিত হওয়ায় তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। ইহার কারণ কি? পৃথিবীর উপরিভাগে যে পরিমাণ ভূবায়ু আছে, ৩০ ক্রোশ উপরে তাহার অস্তিত্ব সত্বে, অপেক্ষাকৃত অতি বিকীর্ণাবস্থায় অবস্থিতি করে। পৃথিবীবক্ষে প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চ স্থানে, সাড়ে সাত সের গুরুত্ব পতিত রহিয়াছে। এই গুরুত্ব সুতরাং পদার্থের আকৃতি বা আয়তন-বিশেষে, অত্যল্প বা অত্যধিক পরিমাণে লক্ষিত হয় এবং তাহারা তদনুসারে আকৃতি বা গঠন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন এক সের তুলা পিঁজিয়া ইচ্ছা-মত বিস্তৃত করা যায় এবং তাহাকে পুনরায় সঙ্কাপিত করিলে, একটী ক্ষুদ্র সুপারির আকারে পরিণত করা যাইতে পারে। সঙ্কাপন বা গুরুত্বের তার-তম্যে আকৃতির তারতম্য হয়। সেইরূপ, পৃথিবীর উপরিস্থিত যে সকল পদার্থদিগকে আমরা যেরূপে সচরাচর দেখিতে পাই, তাহা ভূবায়ুর সঙ্কাপন ক্রিয়া এবং উত্তাপ শক্তির দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে।

যাঁহারা পার্ব্বত্য প্রদেশের উচ্চতম শৃঙ্গোপরে ডাল-ভাত রন্ধন করিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, তাহা সিদ্ধ করিতে অতিরিক্ত সময়ের আবশ্যক হইয়াছে। তাহার কারণ, ভূ-বায়ুর সঙ্কাপন ক্রিয়ার লাঘবতা মাত্র। উপরি উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে, পদার্থেরা সম্পূর্ণ অবস্থার বশীভূত। অবস্থাবিশেষে তাহারা নানাপ্রকার অবস্থা বা রূপান্তরে পরিণত হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা পদার্থ মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং তাহারাও অবস্থার দাস। তাহাদের অধীনে অবস্থা নহে। এই নিমিত্ত, রামকৃষ্ণদেবের দেশ কাল পাত্র কথাগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া পরিচালিত হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

এক্ষণে, পুনরায় আর একটী আপত্তি উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা। উপরে যে উপমা প্রদত্ত হইল, তাহার সহিত জাতি, কুলের, দেশের কি সম্বন্ধ দেখান হইল? প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, হিন্দু খৃষ্টান হইয়া কত উন্নতি করিয়া ফেলিতেছে, কেহ কেহ পৈতৃক মত বিশ্বাস ও ধারণা করা কুসংস্কারের কথা বলিয়া খাদ মলা বাদ দিয়া, তাহার বিশ্বাস প্রমাণ-খাঁটী করিয়া তাহাতেই পরাকাষ্ঠা-লাভ করিতে পারিতেছে এবং কেহ বা পুরাকালীন সমুদায় শাস্ত্রাদি পণ্ডিতদিগের কল্পনাপ্রসূত নীতিবাক্য বলিয়া সাব্যস্থ পূর্ব্বক তাহাতেই প্রবীণ হইয়া যাইতেছে। কৈ, এস্থলে ত স্বধর্ম্ম, স্বজাতী, স্বকুল, দেশের আচার ব্যবহার বিবর্জ্জিত হইয়া নিয়গামী হইতেছে না? বরং সেই সেই

লোকেই দশ জনের নিকট মান্য গণ্য ও খ্যাতি-স্তুত প্রাপ্ত হইতেছেন। এ অবস্থায় উন্নতি না বলিয়া অবনতি বলা যাইতে পারে না।

স্থূল দৃষ্টিতে এ কথা স্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলে এই আকাশ পাতাল প্রভেদের কারণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

যে ব্যক্তি স্বজাতি পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকে সে জন্য কোন দোষ প্রদান করা যায় না। কারণ তাহার স্বভাবই তাহাই। সে ব্যক্তির স্বভাব লক্ষ্য করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে প্রতিবন্ধক জন্মান কাহার কর্ত্তব্য নহে। কারণ পাত্র বিচারে সে ব্যক্তি সেই বিশেষ কার্য্যের উপযুক্ত হইতেছে।

হিন্দুকুলে জন্মিলেই হিন্দু হইতে পারে না এবং হিন্দু পিতার সমুদয় গুণ সন্তানে গমন করিতে পারে না। যদিও কুলগত ভাবের নানাবিধ প্রমাণ আছে, কিন্তু কুল ত্যাগের দৃষ্টান্তেরও অপ্রতুল নাই। সে স্থলে, যদ্যপি হিন্দু পিতার পুত্র বলা না যায়, তাহা হইলে তাহাকে জারজ বলা হয় কিন্তু একথা কতদূর অসঙ্গত, তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে হইবে না। অতএব হিন্দু পিতারই বা যবন কিম্বা ম্লেচ্ছ স্বভাবের সন্তান কিরূপে জন্মে? পিতা মাতার শোণিত শুক্রের ক্রিয়া কিরূপেই বা বিলুপ্ত হইয়া যায়?

আমরা যে সূক্ষ্ম কারণের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই;—সন্তানের সূত্রপাত হইবার সময়ে, পিতা মাতার যে প্রকার স্বভাব থাকিবে, সন্তানেরও অবিকল সেই স্বভাব হইবেই হইবে। এই নিমিত্ত আমাদের রতি শাস্ত্রে এত বিধির সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন যাঁহারা সেই শাস্ত্র মতে পরিচালিত হইতেন, তাঁহাদের সেইরূপ ধর্ম্ম-প্রিয় সন্তানও জন্মিত। এক্ষণে প্রায় সকলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট, আপন ইন্দ্রিয় চরিতার্থই একমাত্র মানসিক স্পৃহা, সুতরাং সন্তানদিগের স্বভাবে বৈষম্য দোষ ঘটিতেছে, কিন্তু হিন্দুর শোণিত শুক্রের অস্তিত্ব বিধায় বিকৃত ভাবের প্রাবল্য হইতেছে। যতক্ষণ কারণ অর্থাৎ অবস্থা উপস্থিত থাকিবে, ততক্ষণ সকলকেই তাহার বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইবে; সুতরাং এ ক্ষেত্রে দেশ কাল এবং পাত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। দেশ বলিবার হেতু এই যে, ভারতবর্ষের এক্ষণে এই বিকৃত অবস্থা ঘটিয়াছে, কালের দ্বারা সেই বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট করিতেছে এবং পাত্রের দ্বারা তাৎকালীক লোকদিগকেই গণনা করা যাইতেছে। আবার এমন অবস্থা হইতে পারে, যখন বিজাতীয় ভাব সকল বিলুপ্ত হইয়া স্বজাতীয় বলিয়া ধারণা হইবে,

তখন ক্রমে ক্রমে তাহাদের সন্তান সন্ততির স্বভাবও পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। সে সময়ে তাহাদের পিতা প্রপিতামহের স্বধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। তখন তাহাদের স্বতন্ত্র শ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে। সুতরাং দেশ কাল পাত্রের প্রাবল্য সর্ব্বত্রে অনিবার্য্য।

রামকৃষ্ণদেব এই নিমিত্ত, যাহার যাহা ইচ্ছা, সেই ভাবে, সেইরূপে, ঈশ্বর সাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সকলেই যদ্যপি কালের বশীভূত হইয়া গেল, তাহা হইলে পাত্রের দোষ কি? সে যে অবস্থায় যাহা করিবে, তাহা তাহার অবস্থাসঙ্গত। সে অবস্থা বিপর্য্যয় করা কাহার অধিকার নাই। যাহাদের এই সূক্ষ্ম জ্ঞান জন্মে, তাহারা আর সাম্প্রদায়িক ভাবে সকলকে আহ্বান করিতে পারে না। যেমন বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর বালক বর্ণশিক্ষার ছাত্রকে আপন শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে বলিলে পাত্র দোষ ঘটে এবং তাহাকে উন্মাদ বলিয়া গণনা করা যায়; ধর্ম্মক্ষেত্রেও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

বর্ত্তমান বিকৃত কালে বিকৃত পাত্র বিধায় পুরাকালীন কোন সাধন-বিশেষ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। কারণ, তাহা সকলের পক্ষে বিজাতীয়। হিন্দু রাজত্বের পতন কালের পর যাবনিক ভাব ক্রমে ক্রমে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ হিন্দুভাব বিকৃত করিয়াছিল। তদনন্তর ম্লেচ্ছভাব তাহাতে যোগ দিয়া হিন্দু, যবন এবং ম্লেচ্ছ, এই তিনের সংযোগে এক প্রকার যৌগিক ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে। এস্থলে বিশুদ্ধ কিছুই নাই, এমন অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? যেমন, কেহ বহুমূত্র, শ্বাসকাশ ও বিকার প্রভৃতি নানাবিধ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলে চিকিৎসক জ্বরের ঔষধ কিম্বা বহুমূত্রের মুষ্টিযোগ অথবা শ্বাসকাশের ব্যবস্থা করিতে পারেন না। তখন তিনি সেই রোগীর অবস্থা অর্থাৎ পাত্র বিচারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উত্তেজক ঔষধ নিরূপণ-পূর্ব্বক বলকারক আহারের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকেন। কলিকালের "নারদীয়-প্রণালী" অর্থাৎ "নামে বিশ্বাস" তদ্রূপ। "ম্যালেরিয়া" অর্থাৎ দেশের প্রকৃতি এত দূষিত যে, শতকরা শতকরা-বিকৃত স্বভাবাপন্ন হইয়াছে। কাহার শক্তি নাই, তপ জপ করিবার সামর্থ্য কোথায়? কোথায় সে শক্তি, যদ্দারা হঠযোগের আসন করিতে পারিবে? কোথায় সে মস্তিষ্ক, যাহা অনন্ত-দেবের ভাব ধারণা করিয়া ধ্যানস্থ হইতে পারিবে? কোথায় সে বিশুদ্ধ হিন্দুর বিশ্বাস, যাহাতে ঈশ্বরের অলৌকিক-রূপ দর্শন পূর্ব্বক ভক্তিপ্রেমে গদগদ হইয়া পৌরাণিক মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারিবে? এই নিমিত্ত

কেবল ঈশ্বরের নামই স্ব স্ব ভাবে অবলম্বন করা বর্ত্তমান কালের একমাত্র উপায়।

৬৯। ঈশ্বর দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকিলে, নামে বিশ্বাস এবং সদসৎ বিচার করা কর্ত্তব্য। এই সাধন পথ অবলম্বন ব্যতীত, কাহার পক্ষে ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব নহে।

"সদসৎ বিচার" করিবার কথা বলিয়া রামকৃষ্ণদেব যে কি গুরুতর সাধনের পথে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছেন, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। যদ্যপি সদসৎ বিচার করিতেই হয়, তাহা হইলে কত বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন। কারণ, পৃথিবী মধ্যে সৎ এবং অসৎ কি,তাহা নিরূপণ করা সামান্য জ্ঞানের কর্ম্ম নহে। হয় ত, অনেকে মনে করিতে পারেন যে, সৎ এবং অসৎ বলিলে ভাল মন্দ দুইটা কথা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভাল মন্দ বিচার করিয়া উঠা, যারপরনাই দুরূহ ব্যাপার।

কেহবা বলিতে পারেন, কাহাকে ভাল বলে এবং কাহাকেই বা মন্দ বলে? জগতে এমন কিছুই নাই যাহাকে ভাল এবং মন্দ বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। মনুষ্যদিগের মধ্যে ভাল মন্দ কে? স্থূল দৃষ্টিতে যাহাদিগকে সামাজিক নিয়মাতীত কার্য্য করিতে না দেখা যায়, তাহাদের ভাল বলিয়া পরিগণিত করা যায় এবং যাহারা সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহারা মন্দ শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইয়া থাকে।

সামাজিক নিয়ম দেশ বিশেষে স্বতন্ত্র। কোন দেশে মদ্য পান করা নিষিদ্ধ। তথাকার লোকেরা সুরাপান করিলে মন্দ বলিয়া উল্লিখিত হয় এবং কোন দেশে তাহার বিশেষ ব্যবহার থাকায় সুরাপান দোষে কেহই মন্দ শব্দে অভিহিত হয় না। কোথাও স্ত্রী স্বাধীনতা আছে। তথাকার স্ত্রীলোকেরা পরপুরুষের অঙ্গস্পর্শ করিলে দোষ হয় না কিন্তু কোথাও কাহার প্রতি কটাক্ষ করিলে তাহারা ব্যভিচারী দোষে পঙ্কিল হইয়া থাকে। কোথাও পুরুষেরা পরনারি গমনে মন্দ লোক বলিয়া কথিত হয়, কোথাও তাহাতে সুনাম বিলুপ্ত হয় না।

পদার্থদিগের মধ্যেও ঐরূপ। দুগ্ধ পরম উপকারী দ্রব্য এবং অহিফেন প্রাণ নাশক মন্দ পদার্থ। চন্দন সুগন্ধি-দ্রব্য এবং বিষ্ঠা শরীরানিষ্ট-কারক মন্দ পদার্থ।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা হউক, উপরোক্ত দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে ভাল মন্দ কে? কোন মনুষ্য কিম্বা পদার্থকে ভাল মন্দ বলা যাইতে পারে

না। কারণ, তাহারা অবস্থার দাস। যে ব্যক্তি সুরাপান কিম্বা পরদার গমনাপরাধে মন্দ হইয়া যাইতেছে, তাহারা সেই সেই অবস্থায় পতিত না হইলে কখন এরূপ কার্য্য করিতে পারিত না। যেমন চুম্বক ও লৌহ একত্রিত হইলে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায়, কিন্তু যে পর্য্যন্ত উহারা পরস্পর সন্নিহিত না হয়, সে পর্য্যন্ত মিলন কার্য্য হয় না। ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাহার স্বভাব প্রকাশ পায় না। চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিয়া লয়, ইহা পদার্থগত শক্তি নহে। যদ্যপি সেই শক্তি অপসৃত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই চুম্বকের আর চুম্বকত্ব থাকে না। মনুষ্যদিগের পক্ষেও তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে। মনুষ্যের অপরাধ কি? আধারের দোষ গুণ কি? মনুষ্যই বিদ্যাশক্তি বলে পণ্ডিত, আবার সেই মনুষ্য বিদ্যা বিহীনে মূর্খাধম বলিয়া পরিচিত হয়। যাহার মধ্যে যে ভাব থাকে, তাহার দ্বারা সেইরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে অধারের ভাল মন্দ কি? যদ্যপি ভাবের ইতর বিশেষ করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। ভাব কোথা হইতে আইসে? মনুষ্যদিগের দ্বারা সৃজিত হয়, অথবা তাহাদের জন্মিবার পূর্ব্বে সে ভাবের সৃষ্টি হইয়া থাকে? ভাবের সৃষ্টি অগ্রেই হইতে দেখা যায়। নিউটনের মস্তিষ্কে বিশ্বব্যাপিনী আকর্ষণী শক্তির ভাব উদ্দীপন হইবার পূর্ব্বে আপেল পতিত হইয়াছিল, অর্থাৎ আকর্ষণী শক্তি নিউটন কর্তৃক সৃজিত হয় নাই। তাঁহার পূর্ব্বেই তাহা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। স্ত্রী পুরুষে সন্তান উৎপত্তি হয়, তাহা ইহাদের ইচ্ছাধীন নহে; সন্তানোৎপত্তির কারণ পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়া আছে।

বিষ এবং অমৃতও তদ্রূপ। অবস্থাবিশেষে, দুগ্ধ অমৃতবৎ এবং অবস্থা-বিশেষে, অহিফেণও অমৃতবৎ কার্য্য করে। অবস্থাবিশেষে দুগ্ধ বিষ এবং অবস্থাবিশেষে অহিফেণও বিষবৎ হইয়া দাড়ায়। ইহা দ্বারা পদার্থের দোষ গুণ হইতেছে না, কেবল ব্যবহারের ব্যতিক্রমে ভাল মন্দ ফল উৎপাদন হয় মাত্র।

যদ্যপি ভাল মন্দ না থাকে, তবে ভাল মন্দ বিচারের প্রয়োজন কি? কথিত হইল, পদার্থদিগের ব্যবহারের ব্যতিক্রমে ভাল মন্দ কার্য্য উপস্থিত হয়। যদ্যপি প্রত্যেক পদার্থের ব্যবহার জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা কোন চিন্তা হইতে পারে না। যে অহিফেণের ব্যবহার জানে, সে তাহার অমৃত গুণই লাভ করে। যে সর্পের ব্যবহার জানে, সে তাহাদিগকে

লইয়া ক্রীড়া করে। যে সুরার গুণ জানে, তাহার নিকট সুরার বিকৃত ফল ফলে না; যে নারীর সহবাস সুখ বুঝিয়াছে, তাহার তাহাতে চিন্তার বিষয় কি ?

ভাল মন্দ বিচার অর্থে, যে দেশে যে সময়ে এবং যে কেহ যেরূপ অবস্থায় পতিত হইবে, তাহার পক্ষে এই ত্রিবিধ জ্ঞান সামঞ্জস্য হইয়া কার্য্য হওয়া উচিত। তাহা হইলে সর্ব্ব বিষয়ে শুভজনক হয়।

৭০। বিচার দুই প্রকার, অনুলোম এবং বিলোম। যেমন খোল ছাড়িয়ে মাঝ। ইহাকে বিলোম এবং মাঝ হইতে খোল, ইহাকে অনুলোম কহে। যেমন বেল। ইহা খোশা, শাস, বিচি, আঠা এবং শিরার সমষ্টি; এই বিচারকে বিলোম বলে। অনুলোম দ্বারা উহাদের এক সত্ত্বায় উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

অনুলোম বা সংশ্লেষণ এবং বিলোম বা বিশ্লেষণকে বুঝাইয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব অনুলোম এবং বিলোম দ্বারা সাধন করিতে আদেশ করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করিয়া বিচার করিতে থাকিলে তাহাকে কখন ভ্রমে পতিত হইতে হয় না, অথবা কেহ তাহাকে সাম্প্রদায়িক ধৰ্ম্মে আবদ্ধ করিতে পারে না। কারণ তাঁহার নিকটে যে কোন ভাব পতিত হইবে, তিনি তাহার স্থূল কার্য্য দেখিয়া কখন তদ্দ্বারা পরিচালিত হইবেন না। তিনি সেই স্থূল ভাব বিশ্লিষ্ট করিয়া অবশ্য দেখিয়া লইবেন। যাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, তিনি জানেন যে, এক অদ্বিতীয় ভগবান্ ব্যতীত, দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় কেহ নাই। জগতের একমাত্র অদ্বিতীয় তিনি; সুতরাং যাহা কিছু সৃষ্টি হইতেছে, বা হইয়াছে, অথবা হইবে, সকলের কারণ তিনি। যে কেহ, কোন ভাবের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে চাহিবেন, সদসৎ বিচারকের নিকট তাহার স্থান হইবে না। তিনি দেখিবেন যে, আমারই দ্বারা ঈশ্বরের, আর এক ভাবের কার্য্য হইতেছে। ইহাই চরম-জ্ঞানের অবস্থা কিন্তু সাধনকালীন সদসৎ বিচার দ্বারা বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। সাধকেরা চতুর্দ্দিকে নানা বর্ণের সম্প্রদায় দেখিতেছেন। এই বাঙ্গালা দেশে হিন্দুদের সহস্রাধিক সম্প্রদায় রহিয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে নূতন নূতন

ভাবের কাহিনী শ্রবণ করা যায়। সকলেই বলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মের ন্যায় সিদ্ধ পথ আর হয় নাই এবং সকলেই আপন ধর্ম্মের অসাধারণ ভাব দেখাইতেও ত্রুটি করিতেছেন না। ঐ সকল ভাবে কত ভাঙ্গা দল হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাঁহারাও আপনাপন ভাবের উৎকর্ষতা লইয়া প্রতিধ্বনি করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপও দেখা যাইতেছে। সাধকের মনে সহসা এই চিন্তা আসিতে পারে যে, কোন্ ধর্ম্মটী সত্য? হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, না ইহাদের ভাঙ্গা দল? এ স্থানে মীমাংসা হইতে পারে না। কোন্ ধর্ম্মটী সত্য অর্থাৎ সেই সাধকের পক্ষে কোন ভাব অবলম্বনীয়, তাহা বিচার করিয়া দেখিয়া লইতে হইবে। যখন এইরূপ বিলোম এবং অনুলোম প্রক্রিয়ার দ্বারা অগ্রসর হওয়া যায়, তখন সেই সাধকের যে ভাব প্রবল, সেই স্থানে গিয়া মন প্রাণে শান্তি ও আনন্দ উপস্থিত হইয়া যাইবে। সে অবস্থার কথা, সাধক অগ্রে তাহা বুঝিতে অশক্ত হইয়া থাকেন।

যে সাধক সদসৎ বিচার করিয়া ধর্ম্ম সাধন করেন, তাঁহার উপরোক্ত দ্বিবিধ উপকার হইবার সম্ভাবনা, অর্থাৎ এক ক্ষেত্রে, এক ঈশ্বর এবং তাঁহারই সমুদয় ভাব অবগত হওয়া এবং আর এক স্থলে, তাহার নিজের ভাবের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করা, সাধকের এই দুইটীই প্রয়োজন, তাহার সন্দেহ নাই।

৭১। শিয়ালদহে গ্যাসের মসলার ঘর। কোন জায়গায় পরী, কোথাও মানুষ, কোথাও লণ্ঠন, কোথাও ঝাড়; কত রকমে গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে। গ্যাস কোথা হইতে আসিতেছে, কেহ তাহা দেখিতে পাইতেছে না। যে কেহ স্থূল আলো পরিত্যাগ করিয়া কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে, সে সেই শিয়ালদহের গ্যাসের ঘরকেই অদ্বিতীয় ঘর বলিয়া জানিবে।

এই দৃষ্টান্তে, রামকৃষ্ণদেব স্থূল দর্শন হইতে বিচার দ্বারা যে এক অদ্বিতীয় কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার উপমা দিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত আলোকের ছোট বড় কিম্বা আধার লইয়া ইতর বিশেষ করা যায় অর্থাৎ কোন স্থানে বহুমূল্যের ঝাড় কিম্বা অন্য কোন আধারে জ্বলিতেছে, আধার বিচারে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে কিন্তু আলোকের উপাদান কারণ বিচার

করিলে সেই শিয়ালদহের অদ্বিতীয় গ্যাস ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না।

৭২। সদসৎ বিচারকেই বিবেক বলে। বিবেক হইলে বৈরাগ্যের কার্য্য আপনি হইয়া যায়। বৈরাগ্য সাধনের স্বতন্ত্র কিছুই প্রয়োজন নাই। কারণ বৈরাগ্য সাধন বা সন্ন্যাসী হওয়া যা'রপরনাই কঠিন কথা। বৈরাগ্য হইলে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিতে হয় কিন্তু কলিকালে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করা যায় না। হয় ত অনেক কষ্টে কামিনী ত্যাগ হইতে পারে, কিন্তু অপর দিক হইতে কাঞ্চন আসিয়া আক্রমণ করে। যদ্যপি কামিনী পরিত্যাগ করিয়া কাঞ্চনের দাস হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার বৈরাগ্য সাধন হয় না। যদিও এক্ষেত্রে এক দিকে বৈরাগ্য হইল, কিন্তু তাহাতে আরও অপকারের সম্ভাবনা। কামিনীত্যাগী বলিয়া মনে মনে অহঙ্কারের এতদূর প্রাবল্য হয় যে, যে অহং বিনাশের জন্য বিবেক বৈরাগ্য, তাহারই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে ; সুতরাং ইহার দ্বারা উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং কামিনীকাঞ্চন সংলিপ্ত মূঢ় বিষয়ী অপেক্ষা সহস্রগুণে নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

৭৩। সন্ন্যাসী বা ত্যাগী হইলে অর্থোপার্জ্জন কিম্বা কামিনী সহবাস করা দূরে থাক, যদ্যপি হাজার বৎসর সন্ন্যাসের পর স্বপনে কামিনী সহবাস হইতেছে বলিয়া জ্ঞান হয় এবং তদ্দ্বারা রেত পতন হইয়া যায়, অথবা অর্থের দিকে আসক্তি জন্মে, তাহা হইলে এত দিনের সাধন তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

সন্ন্যাসীর কঠোরতার পরিচয় চৈতন্যদেব ছোট হরি-

দাসে দেখাইয়াছেন। হরিদাস স্ত্রীলোকের হস্তে ভিক্ষা লইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত মহাপ্রভু তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে গৈরিক বসন পরিধান, ব্যাঘ্র চর্ম্মে উপবেশন এবং একতারা লইয়া চক্ষু মুদিত করিতে পারিলেই সন্ন্যাসী সাজা যায়। অথবা দুঃখে পড়িয়া অর্থ বা স্ত্রী পুত্র না থাকায় ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য বৈরাগী হওয়া অপেক্ষা সুলভ প্রণালী আর দ্বিতীয় নাই। পাঁচ জনের স্কন্ধে উদর পূর্ণ হইবে, ভাল মন্দ আহারের জন্য সদাই ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া স্ত্রী সহবাস করিবে, তথাপি তাহারা সন্ন্যাসী। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব বলিতেন—

৭৪। সংসারে থাকিয়া সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সন্ন্যাসী অর্থেই "ত্যাগী", তখন লোকালয়ে তাহাদের স্থান নহে।

৭৫। দুই প্রকার সাধক আছে। বাঁদরের ছানার স্বভাব এবং বিড়াল ছানার স্বভাব। বাঁদরের ছানা জানে যে, তা'র মাতাকে না ধরিলে সে কখন স্থানান্তরে লইয়া যাইবে না, কিন্তু বিড়াল ছানার সে বুদ্ধি নাই। সে নিশ্চয় জানে যে, তা'র মাতার যেখানে ইচ্ছা, সেই খানে রাখিবে। সে কেবল "ম্যাও ম্যাও" করিতে জানে। সন্ন্যাসীসাধক বা কর্ম্মীদিগের স্বভাব বাঁদর ছানার ন্যায় অর্থাৎ আপনি খাটিয়া খুটিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে এবং ভক্ত সাধকেরা ঈশ্বরকে সকল কার্য্যের অদ্বিতীয় কর্ত্তা জানে তাঁহার চরণে আত্ম-নিবেদন করিয়া বিড়াল ছানার ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে।

৭৬। জ্ঞান এবং ভক্তি অর্থাৎ নিত্য এবং লীলাভাব অথবা আত্মতত্ত্ব এবং সেব্য সেবক ভাব। এই পথ লইয়া

সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া থাকে। জ্ঞানীরা বলে যে, জ্ঞান ভিন্ন অন্য মতে ঈশ্বর লাভ হয় না এবং ভক্তিমতে তাহারই প্রাধান্য কথিত হইয়া থাকে। চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "জ্ঞান" পুরুষ। সে বহির্বাটীর খবর বলিতে পারে এবং "ভক্তি" স্ত্রীলোক, সে অন্তঃপুরের সমাচার দিতে সক্ষম। এই নিমিত্ত জ্ঞানপথে যে জ্ঞানোপার্জ্জন হয়, তাহা সম্পূর্ণ স্থূল ও বাহিরের কথা। ভক্তদিগের মতে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

ফলে, রামকৃষ্ণদেবও তাহাকেই স্থূল ভাব কহিতেন, কিন্তু জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিবার হেতু কি? তিনি বলিতেন;—

৭৭। জ্ঞান অর্থে জানা এবং বিজ্ঞান অর্থে বিশেষ রূপে জানা। এই বিজ্ঞানের পর অর্থাৎ ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সাধকের মনের ভাব যেরূপে প্রকাশিত হয়, সেই কার্য্যকে ভক্তি বলে। ইহাকে শুদ্ধজ্ঞানও কহা যায়। এই "শুদ্ধ-জ্ঞান" এবং "ভক্তি" একই কথা। ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

সাধারণ ভাবে ভক্তিকে জ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে। জ্ঞানে ঈশ্বর শ্রুতি-গোচর মাত্র থাকেন, কিন্তু বিজ্ঞানে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া মনের সাধে তাঁহার সহিত সহবাস সুখ সম্ভোগ করা যায়, সুতরাং জ্ঞানীর এবং ভক্তের অবস্থা সম্পূর্ণ প্রভেদ হইয়া যাইল। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বর বাক্য মনের অগোচর, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যাইবে কিরূপে? একথা অসম্ভব, যুক্তির অগোচর এবং ন্যায় মীমাংসার "অধিকার" ভুক্ত নহে। ভক্তির কথা বাস্তবিক তাহাই। ঈশ্বরের কার্য্য অনন্ত, মনুষ্যের ন্যায়-যুক্তির অতীত, তাহার কোন ভুল নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি কি করিতে অশক্ত এবং কি করিতে পারদর্শী, তাহা মনুষ্য স্থির করিতে পারিলে, তাহারাও স্বতন্ত্র ঈশ্বর হইয়া যাইতেন। তাঁহাকে ডাকিলে তিনি কিরূপে উপাসকের

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তাহা উপাসক ব্যতীত অন্যের জ্ঞাত হইবার অধিকার নাই।

জ্ঞানীরা ঈশ্বরের সৃষ্টি বিসমাসিত করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া যে স্থানে আর কিছুই বলিবার অথবা উপলব্ধি করিবার থাকে না, তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া নিরস্ত হইয়া থাকেন, অথবা যিনি সাধন করিতে চাহেন, তিনি আপন দেহকে বিচার দ্বারা পাঁচে পাঁচ মিশাইয়া দিতে অভ্যাস করেন। যখন তাঁহারা আপনাকে অর্থাৎ স্থূলদেহ বিচার দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিতে কৃতকার্য্য হন, তখন মন বুদ্ধি আর তথায় থাকিতে পারে না। যেমন, কোন পাত্রে জল আছে। পাত্র ভগ্ন করিয়া দিলে জল অবশ্যই পতিত হইয়া যাইবে। সেই প্রকার দেহ লইয়া মন বুদ্ধি। দেহ-বোধ যাইলে তাহার অস্তিত্ব বোধও বিলুপ্ত হইবে। যেমন গভীর নিদ্রাকালে আত্মবোধ, মন, বুদ্ধি কোথায় থাকে, কাহারও সে জ্ঞান থাকে না। জ্ঞানীর নির্ব্বাণ-সমাধিও তদ্রূপ। তাঁহার তখন "আমি" ও "ঈশ্বর জ্ঞান" থাকে না। পৃথিবী ও স্বর্গ জ্ঞান থাকে না। নিদ্রাগত ব্যক্তি কি জানিতে পারেন যে, আমি ঘুমাইতেছি? কিম্বা কোন্ স্থানে ঘুমাইতেছি, অথবা ঘুমাইয়া কি সুখশান্তি লাভ হইতেছে? জ্ঞানীর সমাধি অবস্থাতেও সেই প্রকার ঘটিয়া থাকে। এই নিমিত্ত ঈশ্বরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় না, কিন্তু ভক্তির তাহা উদ্দেশ্য নহে। ভগবান্ নিশ্চয় আছেন, এই বিশ্বাসে তাঁহার দর্শন প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল-প্রাণে ডাকিলেই অন্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু সর্ব্বশক্তিমান্ ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া দেন। এই স্থানে ভক্তেরা জ্ঞানীদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন, কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাহারও খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন।

৭৮। ভক্তেরা যখন যেরূপ দর্শন করেন, তাহা তাঁহাদের চরম নহে। কারণ, সে অবস্থা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। দেহ রক্ষা করিতে হইলে আহারের প্রয়োজন এবং অনাহারে থাকিলে দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়। উহা ভগবানের নিয়ম। যাঁহারা ভগবানের রূপ লইয়া অবিচ্ছেদে কালহরণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের একুশ দিনের অধিক দেহ থাকিতে পারে না। দেহান্ত হইয়া যাইলে তাঁহাদের যে কি অবস্থা হয়,

তাহা কাহারও বলিয়া দিবার শক্তি নাই। দেহ-বিচারে জ্ঞানীর নির্ব্বিকল্প সমাধি হওয়া এবং ভক্তের এই অবস্থা একই প্রকার।

অথবা যগুপি ভক্তের দেহ বিনষ্ট না হয়, তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের অদর্শন হইয়া থাকে। তখন দেহে মন পতিত হয় এবং দৈহিক কার্য্য হইতে থাকে। দেহে মন পতিত হইলে অন্যান্য পদার্থ-বোধও জন্মে। যখন দেহে এবং বহির্জগতে মনের সংস্রব বিচ্যুত হইয়া থাকে, তখন তাঁহার অবস্থা বাক্যের অতীত, তাহার সন্দেহ নাই। সেই অবস্থায় দ্বৈতজ্ঞান থাকে না। যেমন পুস্তক পাঠ কালে মনের ত্রিবিধ কার্য্যসত্ত্বে, যথা—(১) আমি পাঠ করিতেছি, (২) শব্দার্থ এবং (৩) তাৎপর্য্য জ্ঞান, এতদ্ব্যতীত আনুসঙ্গিক অন্যান্য অবস্থাও ভূরি ভূরি আছে, পাঠক সকল বিষয় বিস্মৃত হইয়া তাৎপর্য্য জ্ঞানে নিমগ্ন থাকে, অর্থাৎ আহারকালীন যেমন ভোজ্য পদার্থদিগের রসাস্বাদনে মনের সম্পূর্ণ ভাব দেখা যায়, কিম্বা কোন প্রিয়বন্ধুর সহিত রসালাপে বিভোর হইলে অন্য কোন ভাব থাকে না; সেই প্রকার ভগবানের প্রতি কার্য্য করিয়াও আত্ম-বিস্মৃতি জন্মে। সে অবস্থাও জ্ঞানীদিগের নির্ব্বিকল্প সমাধির ন্যায়। যেমন নিদ্রাভঙ্গের পর পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী সময়ের দ্বারা মধ্যবর্ত্তী ঘোর নিদ্রার অজ্ঞেয়কাল নিরূপিত এবং উপলব্ধি হয় কিন্তু বর্ণনা করা যায় না, জ্ঞানীদিগের নির্ব্বিকল্প সমাধি এবং ভক্তদিগের ঈশ্বর দর্শনও তদ্রূপ।

যগুপি এ কথা বলা হয় যে, জ্ঞানীদিগের সহিত ভক্তদিগের অবস্থার প্রভেদ আছে, এক পক্ষে কিছুই নাই এবং আর এক পক্ষে রূপাদি দর্শন ও কার্য্যাদি জ্ঞান আছে, তখন "এক" কেমন করিয়া বলা যাইবে? জ্ঞানে শান্তি, অশান্তি, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি দ্বৈতভাব বিবর্জ্জিত। ভক্তিতে, আনন্দ সুখ শান্তি আছে। তখন উভয়ের এক অবস্থা হইবে কিরূপে? ইহাকেই রামকৃষ্ণদেব স্থূলে প্রভেদ কহিতেন।

এক্ষণে মীমাংসা করিতে হইবে, শান্তি, সুখ এবং আনন্দ কাহাকে বলে? ভক্তদিগের তাহা থাকে কি না?

আমরা সংক্ষেপে এই বলিতে পারি যে, প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীতাবস্থার নাম সুখ, শান্তি ও আনন্দ। যেমন, অর্থাভাবে দুঃখ ভোগ হইতেছে। এক্ষণে, মনের জ্ঞান বা প্রবৃত্তি অর্থে রহিয়াছে। যখনই

অর্থ লাভ হয়, তখনই মনের পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তন হওয়ায় অজ্ঞান অথবা নিবৃত্তি কহা যায়। তাহার এই সময়ের অবস্থাকে আনন্দ, সুখ বা শান্তি বলিয়া কথিত হয়, অথবা যখন অর্থ ছিল না, তখন তাহার মনের প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা কেবল অর্থের জন্য ছিল, অর্থলাভ হইলে সে বাসনা কোন্ সময়ে কিরূপে কোথায় অদৃশ্য হইয়া একপ্রকার ভাবের উদয় করিয়া দেয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ইহাকে আনন্দ বলে; অর্থাৎ সঙ্কল্প ও বিকল্পের মাঝামাঝি অবস্থাই আনন্দের প্রকৃত স্বরূপ।

ভক্তেরও সেই অবস্থা হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত ভগবানের সাক্ষাৎলাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত বাসনা বা প্রবৃত্তি কিম্বা আসক্তি থাকে। তাহার পর দর্শন কালে যে অবস্থা হয়, তাহাতে আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় কার্য্য হইতে থাকে। আত্মজ্ঞান লইয়া বিচার করিলে ভক্তদিগকে জ্ঞানী-দিগের ন্যায় একপ্রকার অবস্থাসম্পন্ন বলিয়া সাব্যস্থ করা যাইতে পারে। পৃথিবীতে যত উপাসক হইয়াছেন, আছেন ও হইবেন, তাঁহারা সকলেই এই দুই অবস্থায় পরিভ্রমণ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। যদিও কথিত হইয়াছে যে, প্রত্যেকের স্বতন্ত্রভাব, কিন্তু কাহার উদ্দেশ্য প্রভেদ হইতে পারে না। যেমন—

৭৯। গৃহস্থেরা একটা বড় মৎস্য ক্রয় করিয়া আনিল, কেহ ঐ মৎস্যটীকে ঝোলে, কেহ ভাজিয়া, কেহ তেলহলুদে চড়্চড়ী করিয়া, কেহ পোড়াইয়া, কেহ ভাতে দিয়া ও কেহ অম্বলে ভক্ষণ করিল। এস্থানে মৎস্য এক, কিন্তু ভাবের কত প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

৮০। এক ব্যক্তি কাহার পিতা, কাহার খুড়া, কাহার জ্যেঠা, কাহার মামা, কাহার মেসো, কাহার পিসে, কাহার ভগ্নিপতি, কাহার শ্বশুর, কাহার ভাসুর, ইত্যাদি। এস্থলে ব্যক্তি এক অদ্বিতীয়, কিন্তু তাহার ভাবে অসীম প্রকার প্রভেদ রহিয়াছে।

৮১। যেমন জল এক পদার্থ। দেশভেদে, কালভেদে

এবং পাত্রভেদে নামান্তর হয়। যেমন, বাঙ্গালায় জলকে বারি নীর বলে, সংস্কৃতে অপ্ বলে, হিন্দিতে পাণি বলে, ইংরাজিতে ওয়াটার ও একোয়া বলে। কাহার কোন কথা না জানিলে তাহা কেহ বুঝিতে পারে না কিন্তু জানিলেও ভাবের ব্যতিক্রম হয় না।

সেইরূপ ব্রহ্মের অনন্ত নাম এবং অনন্ত ভাব। যাহার যে নামে, যে ভাবে তাঁহাকে ভাবিতে ভাল লাগে, সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকিলে ঈশ্বর লাভ হয়। অনন্ত ব্রহ্মের রাজ্যে কোন বিষয়ের চিন্তা হইতে পারে না অথবা কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

৮২। যে তাঁহাকে সরল বিশ্বাসে অকপট অনুরাগে মন প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিবে, তিনি তাহার অতি নিকট হইয়া থাকেন।

৮৩। অজ্ঞান্তে ডাকিলে অথবা না ডাকিলেও তিনি তাহাকে কৃপা করেন, কিন্তু অবস্থাভেদে কার্য্যের তারতম্য হয়।

৮৪। যদ্যপি কাহার সাধনের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তিনি তাহার সদ্‌গুরু সংযোজন করিয়া দেন। গুরুর জন্য সাধকের চিন্তার প্রয়োজন নাই।

৮৫। বকল্‌মা অর্থাৎ ভগবানের প্রতি আত্ম-সমর্পণ করা অপেক্ষা সহজ সাধন আর নাই।

যখন যে প্রকার সময় উপস্থিত হয়, সেই সময়োপযোগী হইয়া মনুষ্যেরা পরিচালিত হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত কোন সমাজ চিরকাল এক নিয়মে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

অতি পূর্ব্বকালে হিন্দুরা বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী এবং স্বাধীনচেতা ছিলেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতে যে প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছিলেন,

সামাজিক কার্য্যেও তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সমরপ্রিয় ছিলেন, সুতরাং ভুজবলের বিক্রমের ভূরি ভূরি প্রশংসা ইতিহাস অদ্যাপি গান করিতেছে। শিল্প, বাণিজ্য, পদার্থবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান সভ্যতম জাতিদিগের মধ্যেও অদ্যাপি দেখা যাইতেছে না। ফলে, কি উপায় দ্বারা মনুষ্য প্রকৃত মনুষ্য হইতে পারে, তাহার যাবতীয় কারণ তাঁহারা অবগত ছিলেন। পরে সময়ের চক্রে তাঁহাদের মধ্যে অধর্ম্মাচরণ প্রবেশ করিয়া ক্রমে বীর্য্যহীন করিয়া ফেলিল। তখন কি শারীরিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল বিষয় শিথিল হইতে লাগিল। ক্রমে দেহ এবং মনের উপর তাঁহাদের যে নিজ নিজ অধিকার ছিল, তাহা চলিয়া গেল, সুতরাং সকলে মনের দাস হইয়া পড়িলেন। দেহের উপর মনের অধিকার স্থাপন হওয়াই আর্য্যদিগের প্রথম পতন। তদ্দ্বারা রিপুদিগের প্রাবল্য হওয়া সূত্রে, কাম, লোভ, আপনপর জ্ঞান, দ্বেষ, হিংসার প্রশ্রয় পাইতে লাগিল। ক্রমে ভ্রাতৃদ্বেষ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন ভগবান্ হিন্দুদিগের তাৎকালীক অবস্থানুসারে যবনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

যবনরাজের অধিকার স্থাপিত হইলে যাবনিক ভাবের বহুল বিস্তার হওয়ায় হিন্দু ভাবের যাহা কিছু ভগ্নাবশিষ্ট ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে অপনীত হইয়া তৎস্থানে যাবনিক ভাব প্রবেশ করিয়া হিন্দু আধারে হিন্দু এবং যবনের মিশ্রিত ভাবের কার্য্য হইতে আরম্ভ হইল, সুতরাং হিন্দুসমাজেরও প্রচুর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ক্রমে আহার, বিহার, আদান, প্রদান, ধর্ম্ম এবং নীতি শিক্ষা, স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিল।

এইরূপে হিন্দু এবং যাবনিক ভাবের যৌগিকে হিন্দুসমাজ দীর্ঘকাল একাবস্থায় থাকিয়া যে আকারে পরিণত হইল, তাহার সহিত বিশুদ্ধ হিন্দু ভাবের কোন সংস্রব রহিল না।

যবনাধিকারের পর আমরা বর্ত্তমান ম্লেচ্ছাধিকারের অন্তর্গত হইয়াছি। এক্ষণে আমরা ত্রিবিধ অর্থাৎ হিন্দু, যবন এবং ম্লেচ্ছভাবের যৌগিক ও মিশ্রিত জাতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছি। আমরা মুখে হিন্দুজাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে বাস্তবিক বিশুদ্ধ হিন্দুর কোন ভাবই নাই বলিলে অধিক বলা হয় না, তাহা থাকিবারও নহে।

---

* যোগবলে দেহ এবং মনকে আপন অধীনে আনয়ন করা যায়।

যাবনিক সময়ে আমাদের যে প্রকার রীতি নীতি, দেশাচার, কুলাচার, সামাজিক নিয়ম এবং ধর্ম্মশিক্ষা ছিল, তাহার প্রায় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা কালক্রমে ঘটিয়া যাইবে। হিন্দু, যবন এবং ম্লেচ্ছ, এই তিন কালে আমাদের যে যে প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান অবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায় প্রদত্ত হইবে।

হিন্দুরাজত্ব কালে ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কথিত আছে, কার্য্যবিশেষে আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি চারি বিভাগে ন্যস্ত ছিলাম। ব্রাহ্মণেরাই বিশেষরূপে ধর্ম্মসাধন এবং আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। তাঁহারা তপশ্চারণ ব্যতীত অন্য কার্য্য করিতেন না কিন্তু ক্ষত্রিয়াদিরা স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিয়াও ধর্ম্মশিক্ষা পক্ষে কিছুমাত্র ঔদাস্যভাব প্রকাশ করেন নাই।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা দূরে থাকুক, এমন কি শূদ্রাধম গুহক চণ্ডালের ধর্ম্মনিষ্ঠা ভাবের প্রচণ্ড পরাক্রম ভগবান্ রামচন্দ্রকে সখা সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছিল। ধর্ম্ম-ব্যাধের উপাখ্যান সকলেরই জ্ঞাত বিষয় এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তেরও অপ্রতুল নাই।

হিন্দুদিগের পূর্ব্বে অন্য কোন জাতি ধর্ম্মসাধন পক্ষে এরূপ অগ্রসর হয় নাই। এই নিমিত্ত ধর্ম্মের বর্ণমালা হইতে তাহার চরম শিক্ষা পর্য্যন্ত, অতি সুন্দররূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্র। এই ত্রিবিধ শাস্ত্রে, জড় জগতের স্থূল পদার্থ ও নানাবিধ শক্তি হইতে উহাদের মহাকারণের মহাকারণ স্বরূপ ঈশ্বর পর্য্যন্ত উপাসনা পদ্ধতি এবং তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া সাধকেরা যেরূপে আনন্দ সম্ভোগাদি করিয়া থাকেন, তাহার যাবতীয় বৃত্তান্ত পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলির প্রথমভাগে উপরোক্ত বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্রের বিশেষ প্রচলন ছিল, কিন্তু যাবনিক ভাব সংস্পর্শ হইবার পর, বৈদিক-ভাব ক্রমে হ্রাস হইয়া পুরাণ এবং তন্ত্রের ভাবের আভাস মাত্র ছিল। এই সময়ে তমোগুণের প্রাবল্য বিধায় তন্ত্রের বীরাচার ভাবের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সুতরাং বৈদিক মতে তপশ্চারণ এবং পুরাণ সম্বন্ধীয় ক্রিয়া কলাপের প্রতি বিশেষ আস্থা ছিল না।

যবন অধিকারের অবসান কালে চৈতন্য প্রভু পৌরাণিক ভাবের পুনরুদ্ধা-

রের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। সে সময়ে জগাই মাধাই নামক দুইটী ব্রাহ্মণের বিবরণ সর্ব্বজন-জ্ঞাত-বিষয়। তাহারা যে প্রকার তীব্রবেগে চৈতন্য-দেবের ভক্তদিগকে আক্রমণ করিতে যাইত, ইতিহাস তাহার অদ্যাপি সাক্ষ্য দিতেছে। জগাই মাধাইয়ের যে প্রকার স্বভাব এবং ধর্ম্ম-দ্বেষী-ভাব অবগত হওয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে তখনকার লোকের সেই প্রকার বিকৃত প্রকৃতি উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া বিখ্যাত। যবন রাজত্বকালে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মজ্ঞান কতদূর ছিল, জগাই মাধাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ব্রাহ্মণের যখন এইরূপ দুর্গতি হইয়াছিল, তখন অন্য বর্ণের যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি ভয়ানক অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সময়ে পৌরাণিক দুর্গাদির পূজার স্থানে, ঘেঁটু, মনসা, শীতলা, বাবাঠাকুর, পঞ্চানন্দ, সত্যপির, মাণিকপির, প্রভৃতির বিশেষ সমাদর হইয়া পড়ে। যাহা হউক, এসময়েও ধর্ম্মশিক্ষা একেবারে বিরল হয় নাই।

বর্ত্তমান ম্লেচ্ছ রাজ্যাধিকারের সময়ে ধর্ম্ম লোপ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখনকার স্বভাব তিন ভাবের যৌগিক, তাহা ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। যবনেরা সময়ে সময়ে হিন্দুধর্ম্ম বলপূর্ব্বক বিলুপ্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, ধর্ম্মশাস্ত্র নষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং অনেক হিন্দুকেও মুসলমান করিয়া লইয়াছে, কিন্তু ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় কৌশল করিয়া ধর্ম্ম লোপ করিবার কোন উপায় অবলম্বন করে নাই।

আজকাল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া অনেকে চীৎকার করিতেছেন বটে, স্থানে স্থানে নূতন নূতন ধর্ম্ম সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য দেখিলে বিষাদিত হইতে হয়। ঈশ্বর অবিশ্বাস করা এখনকার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। নাস্তিক হইতে পারিলেই পণ্ডিত হওয়া যায়। যাঁহারা শিক্ষিত, উন্নত, পদান্বিত, সাধারণের সম্মানিত এবং রাজসভায় প্রতিষ্ঠাপন্ন, তাঁহাদের মুখে নাস্তিকতার দৃষ্টান্ত ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বিশ্বাসের কথা শ্রবণ করা যায় না। যবনদিগের সময়ে বেদের বিশেষ আদর না হউক, হতাদরের কিম্বা দুর্দ্দশার কোন কথা শ্রবণ করা যায় নাই, কিন্তু বর্ত্তমান কালে তাহার চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। যে বেদ ব্রাহ্মণ * অর্থাৎ অধিকারী ব্যতীত স্পর্শ করা নিষিদ্ধ

* ব্রাহ্মণের ব্যতীত যে কাহারও বেদাধ্যয়ন করিবার অধিকার ছিল না, তাহার বিশেষ কারণ ছিল এবং তাহা অদ্যাপিও আছে। বেদ অতি গুরুতর শাস্ত্র। বেদাঙ্গ, অর্থাৎ

ছিল, সেই বেদের প্রণব, ধোপা, কলু, মেতর, মুচিতেও উচ্চারণ করিয়া বেড়া-ইতেছে। যে বেদ হিন্দুর চক্ষে সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ বলিয়া প্রতীতি হয়, যে বেদের প্রণব উচ্চারণ করিবামাত্র চিত্ত স্থির হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি উপস্থিত হইয়া থাকে, সেই বেদের এই দুর্গতি! যে বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে সত্বগুণাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন, তমোগুণী ম্লেচ্ছেরা সেই বেদের টীকা টিপ্পনী করিয়া দিতেছেন! যে বেদ শিক্ষার জন্য বেদাঙ্গ এবং বেদান্ত দর্শনের সহায়তা আবশ্যক, সেই বেদ হাড়ি, শুঁড়ী, ম্লেচ্ছ-ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিতেরা পাঠ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা যম নিয়ম * প্রভৃতি নিয়মে পরিচালিত হইয়া বেদাধ্যয়ন করিতেন, সেই বেদ ভোগী বিলাসী সংসারী দাসত্ব সূত্রে গ্রথিত হইয়া শূকর ও গোমাংস এবং সুরাদি পান করিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন! ইহাকে এক্ষণে বেদের দুর্গতি ভিন্ন আর কি বলা যাইবে?

বেদ অপেক্ষা পুরাণের অতি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। কোথাও

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ; এবং ষড়্‌দর্শন যথা,—বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত। এই সকল শাস্ত্রে যিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিতেন, তাঁহারই বেদে অধিকার জন্মিত। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরাই পুরুষানুক্রমে এই নিয়মে চলিতেন, সুতরাং তাঁহাদের সন্তানেরাই কুলধর্ম্মানুসারে বেদ পাঠ করিবার যোগ্যতালাভ করিতে পারিতেন। তাঁহারা বাল্যাবস্থা হইতে পিতা মাতা এবং সংসারের অন্যান্য বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিতেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা এত অধিক শাস্ত্র অল্প সময়ে শিক্ষা করিতে পারিতেন। ক্ষত্রিয়েরা বেদ পাঠ করিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহাদের রণবিদ্যা শিক্ষা করিতে সমুদায় সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত। তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিতেন এবং ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম শাস্ত্রের সুলভ প্রণালী প্রদর্শন করাইয়া দিতেন। বৈশ্যেরা বাণিজ্য-ব্যবসায় জীবন গঠন করিতেন এবং শূদ্রেরা ত্রিবর্ণের দাসত্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। ফলে, যাঁহার যে কার্য্য, তিনি তাহাই করিতেন। সে সময়ে, কার্য্যের তারতম্যে বর্ণের প্রভেদ ছিল। এখনকার ন্যায় তখন কেহ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। শূদ্র দাস্যবৃত্তি ছাড়িয়া ব্রাহ্মণের আসন গ্রহণ করিতে লোলুপ হইতেন না, অথবা ব্রাহ্মণ পর্ণ কুটীর এবং বৃক্ষের বাকল পরিধান ও ফলমূল ভক্ষণ করা ক্লেশকর জ্ঞানে বিলাসী ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচরণ করিতেন না, কিম্বা মস্তিস্ক চালনা না করিয়া হীন শূদ্র জাতিদিগের ন্যায় নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্ক হইয়া থাকিতে চাহিতেন না।

* যম অর্থে ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষমা, ধ্যান, সত্য কথন, হিংসা ও অপহরণ না করা এবং নিয়ম অর্থে স্নান, মৌনাবলম্বন, উপবাস, যজ্ঞ, ইন্দ্রিয় সংযম, গুরু শুশ্রূষা ইত্যাদি।

বেদের * কিয়ৎ পরিমাণের আদর আছে, কিন্তু পুরাণকে কল্পিত গ্রন্থ বলিয়া, ধর্ম্ম-জগৎ হইতে ইহার স্থান উঠিয়া যাইবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে কলরব হইতেছে। কেহ বা দয়া করিয়া পুরাণের আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যা প্রকাশপূর্ব্বক আর্য্যীয় মর্য্যাদা সংরক্ষণার্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন। অবতার স্বীকার করা এক্ষণে মূর্খের কর্ম্ম। দেবদেবীর নিকটে মস্তকাবনত করা কিম্বা উপকরণাদি সহকারে পূজা করাই এখন কুসংস্কারের কথা বলিয়া সকলের ধারণা হইয়াছে।

তন্ত্র ও পুরাণের সকল কথাই অবিশ্বাসমূলক। আর্য্য-ঋষিগণ যে আমাদিগকে কুপথে ফেলিবার জন্য ভণ্ডামী করিয়া গিয়াছেন, ইহাই এখনকার চলিত মত।

সুতরাং বেদ, তন্ত্র এবং পুরাণের আর মান সম্ভ্রম নাই। যাঁহার যাহা ইচ্ছা হইতেছে, তিনি এক একজন নূতন নূতন ধর্ম্মপ্রদর্শক হইয়া উঠিতেছেন। যেমন, কাহার এক ছটাক জমি নাই, একটী করপ্রদ প্রজা নাই, তিনি মহারাজ চক্রবর্ত্তী; অথবা যেমন বিদ্যাশূন্য বিদ্যানিধি, তেমনই সাধন-ভজন বিহীন এখনকার সিদ্ধপুরুষ। ঈশ্বর কি বস্তু যিনি জানিলেন না, শাস্ত্রের সহিত যাঁহার সম্বন্ধ স্থাপন হইল না, সাধন কি বুঝিয়া দেখিলেন না, বিবেকী এবং বৈরাগী হইয়া যাঁহার বিবেক বৈরাগ্য জ্ঞান জন্মিল না, তিনি ধর্ম্মজগতের নেতা হইয়া দাঁড়াইতেছেন!

ঈশ্বরের পূজা উঠিয়া গেল, ঈশ্বরের সেবা অপনীত হইল, তাহার স্থানে মনুষ্য-পূজা প্রচলিত হইয়া গেল। বেদ, পুরাণের পরিবর্ত্তে স্বকপোল-কল্পিত শাস্ত্রের বিধান হইল। এমন অবস্থায় ধর্ম্ম লোপ হইয়াছে না বলিয়া আর কি বলিব?

বেদ, তন্ত্র এবং পুরাণ বিষমাসিত করিয়া তাৎপর্য্য বাহির করিয়া দেখিলে, ঈশ্বর উপাসনার এক অদ্বিতীয় প্রণালী প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাকে ঈশ্বরের লীলা কহে। লীলা দ্বিবিধ। আমরা ও আমাদের দশদিকে যাহা কিছু দেখিতে পাই, ইহারা সকলেই নিত্য, সুতরাং নিত্য বস্তুর লীলা বা প্রকাশ-মাত্র। ইহা বেদান্তর্গত এবং অবতার ও নিত্যের অন্যান্য বিকাশ, যাহা তন্ত্র এবং পুরাণ শাস্ত্র বিহিত কথা। তন্ত্রকে এই উভয়বিধ লীলার যৌগিকও বলা যায়।

---

* ইহার অন্তভাগ উপনিষদাদি নির্দ্দেশ করা গেল।

প্রথম প্রণালী দ্বারা জড়জগৎ পর্য্যালোচনা করিয়া "ইহা তিনি নহেন" এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ক্রমে চলিয়া যাইতে হয়; অর্থাৎ, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ অতিক্রম করিয়া মহাকারণে উপনীত হইলে তথায় জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয় ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতির বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। এই অবস্থাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি কহে। বেদ মতে সাধন ভজনের ইহাই শেষ কথা।

সময়ে সময়ে ভগবান্ মনুষ্যাদি নানাবিধ রূপধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীর কল্যাণের নিমিত্ত প্রকটিত হইয়া থাকেন। সেই সকল অবতারদিগের পূজা অর্চ্চনা ও গুণ গান করা দ্বিতীয় প্রণালীর উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত দুই মতের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, প্রথমের ভাব পরব্রহ্মে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি এবং দ্বিতীয়ের মর্ম্ম তাঁহার সহিত সম্ভোগ করা।

বর্ত্তমান কালে এই প্রকার কথা কেহ বিশ্বাস করিতে চাহেন না। ঈশ্বর আবার দেখা যায়? এ অতি মূর্খের কথা। ইত্যাকার ভাবে সকলেই শিক্ষিত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত হইয়াছে যে, অনেকে বেদপুরাণের অভিনব অর্থ প্রকাশ করিয়া আর্য্যখ্যাতি পুনরুদ্ধার করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। যে শ্রেণীর লোকেরা অবতার অস্বীকার করেন, তাঁহাদের বুঝাইবার জন্য অবতারের বিকৃত অর্থ রচনা করা হইতেছে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম অবতার, ইহাই পৌরাণিক কথা। কেহ অর্থ করেন যে, কৃষ্ণ বলিয়া এমন কেহ ছিলেন না, তবে কৃষ্ণ অর্থে "যিনি পাপ অপনীত করেন," তাঁহাকে কৃষ্ণ বলা যায়। পাপ অপনোদন কর্ত্তা ভগবান্, সুতরাং কৃষ্ণ শব্দে ভগবান্। অর্থের তাৎপর্য্য তাহাই সত্য বটে, কিন্তু বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিলে পুরাণ শাস্ত্রের কোন মর্য্যাদা থাকে না। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান কালে বেদ পুরাণের অতি ভীষণাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। হিন্দু সন্তান দেবতা মানে না, ঠাকুর দেখিলে প্রস্তর কিম্বা কর্দ্দম খণ্ড বলিয়া উপহাস করে। অধিক কথা কি বলিব, পৌরাণিক বা তান্ত্রিক ব্রাহ্মণেরা যাঁহারা এই সকল শাস্ত্র যাজন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এমন অবিশ্বাসের কথা কহিয়া থাকেন যে, তাহা শ্রবণ করিলে স্পন্দনরহিত হইয়া যাইতে হয়। একদা কোন ভদ্রলোকের বাটীতে ৺পূজার মহাষ্টমীর দিনে তাঁহাদের পুরোহিতের

সহিত কথায় কথায় দুর্গোৎসবের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। তিনি তাহাতে অম্লান-বদনে বলিয়াছিলেন যে, তন্ত্রখানা পরশ্ব দিবসের লেখা এবং তদ্বিবরণাদি রূপক মাত্র। দেখুন! কালের বিচিত্রগতি!

যদিও স্থানে স্থানে ধর্ম্মের আন্দোলন, ধর্ম্ম প্রচার এবং ধর্ম্ম শিক্ষা হই-তেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশ স্থলেই সে সকল কালের নিয়মানুযায়ী হইয়া পড়িয়া থাকে। প্রথমতঃ বেদের দুর্দ্দশা দেখাইতে হইলে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়। ইহা হিন্দু, যবন, এবং ম্লেচ্ছভাবের জাজ্বল্য প্রমাণ। ইহার অন্তর্গত ব্যক্তিরা প্রায় কোন বিশেষ জাতিতে পরিগণিত নহেন। হিন্দু যাঁহারা. তাঁহারা তাহা নহেন এই কথা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়াছেন. ব্রাহ্মণ উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং শূদ্রাধমের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেছেন, তাহাতে হিন্দুভাব বাস্তবিকই অপনীত হইয়া যায়। এ অবস্থায় হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহাদের যে প্রকার অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা, সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে যদিও হিন্দুশাস্ত্রের প্রসঙ্গ হয়, তাহা নিতান্ত বিকৃতভাবেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাদের হস্তে মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের শাস্ত্রেরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে।

ব্রাহ্ম-সমাজে নিরাকার ঈশ্বর অর্থাৎ বেদ মতের উপাসনা করা উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহা কোথায় হইতেছে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। পূর্ব্বে আমরা বেদাধ্যয়ন করিবার অধিকারী উল্লেখ করিয়া যে ধোপা মুচির কথা বলিয়াছিলাম, অধিকাংশ ভাগে তাহারাই ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। বেদ শাস্ত্র তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। যাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলা হইয়াছে, তাঁহারা কালের ধর্ম্মানুযায়ী ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করিয়া নূতন জাতিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন; অর্থাৎ ধোপা, কলু, মুচির শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া এক্ষণে বেদাধ্যয়নের যেরূপ সুন্দর পাত্র হইয়াছেন, তাহা পরিচয়ের সাপেক্ষ থাকিতেছে না। বেদের সাধন বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, শ্রদ্ধা, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ইত্যাদি। কিন্তু ব্রাহ্ম মতে তাহার ঠিক বিপরীত ভাব। পুরাকালে বিবেক অর্থে সদসৎ বিচার বুঝাইত। সৎ ঈশ্বর এবং অসৎ মায়া বা জগৎ; অসৎকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎ অবলম্বন করাই তখনকার অভিপ্রায় ছিল; এখন, সৎ অর্থে স্বার্থ চরিতার্থ, অসৎ অর্থে যাহাতে তাহার হানি না হয়। বৈরাগ্য বলিলে আপন বিষয়ে বিরাগ হওয়া বুঝাইত কিন্তু এক্ষণে তাহা পাত্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

সত্যনিষ্ঠ হওয়া তখনকার সাধন ছিল কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত ভাব ইষ্ট-মন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ যাঁহাকে লইয়া ধর্ম্ম, তিনি অদৃশ্য পদার্থ, মনের অতীত; বুদ্ধি তাঁহাকে চিন্তা করিতে অক্ষম, কিন্তু শিক্ষা দিবার সময়ে যদ্যপি এই সত্য কথা কহা যায়, তাহা হইলে সমাজের কলেবর শুষ্ক হইয়া অস্থির অন্তস্তর পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়ে, মহান্ধতার ঘটা দেখিলে অবাক হইতে হয়। কথিত হইতেছে, অনন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইবে! হিন্দুরা সে ঈশ্বর দেখে নাই, জানে না, তাহারা কাষ্ঠ মাটি পূজা করে। শুনিতে অতি মধুর, লোক সকল ছুটিল; পরে শুনা যাইল, তিনি আছেন সত্য কিন্তু নিরাকার; কোন আকৃতি নাই। তাঁহার অবয়বশূন্য বলিয়া আবার সকলের মোহ জন্মাইবার নিমিত্ত বলা হইয়া থাকে। আহা কিবা প্রেমপূর্ণ বদনকান্তি! কি দয়ার মূর্ত্তি! পাপীর জন্য কত করুণা! এস, তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই, আরতি করি এবং আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দিই, ইত্যাদি।

বেদ মতে, এপ্রকার কোন স্তব স্তুতি নাই। এই নিমিত্ত উপরোক্ত বৈদিক মত সম্পূর্ণ বিকৃত।

ব্রাহ্মসমাজে বেদব্যতীত পুরাণের ছায়াও আছে। হরিনামসঙ্কীর্ত্তনের ঘটা নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু হরির পৌরাণিক অর্থ স্বতন্ত্র। সে ভাব এস্থানে নাই। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যেরূপে, যে ভাবে এবং যে উদ্দেশ্যে হরিনাম করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মেরা তাহা বিশ্বাস করেন না। শ্রীকৃষ্ণকে হরি বলে এবং নামের ফলে যে, ভাব ও মহা-ভাব উপস্থিত হয়, তাহাকে ইহাঁরা "মানবীয় দৌর্ব্বল্য" কহিয়া থাকেন। এস্থলে পুরাণের দুরবস্থাই প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মেরা যে ইচ্ছা করিয়া এই প্রকার বিকৃত ভাবে পরিচালিত হন, অথবা আত্মপ্রতারণা করেন, তাহা কদাপি নহে। ইহা কালের ধর্ম্ম, তাঁহাদের অপরাধ কি! যবন-ভাবের কার্য্য ম্লেচ্ছেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত আহারের বিচার নাই, পরিচ্ছদের বিচার নাই, আদানপ্রদানে নিয়ম নাই, স্ত্রীপুরুষ একত্রে থাকিবার বিঘ্ন বাধা নাই। এরূপ অবস্থার ব্যক্তিরা হিন্দুস্থানে ধর্ম্ম প্রচারক, ধর্ম্ম-সাধক ও ধর্ম্ম-পরিবার বলিয়া প্রতিঘোষিত হইয়া যাইতেছেন। লোকে আগ্রহপূর্ব্বক ইহাঁদের উপদেশ শ্রবণ করেন, ধর্ম্মব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সহানুভূতি করিতে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া দেখেন না। দেখিবেন কি, কালের প্রচণ্ড পরাক্রম অতিক্রম করিবার শক্তি না জন্মিলে দেখিবে কে? এস্থলে বেদ পুরাণের ভাব, হিন্দু ভাবের সাধনায়

দেখা যাইতেছে, ম্লেচ্ছ এবং যাবনিক ভাব কার্য্য দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে।

কাল-ধর্ম্মের আর একটী দৃষ্টান্ত, কর্ত্তাভজা। বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্রের অভাবে, এই এক নূতন ধর্ম্মস্রোত চলিতেছে। মনুষ্য পূজার সম্প্রদায় বলিয়া যে ধর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে, ইহারা সেই শ্রেণীভুক্ত; ব্রাহ্মেরা যে প্রকার বেদ পুরাণের ছায়া লইয়া আপনাদের অভিমত সম্প্রদায় করিয়াছেন, কর্ত্তাভজারাও তদ্রূপ। ইহাঁরা মনুষ্যকেই ভগবানের নিত্য এবং লীলার আদর্শ স্থল জ্ঞান করিয়া মনুষ্যদিগকেই পূজা করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরের অন্যরূপ অবতারাদি কিছুই স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে এই মানুষে সেই মানুষ (ঈশ্বর) বিরাজ করে। তাঁহারা ৩২ অক্ষরীয় মন্ত্রের যে বিকৃত অর্থ করিয়া থাকেন, তাহা এইস্থানে উল্লিখিত হইতেছে।—

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥

হিন্দুরা এই নাম ঈশ্বরের জানিয়া জপ করিয়া থাকেন কিন্তু কর্ত্তাভজারা বলেন যে, কৃষ্ণ হ'রে অর্থাৎ তুই কৃষ্ণ এবং হ' রাম বেদ মতে নির্ব্বাণ সাধনে দেহের পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিলাইয়া দিতে পারিলে মন অবলম্বনবিহীন হওয়ায় বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, যাহাকে সমাধি বলে। কর্ত্তাভজারা এই স্থানে সেই ভাব আনিয়া দিয়া থাকেন। কৃষ্ণ বলিলে যে পর্য্যন্ত "আমি কৃষ্ণ" এ কথা জানা না যায়, সে পর্য্যন্ত সে "জীব"। "আমিই কৃষ্ণ জানিলে," তিনি কৃষ্ণপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অমনি তিনি বরাতি (শিষ্য) করিতে আরম্ভ করেন। পুরুষেরা কৃষ্ণ হইয়া পুরাণের কৃষ্ণলীলা আপনাতে প্রকাশ করিতে থাকেন এবং স্ত্রীলোকেরা রাধা শক্তি-স্বরূপ জ্ঞানে পুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাসলীলা, বস্ত্রহরণ ও দোলযাত্রার আনন্দ প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়া থাকেন। কর্ত্তাভজারা নিত্যলীলা এইরূপে বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের সকলই ভাবের কথা, সুতরাং বেদ পুরাণের প্রাচীন ভাবের লেশ মাত্র নাই। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ে নানাপ্রকার মতভেদ আছে এবং হইবারই কথা।

বাঙ্গালায় ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে কর্ত্তাভজার মত ১৭২২ খৃঃ অব্দে আউলে কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার উদ্দেশ্য অতি সুন্দর এবং তাহাতে বৈদিক মতের সম্বন্ধ ছিল।

"মেয়ে হিজ্ড়ে, পুরুষ খোজা—
তবে হবি কর্ত্তাভজা ;—"

কিন্তু, এক্ষণে সে ভাব বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এই ধর্ম্ম মূর্খ অশিক্ষিত হীন জাতিদিগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল। কারণ আউলে চাঁদের যে ২২ জন শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ কিম্বা অন্য শ্রেষ্ঠ জাতির কেহই ছিলেন না।

ইতিপূর্ব্বে বেশ্যা এবং লম্পটদিগকেই এই ধর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যাইত। আমাদের কোন বন্ধু এক কর্ত্তাভজার মশাইয়ের (গুরু) নিকট কেবল স্ত্রীসহবাস রসাস্বাদন করিবার জন্য যাতায়াত করিতেন। হুতোমপ্যাঁচায় গোস্বামীদিগের যে ভাবের কথা আছে, 'বল আমি রাধা তুমি শ্যাম'; কর্ত্তাভজাদিগের মধ্যেও অবিকল সেই ভাব সর্ব্বত্রে না হউক, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে চলিতেছে।

কর্ত্তাভজাদিগের বর্ত্তমান ভাব কি প্রকার হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করাইবার জন্য "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" হইতে এই স্থলে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল। "বোধ হয়, সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকের অভিপ্রায় উত্তমই ছিল কিন্তু তাঁহার গতানুগতিকেরা তৎপ্রদর্শিত পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। বিশেষতঃ, ব্যভিচার দোষ তাঁহাদের সকল গুণগ্রাম গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।"

১৫১০ খৃঃ অব্দে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক যে মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাই এদেশে বৈষ্ণব * মত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। বেদ এবং পুরাণই এই সম্প্রদায়ের ভিত্তিভূমি ছিল। সংসার পরিত্যাগ করিয়া যে প্রকারে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইলে তাঁহার দর্শন লাভ হয় এবং তাঁহার সহিত প্রেম-ভক্তির কার্য্য দ্বারা 'অকৈতব-আনন্দ' সম্ভোগ করা যায়, মহাপ্রভু তাহাই প্রদর্শন করিয়া যান। তাঁহার আবির্ভাবের সময়ে বঙ্গদেশের অতি শোচনীয়াবস্থা হইয়াছিল। হিন্দুরা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যবনের অধীনে থাকিয়া প্রায় ধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তন্নিমিত্ত ধর্ম্মের মত্ততা উপস্থিত করিবার জন্য নাম সঙ্কীর্ত্তনে উদ্ধত নৃত্যগীতের ভাবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাতে লোকে মুহূর্ত্তের মধ্যে আত্মবিস্মৃতিতে পর্য্যবসিত হইয়া যাইত। সুতরাং ইহা

* রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধ্বাচার্য্য এবং নিম্বাদিত্য, এই চতুর্ব্বিধ মত বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক বলিয়া ভারতবর্ষে বিখ্যাত।

বৈরাগ্যের কার্য্য হইবার নিমিত্ত তৎকালোপযোগী সুগম প্রণালী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। তিনি বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য নিজে ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বৈদিক মতে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসের শাসন প্রণালী স্ত্রীর হস্তে ভিক্ষা গ্রহণাপরাধে ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করায় প্রকাশ পাইয়াছে। পুরুষ, স্ত্রী স্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ কাম দমন করিতে না পারিলে তাহাদের কৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ হয় না, এই তাঁহার বিশেষ উপদেশ ছিল, যাহাকে সখী ভাব কহে। এই মতের মধ্যে আর্য্যীয় ভাবের কোন বিরোধ লক্ষণ ছিল না কিন্তু তাঁহার অপ্রকটাবস্থা হইতে না হইতেই, চৈতন্যমত ক্রমশঃ বিকৃত হইতে লাগিল। সেই বিকৃতির সময়ে কর্ত্তাভজা, পঞ্চনামী, বাউল, প্রভৃতি নানাবিধ উপশাখার প্রাদুর্ভাব হইয়া যায়।

চৈতন্য সম্প্রদায় ক্রমে কাল-কবলিত হইতে আরম্ভ হইলে মূল মত ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে। তখন সকল বিষয়েই ব্যভিচার দোষ প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। যাঁহার সময়ে রূপ-সনাতন প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বিষয় বৈভব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়াছিলেন, সেই সন্ন্যাস স্থলে প্রকৃতিতে স্ত্রী-ভাব আসিয়া প্রবেশ করিল। সখী ভাবের বিকৃত অর্থ হইয়া যাইল। পুরুষ প্রকৃতি একত্রে মিলিত হইয়া সখীর স্বভাব প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রকৃতি সহবাস আরম্ভ হইল। অপরিপক্কাবস্থায় স্ত্রীর সহিত সংস্রব রাখিলে স্বভাব চ্যুত হওয়া অনিবার্য্য, তাহাই ঘটিতে লাগিল। সুতরাং বিমল চৈতন্য সম্প্রদায় পঙ্কিল হইয়া আসিল। মহাপ্রভুর পর যখন নিত্যানন্দদেব ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন তিনি বিষয়ী লোকদিগের পক্ষে সন্ন্যাসী হওয়া অসম্ভব বোধ করিয়া বলিয়াছেন যে, "যুবতী স্ত্রীর কোল, মাগুর মাছের ঝোল, বোল হরি বোল",—অর্থাৎ সংসারেও থাক এবং হরিনামটাও বল। নিত্যানন্দ ঠাকুর এই সহজ উপায় বলিয়া দিয়া এক পক্ষে সংসারীদিগের পক্ষে ভালই করিয়াছিলেন। তিনি নিজে কুমার বৈরাগী হইয়াও যে সংসারীদিগের অবস্থাসঙ্গত উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহাই পরম উপকার, কিন্তু এই সুলভ-প্রণালী দ্বারা যে কি পর্য্যন্ত হিতসাধন হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে অসমর্থ, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের কল্যাণ না হইলে নিত্যানন্দ ঠাকুর সে কথা বলিবেন কেন? নিত্যানন্দ ভক্তেরা কৃষ্ণের সংসার জানিয়া সংসারে অবস্থান পূর্ব্বক দিনযাপন করিতেন। কালক্রমে ম্লেচ্ছ শিক্ষার পরাক্রমে এবং নানাবিধ বিজাতীয় উপদেশ দ্বারা সে ভাব অপনীত হইয়া

সন্দেহের উত্তেজনা আরম্ভ হইল। সুতরাং অতি সত্বরই কৃষ্ণ ভাব অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এখন কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং গৃহী-বৈষ্ণবেরা ম্লেচ্ছাহার করিতেছেন, মৎস্যের ত কথাই নাই, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, দ্বেষাদ্বেষী ভাব, লাম্পট্য ও সুরাপান দোষ সকল আদর পূর্ব্বক শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছেন। এই প্রকার ম্লেচ্ছাচারী ব্যতীত যাঁহারা দুই চারিখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিম্বা সঙ্কীর্ত্তনে ভাবাবেশের ভান করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা চৈতন্যের কিম্বা তাঁহার গণ-(ভক্ত) বিশেষের স্বরূপ বলিয়া, আপনা আপনি স্ফীত হইয়া থাকেন। এই সকল কারণে, চৈতন্য ধর্ম্মের বিকৃতি সাব্যস্ত করা অতি বিরুদ্ধ কথা নহে। শক্তিমত বাস্তবিক পুরাণ ঘটিত বটে। যাহা কিছু দেখিবার, বুঝিবার, উপলব্ধি করিবার আছে, সে সকলই শক্তির বিকাশ মাত্র। কি বৈদিক, কি পৌরাণিক, কাহাকেও শক্তি ছাড়া বলা যায় না। কিন্তু কালপ্রতাপে তাহা এক্ষণে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। শাক্তেরা কালীর উপাসক বলিয়া পরিচিত এবং তাঁহারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদিগের ন্যায় সাম্প্রদায়িক ভাবে অভিভূত।

শক্তিকে পূজা করা শাক্তদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্তু এক্ষণে সেই উদ্দেশ্য কাহার কতদূর আছে, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। একদা কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, মহাশয়! আর বাটীতে মহামায়ার পূজা হয় না কেন? সে এই বলিয়া উত্তর দিয়াছিল যে, আমার আর দাঁত নাই সুতরাং পূজার সুখ চলিয়া গিয়াছে; অর্থাৎ যতদিন দন্ত ছিল, ততদিন বলিদানের ছাগ মাংস ভক্ষণে সুবিধা ছিল। দন্ত স্খলিত হওয়ায়, আর সে সুখ হইবার উপায় নাই। ফলে এই মতে এই প্রকার চরিত্রেরই অধিকাংশ ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কালীঘাট তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পূজা যত হউক আর নাই হউক, ছাগের শ্রাদ্ধটা যথেষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহাদের বাটীতে কালী কিম্বা অন্য শক্তি পূজা হইতে দেখা যায়, তাঁহারা পূজার জন্য যে পর্য্যন্ত অনুরক্ত হউন বা নাই হউন, বাহ্যিক আড়ম্বরেরই যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই কালের ইহাই স্বভাব সিদ্ধ। শক্তি সাধকেরা পঞ্চ মকার * লইয়া সাধন

* মদ্য, মাংস, মুদ্রা, মৎস্য এবং মৈথুন।

করিয়া থাকেন। দিবারাত্র সুরাপানে অভিভূত থাকা, ভৈরবী লইয়া সম্ভোগ করা, মাংস ভক্ষণ, ইহাই সাধনের বিষয় বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের কিছু পূর্ব্বে রামপ্রসাদ এই শক্তি সাধক ছিলেন। তিনি সুরাপান সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন ;—

"সুরাপান করি না আমি, সুধা (নামামৃত) খাই জয় কালী বলে।
আমার মন মাতালে (ভাবের উচ্ছ্বাস) মাতাল করে,
(সব) মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মস্‌লা দিয়ে, (মা)
আমার জ্ঞান শুঁড়িতে চুয়ায় ভাটী, পান করে মোর মন-মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র (দেহ) ভরা (আমি) শোধন করি ব'লে তারা, (মা)
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে।"

এখনকার শক্তি সাধন পক্ষে যখন সুরা, মাংস, মৈথুনাদির প্রাবল্য ঘটিয়াছে, তখন পূর্ব্বের ভাব আর নাই বলিতে হইবে। এস্থলে হিন্দুভাব শক্তি পূজা, যবন ও ম্লেচ্ছ ভাব তামসিক কার্য্য কলাপ।

বর্ত্তমানে এই এক নূতন সৃষ্টি হরিসভা—হরিসভায় কালোচিত স্বভাবের স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে কলিযুগের বর্ত্তমান সময়ের অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে, হরিসভা বলিয়া এমন কোন ধর্ম্মালয়ের প্রসঙ্গ ছিল কি না—তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণাভাব বলিয়া আমাদের ধারণা আছে। ধর্ম্ম প্রাণের সামগ্রী, মনের অধিকারের অতীত; এই নিমিত্ত ঈশ্বর মনের অগোচর বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন।

ধর্ম্ম সাধকেরা সংসারের কলরব অসহ্য জ্ঞানে এবং ঈশ্বর লাভের প্রতিবন্ধক বুঝিয়া বিজনে যাইয়া বসতি করিতেন। তাঁহারা জনশূন্য স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক নিমীলিত-নয়নে ধ্যান করিয়া, অনেক কষ্টে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিতেন। তখনকার সাধকদিগের তপশ্চারণের কঠোরতা-দেখিলে মনে হয় যে, ঈশ্বরলাভ করা অতি গুরুতর ব্যাপার ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান কালের যাবতীয় ধর্ম্ম মতে, ঈশ্বর সাধন করা যারপরনাই সুলভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হরিসভা তাহার একটী দৃষ্টান্তের স্থল। প্রতি রবিবারে সকলের অবকাশ আছে ; বিষয় কর্ম্মের তাড়না নাই, কর্ম্মস্থানের কর্ত্তৃপক্ষদিগের আরক্তিম ঘূর্ণিত চক্ষু দর্শনের ভয় নাই, তাই সে দিবস প্রাতঃকালে স্ত্রীপুত্রের দাসত্ব খতের সুদ আদায় দিয়া অপরাহ্নে পাঁচ-ইয়ারে একত্রিত হইয়া থাকেন।

তখন শ্রীমদ্ভাগবতের একটা কিম্বা দুইটা শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করা হয়; তদনন্তর কেহ ধর্ম্ম-জগতের কোন বিশেষ অবস্থা লইয়া কিঞ্চিৎ আন্দোলন করেন এবং পরিশেষে নৃত্য গীতাদির দ্বারা সভা এক সপ্তাহের জন্য সমাপ্ত হইয়া যায়। এই ব্যবধানের মধ্যে কেহ হয়ত ইষ্টমন্ত্র জপ অথবা অন্য কোন প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারেন কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিরা তাহার কোন সংস্রবই রাখেন না। যাহা হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, এপ্রকার ধর্ম্মসভা স্থাপনের উদ্দেশ্য কি?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্ম প্রাণের সামগ্রী, নিজের সাধনের বস্তু। লোকের নিকট ধার্ম্মিক বেশে অবস্থিতি করিলে বাস্তবিক ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া যায় না, তাহাতে লোকে প্রতারিত হয় মাত্র; কিন্তু অন্তর্যামী ভগবান্‌কে তাহাতে বিমুগ্ধ করা যায় না এবং ধর্ম্মের বিমল সুখ শান্তি নিজেরও উপলব্ধি হয় না! থিয়েটারে ও যাত্রায় যেমন সন্ন্যাসী সাজিয়া উপস্থিত দর্শকবৃন্দের মোহ উপস্থিত করিয়া দেয়, কিন্তু অভিনেতৃগণ সে সকল নিজে কিছুই অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় না। লোক দেখান ধর্ম্মালোচনাও তদ্রূপ।

পুরাকালে আচার্য্য যখন শিষ্যমণ্ডলীকে শিক্ষা দিতেন, তখন অনেকে একত্রে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেন। পরে যখন গৌরাঙ্গদেব এপ্রদেশে নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রণালী প্রচলিত করেন, তখন একাধিক ব্যক্তিরা একত্রে সমবেত হইয়া সে কার্য্য করিতেন সত্য, কিন্তু নিয়ম পূর্ব্বক পাঠ, বক্তৃতা, পরে সঙ্কীর্ত্তন, এরূপ কোন নিয়ম ছিল না। ধর্ম্ম জগতে নিয়ম কিসের? বিশেষতঃ নাম সঙ্কীর্ত্তনে যখন উন্মত্ততা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আপনিই আপনার ভাব হারাইয়া ফেলে। এমন অবস্থায় নিয়ম, বিধি লক্ষ্য রাখিবে কে? পাঁচজনে মিলিত হইয়া একটা কার্য্য করা ম্লেচ্ছদিগের ভাব। এই ভাব দ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হয়। ব্রাহ্ম-সমাজের অনুকরণ আমাদের হরিসভা। ইহা প্রথমে দ্বেষ ভাবেই উৎপত্তি হইয়াছিল। পরে আমোদপ্রিয় যুবাদিগের পাঁচটা সখের মধ্যে হরিসভাও একটা আমোদের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সহজে অল্প বিদ্যায় নাম বাহির করিবার এমন সুবিধা আর নাই। মদ্য-মাংস ভক্ষণ, বার-নারীর সহবাস, মিথ্যাকথা কথন, লোকের কুৎসা প্রচার, অপর ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষাদেষী ভাব ও কটু বাক্য বরিষণের পক্ষে বিশেষ উন্নতি হইয়া থাকে।

এই কলিকাতা সহরে এবং ইহার সন্নিহিত অনেক স্থলে হরিসভা আছে।

আমরাও কয়েক স্থানে মধ্যে মধ্যে গমনাগমন করিয়া দেখিয়াছি কিন্তু কুত্রাপি সাধন ভজনের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া বোধ হয় নাই। আত্মোন্নতির প্রতি একেবারে ভুল হইয়া গিয়াছে। হরি নাম যে ইহ এবং পরকালের উপায় এবং অবলম্বন, তাহা অদ্যাপি বোধ হয় কাহারও বোধ হয় নাই। কেবল আড়ম্বর—আড়ম্বর—আড়ম্বর? আমাদের সভায় অমুক পাঠক পাঠ করেন, অমুক পণ্ডিত বক্তা, সাম্বাৎসরিকের দিনে এত দরিদ্রকে বস্ত্রদান করা, ইত্যাদি কেবল আড়ম্বরের প্রতিধ্বনিই হইবে এবং তাহা ছাপাইয়া সমালোচনার নিমিত্ত সংবাদ-পত্রে প্রেরিত হইয়া থাকে। হরিসভার ত এই দশা!

কেহ বা বলিতে পারেন যে, অন্য প্রকার আমোদ আহ্লাদে দিনযাপন না করিয়া ঐশ্বরিক নামে কিয়দংশকাল যদ্যপি কাটিয়া যায়, তাহা হইলেও সময়ে মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে একথা বলিতে চাহি না। ধর্ম্ম আমোদের জন্য নহে, ধর্ম্মেরই জন্য ধর্ম্ম। আনন্দ তাহার ছায়া মাত্র। আমোদের জন্য ধর্ম্ম করা ইহাই কাল ধর্ম্ম বটে. আমরা তাহাই বিশিষ্ট করিয়া দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

হরিসভায় যে কার্য্য করা হয়, তাহাতে নারায়ণের অর্চ্চনা, লীলা শ্রবণ এবং তাহার রসাস্বাদন করাই উদ্দেশ্য। এই স্থানে প্রকৃত হিন্দুভাব আছে। কিন্তু নারায়ণ পূজা লীলা শ্রবণ এবং রসপান করিবার অধিকারী হইতে হইলে কোন্ অবস্থা লাভ করা উচিত? তামসিক কিম্বা রাজসিক ভাবের লেশমাত্র সংস্রব থাকিলে নারায়ণের লীলায় অধিকার জন্মে না। সত্বগুণে কিঞ্চিৎ সাহায্য হয় বটে কিন্তু শুদ্ধ সত্বই তাহার প্রকৃত অবস্থা। যে পর্য্যন্ত সে অবস্থা উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত নামেই নির্ভর করিয়া থাকাই ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ। হরিসভায় এই স্থানে বিকৃত ভাব ঘটিয়াছে, ইহা সেই নিমিত্ত ম্লেচ্ছ-ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইল।

মনুষ্যেরা অবস্থার দাস। সুতরাং আমরা যখন হিন্দু রাজাদিগের অধীনে ছিলাম, তখন সকল বিষয়ে হিন্দুভাব রাজা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইত এবং রাজা প্রজার এক প্রকার ভাব বিধায়, পরস্পর সামঞ্জস্য হইয়া যাইত। যবন রাজের একাধিপত্য স্থাপিত হইলে যাবনিক ভাব প্রবল হইয়া উঠে, সুতরাং দুর্ব্বল হিন্দুপ্রজাদিগের হিন্দুভাব অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া যাবনিক ভাবের আশ্রয়স্থান হইয়াছিল। ক্রমে সামাজিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্যেরও বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছিল। স্বাধীনতার খর্ব্ব হইলে যেমন মানসিক কার্য্য

সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তেমনি বাহিরের বিষয়েও দেখা যায়। বিজাতীয় রাজার অধীনস্থ হইলে আপন ইচ্ছামত কোন কার্য্য করা যায় না। রাজদণ্ড প্রতিক্ষণ বিভীষিকা প্রদর্শন করে। মনের প্রকৃতভাব সঙ্কুচিত করিয়া কালের ন্যায় কার্য্য করিয়া যাইতে হয়। এই নিমিত্ত হিন্দুদিগের বেশ-ভূষা ও আহারাদির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা উঠিয়া যায়; মাতৃ-ভাষার স্থানে, আরব্য ও পারস্য ভাষা প্রবিষ্ট হয়, পুরাণ ঘটিত পূজার সহিত সত্যপির এবং মানিকপিরের সিন্নির ব্যবস্থা হয়। এইরূপ হিন্দু-সমাজ এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল।

পুনরায় হিন্দুদিগের এই অবস্থার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। ম্লেচ্ছাধিকার স্থাপন হইতেই যবন-ভাবের দৈনিক অস্তমিত দেখা যাইল। আরব্য ও পারস্য ভাষা ভাগিরথীর অতল স্পর্শ জলে সমাধি প্রাপ্ত হইল। ম্লেচ্ছ-পরিচ্ছদ, ম্লেচ্ছ আহার এবং ম্লেচ্ছ-ভাষা হিন্দুর অবলম্বন হইয়া গেল। সামাজিক রীতি নীতি ম্লেচ্ছ-ঢংএ গঠিত হইল। মানসিক ভাব ম্লেচ্ছভাবে উন্নতি সাধন করিতে শিক্ষা করিল। হিন্দু-ধর্ম্মের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমূলে মূলোৎপাটিত হইল। স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার দ্বারোৎঘাটিত হইল। মহিলামহলে শিল্প ও কারুকার্য্যের শিক্ষা আরম্ভ হইল। হিন্দু ও যবনের যৌগিক নাম ম্লেচ্ছাকারে পরিণত হইল। এমন স্থলে, আমাদিগকে অবস্থার দাস না বলিয়া অন্য আখ্যা প্রদান করা যায় না। আমরা বাস্তবিক হিন্দু বটে। হিন্দু শোণিত শুক্র এখনও ধমনিতে প্রবাহমান রহিয়াছে কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? যবন এবং ম্লেচ্ছেরা দুই দিক্ দিয়া সঙ্কাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন দিকে পালাইবার উপায় নাই। যেমন শীতকালে শীতের হস্তবিমুক্ত হওয়া যায় না। বর্ষায় বর্ষা এবং বসন্তে বসন্ত কালের অধিকার অতিক্রম করা কাহার সাধ্য নহে, সেই প্রকার স্বাধীন রাজাদিগের অধীনস্থ হইলে রাজার নিয়মের বশীভূত হইতে বাধ্য হইতে হয়। এই বাধ্যবাধকতাই আমাদের স্বভাব পরিবর্ত্তনের কারণ হইয়াছে।

এক্ষণে আমাদের উপায় কি হইবে? আমরা হিন্দু, যবন ও ম্লেচ্ছ ভাবের যৌগিক হইয়া আর্য্য সন্তান নামে অভিহিত হইব, না বাস্তবিক ম্লেচ্ছভাবেই সম্পূর্ণরূপে পরিণত হইয়া যাইব?

আর্য্যদিগের ন্যায় অবস্থায় আরোহণ করা এখনকার অবস্থায় সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া নিশ্চয় ধারণা হইতেছে। কারণ, স্বাধীনতা প্রথম সোপান কিন্তু

সে আশা দুরাশা মাত্র। এ অবস্থায় তাহা কল্পনায় স্থান দেওয়া বাতুলের কর্ম্ম সুতরাং আর্য্যখ্যাতি পুনরুদ্ধারের কোন আশা নাই। যাহা কিছু হিন্দু-ভাব আছে, তাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া, একেবারে ম্লেচ্ছ-জাতিতে পরিবর্ত্তন হইয়া যাওয়া মনে করিলে, আপনাতে আপনি ধিকার উঠিয়া থাকে এবং আপনাকে আপনি কুলাঙ্গার বলিয়া যেন সম্বোধন করে!

আমাদের ভবিষ্যপুরাণে শুনিয়াছি এবং বর্ত্তমান কালের অবস্থাতেও দেখিতেছি যে, আর হিন্দুকুল থাকিবে না। যেমন পদ্মানদী গ্রামের নিম্নদেশ ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিয়া একদিনে উপরিভাগ উদরসাৎ করে, ম্লেচ্ছভাব সেইরূপে আমাদের গ্রাস করিয়া সমুদায় একাকার করিবে। আমাদের পাঠ্য পুস্তকে ম্লেচ্ছভাব, বস্ত্রে ম্লেচ্ছভাব, আমোদে ম্লেচ্ছভাব, ঔষধিতে ম্লেচ্ছভাব এবং ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম চতুর্দ্দিক দিয়া প্রচার হইয়াছে। এখন অন্তঃপুর পর্য্যন্ত তাহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছবিদ্যা শিক্ষা করেন নাই, ম্লেচ্ছদিগের বিশেষ কোন সংস্রব রাখেন নাই, তথাপি তাঁহারা কালের নিয়ম অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এমন দুরন্ত "ব্যাধির" আবির্ভাব হইয়াছে যে, তাহা আর আর্য্য-চিকিৎসায় ফলদর্শে না, সুতরাং প্রাণের প্রত্যাশায় ম্লেচ্ছ-চিকিৎসক কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া ম্লেচ্ছাহার ও ম্লেচ্ছ ঔষধের দ্বারা আরোগ্য লাভ করিতে হইতেছে। আর্য্যবিদ্যায় অনভিজ্ঞ সুতরাং আর্য্যীয় শাস্ত্রাধ্যয়ণ করিতে অভিলাষ জন্মিলে, ম্লেচ্ছদিগের পুস্তক পাঠে তাহা জানিতে হয়। এইরূপে ম্লেচ্ছ ভাবের হস্ত হইতে কোন মতে পরিত্রাণের উপায় নাই।

মনুষ্যেরা, দেহ এবং মন এই দুই ভাগে বিভক্ত। দেহের অবস্থাক্রমে মনের অবস্থাও ঘটিয়া থাকে। দেহের যে অবস্থা, তাহাতে ম্লেচ্ছ-শৃঙ্খলে আপাদ মস্তক আবদ্ধ হইয়াছে। এমন স্থান নাই, যথায় তাহা স্পর্শ করে নাই। মনও তদ্রূপ হইয়াছে। পদমূলে একটী ক্ষুদ্র কণ্টক বিদ্ধ হইলে মন যেমন স্বভাববিচ্যুত হয়, এস্থলে তাহাই ঘটিয়াছে। এমন স্থলে উপায় কি? চিকিৎসা শাস্ত্রের একটী নিয়ম আছে যে, দুইটী কারণে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। একটীকে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ এবং অপরটীকে উত্তেজককারণ বলে। পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অগ্রে অপনীত করিয়া উত্তেজক কারণ দূরীভূত করিলে রোগ মুক্ত হইয়া থাকে কিন্তু আমরা এ নিয়মে চিকিৎসিত হইতে পারি না। যে স্থানে উত্তেজক কারণ দূরীভূত করা না যায়, সে স্থানে কেবল বলকারক

পথ্যের সাহায্যই একমাত্র ভরসা; তদ্দ্বারা সময়ের প্রতীক্ষা করা হইয়া থাকে।

আমাদের যখন এই অবস্থা ঘটিয়াছে, তখন আর্য্যধর্ম্ম সাধন করা আমাদের কার্য্য নহে। সুতরাং, বেদ, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি বর্ত্তমান অবস্থাসঙ্গত করিয়া না লইয়া, তাহা একেবারে পরিত্যাগ করাই এক্ষণে যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। ক্ষীর, দধি, দুগ্ধ, মৎস্য, মাংসাদি ভক্ষণ করা সুখের কথা বটে, কিন্তু উদরাময়-গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা ব্যবস্থা নহে। স্ত্রী সম্ভোগ করা মনুষ্য জীবনের সর্ব্ব প্রধান সুখ কিন্তু স্নায়বীয় রোগীর পক্ষে তাহা একেবারেই নিষিদ্ধ। সেইরূপ আমাদের অবস্থায় আর্য্য-শাস্ত্র একেবারে ব্যবহার হইতে পারে না। একথাটা বলিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে কিন্তু কি করা যায়, উপায় নাই। ইহা না করিলে আমাদের এবং আর্য্য-শাস্ত্র উভয়েরই অকল্যাণ হইবে। এ অবস্থায় কেবল জীবন ধারণের জন্য যাহার যে প্রকার অবস্থা ও যে প্রকার ভাব, তদ্দ্বারা ভগবানের নাম অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। নামে যাহা হইবার হইবে। যদ্যপি কাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তাহা হইলে নামেই ঈশ্বরের রূপদর্শন এবং নির্ব্বাণ ও সমাধি লাভ হইয়া যাইবে।

এইজন্য বলি যে, বর্ত্তমান কালে যত বিকৃত ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে যে সুধাময় ফল ফলিতেছে, তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। বিবাদ, কলহ ভিন্ন কোন কথাই নাই। কোথায় প্রাণের শান্তির জন্য ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে হইবে, কোথায় বিষয়-জ্বরের যন্ত্রণা বিমুক্ত হইবার জন্য ধর্ম্মরূপ মহৌষধি সেবন করিতে হইবে, তাহার পরিবর্ত্তে বিষম জ্বরাক্রান্ত হইয়া প্রলাপ বকিবার আবশ্যক কি?

আমরা যাহা প্রস্তাব করিলাম, তাহা অদ্যকার ব্যবস্থা নহে। আমাদের দুর্দ্দশা ঘটিবে জানিতে পারিয়াই, ভগবান "হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" বলিয়া, তাহার উপায় স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমরা কালের অবস্থাচক্রে যেমন ভাবেই পরিণত হই, ঈশ্বরের নাম মাত্র অবলম্বন করিয়া থাকিলে কাহার সহিত কোন মতান্তর হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন, রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, জলকে জল, নীর, পাণি, ওয়াটার, একোয়া নামে সকলে পান করিয়া থাকে। নাম ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন হইল বলিয়া কি জলপান সম্বন্ধে কাহার মত ভেদ হইতে পারে? না— নামের প্রভেদের জন্য পিপাসা নিবারণের কোন তারতম্য হয়?

এই কথায় অনেকে এই বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া থাকেন যে, হরিনামই কলিযুগের একমাত্র অবলম্বন। অতএব হরিনামের পরিবর্ত্তে, কালী, শিব, দুর্গা বা রাম, কিম্বা যীশু বলিলে চলিবে না। আমরা একথা অস্বীকার করি; কারণ, শাস্ত্রের মর্ম্ম ঈশ্বরের নাম। ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়। তাঁহাকে উদ্দেশ্য রাখিয়া প্রত্যেক সাধক সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যে ভাব, সেই ভাবের যে নাম, তাহাই তাঁহাদের অবলম্বনীয়। যাঁহারা কালী বলেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য চিৎশক্তি এবং অবলম্বন নাম। হরি উপাসকেরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাহাও চিৎশক্তি এবং অবলম্বন নাম। মুসলমানদিগের এবং খৃষ্টান প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্ম্ম মতেও এই দুইভাব জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এই নিমিত্ত কলির নাম মাহাত্ম্য কুত্রাপি পরিভ্রষ্ট হয় না।

নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এই স্থানে আমরা দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজে নিরাকার ঈশ্বর সাধন হইবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরে, কাল সহকারে তথায় মৃদঙ্গাদি সহযোগে ধ্রুপদের রাগরাগিণীর সুর লয়ে ব্রহ্মের নাম কীর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়। ব্রহ্মের নাম কীর্ত্তন হওয়া ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ হইলেও, অবিকল বৈদান্তিক ব্রহ্মভাব নহে; কারণ, তাহাতে ধ্যানই একমাত্র সাধন এবং জড়পদার্থাদি ব্রহ্মের মায়ার অন্তর্গত বলিয়া কথিত হয়। যে যাহা হউক, এই প্রকার নাম কীর্ত্তন করায় কাল ধর্ম্মই প্রকাশ পাইয়াছে। পরে, সেই ব্রাহ্মসমাজে গৌরাঙ্গীয় ভাব আসিয়া প্রবেশ করিল। গৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়া ভাগবতীয় হরিনাম সাধনের উপায় করিয়া যান। তিনিই খোল করতালের সৃষ্টি করেন। তাঁহার সময়েই কীর্ত্তনের সুর বাহির হয়। এই গৌরাঙ্গীয় কীর্ত্তন, খোল, করতাল এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে বিশিষ্টরূপে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহাদের আর নাম সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত প্রাণ শীতল হয় না। গৌর নিতাই এর নাম উল্টা করিয়াও গ্রহণ করা হইতেছে। সেইজন্য বলিতেছি, কালধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া যাইবার কাহারও অধিকার নাই। জানিয়াই হউক কিম্বা না জানিয়াই হউক, তাহা করিতে সকলেই বাধ্য হয়।

নামের মহিমা যে কি প্রবল, তাহা যতই পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই তাহার কার্য্যকলাপের সূক্ষ্মগতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া থাকিতে হয়। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা কি না—পরিশেষে গির্জ্জা ছাড়িয়া, পথে পথে গৌরাঙ্গীয় নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন! তাঁহারা করিলেন কি?

যাঁহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম ভাল নয় বলি আপনাদের জাতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছধর্ম্ম আশ্রয় করিলেন, পরে তাহা হইতে আবার পরিত্যক্ত ভাব লইয়া কাড়াকাড়ি কেন? এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, নাম সঙ্কীর্ত্তনে প্রাণ শীতল হয়, প্রেমভক্তির সঞ্চার হয়; সুতরাং এমন সুলভ উপায় কি আর আছে? ভাই ব্রাহ্ম! ভাই খৃষ্টান! তোমরা আমাদেরই বাটীর ছেলে, দুর্ভাগ্যবশতঃ কলির অত্যাচারে পথহারা হইয়া কোথায় যাইয়া পড়িয়াছিলে, কি ভাবিয়া যে এতদিন কাটাইলে, তাহা তোমরাই বলিতে পার, কিন্তু এখন কূল পাইয়াছ, নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছ, নামের মত্ততায় স্বর্গের বিমল প্রেমকণার আস্বাদন পাইতেছ, ইহা দেখিয়া কাহার না মন প্রাণ পুলকিত হয়? কেবল তাহাও নহে, তোমাদের আরও উপায় হইয়াছে। রামকৃষ্ণদেব তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে কেহ, যে ভাবে, যে জাতিতে, যে কোন অবস্থায়, ব্রহ্মের—এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের, নাম যেরূপেই হউক, গ্রহণ করিবে, তাহারই পরিত্রাণ হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এই নিমিত্তই ব্রাহ্মেরা এবং খৃষ্টানেরা, অর্থাৎ যাঁহাদের বাস্তবিকই ধর্ম্মের জন্য প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়াছিল, তাঁহারা রামকৃষ্ণদেবের চরণপ্রান্তে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অদ্যাপিও করিতেছেন। আমরা সেই জন্য বলিতেছি যে, কালধর্ম্মের অধিকার অতিক্রম করিয়া যাইবার কাহারও শক্তি নাই।

নাম সঙ্কীর্ত্তনের ভাব অন্যস্থানেও দৃশ্য হইতেছে। মুক্তিফৌজ বলিয়া যে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়টী ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে দলবদ্ধ হইয়া রাজপথে বাদ্যাদি সহকারে কীর্ত্তন করেন। এস্থলেও সেই গৌরাঙ্গীয় সঙ্কীর্ত্তনের ভাব দেখা যায়। অতএব, নাম ভিন্ন আর কাহারও গতি নাই।

নাম সাধনের দুইটী মত আছে। নাম জপ করা অর্থাৎ নামে চিত্তার্পণ করিয়া অবস্থিতি করা, অথবা আপনার অভীষ্ট ঈশ্বরের রূপবিশেষে আত্মোৎসর্গ করিয়া, ভগবানের কার্য্যজ্ঞানে, সাংসারিক কার্য্যই হউক, কিম্বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানই হউক, অসন্দিগ্ধচিত্তে নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে হয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, আমরা অবস্থার দাস। শরীর ও প্রকৃতি ঈশ্বরদত্ত, সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি। তাঁহার যেরূপ অভিপ্রায় হইবে, আমাদিগকে সেইরূপে পরিচালিত করিবেন। আমরা যদিও সময়ে সময়ে অহংজ্ঞানে আপনারই প্রাধান্য স্থাপন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমের কথা। কারণ, আমি

কোন কার্য্য করিব বলিয়া স্থির করিতেছি, পরক্ষণেই কোন ব্যাধি অথবা মৃত্যু আসিয়া তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া দিতেছে। আপন অবস্থা উন্নতি করিবার জন্য চেষ্টা পইতেছি কিন্তু সর্ব্বত্রে সমান ফল ফলিতেছে না। যেস্থানে ঈশ্বরের যেরূপ ইচ্ছা, সেই স্থানে তাহাই হইয়া থাকে। আত্মনিবেদন করিলে এই প্রকার অন্তর্দৃষ্টি জন্মে।

৮৬। একটী পক্ষী, কোন জাহাজের মাস্তুলে বসিয়া থাকিত; চতুর্দ্দিকে জল, উড়িয়া যাইবার স্থান ছিল না। পক্ষী মনে মনে বিচার করিল যে, আমি এই মাস্তুলকেই অদ্বিতীয় জ্ঞান করিয়া বসিয়া আছি, হয়ত কিঞ্চিৎ দূরে অরণ্য থাকিতে পারে। এই স্থির করিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। সে যে দিকে ধাবিত হইল, সেই দিকে অনন্ত জলরাশির কোথাও কূল কিনারা পাইল না। যখন চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন সেই মাস্তুলে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া আশ্রয় লইল। সেই দিন হইতে তাহার মাস্তুল সম্বন্ধে অদ্বিতীয় বোধ স্থির হইয়া নিশ্চিন্তচিত্তে কালযাপন হইতে লাগিল। ব্রহ্মতত্ত্বও সেইরূপ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-পতির অনন্ত ভাব জ্ঞাত না হইলে, তাঁহার প্রতি আত্ম-সমর্পণ করা যায় না। এই জন্য সাধনের সময় বিচার আবশ্যক।

৮৭। নাম অবলম্বন করিয়া তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিলে, আর কোন প্রকার বিচার করিতে হয় না। নামের গুণে সকল সন্দেহ, সকল কুতর্ক দূর হয়, নামে বুদ্ধি শুদ্ধি হয় এবং নামে ঈশ্বর লাভ হইয়া থাকে।

৮৮। যেমন বৃক্ষে পক্ষী বসিয়া থাকিলে করতালী দ্বারা তাহাদের উড়াইয়া দেওয়া হয়, তেমনি নাম সঙ্কীর্ত্তন

কালে করতালী দিয়া নৃত্য করিলে শরীররূপ বৃক্ষ হইতে পাপ পক্ষীরা পলাইয়া যায়।

৮৯। কলিকালে তমোমুখ চৈতন্যের সাধন ভিন্ন সত্ত্ব-মুখ চৈতন্যের সাধন নাই। সত্ত্বমুখ চৈতন্যের উপাসনায় মাধুর্য্যভাবে কার্য্য হয় এবং তমোমুখ চৈতন্যে দাম্ভিকতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন, কোন ধনীর উপাসনা করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ লাভ করা, ইহাকে সত্ত্বমুখী চৈতন্য কহা যায়। এস্থানে ভগবানের কৃপালাভ করা উদ্দেশ্য। তমোমুখ চৈতন্য তাহা নহে। যেমন, ডাকাতেরা কোন্ গৃহে অর্থ আছে অগ্রে স্থির করে, পরে কালী পূজান্তে সুরাদি পান পূর্ব্বক জয় কালী বলিয়া বস্ত্রখণ্ড ছিন্ন করণান্তর, রে রে শব্দে ঢেঁকি সহকারে গৃহের দ্বার ভগ্ন করিয়া সমুদয় অর্থ লইয়া যায়; তমোমুখ সাধনেও তদ্রূপ। জয়কালী জয়কালী বলিয়া উন্মত্ত হওয়া, অথবা হরিবোল হরিবোল বলিয়া মাতিয়া উঠা।

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন তাহার দৃষ্টান্ত। সেই জন্য গৌরাঙ্গদেব, শিঙা, খোল ও করতাল সহকারে, দলবদ্ধ হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। নারদ ঠাকুর একাকী হরিগুণানুগুণ গান করিয়া বেড়াইতেন কিন্তু কলিকালে তমোভাবাক্রান্ত জীব বলিয়া তাহাদের স্বভাবানুযায়ী যুগধর্ম্মেরও সংগঠন হইয়াছে। বাস্তবিক কথা এই, যখন নগর-কীর্ত্তন বাহির হয়, তাহা দেখিলে কাহার না হৃদয়-তন্ত্রী আন্দোলিত হইয়া থাকে?

৯০। অদ্বৈত জ্ঞান আচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।

পৃথিবীর যে দিকে দৃষ্টি পতিত হয়, সেই দিক্ হইতেই নব নব পদার্থের নব নব ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন বোধ হয়, যেন সেই সেই পদার্থ এবং সেই সেই ভাব পরস্পর স্বতন্ত্র। যেমন—বরফ, জল এবং বাষ্প। এই অবস্থায় কাহার মনে না ইহাদের প্রার্থক্য ভাব উদ্দীপন হইবে? বরফ দেখিতে

হীরক খণ্ডের ন্যায়, বর্ণবিহীন, কঠিন এবং অতিশয় শীতল গুণবিশিষ্ট পদার্থ। জল স্বচ্ছ, বর্ণবিবর্জ্জিত, তরল এবং ঈষৎ শৈত্য-ধর্ম্ম-সংযুক্ত পদার্থ। বাষ্পের আকৃতি নাই, বর্ণ নাই, এবং দৃষ্টির অতীতাবস্থায় অবস্থিতি করে। ইহা অতিশয় উষ্ণ গুণযুক্ত পদার্থ। বরফ, জল এবং বাষ্পের মধ্যে যে প্রকার স্বভাব দেখা যাইল, তাহাতে কে না এই তিনটী পৃথক্ পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করিবেন? যাঁহারা পদার্থদিগের অথবা তদুদ্ভূত ভাব লইয়া পরিচালিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের সকল কার্য্যেই, সকল ভাবেই ভেদ-জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা স্থূলদ্রষ্টা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা বরফ, জল এবং বাষ্পের স্থূল ভাব পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা সেই দর্শন ফলে, সূক্ষ্মাবস্থায় দুই আয়তন হাইড্রোজেন এবং এক আয়তন অক্সিজেন প্রাপ্ত হন। কারণে,—ঐ দুইটী বাষ্পের অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা সর্ব্বত্রে পরিদর্শন করেন এবং মহাকারণে,—তাহাদের উৎপত্তিস্থান নিরূপন করিয়া, এক আদি শক্তিতে উপনীত হইয়া থাকেন। এই আদি শক্তি হইতে পর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ মহাকারণ হইতে কারণে, কারণ হইতে সূক্ষ্মে এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে নামিয়া আসিলে, পুনরায় বরফ, জল এবং বাষ্পে, বিচারশক্তি স্থগিত হইয়া যাইবে। যে পর্য্যন্ত, যে কেহ, বরফ ও জল লইয়া এই প্রকার বিচার না করেন, সে পর্য্যন্ত ইহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থা নিরূপণ করিবার অধিকার কাহারও জন্মে না। সে পর্য্যন্ত স্থূলের পার্থক্য বোধও কিছুতেই যাইতে পারে না। সেই প্রকার, ঈশ্বরতত্ত্বের চরম জ্ঞান বা অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু বিশিষ্টরূপে উপলব্ধি না হইলে, স্থূলদর্শন বশতঃ, স্থূল-জ্ঞানে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিত হওয়া, কাহার কখন নিবারিত হয় না। সে পর্য্যন্ত বাহ্যিক ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হইতে পারে না। সে পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভাবের অবসান হয় না। যাহার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তিনি সকল বিষয়েরই তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইতে পারেন। যে কোন ভাব তাঁহাদের নিকট প্রতীয়মান হয়, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহার অবস্থা বুঝিয়া লইতে পারেন। এই নিমিত্ত যে ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত, যে কোন প্রকার, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থার দ্বারা আবদ্ধ থাকেন, সে পর্য্যন্ত অন্য সম্প্রদায়ের অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। সেই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বীর যে মুহূর্ত্তে সাম্প্রদায়িক বা ধর্ম্মের স্থূলভাব অপনীত হইয়া সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ পর্য্যন্ত গমনাগমনের অধিকার জন্মিবে, সেইক্ষণেই বরফের দৃষ্টান্তের

ন্যায় তাঁহার মোহ-তিমির বিদূরিত হইয়া যাইবে। আমাদের যে সকল শাস্ত্র প্রচলিত আছে, ইহাদের প্রত্যেকের আদি উদ্দেশ্যই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর। আমাদের প্রধান শাস্ত্র বেদ। ইঁহাতে, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কথা। পুরাণে সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কথা এবং তন্ত্রাদিতেও এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কথা। এক্ষণে বেদ পুরাণ এবং তন্ত্রাদির ঈশ্বর ভাবের বিবিধ উপাসনা-প্রকরণ লইয়া অজ্ঞান ব্যক্তিরা যে বহু ঈশ্বরবাদের আপত্তি করিয়া থাকেন, তাহার মীমাংসা করা যাইতেছে। যেমন পৃথিবীর নানাস্থানে নানাবিধ আকার প্রকার এবং অবস্থাভেদে নানাবিধ কূপ, খাত, পুষ্করিণী, নদ, নদী, সাগর এবং মহাসাগরের উৎপত্তি হয়। কূপের সহিত আটলাণ্টিক মহাসাগরের সাদৃশ্য আছে, এ কথা কে বলিতে পারেন? কিন্তু সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহা-কারণে কিছুই প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। সেই প্রকার পুরাণ তন্ত্রাদিতে বহু আকারে, বহু ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা বর্ণিত হইয়াও অদ্বৈতভাব অতি সুন্দররূপে রক্ষিত হইয়াছে। যখন যে দেবতার অর্চ্চনা হইয়াছে, ঈশ্বর অর্থাৎ মহাকারণ হইতে সাকার বা স্থূল-ভাব পর্য্যন্ত যে সাধক যাহা দেখিয়াছেন, তিনি তদ্রূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই সেই দেবতাদিগের উৎপত্তিস্থান উপলব্ধি করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায় কি, দৃষ্টান্ত প্রদান করিলে অবাধে বুঝিতে পারা যাইবে। রামপ্রসাদসেন তান্ত্রিক উপাসক বলিয়া পরিচিত আছেন। তিনি মৃণ্ময়ী কালীমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া মাতৃভাবে উপা-সনা করিয়াছিলেন। সেই মৃণ্ময়ী কালী হইতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার বিরচিত গীতে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি তন্ত্রের মতাবলম্বী হইয়া "কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সবই আমার এলোকেশী" বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। কালী, কৃষ্ণ, শিব, রামের স্থূলভাব দেখিলে সম্পূর্ণ ভাবান্তর আসিয়া থাকে, কিন্তু সে স্থান অতিক্রম করিয়া কারণে যাইলে "সবই আমার এলোকেশী" অর্থাৎ তাঁহাদের এক শক্তিরই বিকাশ বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। সেই অবস্থায় উপনীত না হইলে, "সবই আমার এলোকেশী" কখন বলা যাইতে পারে না এবং তাহা ধারণাও হইবার নহে। রামপ্রসাদের অবস্থা তথায়ও একেবারে পর্য্যবসিত হইয়া যায় নাই। তিনি একস্থানে বলিয়া গিয়াছেন, "আমি মাতৃভাবে পূজি যাঁরে (ওরে) চাতরে কি ভাঙ্গব হাঁড়ি, বোঝনারে মন ঠারে ঠোরে।" এস্থলে মহাকারণ বা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মভাব তিনি অন্যান্য স্থানেও প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। "পাঁচ ভেঙ্গে যে

এক করে মা তা'র হাতে কেমনে বাঁচ।" ইহা অপেক্ষা আর একটী গীতে ব্রহ্ম শব্দ খুলিয়া দিয়াছেন। "আমি কালীর নাম ব্রহ্ম জেনে, ভক্তি মুক্তি সব ছেড়েছি।" রামপ্রসাদ আর একস্থানে তাঁহার মাতার রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দ্বিতীয় খণ্ড ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। 'মন তোমার এই ভ্রম গেল না, কালী কেমন তা চেয়ে দেখলি না, (ওরে) ত্রিভুবন যে কালীর মূর্ত্তি জেনেও কি তা জান না।" "ত্রিভুবন যে কালীর মূর্ত্তি" ইহা দ্বারা বিরাট বা ব্রহ্মের স্থূল ভাব নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়ীর মূর্ত্তি ত্রিভুবন অর্থাৎ জগৎ ব্যাপিনীরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন, তাহা স্থূলচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও তথাপি মনের সন্দেহ বিদুরিত না হইয়া দ্বৈত ভাবের উত্তেজনা হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই অদ্বৈত ভাবে পরিপূর্ণ। এই অদ্বৈত ভাব দেখিবার "চক্ষু" প্রয়োজন, এই অদ্বৈত জ্ঞান ধারণা করিবার মস্তিষ্কের প্রয়োজন এবং এই অদ্বৈত ভাবে, সমস্ত পদার্থ সমীকরণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে অন্ধের সম্মুখবর্ত্তী অপরূপ পদার্থের পরিণামের ন্যায়, ভ্রমান্ধ জীবের দ্বারা পার্থিব পদার্থের প্রকৃত ভাবের হতাদর হইয়া থাকে। পদার্থদিগের অদ্বৈতভাব সম্বন্ধে ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি এবং এ ক্ষেত্রেও কিছু উল্লেখ করা অবশ্যক হইতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, জল, মৃত্তিকা, মনুষ্য, গো, স্বর্ণ, রৌপ্য, সকলই অদ্বিতীয় ভাবে রহিয়াছে। এই সকল পদার্থ স্থান-ভেদে, অবস্থাভেদে, এবং কালভেদে, কখন স্বতন্ত্র হইতে পারে না। স্বর্ণ ধাতু কোন স্থানে রৌপ্যে পরিণত হয় না অথবা রৌপ্য সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। মনুষ্য গো হয় না এবং গো মনুষ্য হয় না। স্থূল রাজ্যে সকল দ্রব্যই অদ্বিতীয়; পরে, তাহাদের সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহা-কারণ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারিলে, তথায় স্থূলভাবের বহুবিধ অদ্বিতীয় পদার্থের বিপর্য্যয় হইয়া এক অদ্বিতীয় শক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সেইরূপ পৌরাণিক বহু দেবতার অদ্বিতীয় মহা-কারণ ব্রহ্ম।

যিনি এইরূপ সংশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিশুদ্ধ অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করেন, সেই সাধকের নিকট স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ সম্বন্ধীয় সমুদয় ভাবই স্থান পাইয়া থাকে। যেমন জলের উপাদান কারণ অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার

চক্ষে গঙ্গা, পুষ্করিণী, কূপ, খাত প্রভৃতি সকল জলই একভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যিনি জ্ঞান চক্ষে পদার্থের গঠন সম্বন্ধীয় রূঢ় পদার্থদিগের অবস্থা জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট বিষ্ঠা ও চন্দন কি জন্য এক না হইবে? সেই প্রকার অদ্বৈতজ্ঞানী না হইলে ব্রহ্মরাজ্যের ব্যাপার পরিদর্শন করিবার যোগ্যতা কাহারও কদাপি সঞ্চারিত হইয়া থাকে। জড় জগৎ বিশ্লিষ্ট করিয়া না দেখিলে অদ্বৈতজ্ঞান উপার্জ্জন করা যায় না। কারণ, স্থূলে যে প্রকার প্রভেদ দেখা যায়, বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে তাহার আদি কারণ অবগত হইবার উপায় নাই। মনুষ্য মাত্রেই এক জাতীয় পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হয়। ইহা শরীর-তত্ত্ব শিক্ষা ব্যতীত গো-তত্ত্ব কিম্বা উদ্ভিদ-তত্ত্বের দ্বারা কোন জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। সেই প্রকার, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অদ্বৈতাবস্থা জ্ঞাত হইতে হইলে, মনুষ্যের প্রত্যক্ষ পদার্থের অদ্বৈতভাব দ্বারা, পরোক্ষ অদ্বৈত ব্রহ্ম-তত্ত্বের ভাব ধারণা হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণদেব এই নিমিত্তই বলিতেন, যেমন থোড়ের খোল ছাড়াইয়া মাঝ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন বিচার করিতে হইবে যে, মাঝেরই খোল এবং খোলেরই মাঝ, অর্থাৎ একসত্তায় খোল এবং মাঝ উৎপন্ন হইয়াছে। এই দৃষ্টান্তে খোল এবং মাঝ মনুষ্যের বিচারশক্তির অধীন। ইহার দ্বারা যে "এক সত্তার" ভাব উপলব্ধি হয়, তাহাকে খোল এবং মাঝ সম্বন্ধীয় অদ্বিতীয় জ্ঞান কহে। অতএব ব্রহ্মতত্ত্বের অদ্বিতীয় জ্ঞানলাভ করিতে হইলে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ অর্থাৎ জড়, চেতন এবং জড়চেতন পদার্থ পর্য্যালোচনায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অদ্বৈতজ্ঞান কহে। সেই জ্ঞান অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয়, অভূতপূর্ব্ব এবং অনন্ত। তিনিই ব্রহ্ম। রামকৃষ্ণদেব এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রধান এবং অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ভাব-বিশেষকে সম্প্রদায় বলে। তিনি অনন্ত সুতরাং অনন্ত ভাবের কর্ত্তা তিনিই; স্থূলে এই ভাবকে স্বতন্ত্র বলিয়া জ্ঞান হয়। যাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই, তাঁহারা স্থূল ভাবের তারতম্য দেখাইয়া পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া থাকেন; এই বিবাদ ভঞ্জন হইবার অন্য উপায় নাই। ব্রহ্মজ্ঞানই তাহার একমাত্র মহৌষধ। যেমন কোন পরিধির মধ্য বিন্দু হইতে পরিধি পর্য্যন্ত সরল রেখা টানিয়া অপর অন্ত হইতে দ্বিতীয় সরল রেখার মূলের বিন্দু দেখা যায় না, অথবা তাহা কোন্ স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথাও অবগত হওয়া যায়

না। ঐ সরল রেখার অন্ত পরিত্যাগ করিয়া, হয় বিন্দু স্থানে গমন করিতে হইবে, না হয় দ্বিতীয় সরল রেখায় যাইয়া তাহার উৎপত্তির স্থান নিরূপণ করিতে হইবে। তখন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, পরিধির মধ্য-বিন্দু হইতে যে সকল রেখা উৎপন্ন হয়, তাহারা সকলেই পরস্পর সমান। অদ্বৈত-জ্ঞান সম্বন্ধে অবিকল সেই প্রকার। ব্রহ্মজ্ঞানীর চক্ষে সকল মত, সকল ভাব, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিন্দু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যেমন রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "বাটীর কর্ত্তা এক কিন্তু তাঁহার সহিত প্রত্যেক পরিজনের স্বতন্ত্র সম্বন্ধ। কেহ স্ত্রী, কেহ কন্যা, কেহ মাতা, কেহ পুত্র, কেহ ভৃত্য, কেহ সম্বন্ধী, কেহ বন্ধু ইত্যাদি। এক ব্যক্তি হইতে এত প্রকার ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভাব লইয়া বিচার করিলে কাহারও সহিত মিলিবে না, কিন্তু ব্যক্তি লইয়া দেখিলে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়-ভাবে প্রতিপন্ন হইবেন। সেই কর্ত্তা কাহার পতি, সেই অদ্বিতীয় কর্ত্তা কাহার পিতা, সেই অদ্বিতীয় কর্ত্তা কাহার মামা, সেই অদ্বিতীয় কর্ত্তা কাহার পরম মিত্র এবং সেই অদ্বিতীয় কর্ত্তা কাহার পরম শত্রু। এক্ষেত্রে ভাবের ইয়ত্তা নাই, কিন্তু সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্রে অদ্বিতীয়।" রামকৃষ্ণদেব সাধন কালে ভারতবর্ষীয় প্রতেক ধর্ম্মভাব এবং খ্রীষ্টীয় প্রণালী পর্য্যন্ত এইরূপ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা সাধন করিয়া অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সকলেরই কথায় বিশ্বাস করিতেন কিন্তু তাহা পরীক্ষা করিয়া লইতেন। তিনি অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা বিশ্রাম করিতে পারিতেন। তিনি মধ্যস্থলে পরিধির মধ্যবিন্দুর ন্যায় বসিয়া থাকিতেন এবং তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, জ্ঞানী, ভক্ত, সাধু, অসাধু, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, বাউল, কর্ত্তাভজা, নবরসিক, বিবেকী, বৈরাগী, বিষয়ী, ধনী, নির্ধনী, বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা, বালক, পৌগণ্ড, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, মূর্খ, পণ্ডিত প্রভৃতি বসিয়া পরিধি সম্পূর্ণ করিতেন। প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানের এই অদ্ভুত মহিমা। অদ্বৈতজ্ঞান সঞ্চারিত হইলে সেই সাধকের চৈতন্যোদয় হইয়া থাকে। তিনি তখন সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বপদার্থে এবং সর্ব্ব প্রকার ভাবে অখণ্ড চৈতন্যের জাজ্বল্য প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যেমন কুমারের দোকানে হাঁড়ি, গামলা, জালা, প্রদীপ, প্রভৃতি নানাবিধ আকারবিশিষ্ট পাত্র দেখিয়াও এক মৃত্তিকাই তাহাদের উপাদান কারণ বলিয়া ধারণা থাকে, অথবা দিবাভাগে

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গমন পূর্ব্বক রৌদ্র দেখিয়া এক সূর্য্যের জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না, কিম্বা যাঁহারা ভুবায়ুর সর্ব্বব্যাপকতা ধর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তাঁহারা দেশভেদে তাহার অভাব কুত্রাপি উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সেই প্রকার, যে সাধকের চৈতন্যোদয় হয়, সে সাধক আর কাহাকেও দোষারোপ করিতে পারেন না। কারণ, তিনি ছোট বড়, পাপী পুণ্যবান, অধম উত্তম, সকলেরই মধ্যে এক অখণ্ড চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া থাকেন। সে অবস্থায় অর্থাৎ চৈতন্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে কাহাকে ইতর এবং কাহাকেই বা শ্রেষ্ঠ বলা যাইবে? যেমন, "ময়রার দোকানে এক চিনিতে মট প্রস্তুত হয়। মটের আকার নানাপ্রকার কিন্তু মিষ্টতা কাহার কমবেশি হয় না।" যাঁহার সর্ব্বত্রে চৈতন্য স্ফূর্ত্তি হয়, তাঁহার মনে সর্ব্বদা অবিচ্ছেদ ভাববশতঃ সুখ কিম্বা দুঃখ আসিতে পারে না। সুতরাং এমন ব্যক্তি গুণাতীতাবস্থায় অবস্থিতি করেন। এইরূপ চৈতন্য-জ্ঞানী ব্যক্তির অবস্থা দ্বিবিধ। যখন সর্ব্ব পদার্থের মধ্যে অখণ্ড চৈতন্যের বিকাশ দেখিয়া থাকেন, তখন আপনাকেও তাহার অন্তর্গত বোধ করিলে, গুণাতীতাবস্থা ঘটিয়া থাকে। সেই সাধকের আর কোন প্রকার সঙ্কল্প না থাকায় চৈতন্যে মন বিলীন হইয়া আপনাকেও হারাইয়া ফেলেন। এই অবস্থাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি কহে। যখন চৈতন্যের নিত্যভাব হইতে লীলায় মন নিয়োজিত হয়, তখন একের নানাবিধ কাণ্ড দেখিয়া চৈতন্য-জ্ঞানী আনন্দে মাতিয়া উঠেন। যেমন স্বর্ণরাশির এক অবস্থা এবং তাহা হইতে নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিলে কত শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে থাকে। এই অলঙ্কার ধারণ করিলে মনে যে প্রকার আনন্দ হয়, কেবল সুবর্ণ খণ্ড দ্বারা তাহা হয় না। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "সকল বস্তুই নারায়ণ। মনুষ্য নারায়ণ, হাতি নারায়ণ, অশ্ব নারায়ণ, লম্পট নারায়ণ, সাধু নারায়ণ। আমি দেখি যে, তিনি নানা ভাবে, নানা আধারে, খেলা করিতেছেন।" এই খেলা দেখিয়া চৈতন্য-জ্ঞানী নিত্যানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত অদ্বৈত-জ্ঞানীর নিকট আপনার পর থাকে না, সাধু অসাধুর জ্ঞান থাকে না। রামকৃষ্ণদেব আরও বলিতেন, "আমি গৃহস্থের মেয়েদের দেখি যে, আমার সচ্চিদানন্দময়ী মা ঘোমটা দিয়া সতী সাজিয়া রহিয়াছে, আবার যখন মেছোবাজারের মেয়েরা বারাণ্ডার উপর হুকো হাতে ক'রে মাথার কাপড় খুলে গয়না পরে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমি দেখি যে, আমার সচ্চিদানন্দময়ী মা খান্‌কী সেজে আর এক রকম খেলা কচ্চে।"

রামকৃষ্ণদেব যখন প্রণাম করিতেন, তখন বলিতেন, "ওঁ কালী, ব্রহ্মময়ী, জ্ঞানময়ী, আনন্দময়ী, মা, তুমি তুমি তুমি তুই তুই তুই; আমি তোমাতে, তুমি আমাতে; জগৎ তুমি, জগৎ তোমাতে; তুমি আধার,তুমি আধেয়; তুমি ক্ষেত্র, তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ, তুমি খাপ, তুমি তরোয়াল; (সময়ান্তরে আমি খাপ, তুমি তরোয়াল" বলিতেন)। জীবাত্মা ভগবান্, ব্রহ্মাত্মা ভগবান্; নিত্যলীলা, সরাট বিরাট; ব্যষ্টি সমষ্টি; ভগবান্ ভাগবৎ ভক্ত; গুরু, কৃষ্ণ বৈষ্ণব; জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাধুর চরণে প্রণাম, অসাধুর চরণে প্রণাম, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গের চরণে প্রণাম, নর নারীর চরণে প্রণাম, আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীর চরণে প্রণাম;" ইত্যাকার বর্ণনা করিতেন। অদ্বৈত জ্ঞানের এত রস, এত মধুরতা! তাই রামকৃষ্ণদেব "অদ্বৈত জ্ঞান" আঁচলে বাঁধিতে বলিতেন। তিনি যে কি চক্ষে সকলকে দেখিতেন, তাহা আমরা বুঝিতে অপারক। আমরা অদ্বৈতজ্ঞানের কথা শুনিয়াছি এবং অনেকের মুখেও শ্রবণ করা যায়, কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের ন্যায় কাহার ভাব দেখা যায় না। সকলকে এক সূত্রে তিনিই গ্রথিত দেখিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নিকট সকলেই সম-আদরণীয় হইতেন কিন্তু এই স্থানে আর একটী কথা আছে। তিনি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, "গঙ্গা, সাগর, পাতকোয়া, পুকুর, মুখের লাল, এ সকল জলই এক, কিন্তু কোন জলে নাওয়া খাওয়া চলে এবং কোন জলে হাত পা ধোয়া চলে এবং কোন জলে সে সকল কার্য্য হয় না।" সেইরূপ, যখন কেহ কোন ভাবে থাকিবেন, সেই ভাব যাহাদের সহিত মিলিবে, অর্থাৎ তাহাদের কর্ত্তৃক তাহার নিজ ভাবে কোন প্রকার ব্যাঘাত না জন্মে, সেই সকল ব্যক্তির সহবাস করিবে; তথায় ব্রহ্মজ্ঞান নহে। তখন "লীলা" এ কথা যেন ভুল না হয়। যেমন স্ত্রীজাতি মাত্রেই এক, তাই বলিয়া মাতা, স্ত্রী, ভগ্নি, ভাগ্নির সহিত একভাব কদাপি ভাবরাজ্যে চলিতে পারে না। ভাবে সকলই স্বতন্ত্র, তাহাদের কার্য্য স্বতন্ত্র, কিন্তু সে স্থলে ব্রহ্মজ্ঞান আনিলে অর্থাৎ সকলই একবোধ করিয়া ভাবের বিপর্য্যয় করিলে মহাবিভ্রাট হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, "কোন রাজা তাঁহার গুরুর নিকট অদ্বৈতজ্ঞান শ্রবণ করিয়া মহা-আনন্দিত হন। তিনি বাটীর ভিতর আসিয়া রাজ্ঞীকে অনুমতি করেন, 'দেখ রাজ্ঞী, অদ্য আমার শয্যায় বিধবা কন্যাকে শয়ন করিতে বলিবে।' রাণী এই কথা শ্রবণে আশ্চর্য্য হইয়া রাজাকে উন্মাদ জ্ঞান করিলেন এবং কৌশল করিয়া সে দিবস তাঁহার আজ্ঞা কোন প্রকারে পালন

করিলেন না। পরে তিনি শুনিলেন যে, গুরু ঠাকুর রাজাকে অদ্বৈতজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। রাণী তৎক্ষণাৎ গুরুকে আহ্বান করিয়া সমুদয় বলিলেন। গুরু তখন বুঝিলেন যে, হিত করিতে বিপরীত হইয়া গিয়াছে। কোথাকার ভাব কোথায় আনিয়াছে।

গুরুর অনুমতিক্রমে রাণী রাজার আহারের সময় অন্ন ব্যঞ্জনাদির সহিত কিঞ্চিৎ বিষ্ঠা প্রদান করিলেন। রাজা তদ্দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া রাণীকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন। গুরু তখন রাজাকে বলিলেন, 'কেন মহারাজ! তোমার ত অদ্বৈতজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) হইয়াছে, তবে কেন বিষ্ঠা এবং অন্নে ভেদ জ্ঞান কর? যদ্যপি স্ত্রী এবং কন্যা অভেদ হয়, বিষ্ঠা অন্নও অবশ্য অভেদ হইবে। আর যদ্যপি বিষ্ঠা ও অন্নে ভেদ জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে স্ত্রী এবং কন্যায়ও ভেদজ্ঞান রাখিতে হইবে।' রাজা বলিলেন, ইহার অর্থ নাই, কারণ, স্ত্রী জাতি এক। অন্ন ও বিষ্ঠা স্বতন্ত্র পদার্থ। গুরু বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্বারা তাহার কারণ বুঝাইয়া দিয়া ভাবের পার্থক্য দেখাইলেন এবং স্ত্রী ও কন্যার পৃথক ভাব অর্থাৎ এক স্থানে মধুর এবং অপর স্থানে বাৎসল্যভাব উল্লেখ করিয়া তাহার সম্ভোগের স্বতন্ত্র ভাব প্রদর্শন করাইলেন; রাজা তথাপি বুঝিলেন না। অতঃপর, গুরু এক সরোবরে ডুব দিয়া এক শূকররূপ ধারণ পূর্ব্বক অন্ন ব্যঞ্জনের সহিত বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন এবং পুনরায় সেই সরোবরে ডুব দিয়া পূর্ব্বাকার ধারণ করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, 'দেখ রাজা' যদ্যপি তোমার জামাতার আকার ধারণ করিতে পার, তাহা হইলে কন্যার সহিত সহবাসে অধিকারী হইবে। নতুবা পিতৃভাবে মধুরের ভাব রাখা যায় না।" যাঁহারা অদ্বৈতজ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা এই কথার মর্ম্মোদ্ধার করিয়া যেন নিজ নিজ ভাব রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। অদ্বৈতজ্ঞানে ভাব নাই এবং ভাবে অদ্বৈতজ্ঞান থাকিতে পারে না। যেমন আলোক থাকিলে অন্ধকার এবং অন্ধকারে আলোকের অভাব অনুমিতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ অদ্বৈতজ্ঞান এবং ভাব, দুইটী স্বতন্ত্র অবস্থার কথা।

গুরু-তত্ত্ব।

৯১। যাঁহার দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিদূরিত হইয়া জ্ঞান চক্ষু বিকশিত হয়, তাঁহাকে গুরু বলে।

৯২। গুরু দ্বিবিধ, শিক্ষা গুরু এবং দীক্ষা গুরু।

যাঁহাদের উপদেশে জগতের জ্ঞান জন্মে, তাঁহাদের শিক্ষা গুরু কহে। যেমন মাতা, পিতা, শিক্ষক ইত্যাদি। শিক্ষা গুরুর মধ্যে মাতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, প্রথমে প্রায়ই তাঁহার নিকট পদার্থ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা যায়। পরে পিতা, তদনন্তর শিক্ষক এবং সর্ব্বশেষে গ্রন্থকর্ত্তাগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিবিশেষকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

আধ্যাত্মিক বা চৈতন্য জগতের উপদেষ্টাকে দীক্ষা বা মন্ত্র-গুরু কহে। যে সময়ে জীবগণ বিষয়ে উপর্য্যুপরি ভগ্নাশ্বাস হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইবার মানসে বাস্তবিক ব্যাকুলিত হন, তখন তাঁহাদের পরিত্রাণের জন্য স্বয়ং ঈশ্বরই মনুষ্যবেশে আগমনপূর্ব্বক মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। মন্ত্র সাধন দ্বারা,তাঁহারা অনায়াসে ভবভয় হইতে পরিমুক্তি লাভপূর্ব্বক পূর্ণব্রহ্মের নিত্য ও লীলা-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যান। এই নিমিত্ত আমাদের শাস্ত্রে দীক্ষা গুরুকে স্বয়ং ভগবান্-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে উপরি উক্ত দ্বিবিধ গুরুর মধ্যে, শিক্ষা গুরুর সম্বন্ধে বিশেষ বিপর্য্যয় সংঘটিত না হওয়ায়, তাঁহাতে কাহার কোন প্রকার সংশয় হয় না। কিন্তু দীক্ষা গুরুর স্থলে অতি ভয়ানক বিশৃঙ্খল সমুপস্থিত হইয়াছে। দীক্ষা প্রদান করা এক্ষণে এক প্রকার ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা গুরুর আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদের বাস্তবিক বর্ত্তমান অবস্থা বিচারে দীক্ষা গুরু বলা যাইতে পারে না। শাস্ত্র যে গুরুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন, তাহা এ গুরু নহেন। কারণ, দীক্ষা প্রাপ্তির পরে পুনরায় সাধুসঙ্গ করিবার প্রয়োজন থাকে না। দীক্ষা মাত্রেই তাঁহার পূর্ণ মনোরথ হইয়া যায়।

যাঁহারা শিষ্য ব্যবসায়ী, তাঁহাদের সেই জন্য দীক্ষা গুরু না বলিয়া শিক্ষা গুরু বলাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এ প্রকার গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহারা যে সাধুর দ্বারা তাঁহাদের ইষ্ট দর্শন করেন, তাঁহাকেই তাঁহাদের দীক্ষা গুরু এবং ভগবানের-স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত।

যদিও এ প্রকার দীক্ষা গুরুকে শিক্ষা গুরু বলিয়া উল্লিখিত হইল, কিন্তু দীক্ষিতদিগের পক্ষে যে গুহ্যতম ভাব নিহিত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা গুরুকরণ প্রথায় বিশেষ দোষ হইতে পারে না; বরং বিলক্ষণ কল্যানের সম্ভাবনা। কথিত হইয়াছে যে, জীবের অনুরাগের দ্বারা দীক্ষা গুরু লাভ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান দীক্ষাপ্রণালীতে "সাধুসঙ্গ" উল্লেখ থাকায় এক কথাই হইতেছে। যে ব্যক্তি মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সাধন কার্য্যে বিরত থাকিবেন, তাঁহার কস্মিন্ কালে ইষ্টলাভ হইবে না। এস্থলে অনুরাগের অভাব হইয়া যাইতেছে। যদ্যপি নিজের অনুরাগ বা স্পৃহা ব্যতীত ঈশ্বর লাভ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে বর্ত্তমান ব্যবসায়ী-গুরুরা অব্যাহতি পাইতেছেন। তাঁহারা মূর্খই হউন আর পণ্ডিতই হউন, সাধুই হউন বা লম্পটচূড়ামণিই হউন, শিষ্যের সহিত কোন সংস্রবই থাকিতেছে না। কারণ, যে শিষ্যের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, তাহার মন প্রাণ সর্ব্বদাই ঈশ্বর পাদপদ্মে থাকিবে, সুতরাং অন্তর্য্যামী তাহা জানিতে পারিয়া তদনুযায়ী ফল প্রদান করিবেন। এমন অনুরাগী শিষ্য, যদ্যপি লম্পট গুরুকে ভগবান্ জানিয়া পূজা করেন, তাহা হইলে তাঁহার অভীষ্ট অবশ্যই পূর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে গুরুকে লম্পট বা অন্য কোন দোষ সংযুক্ত দেখিয়া, তাহার ঈশ্বর-ভাব বিদূরিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার পতন হওয়া অবশ্য সম্ভব। কারণ শিষ্যের মনে আর তখন ঈশ্বরভাব রহিল না। ঈশ্বর লাভ করিতে যখন ঈশ্বর চিন্তারই প্রয়োজন, তখন মনোমধ্যে অন্য কোন চিন্তা বা ভাব উপস্থিত রাখা অনুচিত। মনে যখন যে ভাব আসিবে, তখন তাহারই কার্য্য হইবে; এই নিমিত্ত মনে ঈশ্বর-ভাব থাকিলে পরিণামে ঈশ্বরই লাভ হইয়া থাকে।

যাঁহারা মন্ত্র গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। যদ্যপি প্রকৃত দীক্ষা গুরু লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে শাস্ত্র বাক্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে যে পর্য্যন্ত মন্ত্র না আইসে, সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত কিম্বা যে গুরুর নিকট মন্ত্র গৃহীত হইবে অথবা যে ইষ্টরূপ প্রাপ্ত হইবে, ঈশ্বর জ্ঞানে তাহাই এক মনে ধ্যান করিলে তাহাতে কখন বিফলমনোরথ হইতে হইবে না।

গুরুদিগের অবস্থা দেখিয়া এবং বর্ত্তমান শিক্ষার দোষে অনেকেই গুরু স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। কি শিক্ষা গুরু, কি দীক্ষা গুরু, বর্ত্তমানে কাহারই মর্য্যাদা নাই। কেহ কেহ গুরু স্বীকার করা অতীব গর্হিত এবং ঈশ্বরের

অপমানসূচক কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করেন। পাঠক পাঠিকা ও শ্রোতাগণ সাবধান হইবেন। এ প্রকার কথার এক পরমাণু মূল্য নাই। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের যে কতদূর ভ্রম, তাহা বালকের নিকটেও অবিদিত নাই। কারণ, শিক্ষক বা উপদেষ্টার সাহায্য ব্যতীত আমাদের একটী বর্ণ শিক্ষা অথবা জগতের পদার্থ লাভের সম্ভাবনা কোথায়? যাঁহাদের দ্বারা আমরা জ্ঞানী হইলাম, তাঁহাদের আসনচ্যুত করিয়া সেই আসনে আপনি উপবেশন পূর্ব্বক আপনাকে অদ্বিতীয় জ্ঞান করা যারপরনাই অকৃতজ্ঞ ও বর্ব্বরের কার্য্য।

যে পর্য্যন্ত জীবের আমিত্ব জ্ঞান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার আত্মোন্নতির জন্ত লালায়িত হয় এবং সে পর্য্যন্ত উপদেষ্টারও অবশ্য প্রয়োজন রহিয়াছে। জড়শাস্ত্রই হউক, বৈষয়িক শাস্ত্রই হউক, কিম্বা তত্ত্বশাস্ত্রই হউক, যাহা কিছু অধ্যয়ন করা যায়, তাহাতেই গুরুকরণ করা হইয়া থাকে। মনুষ্যরূপী গুরু ব্যতীত কোন কার্য্যই হইতে পারে না। হয় মনুষ্য রূপে সশরীরে শিষ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রদান করেন, অথবা গ্রন্থরূপে সে কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। যদিও গ্রন্থ এবং মনুষ্য এক পদার্থ হইল না, কিন্তু গ্রন্থের কাগজ কিম্বা অক্ষর শিক্ষা করা গ্রন্থ পাঠের উদ্দেশ্য নহে। গ্রন্থ মধ্যে যে সকল "ভাব" গ্রন্থকর্ত্তা কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাই উদ্ধার করা পাঠকের কার্য্য; সুতরাং এস্থলে সেই গ্রন্থকর্ত্তার মতে পরিচালিত হইতে হইল। অতএব সেই গ্রন্থকারকেই গুরু বলা যাইবে।

শিক্ষা গুরু এবং দীক্ষা গুরু ব্যতীত জীবের উপায় নাই। এ কথা উপর্য্যুপরি বলা আবশ্যক। যেমন সঙ্গীত শিক্ষার্থী একখানি স্বরলিপি সংগ্রহ করিয়া আপনি সা-রি-গা-মা, সাধন করিতে প্রয়াস পাইলে যে তাহার বিফল উদ্যম হইবে, তাহার সন্দেহ কি? তেমনই আধ্যাত্মিক সাধনের বহুবিধ শাস্ত্র ও প্রকৃত সাধক গুরুর প্রয়োজন। সাধক না হইলে সাধন প্রণালী কে শিক্ষা দিবেন? কিন্তু এ প্রকার গুরু অন্বেষণ করিয়া বহির্গত করা অতি অল্প ব্যক্তিরই সাধ্যসঙ্গত হইবার সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত এ প্রকার চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের করুণার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিলে, তিনি সময়ানুযায়ী গুরু প্রেরণ করিয়া অনুরাগী ভক্তের মনোবাসনা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। এ কথায় এক তিলার্দ্ধ সংশয় নাই। আমরা জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

যাঁহারা ধ্রুব চরিত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের কথার যথার্থতা

অনুভব করিতে পারিবেন। ধ্রুব তাঁহার মাতার প্রমুখাৎ পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ করিয়া অরণ্যে অরণ্যে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি কখন বৃক্ষকে, কখন হরিণকে পদ্মপলাশলোচন বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না, কে তাঁহার ইষ্টদেবতা। যখন যাহাকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার মনে পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ, এই কথা অবিচলিত ভাবে ছিল। সেই নিমিত্ত অন্তর্য্যামী শ্রীহরি প্রথমে নারদকে প্রেরণপূর্ব্বক ধ্রুবকে দীক্ষিত করিয়া, পরে আপনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করাই গুরুকরণের উদ্দেশ্য। এস্থানে গুরু হেতুমাত্র হইতেছেন। হেতু এবং উদ্দেশ্য এক নহে কিন্তু উহারা পরস্পর এরূপ জড়িত যে, হেতু না থাকিলে উদ্দেশ্য বস্তু লাভ হয় না কিন্তু যে পর্য্যন্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত হেতু ত্যজনীয় নহে। উদ্দেশ্য লাভ হইলে হেতু আপনি অন্তর্হিত হইয়া যায়; তাহা কার্য্যের অন্তর্গত নহে। গুরুর দ্বারা ইষ্টলাভ হয় সত্য কিন্তু ইষ্টদর্শনের পর আর "গুরু-জ্ঞান" থাকিতে পারে না। তখন উদ্দেশ্যতেই মন একাকার হইয়া যায়। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব কহিয়াছেন যে, "**সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।**" ধ্রুব নারদপ্রদত্ত দ্বাদশাক্ষরীয় মন্ত্র দ্বারা যখন ভগবানের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথায় নারদের উপস্থিত থাকার কোন উল্লেখ নাই। ইহাতেই উপরোক্ত ভাব সমর্থন করা যাইতেছে।

গুরুকরণ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, তাহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাঁহার দীক্ষা গুরুর প্রতি অটল বিশ্বাস এবং ভক্তি থাকিবে, তাহার কখন কোন আশঙ্কা হইতে পারে না, কিন্তু যাঁহার তাহাতে সন্দেহ হইবে, তাঁহার তাহা না করাই কর্ত্তব্য। যে কেহ গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়া ঈশ্বর আরাধনা করিতে চেষ্টা পাইবেন, তাঁহার তাহাতে কদাচিৎ সুফল ফলিবে। কারণ, যেমন বিদ্যাশিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কথায় বিশ্বাস না করিলে কখন বিদ্যালাভ করিতে পারে না, সেইরূপ গুরুবাক্যে বিশ্বাস চাই। গুরুর বাক্য বিশ্বাস করিতে হইলে গুরুকেও বিশ্বাস করিতে হইবে।

এই স্থানে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, গুরুকে ভগবান্ না বলিয়া ব্যক্তিবিশেষ জ্ঞান করিলে কি ক্ষতি হইবে? তাঁহাকে ভগবান্ বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত কথা বলা হইবে; কারণ, সৃষ্ট ও সৃষ্টিকর্ত্তা কখন এক হইতে পারে না। গুরুকে

ভগবানের স্বরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে ভক্ত যে রূপে যে নামে ঈশ্বরকে উপাসনা করেন, ভগবান্ সেইরূপেই তাঁহার বাসনা সিদ্ধ করিয়া থাকেন। গীতার এই বাক্য যদ্যপি অসত্য হয়, তাহা হইলে সত্য কি তাহা কেহ কি নির্ণয় করিয়া দিতে পারেন? বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদির মর্য্যাদা আর থাকিতে পারে না। সাধু ভক্তদিগের উপদেশের সারভাগ বিচ্যুত হইয়া যায়। বিশেষতঃ জড়শাস্ত্রমতে যে প্রকারে এই পৃথিবী পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে গীতার ঐ ভাবের বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন যে পাত্রে জল রক্ষিত হয়, উহা সেই পাত্রাকারে পরিণত হইয়া থাকে। গোলাকার পাত্রে গোলাকার জল লক্ষিত হয় বলিয়া চতুষ্কোণবিশিষ্ট পাত্রস্থিত চতুষ্কোণ জলের কি পার্থক্য বলিতে হইবে? এই নিমিত্ত গুরুর মূর্ত্তি ভাবনার পদ্ধতি প্রতি কোন দোষারোপ হইতে পারে না কিন্তু পুনরায় বলিতেছি, যে কেহ গুরুর মূর্ত্তি চিন্তা করিবেন, তাঁহার মনে মনুষ্য বুদ্ধি কদাচ স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। মনুষ্য-ভাব আসিলেই ঈশ্বরত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

হেতু যাহাই হউক, ভাবই শ্রেষ্ঠ। যেমন, রজ্জু দর্শনে সর্প ভ্রম হইলেও আতঙ্কে মনুষ্যের মৃত্যু হইতে পারে। আবার সর্প দর্শনে যদ্যপি রজ্জু জ্ঞান হয়, তাহা হইলে তাহার কোন আশঙ্কাই হইতে পারে না। মনুষ্যেরা এমনই ভাবের বশীভূত যে, তদ্দ্বারা জীবন রক্ষা ও মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে। যখন কেহ কাহার আত্মীয়ের মুমূর্ষাবস্থা উপস্থিত দেখিয়া শোক সাগরে নিমগ্ন হয়, তখন চিকিৎসক মৃতপ্রায় ব্যক্তির জীবনের আশার কথা বলিলে সেই ভগ্নহৃদয়ও উত্তেজিত হইয়া থাকে; ইহার তাৎপর্য্য কি? ভাব দ্বারা মন পরিচালিত হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা মস্তিষ্কেরও কার্য্য হইয়া থাকে। মনের অবসাদন হইলে মস্তিষ্কও আক্রান্ত হয়। এই নিমিত্ত মস্তিষ্ক হইতে যে সকল স্নায়ু উৎপন্ন হইয়া ফুস্‌ফুস্ ও হৃদপিণ্ডকে কার্য্যক্ষম করিয়া থাকে, তাহারাও পরম্পরা সূত্রে অবসন্ন হইয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া ফেলে। অথবা আশ্বাস বাক্যরূপ উত্তেজক ভাব মনোময় হইলে, স্নায়ুবৃন্দেরা উত্তেজিত হইয়া অবসন্নপ্রায় হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে।

ভাবের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে ইউরোপে নানাবিধ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে সকলেই একবাক্যে ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান প্রচলিত গুরুকরণ প্রথা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ উপসংহার করা যাইতেছে। গুরুকরণ করা অতি আবশ্যক। যাঁহার বিশ্বাস

ও ভক্তি আছে, তাঁহার দিন দিন উন্নতিই হইয়া থাকে। গুরুকরণের দ্বারা বিশ্বাসীর কখন অবনতি হয় না। তাঁহার ক্রমে প্রেমের সঞ্চার হয় কিন্তু গুরুর প্রতি যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তাঁহাদের গুরুকরণ করা যারপরনাই বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাতে শিষ্যের অবনতি হয় এবং দেশেরও অনিষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য আমরা বলি যে, যাঁহার যে প্রকার অভিরুচি, তাঁহার সেই প্রকারেই পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য। এক জনের দেখিয়া আপনার ভাব পরিত্যাগ করা কখন যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহাতে বিষময় ফল ফলিয়া থাকে।

কথিত হইল যে, শিষ্য আপন অনুরাগে ভগবান্‌কে লাভ করিয়া থাকেন, এবং প্রকৃত পক্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু গুরুদিগের চরিত্র দোষ হইলে ও তাঁহারা অবিরত কদর্য্য কার্য্যে অনুরক্ত থাকিলে, তাহাতে অপরিপক্ক শিষ্যের সাধনের অতিশয় বিঘ্ন হইতে পারে। শিষ্যের আদর্শ স্থলই গুরু। এমন অবস্থায় যাঁহারা শিষ্য ব্যবসায়ী হইবেন, শিষ্যদিগের সাধনানুকূল কার্য্য ব্যতীত তৎপ্রতিকূলাচরণে তাঁহাদের কদাচ লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। গুরু যাহা করিবেন, শিষ্য তাহাই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবে। পাপ কার্য্য সহজে আয়ত্ত হয় সুতরাং গুরুর পাপ কার্য্যগুলি শিষ্যেরা বিনা সাধনে শিক্ষা করিয়া থাকে। আমরা অনেক গুরুকে জানি, যাঁহারা লাম্পট্য, মিথ্যা কথা ও প্রতারণাদি কার্য্যে বিশিষ্টরূপে পারদর্শী থাকায়, তাঁহাদের শিষ্যেরা তাহাই শিক্ষা না করুন, কিন্তু আত্মোন্নতি পক্ষে তাঁহাদের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, দীক্ষা প্রদান করিবার পূর্ব্বে গুরু যদ্যপি আপনাদিগের কর্ত্তব্যগুলি অবগত হইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে গুরু-শিষ্যের বিরুদ্ধে আর কোন কথা কর্ণগোচর হইবে না।

গুরুই সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

৯৩। গুরু আর কে? তিনিই (ঈশ্বর) গুরু।

গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইল। ইহার সার কথাই এই যে, গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করা এবং তাঁহার কথায় বিশ্বাস করা; যে শিষ্যের এই শক্তি না জন্মিবে, তাহার কস্মিন্‌কালে ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিবে না। অনেক সম্প্রদায় আছে, যথায় গুরু স্বীকার করা হয় না, তথাকার লোকদিগের যে প্রকার অবস্থা, তাহা সকলের চক্ষের অগ্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করিলে শিষ্যের বহুল লাভের সম্ভাবনা। ঈশ্বর সাধন করিতে

হইলে, মন প্রাণ ঈশ্বরে সংলগ্ন রাখিতে হয়। যে সাধক যে পরিমাণে ঈশ্বরের দিকে যত দূর মন প্রাণ লইয়া যাইতে পারিবেন, সেই সাধক সেই পরিমাণে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। গুরু হইতে মন্ত্র বা উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্র বা উপদেশ ঈশ্বরলাভের পথ বা উপায় স্বরূপ। যাঁহার দ্বারা ঈশ্বরের পথ লাভ করা যায়, তাঁহাতে স্থূলে ঈশ্বরভাব সম্বদ্ধ করিতে পারিলে ঈশ্বর সম্বন্ধে শীঘ্র মন স্থির অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধ হইবার বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। যে সাধক তাহা না করেন, তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। হয় কালী, না হয় কৃষ্ণ অথবা রাম ইত্যাদি কোন না কোন রূপবিশেষে মনার্পণ না করিলে, কোন মতে দুর্দ্দম্য মনকে স্থির করা যায় না। যে সাধক একবার চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই এ কথার সাক্ষ্য দিতে পারেন। যেমন মৃন্ময়ী কালী কিম্বা কাষ্ঠ অথবা প্রস্তরময় শ্রীকৃষ্ণ, বাস্তবিক সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বস্তু নহেন কিন্তু ভাবে তাহা বিশ্বাস করিয়া লইতে হয়, তথায় কাঠ মাটী জ্ঞান থাকিলে কালীকৃষ্ণ বা রামকৃষ্ণ ভাব একেবারেই থাকিতে পারে না, সেই প্রকার গুরু সম্বন্ধেও জানিতে হইবে।

গুরুকে ঈশ্বর বলায় যে কি দোষ হয়, তাহা আপাততঃ আমাদের মস্তিষ্কে কিছুতেই প্রবিষ্ট হয় না। এক সময় গিয়াছে বটে, যখন এ কথাটী বজ্রের ন্যায় কর্ণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইত। আমরা নিজে ভুক্তভোগী, সেই জন্য বর্ত্তমান কালবিচারে এই প্রস্তাবটী ভাল করিয়া উপর্য্যুপরি আলোচনা করিতেছি। গুরু অস্বীকার করায় নিজের অহঙ্কার ব্যতীত অন্য পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কে কার গুরু? এ কথার অন্য তাৎপর্য্য বাহির করা যাইতে পারে না। যাহার হৃদয়ে অহঙ্কারের পর্ব্বত যত্ন পূর্ব্বক স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মুখে এই প্রকার সাহঙ্কারযুক্ত কথা বাহির না হইয়া কি একজন ধর্ম্মভীরু শিষ্যের মুখে বাহির হইবে?

আপনাকে ছোট জ্ঞান করাই শিষ্যের ধর্ম্ম। আপনাকে অজ্ঞান মনে করাই শিষ্যের ধর্ম্ম, আপনাকে অপবিত্র বলিয়া বিবেচনা করাই শিষ্যের ধর্ম্ম। এই প্রকার শিষ্যই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন। শিষ্য যদ্যপি গুরুর সমান হয়, তাহা হইলে কে কাহাকে শিক্ষা দিবে? সকলেই যদ্যপি ধনী হয়, তাহা হইলে ভিক্ষুক কে? সকলেই যদ্যপি জ্ঞানী হন, তাহা হইলে অজ্ঞানী কে? সকলেই যদ্যপি ঈশ্বর-জ্ঞানী হন, তাহা হইলে ঈশ্বর

অজ্ঞানী কে? কার্য্যক্ষেত্রে তাহা হয় না এবং হইবার নহে। আপনাকে অজ্ঞানী এবং দীনভাবে পরিণত কর‍্যাই ধর্ম্ম-রাজ্যে প্রবেশ করিবার প্রথম সেতু। যে কেহ এই সেতু পার হইতে না পারেন, তাঁহার কি প্রকারে ধর্ম্মরাজ্য মধ্যে গমন করিবার অধিকার জন্মিবে? দীনভাব লাভ করিতে হইলে আপনাকেএক স্থানে সেই ভাবের কার্য্য দেখাইতে হইবে। সে স্থান কোথায়? দৃশ্য জগতে তাহার স্থান কাহার ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে? এইস্থান গুরুর শ্রীপাদপদ্ম। তন্নিমিত্ত ভক্তি ও জ্ঞান শাস্ত্রে গুরুকে ঈশ্বর বলিয়া বার বার উক্ত হইয়াছে। পৃথিবীতে যত বড় লোকই হউন, তাঁহাদের নিকট কখন কেহ সম্পূর্ণ ভাবে মস্তকাবনত করিতে পারে না। সকলেই সময়ে সময়ে আপনাদিগের স্বাধীন বৃত্তির পরিচয় দিবার অবসর পাইলে ছাড়িয়া কথা কহে না, কিন্তু গুরুর নিকট তাহা হইবার নহে। যে শিষ্য প্রকৃত শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছে,তাহার এইভাব। শিষ্য কখন গুরুর সমক্ষে বাচালতা কিম্বা দাম্ভিকতার ভাব দেখাইতে পারে না অথবা কখন এপ্রকার ভাবের লেশমাত্র তাহাকে অজ্ঞাতসারেও স্পর্শ করে না; ফলে, এই শিষ্যের হৃদয় সর্ব্বদা দীনভাবে অবস্থিতি করে। দীন ব্যক্তির জন্যই দীননাথ ভগবান্। যে ব্যক্তি অনাথ, তাহার জন্যই অনাথনাথ; যে ব্যক্তি ভক্ত, তাহার জন্যই ভক্তবৎসল; দাম্ভিকনাথ ভগবানের নাম নহে। বর্ব্বরনাথ তিনি নহেন, কপটীর ঈশ্বর তিনি নহেন, অকৃতজ্ঞের ভগবান্ তিনি নহেন। তাহাকে যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবার জন্য লালায়িত হন, তিনি আপনাকে দীন, অনাথ, ভক্ত, ইত্যাকারে গঠিত করিতে চেষ্টা করিবেন। অতএব সেই প্রকার গঠন লাভ করিবার উপায় কোথায়? শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র স্থান।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশে পূর্ব্বকালীন গুরুকরণ প্রণালীমতে দেখা যায় যে, শিষ্য গুরুর আশ্রমে কিয়ৎকাল বাস করিবে। গুরু এই অবকাশে শিষ্যের স্বভাব চরিত্র পরিক্ষা করিবেন এবং শিষ্যও গুরুর কার্য্যকলাপাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। নিয়মিত কালান্তে যদ্যপি গুরু শিষ্য উভয়ে উভয়কে মনোনীত করেন, তাহা হইলে গুরু শিষ্যসম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়া যায়। এই নিয়ম যদিও পুরাকালে সম্প্রদায়বিশেষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহা সর্ব্বত্রে গ্রাহ্য হইত না। কারণ,তৎকালে ঋষি মুনিরাই গুরুপদবাচ্য হইতেন, তাঁহাদের পরীক্ষা লইবার সামর্থ্য অতি অল্প লোকেরই থাকিত, সুতরাং বিনা তর্কে লোকে শিষ্যত্ব স্বীকার করিত। সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরে

কেহ সত্যভ্রষ্ট হয় নাই, সুতরাং গুরু মিথ্যা উপদেশ দিয়া দিক্‌ভ্রম জন্মাইবেন, এ প্রকার সন্দেহ কখন শিষ্যের মনে উদয় হইত না, তজ্জন্য গুরুশিষ্য ভাবও অবিচলিতভাবে চলিয়া আসিয়াছিল। কলিকালে সত্যের সঙ্কুচিতাবস্থা উপস্থিত হওয়ায় সকলের মনে মিথ্যা বোধ হইয়া গিয়াছে। কেহ যেন সত্য কহেন না, এই প্রকার সংস্কার বশতঃ সকলেই সকলের কথায় সন্দেহ করিয়া থাকেন। এই ভাব যখন গুরু শিষ্য মধ্যেও উপস্থিত হইল, তখন কাজে কাজেই গুরুকে চিনিয়া লইবার জন্য কোন কোন মতে কথিত হইল। বর্ত্তমান কালে এই প্রকার ভাব বিশিষ্টরূপে প্রচলিত হইয়াছে। কালের অবস্থা যাহা, তাহা লঙ্ঘন করিবে কে?

অধুনা যে স্থলে গুরুকরণ করা হয়, তথায় এই নিয়মই চলিতেছে। আপন অপেক্ষা যাঁহাকে উচ্চাধিকারী মনে হয়, তাঁহাকেই গুরু মনে করেন, তাঁহারই কথা বিশ্বাস করেন এবং তৎসমুদয় ধারণা করিতে চেষ্টা করেন।

গুরু শিষ্য হইতে মহান্, এ ভাব চিরকালই আছে। কথিত হইল যে, পূর্ব্বকালে গুরু শিষ্য একত্রে বাস করিয়া তবে সে সম্বন্ধ স্থাপন করা হইত, এ কথা লইয়া আমাদের আন্দোলন করায় এক্ষণে কোন ফল দর্শিবে না। আমরা কেন গুরুকরণ করিতে চাই? কিসে জ্ঞানলাভ হইবে, কেমন করিয়া ভগবানের দর্শন হইবে, কেমন করিয়া মুক্তি লাভ করা যাইবে, ইত্যাকার মনের অভিলাষ জন্মিলে আমরা তত্ত্ব অন্বেষণ করিয়া থাকি। এ সকল ভাব বাস্তবিক যাহার হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি সংসারের তাড়নায় জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল, যিনি বিষয়াদির সুখের মর্ম্মভেদ করিয়াছেন, যিনি কামিনী ও কাঞ্চনের আভ্যন্তরিক রহস্য জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই যথার্থ শিষ্যের যোগ্য এবং তিনিই সহজে গুরু লাভ করিয়া থাকেন। এ প্রকার ব্যক্তি কখন গুরু লইয়া বিচার করেন না। যাঁহারা গুরু লইয়া বিচার করেন, তাঁহাদের তখনও গুরুর প্রয়োজন হয় নাই, অর্থাৎ ধর্ম্মের অভাব জ্ঞান হয় নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে।

গুরু-করণ উচিত কি না?

৯৪। প্রত্যেক্ ব্যক্তির গুরুকরণ আবশ্যক। যে পর্য্যন্ত যাহার গুরুকরণ না হয় সে পর্য্যন্ত তাহার দেহ শুদ্ধি হয় না, সে পর্য্যন্ত তাহার ঈশ্বরলাভ করিবার কোন সম্ভাবনাও থাকে না।

আজকাল আমাদের যে প্রকার গুরু-করণ হয়, তাহাকে দীক্ষা গুরু না বলিয়া শিক্ষা গুরু বলিলেই ঠিক হয়। কারণ, তাঁহাদের দ্বারা প্রায় সর্ব্বস্থানে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু শিষ্যের যদ্যপি গুরু-ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তাহার নিজ বিশ্বাসে এবং ভক্তি দ্বারা নিজ কার্য্য সাধন করিয়া লইতে পারে; রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন ;—

৯৫। আমার গুরু যদি শুঁড়ী বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

কোন গোস্বামীর জন্য একটী গোয়ালিনীকে প্রত্যহ নদী পার হইয়া দুগ্ধ দিতে আসিতে হইত। গোয়ালিনী পারের নিমিত্ত যথা সময়ে আসিয়া পৌঁছিতে পারিত না, তজ্জন্য গোস্বামী মহাশয় তাহার উপর বিলক্ষণ ক্রোধান্বিত হইতেন। একদিন গোস্বামী গোয়ালানীকে কহিলেন, তুই এত বেলায় দুধ দিলে আমি আর লইব না। সে কহিল, প্রভু আমি কি করিব, প্রাতঃকাল থেকে নদীর ধারে বসিয়া থাকি, কিন্তু লোক না জুটিলে মাঝি পার করিয়া দেয় না। এইজন্য বসিয়া থাকিতে হয়। গোস্বামী কহিলেন, কেন? লোকে রামনামে ভবসমুদ্র পার হইয়া যায়, তুই রাম বলিয়া নদীটা পার হইয়া আসিতে পারিস্ না! গোয়ালানী সেই রামনাম পাইয়া মনে করিল, ঠাকুর! এত দিন আমায় বলিয়া দিলে ত হইত! আর আমার বিলম্ব হইবে না। সে সেই দিন হইতে প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে দুগ্ধ আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল। গোয়ালিনীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। সে গোস্বামীর দুগ্ধ প্রত্যূষে দিতে পারিল এবং তাহার একটী পয়সাও বাঁচিতে লাগিল। এক দিন গোস্বামী গোয়ালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন রে, এই ত প্রাতঃকালে আসিতেছিস্? কেমন এখন, খেয়া-ঘাটায় আর বিলম্ব হয় না? বেটি তুই মিথ্যা কথা কেন কহিয়াছিস্? গোয়ালিনী কহিল, সেকি প্রভু? আমার মিথ্যা কথা কেন হইবে; আপনি যে দিন সেই কথাটী বলিয়া দিয়াছেন, তদবধি আর আমায় নদী পার হইতে হয় না, আমি রাম রাম বলিতে বলিতে কখন যে নদী পার হইয়া আসি, তাহা জানিতেও পারি না। গোস্বামী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন বটে, আমিই ত তোকে শিখাইয়া দিয়াছি, বেশ বেশ। গোস্বামীর মনে কিছু অবিশ্বাস্ জন্মিল। ভাবিলেন, এ মাগী অবশ্যই মিথ্যা কথা কহিতেছে রাম নামে কি নদী পার হওয়া যায়! কখন নহে। আমি একটা রহস্য

করিয়াছিলাম, এ মাগী তাহা বুঝিতে পারে নাই। যাহা হউক, ব্যাপারটা কি দেখিতে হইবে। এই বলিয়া গোয়ালিনীকে কহিলেন, দেখ্, তুই কেমন করে পার হইয়া যাস্, আমি একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। গোয়ালিনী তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গেল। গোয়ালিনী রাম রাম বলিয়া নদীর উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল, কিন্তু গোস্বামী তাহা পারিলেন না। তিনি নদীতে নামিয়া রাম রাম বলিতে লাগিলেন, কিন্তু যতই অগ্রসর হইলেন, ততই ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। গোয়ালিনী পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গোস্বামীর দুর্দ্দশা দেখিয়া কহিলেন, "ওকি প্রভু! রাম বলিতেছেন, আবার কাপড়ও তুলিতেছেন?"

শিষ্যের বিশ্বাসেই সকল কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত এই স্থানে প্রদত্ত হইতেছে।

কোন গৃহস্থের বাটীতে গুরুঠাকুর আগমন করিয়াছিলেন। গুরুঠাকুর তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়া একদিন শিষ্যের একটী শিশুসন্তানকে সালঙ্কার দেখিলেন এবং ঐ অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিবার নিমিত্ত যারপরনাই তাঁহার লোভ জন্মিয়া গেল। গুরু কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিয়া সহসা শিশুটীর গলদেশ চাপিয়া ধরিলেন, রুদ্ধকণ্ঠ শিশু তৎক্ষণাৎ হতচেতন হইয়া পড়িল। গুরুঠাকুর শিশুর অলঙ্কার গুলি আত্মসাৎ করিয়া কিরূপে মৃত দেহটী স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন, তাহার উপায় চিন্তায় আকুলিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তখন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না এবং কোন সুবিধাও হইল না। তিনি অগত্যা ঐ মৃতদেহটী বস্ত্রাবৃত করিয়া আপনার সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া দিলেন এবং মনে মনে এই স্থির করিয়া রাখিলেন যে, যদ্যপি অদ্য রজনীযোগে কোন দূর স্থানে ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারি, তাহা হইলে ভালই হইবে, নচেৎ কল্য প্রত্যূষে এ স্থান হইতে বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থানকালীন যাহা হয় একটা করিয়া যাইব। এই স্থির করিয়া শিশুটীকে বস্ত্রাবৃত করণ পূর্ব্বক সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া দিলেন।

ধর্ম্মের কার্য্যই স্বতন্ত্র প্রকার, তাহার গতি অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, এবং মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত। গুরুঠাকুর যদিও সকলের অজ্ঞাতসারে এই পৈশাচিক কার্য্যটী সম্পন্ন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তস্থল হইতে ভীষণ হতাশহুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার হৃদয় দগ্ধীভূত করিতে লাগিল। যখন শিষ্য আসিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, গুরুও আশীর্ব্বাদ করিতে চেষ্টা করিলেন,

কিন্তু তাঁহার বাক্য নিঃসৃত হইল না। গুরুর ভাবান্তর দেখিয়া শিষ্যের মনে অতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হইল, শিষ্য কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু! এ দাসের কি কোন অপরাধ হইয়াছে? আমি নিরপরাধী কবে? প্রতি পদে পদেই আমি অপরাধী; প্রভু! দয়াপরবশে সে সকল ক্ষমা করিয়া থাকেন, তজ্জন্যই আমি এখন জীবিত আছি এবং এই সংসারেও শান্তি বিরাজ করিতেছে। প্রভু! কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। গুরু তখন আপনার অন্তরের ভাব বৃথা লুকাইবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, বাপু! তোমার গুরুভক্তিতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট আছি। কয়েক দিবস বাটী ছাড়া হইয়াছি, সেই জন্য আজ আমার মনের কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যভাব জন্মিয়াছে, বিশেষতঃ আসিবার সময় তোমার ইষ্টদেবীর শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা দেখিয়া আসিয়াছিলাম; তিনি কেমন আছেন, অদ্যাবধি কোন সংবাদ পাই নাই। আমি মনে করিয়াছি যে, আগামী কল্য অতি প্রত্যূষেই বাটী যাত্রা করিব। তুমি এ বিষয়ে কোন প্রকার অমত করিও না। শিষ্য এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, ঠাকুর! মাতার সংবাদ আপনাকে আজ দুই দিবস হইল আমি জানাইয়া দিয়াছি; তিনি ভাল আছেন, বিশেষতঃ আগামী বুধবারে আমার নবশিশুর অন্নপ্রাসনোপলক্ষে তিনি শুভাগমন করিয়া এবাটী পবিত্র করিবেন বলিয়াছেন এবং তজ্জন্য বোধ হয় এতক্ষণ শিবিকাও প্রেরিত হইয়াছে। গুরু অমনি উহা সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বলিয়া উঠিলেন, বটে বটে, আমি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি। দেখ বাপু! তোমাকে আমি আমার পুত্রাপেক্ষাও স্নেহ করিয়া থাকি, অনেকক্ষণ তোমায় দেখি নাই, সেই জন্য প্রাণের ভিতর কেমন ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, ভাবিতে ভাবিতে, কেমন একপ্রকার অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সে যাহাহউক, আমার শরীরটা আজ বড় ভাল বোধ হচ্চে না, আমি কিছুই আহার করিব না। আমি এখনি শয়ন করি, তুমিও অন্তঃপুরে গমন কর। গুরুর অসুস্থতার কথা শ্রবণ করিয়া শিষ্য অমনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ গুরুর পাদমূলে উপবেশন পূর্ব্বক পদ সেবায় নিযুক্ত হইলেন। গুরু বার বার উঠিয়া যাইবার জন্য আজ্ঞা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শিষ্য অতি কাতরোক্তিতে কহিতে লাগিল, প্রভু! চরণ ছাড়া করিবেন না! আমার প্রাণেশ্বর অসুস্থ, আমি কিরূপে বাটীর ভিতরে যাইয়া সুস্থ হইব। প্রভু! এই কঠোর আজ্ঞা আমায় করিবেন না। কেন না, আপনার আজ্ঞা আমি উপেক্ষা করিতে পারিব না।

গুরু কি করিবেন. চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে গুরু কহিলেন, বাপু! আমি এখন সুস্থ হইয়াছি, তুমি বাটীর ভিতরে যাও। এই বলিয়া গুরু উঠিয়া বসিলেন! এমন সময় সমাচার আসিল যে, অপরাহ্ণকাল হইতে শিশুসন্তান-টীকে পাওয়া যাইতেছে না। নানাস্থান অনুসন্ধান দ্বারা কুত্রাপি কোন সন্ধান হয় নাই। শিষ্য সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া গুরুকে কহিলেন, প্রভু! যদ্যপি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আজ্ঞা করুন, এক্ষণে কি আহার করিবেন। গুরু কহিলেন, বাপু! আমি আজ কিছুই আহার করিব না। তোমার সহিত কথা কহিতে, তোমার মুখের দিকে চাহিতে আমার লজ্জা হইতেছে। শিষ্য শিরে করাঘাত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে কহিল, প্রভু! বলিলেন কি? এমন মর্ম্মভেদী কথা আপনি কিজন্য দাসের প্রতি প্রয়োগ করিলেন! বুঝিয়াছি প্রভু! বুঝিয়াছি, শিশুসন্তানের অদর্শনে পরিজনেরা বোধ হয় কাতর হইয়াছে, সেই অপরাধে আমি অপরাধী হইয়াছি। প্রভু! আপনার চরণ ধরি, আমায় ক্ষমা করুন। স্ত্রীজাতিরা স্বভাবতঃই দুর্ব্বল, অল্প বিশ্বাসী, তাহারা কেমন করিয়া আপনার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রাখিতে সমর্থ হইবে? যদ্যপি আপনি দয়া করিয়া তাহাদের বিশ্বাস দেন, তাহা হইলে তাহারা বিশ্বাসী হইতে পারে। প্রভু! সে যাহা হউক, আপনি না দয়া করিলে আর উপায় নাই, এই বলিয়া চরণে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। এতক্ষণে গুরুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, হায়! আমি কি বলিব, যে শিষ্য আমার প্রতি এত বিশ্বাস করে, এত ভক্তি করে, যে পুত্রের অকল্যাণ মনে করাও গুরু ভক্তির প্রত্যবায় বলিয়া জ্ঞান করে, তাহার সহিত কি এই নৃশংস ব্যাপার সাজে? বাপুরে! আমায় আর গুরু বলিও না, আমি ডাকাইত, খুনী, আমায় তুমি পুলিসে দাও, আমি তোমার পুত্রহন্তা, ঐ সিন্দুকে তোমার মৃত পুত্রটীকে লুকাইয়া রাখিয়াছি। শিষ্য এই কথা শ্রবণানন্তর করযোড়ে কহিলেন, প্রভু! এই জন্য আপনাকে কি এত ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়? সকলই আপনার ইচ্ছায় হইতেছে। আপনি আমায় সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনি আমার স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়া আমাকে দিয়াছেন; এই ঘর-বাড়ী আপনার, আমায় দাস জ্ঞানে দিনকতক বাস করিতে দিয়াছেন। পুত্র দিয়াছিলেন, আপনার সামগ্রী আপনি লইয়াছেন, ইহাতে আমার ভাল মন্দ কি ঠাকুর! তবে কি আমায় পরীক্ষা করিতেছেন? প্রভু! অন্য যাহাই করুন, কিন্তু মিনতি এই, প্রার্থনা এই, ও পাদপদ্মে ভিক্ষা এই, যেন কখন

পরীক্ষায় না ফেলেন। পরীক্ষা দিতে পারিব না, তাই ঐ চরণাম্বুজে আশ্রয় লইয়াছি। অনুমতি করুন, এখন আমায় কি করিতে হইবে? কি আহার করিবেন বলুন? গুরু নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শিষ্য পুনরায় কহিলেন, প্রভু! আদেশ করুন, দাসের কি অপরাধ মার্জ্জনা হইবে না? গুরু কহিলেন, বাপু! তুমি কি আমার সহিত রহস্য করিতেছ? আমি তোমার পুত্রকে খুন করিয়াছি, আমি খুনী, সরকার বাহাদুর এখনি আমাকে দণ্ড দিবেন। তুমি কেন বলদেখি কালবিলম্ব করিতেছ? বুঝিয়াছি, এ সকল তোমার কৌশল। বোধ হয়, চুপে চুপে ফাঁড়িতে লোক পাঠাইয়াছ, তাহাদের আগমন কাল প্রতীক্ষার জন্য এই সকল বাক্‌চাতুরী হইতেছে। তুমি বাপু অতিশয় চতুর। যদ্যপি এতই গুরুভক্তি তোমার, তবে নদীতে লাস ফেলিয়া দিয়া আইস, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। শিষ্য স্থির হইয়া সমুদয় কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, প্রভু! কিঞ্চিৎ পদধূলি দিন, এই বলিয়া শিষ্য পদধূলি লইয়া মৃতশিশুর মস্তকে সংস্পর্শ করিবামাত্র বালক যেন নিদ্রাভঙ্গের পর জাগিয়া উঠিল। গুরু তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া আপনাপনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, আমার চরণধূলির এত শক্তি, মরা মানুষ বেঁচে যায়! অগ্রে জানিলে এত গোলযোগ হইত না। তাইত আমার চরণের এত গুণ! মরা মানুষ বাঁচে! গুরু ক্রমশঃ আপনার ক্ষমতা স্মরণ করিয়া অভিমানের মূর্ত্তিবিশেষ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পৈশাচিক বৃত্তি ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি অতঃপর একটী বিশিষ্ট ধনশালী শিষ্যের বাটীতে গমন পূর্ব্বক শিষ্যের একটী নানালঙ্কারবিভূষিত সন্তানকে হত্যা করিয়া তাহার সমুদয় অলঙ্কারাদি আত্মসাৎ পূর্ব্বক পদধূলি সংলগ্ন করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন। তিনি বার বার চরণধূলি লইয়া মৃত সন্তানের আপাদ মস্তক আবৃত করিয়া ফেলিলেন, তথাপি বালকটী চৈতন্য লাভ করিল না। গুরুঠাকুর মহাবিপদে পতিত হইলেন এবং কি করিবেন ভাবিয়া ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে শিষ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। গুরুর সম্মুখে মৃত সন্তানটী দেখিয়া একেবারে বিষাদে অভিভূত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় গুরু ঠাকুর আপনার কীর্ত্তি জানাইতে বাধ্য হইলেন। শিষ্য এই কথা শ্রবণ মাত্রে অমনি হস্তস্থিত যষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া যেমন প্রহার করণোদ্যত হইলেন, ইত্যবসরে তাঁহার স্ত্রী তথায় সমাগতা হইয়া স্বামীর হস্ত হইতে যষ্টি কাড়িয়া লইলেন। গুরু শিষ্যপত্নীর প্রতি সবিনয়ে কহিলেন,

"দেখ, ইতিপূর্ব্বে অমুখ শিষ্যের মৃত পুত্র আমার চরণধূলি দ্বারা জীবিত হইয়াছিল, কিন্তু জানি না, আজ কেন তাহা হইল না!" শিষ্যপত্নী এই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই শিষ্যকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন এবং অনতিবিলম্বে তিনি আসিয়াও উপস্থিত হইলেন। শিষ্যকে সমাগত দেখিয়া গুরু রোদন করিয়া উঠিলেন এবং তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বাপু! তুমি সত্য করিয়া বল, আমার চরণধূলিতে তোমার সন্তানটী পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল কি না? শিষ্য প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন, ঠাকুর! নিরস্ত হউন, আপনাকে কাতর দেখিলে আমাদের প্রাণ আকুলিত হয়। আপনার চরণের কত গুণ, তাহা মুখে কি বলিব। আমি এখনি তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। আপনার পাদপদ্মের কত শক্তি, তাহা বেদব্যাসও বর্ণনা করিতে পারেন নাই, পঞ্চানন পঞ্চমুখে সে কাহিনী ব্যক্ত করিতে অশক্ত হইয়া তব পাদোদ্ভব কল্লোলিনীকে মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

গুরু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, বাপু! বাজে কথা এখন রাখ, তুমি বল যে, হাঁ, গুরুঠাকুরের চরণধূলায় আমার মৃত পুত্র জীবিত হইয়াছিল, তাহা না হইলে আমি এ যাত্রায় আর অব্যাহতি পাইব না। এ পুত্রের আর কল্যান নাই, আমি চরণধূলায় বিমণ্ডিত করিয়া দিয়াছি, তথাপি যখন ইহার চেতন হইল না, তখন আর কেন! তুমি আমায় উদ্ধার কর। শিষ্য কহিলেন, ঠাকুর! আমি আপনার দাস উপস্থিত রহিয়াছি, আপনি কেন রহস্য করিতেছেন; আপনার চরণের শক্তি যাহা বলিয়াছি, তাহা বাস্তবিক কথা। একটা মৃত সন্তান কেন, ব্রহ্মাণ্ডের জীব-জন্তু কীট-পতঙ্গ স্থাবর-জঙ্গম অমৃত লাভের জন্য ঐ চরণরেণু প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছে। এই বলিয়া গুরুর চরণধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক মৃত সন্তানটীর মস্তকে সংস্পর্শ করিবামাত্র অমনি সেই বালক জীবিত হইল এবং সম্মুখে তাহার জননীকে দর্শন করিয়া মা মা শব্দে ক্রোড়ে উঠিয়া বসিল। সকলেই চমৎকৃত হইয়া পড়িল। আর কাহার মুখে একটী বাক্য নিঃসৃত হইল না। তদনন্তর শিষ্য-পত্নী কহিলেন, মহাশয়! এই চরণধূলিতে গুরুঠাকুর ইহার প্রাণ দিতে অশক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আপনি সেই ধূলায় কি কৌশলে এই অমানুষ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন? গুরু কহিলেন, দেখ আমি তাড়াতাড়িতে মস্তকে ধূলি প্রদান করিতে ভুলিয়াছিলাম, আমার চরণধূলির গুণ এই যে, মৃত দেহের মস্তকেই প্রয়োগ করিতে হয়, শিষ্য আমার তাহা জানে, আমিও জানি কিন্তু কি জানি কি নিমিত্ত অগ্রে তাহা স্মরণ হয় নাই।

যাহাহউক, তোমরা উভয়ে দেখিলে যে, আমি যাহা কহিয়াছিলাম, তাহা সত্য। প্রথম শিষ্য কহিল, আপনার শক্তি কতদূর তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। শিষ্য-পত্নী আপনার স্বামীকে নিবারণ করিয়া দ্বিতীয় শিষ্যকে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই রহস্যটী প্রকাশ করিয়া বলুন। আমরা গৃহী, গুরুতত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, এই ঘটনার মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। দ্বিতীয় শিষ্য আনন্দিত হইয়া কহিল, এমন গুরু যাহাদের ইষ্ট, তাঁহাদের আমি কোটী কোটী বার প্রণাম করি। মা! তুমি যে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা বাস্তবিক প্রত্যেক নর-নারীর জ্ঞাতব্য বিষয়, তাহার বিন্দুমাত্র ভুল নাই। মা! আমাদের গুরুই সর্ব্বস্ব ধন জানিবেন। গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর। গুরুই সর্ব্ব দেবাদিদেব পূর্ণব্রহ্ম। স্বয়ং হরি গোলকবিহারী জীবের ভবঘোর বিদূরিত করিবার জন্য নররূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সেই গুরু প্রত্যক্ষ কর মা! গুরুর চরণরেণুতে মরামানুষ বাঁচে, মৃততরু পল্লবিত হয়, পাষণ্ড-হৃদয় প্রেমে আর্দ্র হয়, লৌহ সোনা হয়, মূর্খ পণ্ডিত হয়, বদ্ধজীব মুক্ত হয়, অজ্ঞানী জ্ঞানী হয়। প্রথম শিষ্য কহিল, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে অশক্ত হইয়াছি, কারণ গুরুর চরণরেণু সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা কিরূপে সর্ব্ববিধায় সঙ্গত হইতে পারে বলিয়া স্বীকার করি! আপনি একটা অমানুষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সে শক্তি আপনার কি চরণধূলির? চরণধূলির শক্তি স্বীকার করিব না, যে হেতু গুরুঠাকুর তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। দ্বিতীয় শিষ্য কহিল, আমার শক্তি কিছু নহে, আমি সত্য বলিতেছি যে, ঐ গুরুর চরণধূলিরই শক্তি। আপনি কিঞ্চিৎ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করুণ। আমি বলিতেছি যে, গুরুর চরণধূলিরই শক্তি, আমার শক্তি নহে। গুরুঠাকুর নিজ চরণধূলি দিয়াছেন, তাঁহার তাহাতে অনধিকার চর্চ্চা হইয়া গিয়াছে! ও চরণ যুগল আমাদের, আমাদের সর্ব্বস্ব ধন, ঐ চরণের জোরে আমরা না করিতে পারি কি? পরীক্ষা করিয়া দেখুন, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য কি না। ঘটনা সূত্রে, সেই সময় তদ্‌পল্লীস্থ কোন ব্যক্তি সর্পাঘাতে মরিয়া যায়। তাহার আত্মীয়েরা ঐ শবদেহটী সেই সময় অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নিমিত্ত ঐ স্থান দিয়া লইয়া যাইতেছিল। প্রথম শিষ্য জয়গুরু বলিয়া কিঞ্চিৎ চরণরেণু লইয়া মৃত দেহে সংস্পর্শিত করিবামাত্র সেই ব্যক্তি প্রাণ দান পাইল। গুরু ঠাকুর তখন দ্বিতীয় শিষ্যকে কহিলেন, বাপু! আমি তোমাদের

গুরু হই আর যে কেহ হই, আমায় বলিয়া দাও আমার চরণধূলায় তোমরা মরা মানুষ বাঁচাইতে পার, তবে আমি কেন তাহা পারি না? শিষ্য কহিল, ঠাকুর! আমার গুরুর চরণধূলি আমার সর্ব্বস্ব ধন, আপনার গুরুর চরণ ধূলি আপনার সর্ব্বস্ব ধন জানিবেন। এই নিমিত্ত উপর্য্যুপরি কথিত হইতেছে যে, রামকৃষ্ণদেবের মতে, গুরু যেমনই হউন, শিষ্যের তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। তিনি কহিয়াছেন যে;—

৯৬। কুস্থানে রত্ন পড়িয়া থাকিলে রত্নের কোন দোষ হয় না। গুরু যাহা করেন, শিষ্যের তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই, তিনি যাহা বলেন, তাহাই পালন করা কর্ত্তব্য।

একদা কোন মুসলমান সাধু তাঁহার জনৈক শিষ্যকে হাফেজের উপদেশ শিক্ষা দিতেছিলেন। অধ্যাপনা কালে একটী প্রসঙ্গ উঠিল যে, গুরু যদ্যপি নমাজের আসনকে সুরার-হ্রদে নিমজ্জিত করিতে আদেশ করেন, শিষ্য অগ্র পশ্চাৎ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিবে। শিষ্য এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি বলিলেন যে, সুরা অতি অপবিত্র পদার্থ এবং নমাজের আসন পরম পবিত্র; তাহাকে অপবিত্র করা কি প্রকার গুরু-বাক্য হইল? গুরু এমন অন্যায় কার্য্যের কেন প্রশ্রয় দিবেন? শিষ্যের মনোভাব দেখিয়া সাধু আর কোন কথা না বলিয়া অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন।

কিছুদিন পরে ঐ সাধু শিষ্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে কোন মেলা দর্শন করিতে গমন করেন। তথায় সাধু, রাজা, প্রজা প্রভৃতি সকলেই গমন করিতেন বলিয়া জনতা হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ আনুকূল্য হইত। যেস্থানে দশজনের সমাগম হয়, সেস্থানে ব্যবসায়ীরা অগ্রে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ দোকান খুলিয়া উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে। অন্যান্য ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় বারাঙ্গনারাও অর্থোপার্জ্জনের লালসায় নানাবিধ বেশে বিভূষিত হইয়া সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিবার মানসে কতই হাব ভাবে দণ্ডায়মান থাকে। যে স্থানে ঐ সাধু যাইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার সন্নিকটে একটী বারাঙ্গনার আশ্রম ছিল। সাধু তাহা জানিতেন। ঐ বারাঙ্গনার একটী পালিতা কন্যা ছিল। তাহার বয়ঃক্রম অনুমান চতুর্দশ বৎসর হইবে। বৃদ্ধা বারাঙ্গনা সেই শুভদিনে সাধুদর্শন করাইয়া পালিতা কন্যাকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিযুক্ত করিয়া দিবে, এই স্থির করিয়াছিল। এই নিমিত্ত ঐ যুবতী সাধু ও শিষ্যবৃন্দের প্রতি ঘন-ঘন

দৃষ্টিপাত করিতেছিল। যে শিষ্যটীর সহিত পূর্ব্বে গুরুবাক্য লইয়া আন্দোলন হইয়াছিল, তিনি অনিমেষলোচনে যুবতীর প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সাধু এই ব্যাপার দর্শন করিয়া শিষ্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি কি দেখিতেছ? শিষ্য না কিছু না, বলিয়া অপ্রতিভ হইলেন; কিন্তু কামিনীর আকর্ষণী শক্তি কি প্রবল! একবার সেই ছবি নয়নগোচর হইলে মানসপত্রে অঙ্কিত হইয়া যায়, তাহা অতি যত্নের সহিত দূরীকৃত করিতে চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হওয়া যায় না; সুতরাং শিষ্য গুরুর কথায় লজ্জাপ্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় অবসরক্রমে সেই যুবতীর প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিলেন।

শিষ্যের এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া গুরু পুনরায় বলিলেন, কিহে বাপু! তুমি সমাহিত-চিত্ত হইয়া কি দেখিতেছ? লজ্জা করিও না; যাহা তোমার মনে মনে উদয় হইয়াছে, তাহা সত্য করিয়া আমায় পরিচয় দাও? শিষ্য কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া লজ্জা এবং বিষাদভাবে নীরব হইয়া রহিলেন। গুরু শিষ্যের ভাব পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। তিনি অন্য শিষ্যের দ্বারা বৃদ্ধা বারাঙ্গনাকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন যে, আমার এই শিষ্যটী তোমার কন্যার নিকট লইয়া যাও। যাহা দিতে হয়, তাহা আমি দিব। এই কথা বলিয়া তিনি শিষ্যকে বৃদ্ধার অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন। শিষ্য প্রথমে মৌখিক অসম্মতির লক্ষণ দেখাইলেন বটে; কিন্তু সাধু তাহা শুনিলেন না, সুতরাং তাহাকে বারাঙ্গনার নিকটে যাইতে হইল। সাধুর অন্যান্য শিষ্যেরা এই ঘটনা সন্দর্শন করিয়া কেহ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন, কেহ বিস্ময়াপন্ন হইয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন, কেহ সে স্থান হইতে পলায়ন করিবার অবকাশ অপেক্ষায় রহিলেন, কেহ বা সাধুকে তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন, কিন্তু সকলের মনের কথা মনেই নৃত্য করিতে লাগিল।

এইরূপে তিন দিবস অতিবাহিত হইল। ক্রমে এই কথা অনেকেই শ্রবণ করিলেন। যাঁহাদের শ্রবণে এই কাহিনী প্রবিষ্ট হইল, তাঁহারাই যারপরনাই আশ্চর্য্য হইলেন এবং সাধুর চরিত্রে তাঁহাদের ঘৃণা জন্মিয়া গেল। তাঁহাদের মনে হইল যে, যাঁহাদের দ্বারা সমাজ সংস্কার হইবে, যাঁহাদের কার্য্য দ্বারা সকলের মনে সাধুভাবের উদ্দীপন হইবে, যাঁহাদের নিকটে কুচরিত্র লোকেরা সংশোধিত হইয়া যাইবে, তাঁহারা এ প্রকার পাপ কর্ম্মে—অনুমোদন নহে, প্রশ্রয় নহে, আদেশ;—আপন ইচ্ছাক্রমে আদেশ

করা যে কতদূর অন্যায়, তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না। সংসারে যাহাকে পাপ বলে, সাংসারিক ব্যক্তিরা যাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য সর্ব্বদা শাস্ত্রপাঠ এবং সাধুসঙ্গ করিয়া থাকে, এমন গর্হিত কার্য্যে শিষ্যকে নিয়োজিত করা সাধুর ন্যায় কার্য্য হয় নাই। নিজ অর্থব্যয়ে শিষ্যকে বারবিলাসিনীর ভবনে প্রেরণ করা সাধু চরিত্রের অদ্ভুত রহস্য। ইত্যাকার নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া তাঁহারা সাধুর নিকটে সমাগত হইলেন, কিন্তু তথায় আসিয়া কেহ তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না।

এমন সময়ে বারাঙ্গনাপরায়ণ শিষ্য ম্লানবদনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধু তাঁহাকে আপনার সন্নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপু! তোমার আর কোন বাসনা আছে? শিষ্য নিরুত্তর রহিলেন। তখন সাধু কহিতে লাগিলেন, বুঝিলাম, তোমার আর কোন বাসনা নাই। ভাল, বল দেখি, তুমি এই যামিনীত্রয় কি প্রকারে যাপন করিলে? শিষ্য অধোমুখে রহিলেন। সাধু তদ্দর্শনে কিঞ্চিৎ কপট রোষভাবে বলিলেন, বাপু? নিরুত্তর থাকিলে চলিবে না। তুমি শিষ্য, কোন কথা না বলিতে চাও তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু অদ্য বিদায় গ্রহণ কালে তোমাদের যে সকল কথা হইয়াছে, তাহা নির্ভয়ে প্রকাশ করিয়া বল। শিষ্য কহিলেন, প্রভু! অভয় দিয়াছেন, যথাযথ বর্ণনা করিতেছি, কিন্তু যদ্যপি অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

আমি যখন তাহার নিকট বিদায় চাহিলাম, সে অশ্রুপূর্ণ লোচনে অর্দ্ধস্ফুট বচনে, বাম করে অঞ্চলাগ্রভাগ ধারণপূর্ব্বক অশ্রুধারা মোচন করিতে করিতে বলিল, সখে! কেমন করিয়া তোমাকে বিদায় দিব? আমার জ্ঞান হইতেছে যে,তোমার সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বেই যদ্যপি আমার মৃত্যু হয়,তাহা হইলে পূর্ণ সৌভাগ্য বলিয়া জানিব; কিন্তু তাহা হইবে কেন? এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম যে, তোমরা নটী-জাতি, তোমাদের মুখে এ প্রকার বিরহ-বিষাদ কখন শোভা পায় না। শুনিয়াছি, বারাঙ্গনারা কুহকিনী, মায়াবিনী। পুরুষদিগকে আপনার আয়ত্তাধীনে আনয়ন করিবার জন্য এরূপ বাক্যের দ্বারা তাহাদের মন প্রাণ বিমোহিত করিয়া থাকে; অতএব আমি চলিলাম। যুবতী আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, সখে! যাহা বলিলে, তাহা বেশ্যাদিগের কার্য্য বটে! আমিও তাহা মাসির (বৃদ্ধা বারাঙ্গনার) নিকট শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু যদ্যপি বেশ্যা জানে না অবিশ্বাস কর, তাহা হইলে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা তোমার মন ভুলাইবার জন্য নহে। আমার মনের প্রকৃতভাব তাহাই।

আমি এ পর্য্যন্ত বেশ্যা হই নাই, কিন্তু অদ্য হইতে হইব। তাই মনে হইতেছে, যদ্যপি তোমার সহিত আমার পরিণয় হইত, তাহা হইলে তোমারই চরণ সেবা করিয়া দিন যাপন করিয়া যাইতাম; কিন্তু কি করি, যখন বারাঙ্গনাদিগের দুরবস্থার কথা মনে হয়, তখন আমার বক্ষঃস্থল শুষ্কপ্রায় হইয়া আইসে আতঙ্কে সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া যায়। আমি অধিক আর তোমাকে কি বলিব, অথবা বলিলেই বা তোমার হৃদয় বেশ্যার জন্য আর্দ্র হইবে কেন? এই বলিয়া নীরবে অশ্রুবিন্দু বরিষণ করিতে লাগিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ বিচলিত হইয়া উঠিল। আমি তখন তাহাকে বলিলাম, দেখ সুন্দরি! তোমার কথায় পাষাণও দ্রবীভূত হয়, তা আমার কঠিন মন দ্রবীভূত না হইবে কেন? একবার মনে হইতেছে যে, আমি তোমার সহিত আজীবন স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় দাম্পত্য সূত্রে গ্রথিত হইয়া অবস্থিতি করি, কিন্তু কি করি বল! আমি গুরুর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে না পারিলে কেমন করিয়া মনের অভিলাষ চরিতার্থ করিতে কৃতকার্য্য হইব? তখন সেই রোরুদ্যমানা ললনা আমার চরণে নিপতিত হইয়া বলিল, শরণাগত হইলাম! চরণে আশ্রয় লইলাম! ইচ্ছা হয়, দাসীকে বধ করিয়া যাও। প্রভু! আমি তথায় মহাবিপদে পড়িলাম। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ অগ্র পশ্চাৎ নানাবিধ চিন্তা করিয়া দেখিলাম, তখন আপনার সহায়তার জন্য বার বার প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই আমার মনের প্রকৃতিস্থ সাধন হইল না। ভাবিলাম, আমার এই স্বেচ্ছাচারের কথা যখন গুরুদেবের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবে, তখন না জানি তিনি কি ঘোর-তর অভিশাপ প্রদান করিবেন; অথবা আমার প্রতি তাঁহার এতদূর বীতরাগ জন্মিবে যে, এ জীবনে আর তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে পারিব না। চরণ স্পর্শ করিবার কথা কি, তাঁহার সম্মুখেও দাঁড়াইতে পারিব না। প্রভু! সত্য কথা বলিতেছি, আমায় ক্ষমা করিবেন। আমি তখন মনের আবেগে কি করিতেছি তাহা বুঝিতে না পারিয়া, তাহার সহিত অঙ্গুরি পরিবর্ত্তন করিয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি।

গুরু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, বিবাহ করিয়াছ! তাহার পর? শিষ্য বলিতে লাগিলেন, তদনন্তর সেই সুন্দরী ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দিল! প্রভু! আপনাকেও শত ধন্যবাদ দিল, আর তাহার অদৃষ্টকেও শত ধন্য বাদ দিল। তাহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সে বলিল, আর আমার চিন্তা কি! আর আমি কাহাকেও ভয় করি না, আর আমি মাসির ভয়ও

রাখি না। আর আমায় কেহ ঘৃণিত বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিবে না। আমি এখন একজনের সহধর্ম্মিণী হইলাম। একজনের নিকট বিক্রীত হইলাম, এক জনের চরণে যাবজ্জীবন দাসী হইলাম। তখন আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, নাথ! আর আমি তোমাকে কিছুই বলিতে চাহি না। ইচ্ছা হয়, আমায় তোমার সমভিব্যাহারে রাখিও, ইচ্ছা না হয় তাহা করিও না। ইচ্ছা হয়, আমায় লইয়া সংসারী হও, ইচ্ছা না হয় তাও করিও না। ইচ্ছা হয়, আমায় সময়ে সময়ে দেখা দিও, ইচ্ছা না হয় তাহা করিও না। তোমার প্রতি আমার অনুরোধ নাই, প্রার্থনা নাই। আমি তোমাকে তোমার অভিমত কার্য্য হইতে পরাঙ্মুখ করিতে ইচ্ছুক নহি। আমি যাহা বলিলাম, তাহার প্রত্যুত্তর পাইলে তদ্রূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইব। আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি নির্ব্বাক হইয়া যাইলাম! আমি তাহাকে কোন কথা বলিতে না পারিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিয়াছি। প্রভু! সত্য কথা বলিলাম, যাহা আপনার অভিরুচি হয়, তাহাই করুন। গুরু এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, কৈ তোমার অঙ্গুরি দেখি? শিষ্য তৎক্ষণাৎ সাধুর হস্তে অঙ্গুরি প্রদান করিলেন। সাধু অঙ্গুরির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, তুমি কি আমার সহিত রহস্য করিতেছ? শিষ্য কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া কহিলেন, আপনার সহিত রহস্য! এও কি সম্ভব হইতে পারে? আর রহস্যই বা কিসের প্রভু?

উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা সকলে এই ব্যক্তির ব্যাতুলতা প্রত্যক্ষ কর। এই বলিয়া অঙ্গুরিটী জনৈক শিষ্যের হস্তে প্রদান করিলেন। শিষ্য অঙ্গুরি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, এ ত স্ত্রীলোকের নাম নহে, উহার নিজের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। অতঃপর তাহা সকলেই দেখিয়া ঐ প্রথম শিষ্যকে লাঞ্ছনা করিতে লাগিল।

সাধু পুনরায় শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি প্রকৃতিস্থ হইয়া বল দেখি, এ প্রকার মিথ্যা কাল্পনিক বিবরণ কি জন্য প্রদান করিলে? তোমার নিজের অঙ্গুরি তোমারই অঙ্গুলীতে রহিয়াছে, তবে কি রূপে অঙ্গুরি পরিবর্ত্তন করিয়া বিবাহ করিলে? শিষ্য যাহা শ্রবণ করিতেছিলেন, অঙ্গুরি দর্শন করিয়া তাহাই প্রত্যক্ষ করিলেন; সুতরাং কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। কেবল এই কথা বলিলেন যে, এতদূর কি ভ্রম হইবে! এমন সময়ে তথায় একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। নানা লোকে নানা প্রকার বাদানুবাদ আরম্ভ করিল।

সাধু শিষ্যের প্রতি কহিলেন, ভাল, তুমি এক প্রকার অদ্ভুত কথা কহিলে, দেখি, তোমার নব-বিবাহিতা রমণী কি বলেন! তুমি তাহাকে আমার সম্মুখে লইয়া আইস। শিষ্য অবিলম্বে তাহাই করিল।

সাধু তখন মৃদু মন্দস্বরে ঐ শিষ্যপত্নীকে বলিতে লাগিলেন, তুমি কি বিবাহিতা? প্রভু! আপনার চরণকৃপায় অদ্য তাহা সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া যুবতী প্রণাম করিল; বিবাহিতা! কাহার সহিত? যুবতী কোন কথা বলিতে না পারিয়া তাহার অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরিটী খুলিয়া সাধুর সম্মুখে রাখিয়া দিল। সাধু অঙ্গুরি দর্শন করিয়া বলিলেন যে, আমি কি পাগল হইলাম! আমার চক্ষু কি আজ প্রতারণা করিতেছে? আমার চক্ষু কর্ণের মধ্যে কি কোন বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে? কর্ণে যাহা শ্রবণ করিতেছি, চক্ষু তাহা দেখিতে দিতেছে না কেন? তোমরা একবার দেখ? সকলে দেখিল যে, উহাতে ঐ যুবতীর নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। তখন কোন ব্যক্তি অকুতোভয়ে বলিয়া ফেলিলেন যে, এ কথায় আশ্চর্য্য হইবার হেতু কি? বারাঙ্গনাদিগের নিকট গমন করিলে এপ্রকার অনেক কথাই শ্রবণ করা যায়। সাধে কি উহাদের কুহকিনী বলে? দেখ কেমন ছলনা করিয়াছে! ঐ জ্ঞানবান ব্যক্তিটাকে এতদূর অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে যে, স্বচ্ছন্দে এত লোকের নিকট, বিশেষতঃ শিষ্য হইয়া গুরুর সম্মুখে, বিবাহের কথাই বলিয়া দিল। কেহ বলিলেন, তাহা নহে, বেশ্যারা বশীকরণ মন্ত্রে দীক্ষিত। উহাকে একেবারে মেষের ন্যায় আয়ত্তে আনিয়া ফেলিয়াছে। কেহ বলিল, হয়ত কোন মাদকদ্রব্য সেবন করিয়া নেশার ছলনায় যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া যাইতেছে। নব দম্পতী উভয়ে উভয়ের প্রতি ঘন ঘন চাহিতে লাগিল, তাহাদের মুখে বাক্য নাই, হৃদ্‌পিণ্ড দ্রুতগামী, চক্ষু ও গণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাহারা উপস্থিত ঘটনা যেন স্বপ্নবোধ করিতে লাগিল। সাধু তখন তাহাদিগকে বলিলেন যে, যাহা বলিয়াছ তাহা আমি ক্ষমা করিয়াছি, কিন্তু সত্য কথা বল দেখি, তোমরা কি বাস্তবিক বিবাহিত হইয়াছ? তাহারা বলিল, প্রভু! আমরা আর কি বলিব? স্বপ্ন দেখিতেছি কিম্বা বাস্তবিক জাগ্রতাবস্থায় রহিয়া সত্য কথা শুনিতেছি, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, অথবা বিবাহিত হইয়াছি, পরস্পর অঙ্গুরি বিনিময় করিয়াছি, তাহা যেমন সত্য বলিয়া ধারণা আছে, এক্ষণে যাহা বলিতেছি, এ অঙ্গুরি লইয়া যেরূপ বিভ্রাট দেখিতেছি, তাহা কেমন করিয়া মিথ্যা বলিব? সাধু প্রশ্ন করিলেন, তোমাদের অঙ্গুরিতে

পূর্ব্বে কি লেখা ছিল, তাহা কি জানিতে না? শিষ্য বলিলেন, অবশ্যই জানিতাম। ঐ অঙ্গুরি আমার বিবাহের সময় আমি পাইয়াছিলাম, উহাতে আমার স্ত্রীর নাম ছিল। যুবতী বিবাহের কথা কিছুই বলিতে পারিল না কিন্তু তাহার মাসি ঐ অঙ্গুরিটী তাহাকে অর্পণ করিয়াছিল, তাহাই সে জানিত।

সাধু তখন সেই যুবতীর নাম জিজ্ঞাসা করায় শিষ্যের স্ত্রীর নামের সহিত মিলিল। শিষ্য এই কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইল।

সাধু গাত্রোত্থান করিয়া সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, আমার অনুমান হয়, তোমরা সকলে এই উপস্থিত ঘটনায় বিমুগ্ধ হইয়াছ। আমি যখন উহাকে (শিষ্য) ঐ যুবতীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, তখন তোমরা আমার প্রতি যারপরনাই বিরক্ত হইয়াছিলে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কি কারণে যে, আমি গুরু হইয়া শিষ্যকে সমাজঘৃণিত কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলাম, তাহা তোমরা কেহই অনুমান করিতে পার নাই; এখনও তাহা কাহারও উপলব্ধি হয় নাই। তোমরা, বিশেষতঃ আমার পরম প্রিয় শিষ্য তাহার নব বিবাহিতা সহধর্ম্মিণীর সহিত, বিশেষ মানসিক ক্লেশানুভব করিতেছ; অতএব এই অদ্ভুত রহস্য আমি ভেদ করিয়া দিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর।

তোমরা আমার শিষ্য প্রমুখাৎ শুনিয়াছ যে, তাহার পরিণয় হইয়াছিল, কিন্তু উহার বিশেষ পরিচয় তোমরা প্রাপ্ত হও নাই। এই শিষ্য কোন সম্রাটের পুত্র ছিল। সপ্তম কিম্বা অষ্টম বর্ষকালে উহার পিতার পরম মিত্র কোন নরপতির শৈশব-কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। সম্রাট বালিকা বধূর প্রতি অতিশয় স্নেহ পরতন্ত্র হইয়া তাহাকে সর্ব্বদাই নিকটে রাখিয়া লালন পালন করিতে ভালবাসিতেন।

কিছুদিন পরে উত্তরদেশীয় কোন আক্রমণকারী শত্রু কর্ত্তৃক সম্রাট নিধন প্রাপ্ত হইলে এই বালক প্রাণভয়ে পলায়ন করে। পরে আমি অতি ক্লেশে নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া উহাকে এক কৃষকের নিকট হইতে নানাবিধ উপদেশ দিয়া শিষ্য করিয়া সমভিব্যাহারে লইয়া বেড়াইতেছি। আক্রমণকারী প্রায় সকলকেই বিনষ্ট করিয়াছিল। কোন কোন রাজমহিষী আত্মঘাতিনী হইয়াছিলেন এবং কেহ আক্রমণকারীর মনোনীত হইয়াছেন। বালিকা বধূটীকে বিনষ্ট না করিয়া, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।

যে ধাত্রী তাহাকে লালন পালন করিত, সৌভাগ্যক্রমে সে জীবিত ছিল। ঐ বৃদ্ধা বারাঙ্গনা সেই ধাত্রী এবং এই যুবতী সেই সম্রাট বধূ। আমি সমুদায় জানিতাম এবং কি সূত্রে যে উভয়ের পুনর্ম্মিলন করিব, তাহারই সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিলাম। পাছে বৃদ্ধা যুবতীর ধর্ম্ম নষ্ট করে, এই নিমিত্ত আমি সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতাম। উহারা যথায় যাইত, আমি কোনরূপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিতাম। আমি শুনিয়াছিলাম যে, এই মেলায় উহাকে বারাঙ্গণার কার্য্যে দীক্ষিত করিবে। সেইজন্য অন্যস্থানে না থাকিয়া উহাদের সন্নিকটেই অবস্থিতি করিতেছিলাম। তখন শিষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, বাপু! এখন তুমি বুঝিলে যে, গুরু যদ্যপি কাহাকেও নমাজের আসন সুরাতে নিমজ্জিত করিতে বলেন, তাহা অবাধে সম্পন্ন করাই কর্ত্তব্য?

সৌভাগ্যক্রমে উপরোক্ত দৃষ্টান্তটীর মর্ম্মভেদ হইয়া যাওয়ায় যাহাদের মনে সাধু চরিত্রের প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইয়া গেল; কিন্তু অনেক স্থলে সাধুরা শিষ্যের অবস্থাবিশেষে নানাবিধ কার্য্য করিতে আদেশ করেন। কেন যে আদেশ করেন, তাহা শিষ্য জানে না এবং অন্য ব্যক্তিরাও জানিতে পারে না। কেবল কার্য্য লইয়া যাহারা আন্দোলন করিয়া বেড়ায়, তাহাদের দ্বারা অনেক সময়ে বিশেষ হানি হইয়া থাকে। যদ্যপি উল্লিখিত ঘটনার আভ্যন্তরিক-বিবরণ কেহ জানিয়া না থাকে, তাহার মনে যে কি ভয়ানক কুসংস্কার আবদ্ধ হইয়া রহিল, তাহা বলা যায় না। যখনই ঐ সাধুর কথা উঠিবে, তখনই তাঁহার যাবতীয় গুণগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বলিবে যে, এমন ভণ্ড দেখি নাই, সাধু হইয়া পরদারগমনে অনুমোদন করেন। সাধুর বিরুদ্ধে এপ্রকার অভিযোগ অতি অন্যায় এবং প্রকৃত ঘটনা ছাড়িয়া মিথ্যা জল্পনা বিধায় তাহাকে দুর্নিবার পাপ-পঙ্কে পতিত হইতে হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সাধুদিগের যে, কার্য্য বুঝিতে না পারা যায়, তাহা লইয়া কাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য নহে, অথবা তাহার অনুকরণ করিতে যাওয়া মঙ্গলদায়ক নহে। তাঁহারা যাহা কিছু যাহাকে বলিবেন বা বুঝাইয়া দিবেন, তাহারা অবিচলিত চিত্তে তাহাই করিবে। সে কথা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর করা কোন মতে শ্রেয়স্কর নহে। কাহার কি প্রয়োজন, তাহা সাধু বুঝিতে পারেন, সুতরাং সেই ব্যক্তির জন্য তিনি তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন। এক

ব্যক্তির পক্ষে যাহা ব্যবস্থা হয়, সে ব্যক্তি সেই নিয়ম সর্ব্বত্রে পরিচালিত করিতে পারিবে না এবং কাহাকে জ্ঞাপন করা তাহার পক্ষে বিধেয় নহে। তাহার হেতু এই যে, সর্ব্বজন সঙ্গত যাহা, সাধুরা একজন বা দুই জন বা বিশ জনকে গুপ্তভাবে বলিয়া দেন না, তাহা সাধারণকে জানাইয়া দিয়াই থাকেন।

কার্য্য দেখিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা কতদূর অন্যায়, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় প্রত্যক্ষ হইবে।

কলিকাতার উত্তর বিভাগে বিখ্যাত বসু বংশের কোন কুলপাবককে একদা প্রত্যূষে কোন রজকের গৃহ হইতে দ্রুতপদে বহির্গত হইতে দেখিয়া তাঁহার জনৈক বন্ধু মনে মনে স্থির করিলেন যে, ধর্ম্ম কর্ম্ম ভদ্রাভদ্র সকলই কপটতা মাত্র। তাহা না হইলে, এব্যক্তি ধোপার বাটীতে এমন সময়ে কি কার্য্য করিতে আসিয়াছিল? দরিদ্র নহে যে, লোকজন নাই, তাই নিজের বস্ত্রের কথা বলিতে আসিয়াছিল, চিকিৎসক নহে যে, চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিল এবং এত ব্যস্ত হইয়া যাইবারই বা হেতু কি? সে জানিত যে, রজকের এক পূর্ণযৌবনা স্ত্রী আছে। নানা চিন্তা করিয়া পরে স্থির হইল যে, আর কিছুই নহে, ঐ ধোপানীর সহিত ইহার কুৎসিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। এই নিশ্চয় করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। পরে ভৃত্য দ্বারা ঐ রজককে ডাকাইয়া সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিল, তোর বাটী হইতে অমুক বাহির হইয়া গেল কেন? তুই কিছু জানিস্? সত্য বল্, তাহা না হইলে, তোকে এখনই অপমান করিব? এই ব্যক্তির ক্রোধ দেখিয়া রজক অবাক্ হইয়া বলিল, মহাশয়! আপনি রাগ করিতেছেন কেন? আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমি জানি। যাহা মনে করিয়াছেন, তাহা নহে। আমার স্ত্রী দুই দিবস গর্ভ বেদনায় কাতর হইয়া রহিয়াছে। বাবুকে এই কথা আমি জানাই। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে আনাইয়া, আপনি তাঁহার উপদেশ মতে, সমস্ত রাত্রি ঔষধ সেবন করাইয়া, প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিয়াছেন। যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত আমি না আসি, সে পর্য্যন্ত ঔষধ বন্ধ থাকিবে। কার্য্য দেখিয়া স্থূল দ্রষ্টাদিগের মীমাংসা এইরূপ ভয়াবহ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত কাহার কার্য্য দেখিয়া তাহা অনুকরণ অথবা তাহাতে মতামত প্রকাশ করা, কোন ব্যক্তিরও উচিত বলিয়া আমাদের বোধ হয় না।

কার্য্য দেখিয়া সেই কার্য্য করিতে আপনাকে প্রস্তুত করা, অথবা তাহা অন্যকে উপদেশ দেওয়া নিতান্ত অমঙ্গলের বিষয়। সাধুর নিকটে শিষ্যদিগের মধ্যে এ প্রকার প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমাদের দেশে সাধুরা শিষ্যদিগের কল্যানের জন্য একটী বিশেষ কার্য্য সকলের নিমিত্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া থাকেন। সেই জন্য গুরুগিরির সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেককে প্রত্যেকের প্রকৃত্যনুযায়ী কার্য্য দিয়া যাইলে, একস্থানে আর সকলে থাকিতে পারে না। যদ্যপি কাহার স্বভাবে সুরা সেবন প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সাধু তাহাকে তদ্রূপ কার্য্য দিবেন, কিন্তু কাহার সুরা স্পর্শিত হইলে, তাহার মহাবিপদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং তাহাকে সুরা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ ভৈরবী চক্রে বসিয়া রমণীর রসে অভিষিক্ত হইতে নিযুক্ত হইল, কেহ চির সন্ন্যাসের ভার পাইল। এই প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিরা কখন একত্রে এক ভাবে দিন যাপন করিতে পারে না। এই ব্যক্তিরা যাহা শিক্ষা পাইল, তাহার চরমাবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে, যদ্যপি গুরুগিরি করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা যে কত লোকের সর্ব্বনাশ করে, তাহার ইয়ত্তা থাকে না। সাধুদের অন্তর্দৃষ্টি আছে, সুতরাং তাঁহারা সকলের প্রকৃতি অবগত হইতে পারেন; কিন্তু সাধকের সে শক্তি নাই। তিনি কাহাকে কি শিক্ষা দেওয়া উচিত, না বুঝিয়া অশিক্ষিত চিকিৎসকের ন্যায়, রেচক ঔষধের স্থানে ধারক ঔষধ দিয়া, যেমন রোগীর যমালয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন, তেমনই স্বভাব বিরুদ্ধ কার্য্য শিক্ষায় অনেকের পতন হইয়া থাকে।

কার্য্যের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। হয় ত কেহ কাহার মঙ্গলের জন্য কোন কার্য্য করিতেছেন এবং কেহ বা কাহার সর্ব্বনাশ সাধনের নিমিত্ত কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। যেমন, রণবিদ্যা। উদ্দেশ্য দেশ রক্ষা ও শত্রু নিধন এবং নিরীহ নরপালের সর্ব্বস্বাপহরণ করা। দান করা, দুঃখীর দুঃখ মোচন এবং আপন যশঃ বিস্তারের জন্য। লোকের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য তত্ত্ব-প্রচার এবং আপন মতের দলপুষ্টি ও অপর ভাবের প্রতিবাদ করা। মৎস্যকে আহার প্রদান। কেহ তাহাদের জীবন রক্ষার জন্য এবং জীবন সংহার করিবার নিমিত্ত আহার দিয়া থাকেন। ফলে, কর্ত্তার কি উদ্দেশ্য, তাহা তিনি না বুঝাইয়া দিলে কার্য্য দেখিয়া কখন তাহাতে আস্থা প্রদান করা উচিত নহে।

৭। গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে। যখন ইষ্ট সাক্ষাৎকার হ'ন, তখন অগ্রে গুরু আসিয়া দর্শন দেন। গুরুকে দেখিয়া শিষ্য জিজ্ঞাসা করেন, প্রভু! আপনি আমাকে যে ধ্যেয় বস্তু দিয়াছেন, তিনি কে? গুরু কিঞ্চিৎ গাত্র হেলাইয়া শিষ্যের প্রতি, "এ—ঐ" বলিয়া সেই রূপ দেখাইয়া দেন। শিষ্য সেই রূপ দর্শন করিলে গুরু তাহাতে মিলিত হইয়া যান। শিষ্য তখন গুরু এবং ইষ্টে একাকার দর্শন করে। পরিশেষে শিষ্যের অভিলাষানুসারে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হয় শিষ্যও তাহাতে মিলিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে, অথবা সেব্য সেবক ভাবের কার্য্য হইতে থাকে।

আজ কাল যে সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে গুরুকে ইষ্টজ্ঞান করা দূরে থাক, গুরুকরণই উঠিয়া যাইতেছে। অকৃতজ্ঞতার কাল আসিয়াছে। পিতা মাতার প্রতিই যখন শ্রদ্ধা ভক্তি উঠিতেছে, তখন আর কথা নাই। যখন গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিতেছে না, তখন যে আমাদের কালান্তক-কাল মূর্ত্তিমান হইয়া বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। সব গেল, হিন্দুদিগের যাহা কিছু ছিল, তাহা আর থাকে না। গুরু ভ্রষ্ট সুতরাং শাস্ত্র ভ্রষ্ট, শিষ্যও ভ্রষ্ট; ভ্রষ্টাচারে আর কতদিন হিন্দুকুল জীবন্ত থাকিবে? পরমহংসদেব সেইজন্য বার বার বলিতেন, "ভাবের ঘরে চুরি করিও না।" গুরুগণ! যদি হিন্দুধর্ম্মে সাকাররূপে বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অর্থের অনুরোধে কপটতাচরণ করিবেন না। রজনীযোগে সুরাপান, বেশ্যার চরণ বন্দনা করিয়া প্রাতঃকালে তিলক মালা গরদ পরিধান করিয়া শিষ্যের কাণে আর মন্ত্র ফুঁকিবেন না। যদিও পরমহংসদেব কহিয়াছেন যে, আমার গুরু যদি শুঁড়ী বাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়, এই ভ্রষ্টাচার কালে অবিশ্বাসী শিষ্যকে তাহা বুঝাইতে পারিবেন না, তাহার মন বাস্তবিক তৃপ্তি মানিবে না। গুরু, এমন পবিত্র শব্দ, যিনি ঈশ্বর সদৃশ কিম্বা হিন্দুশাস্ত্রমতে যিনি স্বয়ং ঈশ্বর, যাঁহাকে অনুকরণ করা, যাঁহার দৃষ্টান্ত আদর্শ-স্বরূপ জ্ঞান করা, তাঁহাকে অকার্য্য করিতে দেখিলে কেমন করিয়া অল্প বুদ্ধি-বিশিষ্ট শিষ্য বিশ্বাস করিতে পারিবে?

৯৮। গুরু সকলেরই এক। ভগবানই সকলের গুরু, জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করা তাঁহারই কার্য্য। যেমন, চাঁদা মামা সকলেরই মামা। চাঁদ আমার তোমার স্বতন্ত্র নহে।

যদ্যপি কাহারও ঈশ্বর লাভ করিয়া অবিচ্ছেদ শান্তিচ্ছায়ায় বসিয়া দিন যাপন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, গুরুকে বিশ্বাস করিতে না পারিলে, যে কোন প্রকার সাধন ভজন করাই হউক, তাহা নিশ্চয় বিফল হইয়া যাইবে। এ কথায় তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই। গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি থাকিলেও সকল সাধন ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। গুরু সত্য, এই জ্ঞান যে পর্য্যন্ত সঞ্চারিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার কোন কার্য্যই নাই। যাহা স্বইচ্ছায় করিবে, তাহার ফল কিছুই হইবে না। আমরা উপর্য্যুপরি কহিয়াছি যে, সকল বিষয়েরই গুরুকরণ করা হয়। গুরুকরণ ব্যতীত কোন বিষয় জানা যায় না। সেই জন্য গুরুকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান করা যায়। তিনি সত্য, যাহা তাঁহার নিকট লাভ করা যায়, তাহাও সত্য। যাঁহারা গুরুকরণ করাকে দোষ বলেন, তাহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ই ভুল। সে সকল লোককে কলির বর্ব্বর কহা যায়। যাঁহারা গুরুকরণ করা দোষের কার্য্য বলিয়া থাকেন, তাঁহারা যাহাদের দ্বারা এই অকৃতঘ্নতারূপ মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাঁহাদেরও সেই জন্য গুরু বলা যায় সুতরাং এ হিসাবেও তাঁহাদের গুরুকরণ হইতেছে। আজ কাল অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে গুরু অস্বীকার করা হয়; এস্থলেও গুরু অস্বীকার করিতে হইবে বলিয়া যে গুরুদত্ত ধন লাভ করা হইতেছে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারিবেন? গুরু স্বীকার না করা যেমন দোষ, বহু গুরু করাও ততোধিক দোষ বলিয়া জানিতে হইবে। যেমন সতী স্ত্রীর এক স্বামীই হইয়া থাকে ও যাহার বহুস্বামী তাহাকে নষ্টা, ভ্রষ্টা বা বেশ্যা প্রভৃতি বিবিধ নামে কহা যায়, তেমনি বহু গুরুকরণকে ব্যভিচার ভাব কহা যায়।

উপরে কথিত হইয়াছে যে, গুরুর প্রতি নৈষ্টিকভাব ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না। যে গুরু বিশ্বাস করে, তাহার পৃথিবীমণ্ডলে কিছুরই অভাব থাকে না। যদ্যপি সাধনের কিছু থাকে, তাহা হইলে গুরুকেই বিশ্বাস করা। গুরুকে বিশ্বাস করা সম্বন্ধে আমরা কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়াছি, এস্থলে আরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত না দিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। গুরুকে বিশ্বাস করিলে যে কি আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটী ঘটনায় প্রদর্শিত হইতেছে

কোন ব্যক্তির গুরুর প্রতি অচলা বিশ্বাস ছিল। একদিন গুরুকে বাটীতে আনয়ন পূর্ব্বক মহোৎসব করিয়াছিলেন। তথায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেক ধর্ম্মাত্মাও উপস্থিত ছিলেন। শিষ্য ফুলের মালা আনাইয়া গুরুর গলদেশে প্রদান করিবার নিমিত্ত জনৈক ব্রাহ্মণকে আদেশ করিল। ব্রাহ্মণ ঐ মালা যেমন গুরুর গলদেশে অর্পণ করিতে যাইলেন, তিনি অমনই নিবারণ করিলেন। শিষ্য কিঞ্চিৎ ক্রোধান্বিত হইয়া মনে মনে বলিল, অমন জুঁইফুলের গড়েমালা, চারি আনা দিয়া ক্রয় করিয়া আনাইলাম, তুমি লইলে না? নাই লও আমার কি ক্ষতি হইল? তোমায় কে অমন মালা প্রত্যহ দিয়া থাকে? ইত্যাকার অতি অহঙ্কার-সূচক ভাবে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিল। পরে মনে মনে চিন্তা করিল যে, আমি কি পাষণ্ড! চারিগণ্ডা দামের ফুলের মালায় আমার এত অভিমান হইল! শুনিয়াছি, গুরু অভিমানের কেহ নহেন। তখন মনে মনে অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, প্রভু! আমি হীন-মতি, পামর। ঠাকুর! আমি না বুঝিয়া কি বলিতেছিলাম। অমনি গুরুদেব সেই মালা আপনি ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই দৃষ্টান্তে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ঐ ব্যক্তির অভিমানই তাহাকে আত্মহারা করিয়া রাখিয়াছিল, সেই জন্য প্রথমেই গুরুঠাকুর মালা গ্রহণ করেন নাই।

এই নিমিত্ত কথিত হয় যে, গুরুর সহিত কোন মতে কপটতা-ভাব থাকিবে না। রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বদা সকলকে সাবধান করিতেন যে, "দেখ, যেন ভাবের ঘরে চুরি না থাকে।"

শিষ্য গুরুর প্রতি বিশ্বাসে যাহা করিতে চাহেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। একদা কোন বিশ্বাসী শিষ্য, তাঁহার বাটীর ভৃত্যের বাহুস্থিত অস্থির সন্ধিস্থান ভ্রষ্ট হওয়ায়, সে কয়েক দিবস ক্লেশ পাইতেছিল দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, গুরুপ্রসাদে যখন অসম্ভবও সম্ভব হয়, তখন ভৃত্যের বাহু আরোগ্য না হইবে কেন? এই বলিয়া ভৃত্যকে ডাকাইয়া তাহাকে গুরুর নিমিত্ত কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন প্রদান পূর্ব্বক, গুরুর আবাসে ব্যাধি শান্তির জন্য তৎক্ষণাৎ গমন করিতে আজ্ঞা দিলেন। ভৃত্য গুরুর সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র, গুরুদেব শিষ্যের পারিবারিক যাবতীয় সমাচার গ্রহণানন্তর ভৃত্যকে নিকটে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর কোন্ হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে? ভৃত্য আনন্দিত হইয়া দেখাইল। গুরুদেব ব্যাধিযুক্ত স্থানটীতে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, হাড় সরিয়া গিয়াছে; তুই চিকিৎসককে দেখাইবি!"

ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া শিষ্যকে সমুদায় জ্ঞাপন করিল। শিষ্য এমনই বিশ্বাসী, এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তিনি যখন পদ্মহস্ত অর্পণ করিয়াছেন, তখন আর তোর কোন আশঙ্কা নাই। ভৃত্য কহিল, বাবু! আমার কোন উপকার হয় নাই। শিষ্য বিরক্ত হইয়া ভৃত্যকে বিদায় করিয়া দিল। কিয়ৎকাল বিলম্বে ভৃত্য পুনরায় আসিয়া কহিল, বাবু! আমার হাত ভাল হইয়াছে। শিষ্য আনন্দিত চিত্তে কহিলেন, এই বলিয়া গেলি কোন উপকার হয় নাই, আবার এখনি বলিতেছিস্ যে আরোগ্য হইয়াছে!

ভৃত্য কহিল, পথে যাইতে যাইতে আমি হঠাৎ পা পিছলাইয়া মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিলাম, অমনি একটা শব্দ হইয়া আমার হাত সোজা হইয়া গেল; শিষ্যের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

কোন বিশ্বাসী শিষ্যের শূল রোগ ছিল, সে একদিন গুরুর আশ্রমে গমন করিবামাত্র বেদনাক্রান্ত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল এবং সেই ব্যক্তি উহা গুরুর নিকটে নিবেদন করিল। গুরু তচ্ছ্রবণে কহিলেন যে, আমি চিকিৎসক নহি যে, তোমার ব্যাধি শান্তি করিয়া দিব। যাহা হউক, দেখি কোন্ স্থানে তোমার বেদনা হইয়াছে, এই বলিয়া সেই স্থানটী স্পর্শ করিলেন। শিষ্য অনন্তর নিদ্রাভিভূত হইয়া গেল। নিদ্রা ভঙ্গের পর সে আর বেদনা অনুভব করিল না। তদবধি তাহার রোগ শান্তি হইয়া গেল।

গুরুকে কি প্রকার বিশ্বাস করিলে প্রকৃত গুরু বিশ্বাসী বলে, তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেখান হইতেছে।

একজন অতিশয় দুষ্ট লোক ছিল। সে ব্যক্তি ঈশ্বর মানিত না, গুরু মানিত না এবং শাস্ত্রাদি মানিত না। কাল সহকারে তাহার এমন পরিবর্ত্তন হইয়া গেল যে, এক ব্যক্তির চরণে আপনাকে একেবারে বিক্রীত করিয়া ফেলিল। গুরুর কথা ব্যতীত কাহার কথা আর শুনে না, গুরুর উপদেশ ব্যতীত আর কাহার উপদেশ গ্রহণ করে না, গুরু পূজা ব্যতীত আর কাহার পূজা করে না। গুরুর প্রসাদ না ধারণ করিয়া অন্য কোন দ্রব্য আহার করে না। তাহার পারিবারিক আবাল বৃদ্ধ বনিতার এই প্রকার স্বভাব ছিল। এই ব্যক্তির সহিত অন্যান্য শিষ্যের ভাবে মিলিত না, এই জন্য তাহার বিরুদ্ধে নানা কথা নানা ভাবে গুরুর নিকটে অভিযোগ করা হইত। গুরু কাহার কথায় কর্ণপাত করিতেন না। তিনি বলিতেন, দেখ, তোমরা যাহা বলিতেছ, আমি তাহা জানি, কিন্তু উহাকে কেমন করিয়া কহিব, উহার

ভক্তিতে আমি কিছুই বলিতে পারি নাই। ও আমা ব্যতীত কিছুই জানে না। আমার জন্য না পারে এমন কার্য্যই নাই। সকলে কি বলিবেন, চুপ করিয়া থাকিতেন। একদিন ঐ শিষ্যের প্রসাদ ফুরাইয়া গিয়াছিল। সে তন্নিমিত্ত গুরুর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু কোন মতে প্রসাদ পাইল না। ক্রমে স্বায়ংকাল উপস্থিত হইল। শিষ্য উভয়-শঙ্কটে পড়িল। একদিকে প্রসাদ না পাইলে পরদিবস কি করিয়া আহার করিবে, একাকী নহে সপরিবারে এবং আর একদিকে রাত্রি হইয়া গেলে গুরুর আশ্রম হইতে তাহার আবাসবাটীতে প্রত্যাগমন করা যারপরনাই ক্লেশকর ব্যাপার হইয়া পড়িবে। শিষ্য কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়প্রায় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। পরে স্থির করিল যে, ঠাকুর আমায় পরীক্ষা করিতেছেন। ভাল তাহাতে আপত্তি নাই। তিনি আমায় প্রসাদ দিলেন না, আমি প্রসাদ না পাইলে বাড়ী যাইব না। এই ভাবিয়া, গুরুঠাকুর যে হাঁড়ি হইতে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ মিষ্ট গ্রহণান্তর, যে ডাবরে তিনি থুতু এবং গয়ার ফেলিতেন, (তাহা সেই স্থানে ছিল.) সেই ডাবর হইতে গয়ার থুথুকে শিষ্য প্রভুর অধরামৃত জ্ঞানে ঐ মিষ্টদ্রব্য তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইল। যদিও সেই সময়ে তাহার মনে নানা প্রকার প্রতারণা আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার বিশ্বাসের পরাক্রমে সকলই বিচূর্ণিত হইয়া গিয়াছিল। হায়! ইহাকেই বলে না গুরুভক্তি! ভাইরে! কে তুমি ভক্ত, কোথায় তোমার নিবাস! সেই ভক্তি, বিশ্বাস আমাদের এককণা থাকিলে আমরা ইহকালে অমৃত লাভ করিতে পারি। ধন্য সেই ভক্তি, তাহা গুরুর কৃপাতেই প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। এ প্রকার বিশ্বাস, গুরু দয়া করিয়া না দিলে কে কোথায় পাইবে? শিষ্য যদিও আপনি এইরূপে প্রসাদ করিয়া লইল বটে, কিন্তু তথাপি তাহার প্রাণে আনন্দ হইল না। সে ভাবিল, প্রভু প্রসাদ দিলেন না, তবে কি হইল! শিষ্য তথায় অবস্থিতি করিয়া রহিল। পরে, সন্ধ্যার পর গুরুদেব স্বস্থানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শিষ্যকে কহিলেন, বাপু! তুমি এখনও রহিয়াছ? ভাল, আমার জন্য কিছু আনিয়াছ? তখন শিষ্যের হৃদয়ে যে কত আনন্দ হইল, তাহা বর্ণনা করে কে? সে ব্যক্তি বাস্তবিক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গুরুর সেবার নিমিত্ত বাটী হইতে গমনকালীন লইয়া গিয়াছিল, সেই সামগ্রীগুলি গুরুর সমক্ষে প্রদান করিল। গুরু আনন্দিতান্তঃকরণে তাহার কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়া সমুদয় প্রসাদ শিষ্যকে অর্পণ করিলেন।

কোন স্থানে একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য ছিল। শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ পণ্ডিত, কেহ জ্ঞানী, কেহ ভক্ত, কেহ কর্ম্মী, কেহ মাতাল, লম্পট, নাস্তিক, ইত্যাদি নানাবিধ তন্ত্রের লোক ছিল। পণ্ডিত বা জ্ঞানীরা স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ অভিমানী হইয়া থাকেন, এ স্থানেও তাহাই দেখা যাইত। যাহারা পাষণ্ডশ্রেণী হইতে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল, তাহারা সাধু প্রকৃতির শিষ্য অপেক্ষা বেশী শিষ্ট এবং শান্ত ছিল। যেহেতু তাহাদের অভিমান করিবার কিছুই ছিল না। এই পাষণ্ডশ্রেণীর এক ব্যক্তি গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করিত। সেই জন্য অন্যান্য শিষ্যেরা তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া ঘৃণা করিতেন, কিন্তু কেহ কিছুতেই সে ব্যক্তির ভাবান্তর উপস্থিত করিতে কৃত-কার্য্য হন নাই। অন্যান্য শিষ্যেরা গুরুর নিকট হইতে নানাবিধ সাধন ভজন করিবার প্রণালী শিক্ষা করিতেন এবং কেহ কেহ বা আপন পাণ্ডিত্যের সহায়তায় আপনি শাস্ত্র-বিশেষ হইতে সাধনপ্রণালী বহির্গত করিয়া লইতেন। অন্যান্য বাহিরের লোকেরা কর্ম্মী-শিষ্যদের বিশেষ সমাদর করিত কিন্তু ঐ গুরুবিশ্বাসী শিষ্যকে কেহ দেখিতে পারিত না। গুরুকে ঈশ্বর বলা অন্যায়, এই কথা লইয়া এমন কি, সেই গুরুর সমক্ষেও অনেকে অনেকবার গুরু কখনই ঈশ্বর নহেন বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন। গুরুঠাকুর এই কথায় বলিতেন, দেখ, আমি তাহার কিছুই জানি না, কে কি মনে করে, তাহা তাহা-দের নিজ নিজ বুদ্ধির খেলা। আমি সামান্য মনুষ্য, ঈশ্বর কেন হইব? অবোধ মনুষ্য কেমন করিয়া এই কথা বুঝিবে? গুরুর কৃপা না হইলে গুরুকে কে বুঝিতে সক্ষম হইবে? সে যাহা হউক, এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইয়া গেল, আশ্চর্য্য এই যে, ঐ মহাপুরুষের যখন যে কোন কার্য্য উপস্থিত হইত, যখন কোন স্থানে যাইবার অভিপ্রায় হইত, যখন কোন শিষ্যের বাটীতে মহোৎসব করিতে যাইতেন, ঐ বিশ্বাসী শিষ্যের প্রতি তাহার সমুদয় কার্য্যভার ন্যস্ত হইত। পরে মহাপুরুষ দেহরক্ষা করিলেন। যে সকল শিষ্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা গুরুর শরীরাবশিষ্টভাগ, আপন স্থানে রাখিয়া গুরুর প্রধান চেলাই তাঁহারা, এই পরিচয় দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাদের সহায়তার নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণ বদ্ধ পরিকর হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! গুরু বিশ্বাসের কি অদ্ভুত লীলা! সেই শরীরাবশিষ্ট ভাগ কার্য্যবশতঃ তিনি বিশ্বাসী শিষ্যের নিকটে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। তখন সেই বিশ্বাসী শিষ্যের আনন্দের আর অবধি রহিল না।

আমাদের দেশে আজকাল ধর্ম্মকর্ম্ম নিতান্ত বিকৃত দশায় পতিত হইয়াছে। যেমন, মানুষের প্রাণান্ত হইয়া যাইলে তাহার শোভা বিনষ্ট হয়, তেমনি ধর্ম্মবিহীন নর-নারীর আকৃতি কিম্ভূত কিমাকার দেখায়। এই ধর্ম্মকর্ম্মবিহীন লোকেরাই এক্ষণে চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাহাদের সমক্ষে সকল কার্য্যই ভুল বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহাদের কথার প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে হইলে, কাহার কস্মিন্‌কালেও কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। যদ্যপি কেহ ঈশ্বর দর্শন করিতে চাহেন, তাহা হইলে গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করুন, নিশ্চয়ই তাহার ঈশ্বর লাভ হইবে। অনেকে বলেন যে, মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত বলা হয়। এ কথা লইয়া বিচার করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। বিচার করিব কাহার সহিত? বালকের কথায় উত্তর দিতে হইলে কস্মিন্‌কালে কথার শেষ হয় না। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, সকল দেশের ধর্ম্মস্থাপন কর্ত্তারাই মনুষ্য। এই মনুষ্যদের অবতার বলে, সুতরাং তাঁহারা ভগবান্। গুরু যদিও সামান্য মনুষ্য বটেন কিন্তু শিষ্য যদ্যপি ভগবান্ বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা হইলে ভগবান্ লাভ পক্ষে বিঘ্ন বাধা হয় না। কারণ ভগবান্ এক অদ্বিতীয়। যেমন কোন গৃহে একটী ব্যক্তি বাস করে, তথায় যে কেহ যে কোন নামে বা ভাবে তাহাকে ডাকা যায়, সেই ব্যক্তিই তথায় প্রত্যুত্তর দিতে বাধ্য। গুরুকে মনুষ্য বলিলে ভগবান্ ভাব বিচ্যুত হয়, ফলে ভগবান্ লাভ হয় না।

তাই বলিতেছি, যিনি ভগবান্‌কে লাভ করিতে চাহেন, তাঁহার সেই পথে দাঁড়াইতে ভয় পাওয়া কদাচ উচিত হয় না; অথবা তিনি ভগবানের শরণাপন্ন না হইয়া কোন্ পথাবলম্বন করিবেন? সকলের মনে করা কর্ত্তব্য যে, একদিন যাইতে হইবে! সেই শেষের দিনে যখন সকল বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া কোথায় কে লইয়া যাইবে, তখন কে কূল দিবেন? কাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রাণে শান্তি স্থাপন করিবেন? গুরুবাক্যে বিশ্বাস ও গুরুতে বিশ্বাস ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। যাহার মনে এই ধারণা থাকে, সেই ব্যক্তিই মুক্তপুরুষ। যিনি গুরুর পাদপদ্মই সার করিয়াছেন, তিনি শেষের দিনে বীরের ন্যায় স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন। যেমন,ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি চিকিৎসকের কথায় বিশ্বাস করিয়া অবস্থিতি করে, তেমনি ভব রোগের শান্তির বিধাতাই গুরু। তাঁহাদের কথা, তাঁহাদের উপাসনাই আমাদের ভবরোগের একমাত্র মহৌষধি।

যাঁহাদের বাস্তবিক ভবরোগে আক্রমণ করিয়াছে, যাঁহারা রোগের জ্বালায় ছট্ ফট্ করিতেছেন, তাঁহারা ঔষধের গুণ বুঝিয়া থাকেন। যাঁহারা এখনও রোগাক্রান্ত হন নাই, তাঁহারা চিকিৎসকের ভাল মন্দ বুঝিবেন কি? গুরু-অবিশ্বাসীদিগের এই অবস্থা।

গুরুর কর্ত্তব্য কি ?

৯৯। **শিষ্যকে মন্ত্র দিবার পূর্ব্বে তাহার তাহা ধারণা হইবে কি না, গুরু এ বিষয়টী উত্তমরূপে অবগত হইবেন। শিষ্যের ধারণা শক্তি পরীক্ষা করিয়া দীক্ষা না দিলে উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ ক্ষতির সম্ভাবনা।**

রামকৃষ্ণদেবের এই উপদেশের দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, যে কেহ দীক্ষিত হইতে আসিলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে মন্ত্র দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। গুরু শিষ্যকে যে মন্ত্র জপ বা যে মূর্ত্তি ধ্যান কিম্বা যে ভাবে উপাসনা করিতে শিক্ষা দিবেন, শিষ্যের সেই সকল বিষয়ে কত দূর শ্রদ্ধা আছে, তাহা অতি সাবধানে বিশেষরূপে নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক। অনেকে সাময়িক ঘটনায়, মানসিক উচ্ছ্বাসে মন্ত্র লইয়া, পরে তাহার অবমাননা করিয়া থাকেন। এই প্রকার দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্রেই দেখা যাইতেছে। হিন্দু সন্তান ব্রাহ্মণই হউন, কিম্বা কায়স্থাদি অন্য বর্ণান্তর্গতই হউন, আপনাপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় ভাব, স্ব-ভাবে রঞ্জিত করিয়া অবলম্বন করিতেছেন, আবার সেই ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব-ভাবে পুনরায় আগমন করিতেছেন। এই প্রকার সর্ব্বদা ভাব পরিবর্ত্তন করা অনভিজ্ঞের কার্য্য, তাহার ভুল নাই। হিন্দু সন্তানেরা যদ্যপি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বাস্তবিকই ধর্ম্ম যে কি পদার্থ তাহা অবগত হইবার জন্য চেষ্টা করেন, কিম্বা এপ্রকার স্ব-ধর্ম্মত্যাগী ব্যক্তিদের অপর ধর্ম্মে প্রবেশ করিবার সময়ে তত্তৎ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপদেষ্টারা শিষ্যের অবস্থা যদি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত করেন, তাহা হইলে পরিণামে বৃথা গণ্ডগোল জনিত পূতিগন্ধ বহির্গত হইতে পারে না। যে সময়ে কেশব বাবুর দল ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, সেই সময়ে রাম-কৃষ্ণদেব কেশব বাবুকে কহিয়াছিলেন, "তুমি দল বাঁধিবার সময় ভাল করিয়া লোক বাছিয়া লও নাই কেন? হ'রে প্যালা যাকে তাকে দলে প্রবিষ্ট করাইয়াছ, তাহাদের দ্বারা আর কি হইবে?" অতএব যাঁহার নিকট যে কেহ

দীক্ষা লাভ করিতে আসিবে, তাহার আন্তরিক ভাব উত্তমরূপে যে পর্য্যন্ত তিনি জ্ঞাত হইতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত তাহাকে কোন মতে দীক্ষিত করা বিধেয় নহে।

রামকৃষ্ণদেব শিষ্যের ধারণা শক্তি পরীক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছেন। ধারণা শক্তি অর্থে আমরা কি বুঝিব? ধারণা বলিলে মনের বলই বুঝায়। হিসাব করিয়া দেখিলে মনটীকে আধারবিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রথমেই শিক্ষাগুরু দ্বারা সাধারণ বিদ্যাদি শিখিয়া মনের বলাধান সাধন করিতে হয়। রামকৃষ্ণদেব কহিতেন—

১০০। বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধি হয়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মন ও বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই তিনের সংযোগে দেহ পরিচালিত হইয়া থাকে। মন কোন বিষয়ের সঙ্কল্প করে, বুদ্ধির দ্বারা তাহা সাধন হইবার উপায় হয় এবং অহঙ্কার তাহার ফলাফল সম্ভোগ করিয়া থাকে। বুদ্ধি যে প্রকার অবস্থাপন্ন হইবে, মনের সঙ্কল্পও সেই প্রকারে পরিণত হইয়া যাইবে। মনে হইল যে, সুরাপান করিতে হইবে, বুদ্ধি যদি সীমাবিশিষ্ট ভাবে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে তাহাকে তখনই সুরাপান করাইবে। যাহার বুদ্ধি সুরার দোষ গুণ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহার সুরাপান করা সহজে ঘটিতে পারে না। যে জানে যে বেশ্যা দ্বারা উপদংশাদি উৎকট রোগ জন্মায়, তাহার মনে বেশ্যাভাব আসিলে তাহা কার্য্যে কদাচিৎ পরিণত হইয়া থাকে। যে জানে বিজ্ঞানাদি বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা করিলে মনের অতি উচ্চাবস্থা হয়, সে ব্যক্তি কখন তাহা পরিত্যাগ করে না। বুদ্ধি যতই শুদ্ধ হয়, মনেরও ততই ভাব ধারণ করিবার শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি সাংসারিক ভাব ধারণ করিয়া পরে আধ্যাত্মিক-ভাব শিক্ষা করিতে থাকেন, তাঁহার অবস্থা স্বতন্ত্র প্রকার; কারণ তিনি এই দ্বিবিধ ভাব কখনই একাকার করেন না। সাংসারিক ভাব কি? তাহার পরিণামই বা কি? ইহা যাহার প্রত্যক্ষ বিষয় হয়, তাহার নিকটে আধ্যাত্মিক ভাব যে কি সুন্দর দেখায়, তাহা তদবস্থাপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপরের অনুধাবন হওয়া সুকঠিন। বুদ্ধি শুদ্ধি হইলে এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

আমাদের সাধারণ অবস্থা কি? ভাবের পর ভাব শিক্ষা। এই একটী ভাব শিখিলাম, পরক্ষণে আর একটী ভাব শিখিলাম। এইরূপে প্রত্যহ নূতন নূতন ভাব শিখিয়া আমরা আত্মোন্নতি করিয়া থাকি। ভাব দুই প্রকার,

এক পক্ষীয় ভাবের দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধি হয়, আর এক পক্ষীয় ভাবের দ্বারা আত্মোন্নতি বা ভগবানের দিকে গমন করিবার সুবিধা হয়। যে ব্যক্তির সাংসারিক ভাবের সম্যকরূপ জ্ঞান সঞ্চার হইবার পর, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য মন ধাবিত হয়, তখন তাহার মনের "ধারণা শক্তি" সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত হইতে পারে।

একদা কোন ঋষির নিকটে একটী রাজপুত্র এবং একটী মুনিবালক উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আর্য্য! আমাদিগকে সচ্চিদানন্দ শ্রীহরির সাক্ষাৎ লাভের উপায় বলিয়া দিন। ঋষি এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজকুমারকে উপবেশন করিতে অনুমতি দিয়া মুনিবালককে বলিলেন, দেখ বাপু! আনন্দ কি পদার্থ, তাহা তুমি বুঝিয়াছ? মুনিবালক উত্তর করিলেন, আনন্দ শব্দ বহুদিন শিক্ষা করিয়াছি। তবে কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন? ঋষি পুনর্ব্বার কহিলেন, দেখ বৎস! আনন্দ শব্দ পুস্তকে পাঠ করিয়াছ, তাহা আমি অনুমানে বুঝিয়াছি কিন্তু আনন্দ অনুভব করিবার বিষয়; কেবল শব্দার্থ জানিলেই হয় না, তুমি বনে বাস কর, বৃক্ষের বল্কল পরিধান কর, যথা সময়ে অর্দ্ধাশনে দিন যাপন কর। অদ্যাপি কুমার, আনন্দ বুঝিবে কিরূপে? ভগবান্ নিত্য আনন্দের আভাস দিবার জন্য কামিনী কাঞ্চনের সৃষ্টি করিয়াছেন। কাঞ্চনে যে পরিমাণ আনন্দ আছে, তদপেক্ষা কামিনীতে অধিক পরিমাণে লাভ করা যায়।* যখন কামিনীর দ্বারা আনন্দের সীমা হইয়া যাইবে, তখন সচ্চিদানন্দের আনন্দ সম্ভোগ করিবার অধিকারী হইবে; অতএব যাও, আনন্দ সম্ভোগ করিয়া আইস, পরে সচ্চিদানন্দ লাভের উপায় বলিয়া দিব। এই বলিয়া ঋষি মুনিবালককে বিদায় করিয়া দিলেন।

ঋষি রাজকুমারকে বিষয়াদি সম্ভোগী জানিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিলেন। তিনি তদ্দণ্ডে সন্ন্যাসী হইয়া ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন। মুনিবালক তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কামিনী-কাঞ্চনের উদ্দেশে নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজপ্রাসাদে রাজকুমারীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, দেখ কন্যা! আমি তোমাকে বিবাহ করিব। রাজদুহিতা

---

* রামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, যাহা হইতে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাতেই সচ্চিদানন্দের অংশ অবশ্যই আছে, কিন্তু কাহাতেও কম এবং কাহাতেও বা বেশী আছে। যেমন, চিটে গুড় ও ওলা মিছরি।

মুনিপুত্রের এ প্রকারপ্রস্তাবে ভীতা হইয়া রাজ্ঞীর কর্ণগোচর করিলেন। রাণীও উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, যদ্যপি মুনিপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অভিশাপগ্রস্ত হইতে হইবে এবং দেখিয়া শুনিয়া দীন বনচারী ব্রাহ্মণের করে রাজকন্যাকে কিরূপেই বা অর্পণ করা যায়? বুদ্ধিমতী রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ মনে মনে আশু বিপদ হইতে পরিত্রাণের সংযুক্তি স্থির করিয়া কন্যার সমভিব্যাহারে আগমন-পূর্ব্বক মুনিবালককে সহাস্য বদনে বলিলেন, "আমার কন্যারত্নকে তোমায় অর্পণ করিব, এ অতি সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু রত্ন লাভ করিতে হইলে রত্নের প্রয়োজন। তুমি কি রত্ন দিবে?" মুনিপুত্র বলিলেন, রত্ন কোথায় পাওয়া যায়? রাণী কহিলেন, রত্নাকরে রত্ন জন্মিয়া থাকে। মুনিপুত্র কহিলেন, "রত্নাকরে রত্ন পাওয়া যায়, শব্দার্থেই প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু সে রত্নাকর কোথায়?" রাণী বলিয়া দিলেন, 'সমুদ্রে'। মুনিপুত্র সমুদ্র কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে রাণী দিক নির্দ্দেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর মুনিপুত্র শশব্যস্ত হইয়া দ্রুতপদে সমুদ্রাভিমুখে গমন পূর্ব্বক ত্বরায় জলধিতটে উপনীত হইলেন; কিন্তু রত্ন দেখিতে পাইলেন না। তথায় কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, শুনিয়াছি রত্নাকরে রত্ন আছে, অতএব নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে রত্ন পাওয়া যাইবে না। এই বলিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া সমুদ্রের জল সিঞ্চন করিতে নিযুক্ত হইলেন। অন্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ মুনিবালকের একাগ্রতা দেখিয়া অমনই এক ব্রাহ্মণের রূপে উদয় হইয়া কহিলেন, বাপু! তুমি জল সিঞ্চন করিতেছ কেন? মুনিপুত্র উত্তর দিলেন, রত্নের জন্য?

ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া মৃদুহাস্যে কহিলেন, অতল স্পর্শ সমুদ্রের জল, অঞ্জলি করিয়া কি শুষ্ক করা যায়? মুনিপুত্র উত্তর দিলেন, কেন? জহ্নুমুনি গণ্ডূষে গঙ্গা শোষিত করিয়াছিলেন, আর আমি অঞ্জলি দ্বারা জল সিঞ্চন করিয়া সমুদ্র শুষ্ক করিতে পারিব না? ব্রাহ্মণবেশী নারায়ণ বলিলেন যে, তোমাকে অত ক্লেশ পাইতে হইবে না, তুমি ঐ স্থানে যাও, প্রচুর রত্ন পাইবে।

মুনিপুত্র তথা হইতে রত্ন লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজদুহিতার পাণিগ্রহণান্তর নিত্য নব নব ভাবে সুখ সম্ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মুনিপুত্র রাজজামাতা হইলেন বটে, কিন্তু সচ্চিদানন্দ লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে কামিনী-কাঞ্চন অবলম্বন করিতে হইয়াছে, এ কথা একদিনও

বিস্মৃত হন নাই। * অতঃপর তাঁহার একটী সন্তান জন্মিল। তাহাকে লইয়া কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিলেন। তখন কামিনী সহবাস সুখের মধুরতা অপনীত হইয়া গেল; কারণ, সে সুখ সীমাবিশিষ্ট। সর্ব্ব প্রথমে কামিনী সম্ভোগ সম্বন্ধে যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তৎপরেও তাহা ব্যতীত নূতন কোন প্রকার আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন না। কুমারের বাৎসল্য রসেরও আনন্দ ভোগ হইল, তাহাও সীমাবিশিষ্ট বুঝিলেন। তখন রাজদুহিতা, রাজ-প্রাসাদ ও রাজভোগ এবং নবকুমার, কেহই তাঁহাকে নূতন আনন্দ প্রদান করিতে পারিলেন না। তৎপরে তাঁহার মন উচ্চাটন হইয়া উঠিল। তখন মনে হইল যে, ইহা অপেক্ষা আনন্দ কোথায় পাইব? ক্রমে প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল, তখন আর কিছুতেই প্রীতিলাভ হয় না। সেই ঋষিবাক্য স্মরণ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ঋষির সমীপে সমাগত হইবামাত্র তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া লইলেন এবং বলিলেন, এইবার আনন্দময়কে চিনিতে পারিবে। অতঃপর ঋষি ঐ মুনি-পুত্রকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিলেন।

শিষ্যের কর্ত্তব্য কি?

১০১। গুরু কে? শিষ্যের এ বিষয়টী সর্ব্বাগ্রে বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া উচিত। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা, গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করা এবং গুরুর দর্শনেই শান্তিলাভ করিতে হইবে।

এস্থানে দীক্ষা-গুরুকেই নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। শিক্ষা-গুরু সম্বন্ধে অবিশ্বাস প্রায় কাহার হয় না।

১০২। বিনা তর্কে, বিনা যুক্তি প্রমাণে গুরু যাহা বলিয়া দিবেন, তাহাই সত্য বাক্য বলিয়া ধারণা করিতে হইবে।

---

* ব্রহ্মচর্য্য ও শাস্ত্রাদি পাঠ দ্বারা জ্ঞান লাভ হইলে তখন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। ঋষিরা সেইজন্য প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, পরে গৃহস্থাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণদেবও যুবকদিগকে অগ্রে আমড়ার অম্বল খাইতে অর্থাৎ বিষয় ভোগ করিতে আদেশ করিতেন, কিন্তু বিষয় সম্ভোগ কালে সর্ব্বদা মনে মনে বিচার রাখা কর্ত্তব্য, এ কথাটী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন।

গুরু যাহা বলিলেন, যদ্যপি তাহা ধারণা করিতে ক্লেশ বোধ হয়, তাহা গুরুকে জ্ঞাত করা যাইতে পারে। এইরূপ জিজ্ঞাসাকে কু-তর্ক বলা যায় না। যথায় বুঝাইয়া লইবার জন্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তথাকার ভাব স্বতন্ত্র প্রকার।

১০৩। কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিবার পূর্ব্বে শিষ্যের যদ্যপি কোন প্রকার সন্দেহের বিষয় না থাকে, তাহা হইলে সে স্থলে কোন কথাই নাই; সন্দেহ থাকিলে তাহা ভঞ্জন করিয়া তবে দীক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। দীক্ষা গ্রহণান্তর গুরুর প্রতি অবিশ্বাস করা, বা তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় ব্যক্তিকে গুরুর স্থান প্রদান করা, যারপরনাই অর্ব্বাচিনের কার্য্য।

যে কেহ আপন মনের মত গুরুলাভ করিতে চাহেন, তিনি সর্ব্বাগ্রে সরল হৃদয়ে গুরু অন্বেষণ করিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বয়ং ভগবান্ সে স্থলে গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধকের মনোসাধ পূর্ণ করিয়া থাকেন; অথবা এমন সৎসঙ্গ জুটিয়া যায় যে, তথায় তাহার মনের আকাঙ্ক্ষা সম্যক্ প্রকারে নিবৃত্তি হইয়া যায়। গুরুকরণের তিনটী অবস্থা আছে, যথা—শিক্ষা, দীক্ষা এবং পরীক্ষা। শিক্ষা অর্থে, যে বিদ্যা দ্বারা মানসিক ধারণা-শক্তি জন্মিয়া থাকে। ইহা দুই ভাবে ব্যবহার হইতে পারে। প্রথম ভাবে জড়-শাস্ত্রাদি শিক্ষা করা এবং দ্বিতীয় ভাবে গুরুকে চিনিয়া লওয়া বা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে পারা। গুরুতে বিশ্বাস না জন্মিলে, তাঁহার কথায় বিশ্বাস জন্মিতে পারে না, সুতরাং গুরু-শিক্ষা করা, শিষ্যের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। গুরু স্থির হইলে তবে দীক্ষা হইয়া থাকে। দীক্ষা লাভ মাত্রেই দেহ পবিত্র হয়, তখন চৈতন্য রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, যাহার যে পর্য্যন্ত দীক্ষা না হয়, তাহার সে পর্য্যন্ত কোন কার্য্যেই অধিকার হয় না। দীক্ষালাভের পর পরীক্ষা। পরীক্ষা অর্থে এই বুঝিতে হইবে যে, দীক্ষার ফল কি হইল, তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। দীক্ষার ফল শান্তি। যাহার বাস্তবিক দীক্ষা হয়, তাহার প্রাণে অবিচ্ছেদ শান্তি বিরাজিত থাকে। তাহাকে আর কাহার দ্বারে ভ্রমণ করিতে হয় না, আর সাধুসিদ্ধের পদধূলিকণার জন্য লালায়িত হইতে হয় না, আর তীর্থাদি

দর্শন করিয়া আপনার আত্মোন্নতি করিবার আবশ্যকতা থাকে না, আর শাস্ত্রাদির মর্ম্মোদ্ধার করিতে ক্লেশ পাইতে হয় না, আর কালের ভাবী ভীষণ ছবি তাহাকে ভীত করিতে পারে না, তাহার মন সর্ব্বদা গুরু-পাদপদ্মে সংলগ্ন হইয়া থাকে। দীক্ষার পর শিষ্যের পূর্ব্বাবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। তাহার সকল প্রকার কর্ম্মলোপ পাইয়া গুরুসেবাই এক মাত্র কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে। তাহার তখন ধ্যান জ্ঞান যাহা কিছু, একমাত্র ভরসা শ্রীগুরুর পাদপদ্মেই থাকে। সে যাহা করে তাহা গুরুর কার্য্য, যাহা শ্রবণ করে তাহা গুরুর উপদেশ, যাহা দর্শন করে তাহা গুরুর শ্রীমূর্ত্তি এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দ, যাহা পাঠ করে তাহা গুরুর গুণগাথা। প্রকৃত-দীক্ষিত শিষ্যের, এই প্রকার অবস্থাই হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি যে, রামকৃষ্ণদেব এই ধারণা শক্তি হিসাব করিয়া প্রত্যেককে উপদেশ দিতেন। তিনি কাহাকেও কহিতেন যে, অগ্রে "আমড়ার অম্বল" খাইয়া আইস, কাহাকেও বা সংসার ছাড়িয়া আসিতে বলিতেন এবং কাহাকেও সংসারে রাখিয়া তত্ত্বোপদেশ দিতেন। যেমন বিদ্যালয়ে সকল বালক এক পাঠের উপযুক্ত নহে, যাহার ধারণা-শক্তি যে প্রকার, তাহাকে সেই প্রকার শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে আসিল বলিয়া সকল ছাত্র একত্রে এক পাঠ পড়িতে পারে না। দীক্ষা দিবার সময়ে শিষ্যদিগের এই ধারণা শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা তজ্জন্য যারপরনাই বিশেষ আবশ্যক।

১০৪। শিষ্যদিগকে যে প্রকার শিক্ষা দিতে হইবে, গুরু আপনি তাহা অবশ্য কার্য্যে দেখাইবেন। তাহা না করিলে প্রমাদ ঘটিয়া থাকে। জনৈক অম্ল রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, একদা কোন চিকিৎসকের নিকট একটী ব্যবস্থা লইতে আসিয়াছিল। চিকিৎসক সে দিন কোন ব্যবস্থা না দিয়া পরদিন আসিতে কহিয়া দিলেন। তৎপর দিন ঐ রোগীটী আসিলে পর, চিকিৎসক তাহাকে গুড় খাইতে নিবারণ করিলেন। রোগী এই কথা শুনিয়া বলিল, মহাশয়! এ কথাটা কাল বলিয়া দিলেই হইত, তাহা হইলে আপনার নিকটে আসিবার নিমিত্ত, আমায় দুই বার ক্লেশ পাইতে

হইত না। চিকিৎসক কহিলেন, তুমি কল্য যে সময়ে আসিয়াছিলে, সেই সময়ে আমার এই ঘরে কয়েক কলসী গুড় ছিল; অদ্য তাহা স্থানান্তরিত করিয়াছি।

১০৫। যেমন হাতির দুই প্রকার দাঁত থাকে। বাহিরের বৃহৎ দাঁত দুইটী দেখাইবার, তাহার দ্বারা খাওয়া চলে না, আর এক প্রকার দাঁত ভিতরের, তাহা দ্বারা খাওয়া চলে। সেই প্রকার গুরুরা যাহা করিবেন, তাহা তাঁহার শিষ্যদিগকে দেখাইবেন না। যাহা দেখাইবেন, তাহা শিষ্যদের ধারণা-শক্তি অতিক্রম করিয়া যাইবে না।

১০৬। গুরুই জগৎ-গুরু; এই জ্ঞান গুরুমাত্রেরই বোধ থাকিবে, আপনাদিগকে নিমিত্তমাত্র জ্ঞান করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

যাহাতে কোন প্রকারে মনোমধ্যে অভিমান না হয়, এ প্রকার সাবধানে থাকাই কর্ত্তব্য, নচেৎ অঙ্কুশমাত্রে অভিমান প্রবেশ করিলেই তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভ্রষ্ট করিয়া ফেলিবে, এই টুকুই সাবধান হইতে হয়।

১০৭। কে কার গুরু?

এই কথাটী প্রত্যেক গুরুদিগের স্মরণ রাখা উচিত। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে, যিনি একজনের গুরু তিনি আর এক জনের শিষ্য। এইরূপে প্রত্যেককে, প্রত্যেকের গুরু এবং শিষ্য বলিয়া দেখা যায়। এই জন্য কাহারও গুরু অভিমান করিতে নাই। কারণ রামকৃষ্ণ-দেব কহিয়াছেন—

১০৮। সখি যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি।

প্রভু রামকৃষ্ণদেব, গুরুর অভিমান কিরূপে খর্ব্ব করিতে হয়, তাহা আপনি দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি এক দিকে সকল প্রকার ধর্ম্ম, গুরুকরণ পূর্ব্বক লাভ করিয়াছিলেন এবং আর একদিকে সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে তাহাদের ধারণানুযায়ী উপদেশ দিয়াছেন। তিনি উপদেশ দিতেন, দীক্ষিত করিতেন কিন্তু তাহাদের কাহার নিকট গুরু অভিমান করিতেন না কিম্বা

কোন কার্য্যের আভাসেও সে প্রকার কোন ভাবের লেশমাত্র অনুভব করা যাইত না। তাঁহার উপদিষ্ট শিষ্যেরাই হউন, অথবা সাধারণ ব্যক্তিরাই হউন, সকলকেই সর্ব্বাগ্রে তিনি মস্তকাবনত করিয়া নমস্কার করিতেন। গুরু বলিয়া দক্ষিণ পদ বাড়াইয়া রাখিতেন না কিম্বা কেহ প্রণাম করিবে বলিয়া উন্নত মস্তক করিয়া রাখিতেন না। উপদেষ্টা মাত্রেরই এই সকল কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তাঁহাদের এ কথাটী যেন ভুল না হয় যে, তিনিও একজনের শিষ্য, তাঁহারও একজন গুরু আছেন।

১০৯। যেমন কর্ম্মচারীদিগকে কর্ত্তার অবর্ত্তমানে কর্ত্তার ন্যায় কার্য্য করিতে হয়; সেই প্রকার গুরুদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। যে কর্ম্মচারী আপনাকে কর্ত্তার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া কর্ম্ম করে, তাহার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়া থাকে। গুরুরা আপনাদিগকে গুরু-জ্ঞান করিলে, বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে।

গুরুকরণ করিবার পূর্ব্বে জীবনের লক্ষ্য কি, এই বিষয়টী বিশেষরূপে নিরূপণ করা প্রতেক শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে—সংসার কি? তাহা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। প্রভু কহিয়াছেন—

১১০। যেমন আম্‌ড়া, ঃ—

শস্যের সঙ্গে খোঁজ নাই, আঁটি আর চাম্‌ড়া;
খেলে হয় অম্বল শূল, সংসার সেই প্রকার।

যেমন, আম্‌ড়া ফলের মধ্যে নিকৃষ্ট জাতি। ইহা সকল অবস্থাতেই অপ্রীতি-কর। অপরিপকাবস্থায় অম্লধর্ম্মবিশিষ্ট, সুতরাং উহা দীর্ঘকাল ভক্ষণ করিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা এবং পরিপক হইলে কিঞ্চিৎ অম্লমধুর সারদ্রব্য ব্যতীত উহা আঁটি এবং খোসাতেই পরিণত হইয়া যায়।

ফলের আকৃতি অনুসারে তুলনা করিয়া দেখিলে, আম্‌ড়া হইতে এক-বিংশতি অংশ সার প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তাহাও আবার নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর পদার্থ বলিয়া পরিগণিত।

সংসারও সেই প্রকার। ইহার বহির্দ্দিক দেখিতে অতি রমণীয় এবং চিত্ত-

বিনোদক বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু অভ্যন্তরে কোন সার পদার্থ পাওয়া যায় না। যখন সকলে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নি প্রভৃতি আত্মীয় এবং আত্মীয়দিগের সহিত একত্রে গ্রথিত হইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকে; যখন ধন ধান্য প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়; যখন দাস দাসী হয় হস্তী শকটাদি পরিবেষ্টিত হইয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন থাকে; তখন অনুমান হয়, যেন তাহারা সংসারে থাকিয়া জগতের অনুপমেয় সামগ্রী সম্ভোগ করিতেছে।

কিন্তু যখন বহির্দিক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ইহাকে বিসমাসিত করিয়া দেখা যায়, তখন সংসারের আর এক অবস্থা, আর এক প্রকার অতি ভীষণ ছবি নয়নে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক সাংসারিক নরনারী যেন নাগপাশে আবদ্ধ এবং প্রবল মাদক দ্রব্যের দ্বারা অভিভূত ও হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা প্রথমতঃ পিতা মাতার বাৎসল্য স্নেহসাগরে নিমগ্ন হইয়া শান্ত ও দাস্য মোহে বিমোহিত থাকে, সুতরাং সে অবস্থায় তাহাদের ভাল মন্দ বুঝিবার সামর্থ বিলুপ্ত হয়। যতই বয়ঃবৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই ভাই ভগ্নির সখ্য প্রেমে পরস্পর শৃঙ্খলিত হইয়া ভাবী সুখসমৃদ্ধি আশালতিকায় পরিবেষ্টিত হইতে থাকে। ক্রমে সেই তরুণ লতিকা পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার ফুল ফল জন্মে, ফুল ফল দীর্ঘস্থায়ী নহে, সুতরাং তাহারা চপলা চকিতের ন্যায় তাহাদের কার্য্য প্রদর্শন করিয়া অন্তর্হিত হইয়া যায় কিন্তু লতিকা ফল ফুলের সহিত তিরোহিত হয় না, তাহাদের পরিণতাবস্থা বিধায় পূর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় গঠনে সংগঠিত হওয়ায় দৃঢ়বন্ধন প্রদান করিতে থাকে, কিন্তু ফুল ফল আর জন্মায় না। ইতিমধ্যে তাহাদের মধুর প্রেম পীযুষ পান করিবার লালসা প্রবল বেগ ধারণ হওয়ায় সুধাকরের সুস্নিগ্ধ জ্যোতিঃনিভ রূপলাবণ্যা প্রেমানন্দদায়িনী রমণীর ভুজাশ্রয়ে আশ্রিত হয়। সেই ভুজ, যাহা তাহাদের মৃণাল বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল, তাহা ক্রমে নিম্নশাখা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ভুজঙ্গিনী বেষ্টনের ন্যায় পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে। যেমন তাহার বিমল বদন কমলে মধুপানের জন্য নরমধুপ প্রবিষ্ট হয়, অমনি সেই কামিনীর মোহিনী জলৌকা অলক্ষিত ভাবে ভ্রমরের কোমল অংশ দংশন করিয়া শোণিতসুধা শোষিত করিতে থাকে। সুধা মধুর পদার্থ। তাহা অনবরত ক্ষরিত হইতে থাকিলে সুধাপাত্র সুতরাং মুহুর্মুহুঃ নিঃশেষিত হইতে থাকে। সুধা সময় ক্রমে ক্ষরিত হইলে তাহাতে

উৎসেচন ক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ সুরার জন্ম হইয়া থাকে। সুরা মাদক দ্রব্য। একে নরদিগের সুধা ক্ষয়জনিত এবং নারীদিগের তাহা নির্গমনের সহায়তাকারিণী ও সুরার আধার নিবন্ধন অবসাদ হেতু দুর্ব্বল শরীর; তাহাতে অপত্যরূপ সুরার বাৎসল্য মাদকতায় বিমোহিত হইয়া, তাহারা একেবারে জনমের মত জড়বৎ অবস্থায় পতিত রহিয়া বাৎসল্যের দাম্পত্যপ্রেমের প্রচণ্ড হিল্লোলে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিত হইতে থাকে। সংসারে নরনারীগণ পঞ্চভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে। সাধারণ পক্ষে এই ভাব স্বভাবতঃ যেরূপে সম্ভোগ হইয়া থাকে, তাহা চিত্রিত করা হইল এবং তদ্দ্বারা যে সুখ শান্তি প্রাপ্তির সম্ভবনা, তাহাও সাংসারিক নরনারীদিগের অবিদিত নাই।

কেহ কি বলিতে পারেন যে, সংসারে পরিবার সংগঠিত হইয়া বিষয় বৃত্তিতে মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিয়া দিন যাপন করিলে শান্তি এবং চিরানন্দ সম্ভোগ করা যায়? কেহ কি বলিতে পারেন যে, পিতা মাতার প্রতি শান্তভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই ইহলোকের সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়? কেহ কি দেখিয়াছেন যে, ভ্রাতা ভগ্নির সহিত সদ্ভাব স্থাপন দ্বারা অবিচ্ছেদ সুখলাভ হইয়াছে? কেহ কি জানেন যে, ধনোপার্জ্জন দ্বারা প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া শান্তির মলয়ানিল সেবন করিতে পারিয়াছে? কেহ কি স্ত্রী-রত্ন দ্বারা (রত্ন বলিয়া যাহাকে নির্দ্দেশ করা যায়) অনন্ত সুখ শান্তি সম্ভোগ করিয়াছেন? কেহ কি বলিতে পারেন যে, পুত্র কন্যা লাভ করিয়া তিনি জগতের সারসুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন? তাহা কখন নহে, কখন নহে, কখন হইবারও নহে।

যাঁহারা সংসারকে সার জ্ঞান করেন, যাঁহারা সংসারের সুখই চরম সুখ বলিয়া গণনা করেন, যাঁহারা সংসারের আদি অন্তে অন্য কোন কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন, আমরা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারা অনন্ত অবিচ্ছেদ শান্তি কি সংসারে প্রাপ্ত হইয়াছেন? তাঁহারা কি বিষয়ের সুখ কতদুর, তাহা বুঝিতে পারেন নাই? তাঁহারা কি বিস্মৃত হইয়াছেন যে, ধনোপার্জ্জন করিতে ক্লেশের অবধি থাকে না, ধনোপার্জ্জনক্ষম হইবার নিমিত্ত যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ পাইতে হয় এবং তাহা রক্ষা করিতে ক্লেশের যে পরিসীমা থাকে না, তাহা কি তাঁহারা বুঝিতে অপারক? স্ত্রী রত্ন বটে, কিন্তু এই রত্ন গলদেশে সর্ব্বক্ষণ ধারণ করিলে কি শান্তি সুখের অপ্রতিহত সাম্রাজ্য স্থাপিত

হয়? ইহার সাক্ষ্য কি কেহ প্রদান করিতে সক্ষম? কোন্ নারীর পতিলাভে অখণ্ড শান্তিলাভ হইয়াছে? কোনও রমণী একথা কি বলিতে পারেন? আমরা সাময়িক সুখ শান্তির কথা উল্লেখ করিতেছি না, অনন্ত অবিচ্ছেদ শান্তির কথা বলাই আমাদের অভিপ্রায়।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, পুত্র কন্যা দ্বারা কাহার কি সুখলাভ হইয়াছে? কেহ কি অনন্ত-সুখ-রাজ্যে গমন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন? তাহা কদাপি হইবার নহে। ধন, জন, পুত্র, পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভাই, ভগ্নি, এ সকল জড় সম্বন্ধীয় বাহিরেরই কথা। ইহাদের দ্বারা যে সুখ শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও সেইজন্য বাহিরেরই কথামাত্র। ইহাদের দ্বারা নিঃস্বার্থ পারমার্থিক অনন্ত অবিচ্ছেদ সুখ, কখন প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, যাঁহারা আমাদের পরমাত্মীয় বলিয়া কথিত হন, তাঁহারা প্রত্যেকে স্বার্থশূন্য ব্রতে যোগ দান করিতে অসমর্থ এবং সাধু কার্য্যে যাঁহারা বিরোধী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের দ্বারা চিরশান্তি লাভ করিবার উপায় কোথায়?

যে বিষয় উপার্জ্জন করিতে বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় এবং কখন কখন বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইয়া যায়, তদ্দ্বারা কি ফল লাভ হয়? এইরূপে যাঁহাদের সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা একবার গত জীবন চিন্তা করুন এবং যাঁহাদের তাহা হয় নাই, তাঁহারা সংসারের প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখুন। যেমন, জোয়ার আসিলেই নদী পূর্ণ দেখায়, আবার ভাঁটা পড়িলে সে জল কোথায় চলিয়া যায়, তাহার চিহ্নও দেখা যায় না, বিষয়ও তদ্রূপ। যেমন আসিতেছে, অমনি কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। যাঁহারা ধনোপার্জ্জন দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। যে অর্থ তাঁহারা একমাস মস্তকের স্বেদ ভূমিতে ফেলিয়া ঝড় বৃষ্টিতে দশটার সময় অর্দ্ধাশন করিয়া কর্ম্মস্থানের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের আরক্তিম নয়ন-ভঙ্গি এবং দুর্ব্বিসহ বাক্যবাণ সহ্য করিয়া প্রাপ্ত হন, তাহা তাঁহার কি অপরের? কখন তাঁহার নহে। দেখুন, পরদিনে সেই অর্থের কিছু অবশিষ্ট থাকে কি না? যদ্যপি তাঁহারা সকলের প্রাপ্য প্রদান করেন, তখন ঋণগ্রস্ত না হইলে আর উদরান্ন চলে না। যাঁহাদের অর্থের অনাটন, তাঁহাদের দুঃখের অবধি নাই। তখন তাঁহাদের কি মনে হয় না যে, কেন এ নিদারুণ সংসার সাগরে লিপ্ত হইয়াছিলাম?

যাঁহাদের অত্যধিক পরিমাণে অর্থ আছে, তথায় এ প্রকার অশান্তি নাই

সত্য, কিন্তু তাঁহাদের যে ভীষণাবস্থা, যে দুঃখে তাঁহাদের দিন যাপন করিতে হয়, তাহা বর্ণনাতীত। বিষয়ের উপমা রাজা। কারণ, তাঁহাদের অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী আর কে আছেন? কিন্তু একবার চক্ষু খুলিয়া দেখা উচিত, রাজার সুখ শান্তি কোথায়? একদা কোন সচীব রাজপদের অবিচ্ছেদ সুখ শান্তি স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন, রাজা তাহা গোপনে শ্রবণ করেন; পরদিন সেই সচীবকে রাজ-সিংহাসনে আরোহিত করাইবার জন্য রাজাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল। মন্ত্রী সিংহাসনে উপবেশন করিয়া পরমাহ্লাদে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া বিকট চিৎকার পূর্ব্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কে আমার বিনষ্ট করিবার জন্য আমার মস্তকের উপরে একখানি শাণিত অসি কেশ দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে? কিঞ্চিৎ বায়ু সঞ্চালিত হইলেই আমার মস্তকে পড়িবে!" রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মন্ত্রী! রাজাদিগের অবস্থা এইরূপই জানিবে।" নরপতিদিগের পরিণাম অতি ভীষণ, ইতিহাস তাহার স্বাক্ষ্যস্থল।

সংসার বলিলে পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগ্নি ইত্যাদি এবং ধনৈশ্বর্য্যও বুঝাইয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা যে সুখলাভ করা যায়, তাহাদের বিচ্ছেদ যন্ত্রণার সহিত তুলনা করিলে, সংসারে সুখ বিরহিত অবস্থাই সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইবে। কারণ, পুত্র না হইলে অপুত্রক বলিয়া যে ক্লেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, পুত্র বিয়োগে তদতিরিক্ত কি পরিমাণে পরিতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা সাংসারিক ব্যক্তিদিগের অবিদিত নাই। অথবা নির্ধনীর মনের অবস্থা ধনীর ধনক্ষয়ের পর বিচার করিলে কাহাকে ন্যূনাধিক বলা যাইবে? এইজন্য সাধুরা যাহা বলিয়া থাকেন, তাহাই সত্য কথা।

জীবনের লক্ষ্য নিরূপণ করিতে প্রয়াস পাইলে শিষ্যদিগের আর একটী বিষয় অনুশীলন করিবার আবশ্যক হয়। আমাদের অবস্থা লইয়া বিচার করিয়া দেখিলে কামিনী-কাঞ্চন অতিক্রম করিয়া যাইবার কাহার উপায় নাই। অনেকে সংসারই সাধনের স্থান বলিয়া উল্লেখ করেন। অতএব দেখা হউক, আমাদের জীবনের লক্ষ্য কামিনী-কাঞ্চন কি না?

যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায়, অথবা কোন কথা না বলিয়া যদি অজ্ঞাতসারে তাঁহার দৈনিক কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়,

তাহা হইলে সর্ব্বদেশেই, সকল সংসারে এবং প্রত্যেক নরনারীর জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য, কামিনী * এবং কাঞ্চন বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

যখন সন্তান গর্ভস্থিত, তখন হইতে পিতামাতা ভাবী আশাবৃক্ষবীজ মানস-ক্ষেত্রে বপন করিয়া সন্তানের শুভাগমন প্রতীক্ষায় দিন যাপন করিয়া থাকেন। যদ্যপি পুত্র-সন্তান জন্মে, তাহা হইলে আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না। তখনই মনে মনে কালনিমার লঙ্কাভাগ হইতে আরম্ভ হয়। পিতা নিজ অবস্থানুসারে ভাবিয়া রাখেন যে, পুত্রকে ব্যবসাবিশেষে নিযুক্ত করিয়া আপন অবস্থার উন্নতি করিবেন। মাতাও অমনি স্থির করেন, এবার পুত্রের বিবাহ দিয়া কিঞ্চিৎ স্ত্রীধন করিয়া লইব এবং বধূ আসিয়া সংসারের নানাপ্রকার আনুকূল্য করিবে।

যদ্যপি দুর্ভাগ্যক্রমে কন্যা † সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে যদিও পুত্রের ন্যায় আশা ভরসা না হইতে পারে এবং আধুনিক ভূরি ভূরি বিবাহবিভ্রাটের দৃষ্টান্ত ও কালান্তক ছবি দেখিয়াও কখন কখন আশা মরিচীকা উদ্দীপিত হইয়া বলিয়া দেয়, "পুত্র হইতে কন্যা ভাল, যদি পাত্রে পড়ে।"

পুত্র যখন বয়োঃবৃদ্ধি লাভ করে,তাহার পিতা তখন তাহাকে বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন। পরে সেই বালক ক্রমে ক্রমে তাহার শক্তির পূর্ণভাবে বিদ্যালাভ করিয়া, বিদ্যালয়ের বিশেষ সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, অর্থের জন্য কার্য্যবিশেষে প্রবেশ করে। এই সময়ে প্রায় পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন দ্বারা কামিনীর কণ্ঠাভরণরূপে পরিশোভিত হইয়া থাকে। কখন বা ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেও তাহা সমাধা হইবার সম্ভাবনা। কিয়দ্দিবসান্তে সেই দম্পতী পুত্র কন্যার পিতা মাতা হইয়া পড়ে। তখন নিজ নিজ কামিনী-কাঞ্চন ভাবের অবসান না হইতেই, ইহা প্রকারান্তরে পুত্র কন্যার চিন্তারূপে সমুদিত হইতে থাকে। এই চিন্তাতেই হয় ত অনেককে লোকান্তর প্রাপ্ত হইতে হয়।

সাধারণ সাংসারিক নরনারীদিগের এই অবস্থা। কামিনী-কাঞ্চন ব্যতীত

* নারী সম্বন্ধে পতি বুঝিতে হইবে।

† বর্ত্তমান সমাজ দেখিয়া কন্যা সম্বন্ধে দুর্ভাগ্য শব্দ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলাম। কারণ, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। কন্যার বিবাহ লইয়া একণে যে অস্থিমজ্জাশোষক ব্যবসা চলিয়াছে, তাহার প্রাদুর্ভাবে প্রায় শতকরা ৯৮।৯৯ জন আজীবন দুঃখার্ণবে ভাসিতেছেন।

যেন তাহাদের আর কোন চিন্তাই নাই। বাল্যকালে অর্থোপার্জ্জন অর্থাৎ কাঞ্চন লাভক্ষম হইবার জন্য ব্যাপৃত থাকিতে হয়। যদিও এ সময়ে বালকের মনোমধ্যে বিষয়ের কোন আভাস না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে যে বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করেন, তাহা কাঞ্চন সম্বন্ধীয় বিদ্যা ব্যতীত কিছুই নহে। যে বিদ্যা আমরা এক্ষণে শিখিয়াছি, অথবা আমাদের ভ্রাতা কিম্বা সন্তানাদিকে প্রদান করিতেছি, তদ্দ্বারা কি ফল ফলিবার সম্ভাবনা? যাহা আমাদের ফলিয়াছে, যাহা আমরা সম্ভোগ করিতেছি, তাহারাও তাহাই প্রাপ্ত হইবে। অর্থ, বিশুদ্ধ অর্থ (রূপচাঁদ) ব্যতীত অন্য কোন কামনার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। এমন কোন পুস্তক শিক্ষা দেওয়া হয় না, যাহা দ্বারা অর্থশূন্য বিদ্যালাভ হয়, যাহা কিছু শিক্ষা করা যায়, সকলই অনর্থের মূল স্বরূপ কার্য্য করিয়া থাকে।

অর্থ হইলে তাহার ব্যবহার আবশ্যক। নতুবা এত পরিশ্রম করিয়া যাহা সংগৃহীত হয়, তাহা ব্যর্থ হওয়া উচিত নহে। আমরা এই কথা এত সূক্ষ্ম বুঝিয়া থাকি যে, অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আনা দূরে থাকুক, বালকের অর্থকরী বিদ্যার বর্ণপরিচয় হইলে, তাহার পিতা মাতা তখন সন্তানের ভাবী অর্থোপার্জ্জনের শক্তি সম্বন্ধে এতদূর দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারেন যে, তাহা ব্যবহারের সুপ্রণালীস্বরূপ কামিনী সংযোজন করিয়া দিয়া থাকেন।

এইরূপে সংসার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, কামিনী-কাঞ্চনই সকলকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে, একবার এইরূপ নরনারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা হউক, কামিনী-কাঞ্চন কি বাস্তবিকই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, অথবা এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তু আছে?

ইহার প্রত্যুত্তর প্রদানে তাঁহারা অশক্ত। যাহা তাঁহারা বলিবেন, তাহাতে কামিনী-কাঞ্চন ব্যতীত অন্য কথা হইবে না। অতএব কামিনী কাঞ্চনের সহিত আমাদের কতদূর সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা এইস্থানে সংক্ষেপে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সকলেই বলিবেন যে, আহার না করিলে দেহ রক্ষার দ্বিতীয় উপায় নাই, সুতরাং ভোজ্য পদার্থ সংগ্রহ করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। অর্থোপার্জ্জনের উপায় অবগত হওয়াই সেইজন্য বিশেষ কর্ত্তব্য।

দারপরিগ্রহ অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ একত্রিত না হইলে সন্তানোৎপত্তির উপায় নাই। সন্তান ব্যতীত সংসার হইতে পারে না এবং তাহা কাহারও ইচ্ছাধীন নহে।

মনুষ্যদিগের অন্যান্য মনোবৃত্তির ন্যায়, আদি রস সম্ভোগ করাও আর একটী বৃত্তি আছে ; সুতরাং তাহা চরিতার্থ করা অস্বাভাবিক নহে।

স্বভাবে যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কাহার পরিত্যাগ করিবার অধিকার নাই। বৃক্ষ লতাদির মধ্যে যে গুলি সুমিষ্ট ও সুবাসিত ফল ফুল প্রদান করে, তাহারাই উত্তম এবং যাহাতে তাহা হয় না, অথবা আমরা তাহার ব্যবহার অবগত নহি, কিম্বা বিষাক্ত ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করি, তাহা হইলে আমাদেরই সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইবে। এইজন্য মনোবৃত্তি বলিয়া যাহাদের পরিগণিত করা যায়, তাহারা ঈশ্বর হইতে সৃজিত সুতরাং অস্বাভাবিক বা পরিত্যাগের বিষয় নহে।

যদ্যপি তাহাই সাব্যস্থ হয়, তাহা হইলে কামিনী-কাঞ্চনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, এ কথা না বলা যাইবে কেন ?

আহার ভিন্ন দেহ রক্ষা এবং সন্তানাদি ব্যতীত সংসার সংগঠন হয় না, একথা কাহারও অস্বীকার করিবার শক্তি নাই, কিন্তু ইহাই সমাধা করিতে পারিলে যে মনুষ্যোচিত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধিত হইয়া যায়, তাহা কে বলিতে পারে ?

অতি নিকৃষ্ট জীব জন্তু বলিয়া যাহারা পরিগণিত, তাহারাও তাহাই করিয়া থাকে। তাহারাও আহার করে এবং সন্তান উৎপন্ন করিয়া যথা নিয়মে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা তাহাদের পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেয়। যদ্যপি আমাদের উদ্দেশ্যের সহিত জন্তুদিগের উদ্দেশ্য তুলনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে কি কোন প্রকার ইতর বিশেষ হইবে ? রাজা হউন প্রজা হউন, ধনী হউন নির্ধনী হউন, জ্ঞানী হউন অজ্ঞানী হউন, পণ্ডিত হউন কিম্বা মূর্খই হউন, হাকিম হউন আর চোরই হউন, সকলেরই উদ্দেশ্য এক প্রকার।

বিচারে নিকৃষ্ট জন্তুর ও আমাদের কার্য্য পদ্ধতি এক জাতীয় হইল, কিন্তু আমরা পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি। যদ্যপি এই অভিমান না থাকে, তাহা হইলে কোন কথারই আবশ্যকতা হয় না। পশু যাহারা, তাহাদের অন্য কার্য্য কি ? কিন্তু তাহা কোথায় ? সকলেই আপনার ভ্রাতা ভগ্নি হইতেও আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকেন। অতএব এই শ্রেষ্ঠত্ব বোধ করা আর একটী মনোবৃত্তি, তাহার সন্দেহ নাই।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, এই প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব বোধ করা অস্বাভাবিক কার্য্য, কিন্তু আমরা তাহা বলিতে পারি না। কারণ অস্বাভাবিক হইলে উহা কাহার দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে ?

এক্ষণে এই বৃত্তিটী লইয়া যদ্যপি বিচার করিতে নিযুক্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে ইহার স্বতন্ত্র ব্যবহার বহির্জ্জিত হইয়া যাইবে, কিন্তু উহা এক্ষণে যেরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই ব্যবহার দোষকেই অস্বাভাবিক কহা যাইবে।

আমরা বলি, যাহাতে এই মনোবৃত্তিটী কামিনী-কাঞ্চন অর্থাৎ পশুভাব বিশেষে সীমাবদ্ধ না হইয়া ক্রমশঃ উন্নতিসোপানে আরোহণ পূর্ব্বক প্রকৃত মানসিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে, তাহাই প্রত্যেকের জীবনের অদ্বিতীয় লক্ষ্য হওয়াই কর্ত্তব্য।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইবে যে, মানসিক উন্নতি কাহাকে কহা যাইবে? যাঁহারা দেশের ধনী, পণ্ডিত এবং ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁহাদের কি মানসিক উৎকর্ষসাধন হয় নাই? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জড়জগতের যে সকল সামাজিক, রাজনৈতিক শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহা দ্বারা জড়-জগতের জ্ঞান জন্মে কিন্তু তাহাতে মনের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না। মনের আকাঙ্ক্ষা যে পর্য্যন্ত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত উন্নতির আবশ্যক আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদ্যপি মনের এই বৃত্তি চরিতার্থ করিতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকেই একমাত্র লক্ষ্য করা উচিত, তিনি অনন্তস্বরূপ সুতরাং অনন্তভাবে মন গঠিত হইলে আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হইবে। এইরূপ ব্যক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বুঝিতে পারেন।

কথিত হইল যে, কেবল আহার বিহার দ্বারা দিন যাপন করাকে পশুভাব কহে, তবে মনুষ্য হইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য এবং কি রূপেই বা মনুষ্য হওয়া যায়?

হয় ত এই কথা শুনিয়া অনেকে আমাদের উপহাস করিবেন। অনেকে বলিতে পারেন যে, আমরা মনুষ্য হইব কি? তাহাই ত আছি। ডারউইন্ সাহেবের মত দ্বারা তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বজন্মে লাঙ্গুল ছিল তাহার চিহ্ন স্বরূপ এখনও মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রবর্দ্ধনাংশ (coccyx) বর্ত্তমান আছে। সুতরাং আমরা মনুষ্য।

যদ্যপি লাঙ্গুলবিহীন হইলেই মনুষ্যপদবাচ্য হওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা মানুষ। কিন্তু আর একটী প্রশ্ন উত্থিত হইবে। আমরা যদ্যপি মনুষ্য হই, তাহা হইলে আমাদিগকে কোন্ শ্রেণীবিশেষে পরিগণিত করা যাইবে? অথবা পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্যদিগের সহিত সমশ্রেণীস্থ বলিয়া জ্ঞান করা হইবে?

এক্ষণে আমরা আপনা আপনি অন্যান্য ব্যক্তির সহিত তুলনা করিয়া

দেখি। প্রথমে রাজার সহিত তুলনা করা হউক। ডারউইনের মতে রাজাও যে, আর আমরাও সে। শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের অভিপ্রায়ও তদ্রূপ। রসায়ন শাস্ত্র দ্বারা উভয়ের একই অবস্থা প্রতিপন্ন হইবে, তবে প্রভেদ কেন? কেন আমিও যে, রাজাও সে, না হইব? কেন আমাকে পর পাদুকা বহন করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হয়, আর রাজা আপন আবাসে উপবেশন করিয়া আছেন, তাঁহার দৈনিক ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য আমরাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকি। আমরা মস্তকের স্বেদ ভূমিতে নিপতিত করিয়া বৃত্তি প্রদাতার আরক্তিম মুখভঙ্গি অঙ্গের ভূষণ জ্ঞানে যাহা উপার্জ্জন করিয়া আনি, তাহা হইতে রাজার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া দিই কেন? কেন আমরা আর এক-জন মনুষ্যের জন্য ক্ষতি স্বীকার করি? কেন আমরা ক্লেশ পাই এবং কেনই বা আমরা অপমান সহ্য করি? যদ্যপি এই প্রকার অভিমান ও আত্মবিস্মৃতি নিবন্ধন রাজার প্রাপ্য প্রদান করিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ রাজ-দূত আসিয়া লেহ্য দেয় অর্থের চতুর্গুণ আদায় করিয়া লয়। তখন কাহারও দ্বিরুক্তি করিবার সাহস হয় না।

এক্ষণে রাজার সহিত আপনার প্রভেদ স্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে। রাজার শক্তি অধিক এবং আমার নাই। অতএব সকলে এক মনুষ্য হইয়াও শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিভেদ আছে। এই শক্তি যাহার যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে, সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণে মনুষ্য হইবে।

মনুষ্য হইবার শক্তি দ্বিবিধ। যথা মানসিক এবং কায়িক।

মানসিক শক্তি দ্বারা সঙ্কল্প বা অনুষ্ঠান এবং কায়িক শক্তি দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ করা যায়। যেমন কিছু আহার করিবার সঙ্কল্প হইল কিন্তু কার্য্য না করিলে উদর পূর্ণ হইবে না। অথবা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করণার্থ মনে মনে স্থির করা হইল, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত না করা যায়, সে পর্য্যন্ত অট্টালিকা প্রস্তুত হইবে না।

মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে মস্তিষ্কের বলাধান করা কর্ত্তব্য এবং যে সকল কারণে ইহার দৌর্ব্বল্য উপস্থিত না হয়, তদ্‌পক্ষে তীব্র দৃষ্টি রক্ষা করা অতিশয় আবশ্যক। কারণ, যদ্যপি মস্তিষ্কের পূর্ণ বিস্তৃতি কাল পর্য্যন্ত দৌর্ব্বল্য-জনক কার্য্যে ব্যাপৃত অথবা তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকিয়া তদ্‌পরে এককালে ঔদাস্য ভাব প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলেও আশানুরূপ ফল লাভের কোন মতে সম্ভাবনা থাকে না।

মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্যের দ্বিবিধ কারণ আছে। প্রথম, কোন বিষয় শিক্ষা না করা এবং দ্বিতীয়, মস্তিষ্ক বিধানের হ্রাসতা উপস্থিত করা।

প্রথম। শিক্ষা অর্থাৎ ভাববিশেষ অবলম্বন করিয়া মস্তিষ্ক সঞ্চালিত করিলে সেই ভাববিশেষের অদ্ভুত কার্য্য হইয়া থাকে। সেই কার্য্যও সেই বিশেষ প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য উপায়ে সাধিত হইতে পারে না। যেমন সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিলে যদ্যপি তাহাতে সুশিক্ষিত হওয়া যায় অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি জন্মে, যাহাকে অপর ভাষায় মস্তিষ্কের ভাববিশেষের প্রবর্দ্ধিতাবস্থা কহে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সঙ্গীত সম্বন্ধে নব নব ভাব প্রকটিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা না করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা সে কার্য্য কখন সাধিত হইতে পারে না।

পৃথিবী ভাবে পরিপূর্ণ। ইহার সংখ্যা সংখ্যাবাচক নহে। যে ব্যক্তি এই ভাব যত পরিমাণে আয়ত্ত করিতে পারিবেন, সেই ব্যক্তির মস্তিষ্ক সেই পরিমাণে পূর্ণ হইবে এবং তিনিই প্রকৃত মনুষ্যশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইবেন।

দ্বিতীয়। যেমন আধার ব্যতীত আধেয় থাকিতে পারে না, অর্থাৎ পাত্র না থাকিলে পদার্থ রাখিবার উপায় নাই, সেই প্রকার ভাব শিক্ষা করিতে হইলে অবলম্বনের প্রয়োজন। এ স্থানে ভাবের অবলম্বন মস্তিষ্ক সুতরাং মস্তিষ্কের বৈধানিক শক্তি সংরক্ষা করা কর্ত্তব্য।

অসুস্থতা, স্নানবীয় উত্তেজনা এবং শারীরিক অসঙ্গত অপচয় হইলে মস্তিষ্ক বিধানের হ্রাসতা জন্মে। এই নিমিত্ত অপরিমিত আহার, ব্যায়াম এবং ইন্দ্রিয় চালনা হইতে একেবারে সংযত থাকা আবশ্যক।

যদ্যপি উপরোক্ত নিয়মানুসারে পরিচালিত হওয়া যায়, তাহা হইলে পরিণামে মনুষ্যত্ব লাভ করা যাইতে পারে।

এস্থানে কথিত হইবে যে, ইহা কি বাস্তবিক কথা, না কবির কল্পনাপ্রসূত আকাশকুসুম? আমরা কাল্পনিক কিম্বা আনুমানিক কথার এক পরমাণু মূল্য স্বীকার করিতে সাধ্যপক্ষে পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া থাকি। যে সূত্র প্রদর্শিত হইল, তাহার প্রমাণ আছে। ইতিহাস পাঠ অথবা বর্ত্তমান স্বাধীন জাতিদিগের রীতি নীতি ও কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা হউক। কি উপায় দ্বারা তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা উন্নত, শ্রেষ্ঠ ও স্বাধীন হইয়াছেন, তাহা সুবিবেচকের ন্যায় সহিষ্ণুতা পরতন্ত্র হইয়া সকলে নিরীক্ষণ করুন।

স্বাধীন জাতি যাঁহারা, তাঁহাদের মানসিক এবং দৈহিক শক্তির অতিশয়

প্রাবল্য হইয়া থাকে। এই যে নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়া পৃথিবীর সুখ সমৃদ্ধি ও জগৎপতির অপার সৃষ্টি কৌশল প্রকটিত হইতেছে, তাহা মানসিক উন্নতি ব্যতীত কখন সম্ভবনীয় নহে। ডারউইন মনুষ্যদিগের যে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত, বিজ্ঞান শাস্ত্রের যুক্তি এবং মীমাংসা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজ মস্তিষ্কের গর্ভসম্ভূত বলিয়া অবশ্যই প্রতিপন্ন করিতে হইবে।

স্বাধীন জাতিদিগের বাহুবলের পরিচয় আমরা প্রকাশ করিয়া আর কি লিখিব? তাহা আমাদের প্রত্যেকের অন্তর বাহিরে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

স্বাধীন ব্যক্তিদিগের কার্য্যপ্রণালী কি? তাঁহারা বাল্যকাল হইতে শারীরিক ও মানসিক বলাধান করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। সুতরাং নিয়মপূর্ব্বক বলকারক এবং পরিমিত আহার ও ব্যায়াম এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষাই তাঁহাদের জীবন প্রস্তুত করিবার উপায়বিশেষ। কোন কোন জাতির মধ্যে এই নিয়ম এত বলবতী যে, যাহার পিতা কৃষীকর্ম্মোপজীবী, তাঁহাকেও সন্তানের শিক্ষার জন্য নিয়মিত অর্থ প্রদান করিতে হয়। তাহাতে অসমর্থ হইলে তাঁহাকে তজ্জন্য কারাগারে গমন করিতে বাধ্য হইতে হয়।

স্বাধীন জাতিদিগের বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ। পূর্ণ যুবা কাল প্রাপ্ত না হইলে কাহার বিবাহ হয় না। ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয় চালনা সম্বন্ধে অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে।

এই নিয়ম যে কেবল বর্ত্তমান স্বাধীন জাতিদিগের মধ্যেই বলবতী আছে, এমন নহে। আমাদের দেশেও এক সময়ে এই ব্যবস্থা ছিল। তখন অন্ততঃ যুবকের ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে কখন বিবাহ হইত না। এতাবৎকাল তাঁহাকে মানসিক ও দৈহিক উন্নতির জন্য নিযুক্ত থাকিতে হইত। পরে এই শিক্ষার যতই হ্রাস হইয়া আসিল, ততই অবনতির সোপান খুলিয়া গেল। ক্রমে মানসিক শক্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহা আর অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হইবার উপায় রহিল না। যে জাতি মানসিক শক্তি বলে বিজ্ঞান, দর্শন ও যোগতত্ত্বের চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন; যে জাতির প্রণীত গ্রন্থ দেখিয়া অদ্যাপি পণ্ডিতমণ্ডলী অবাক হইয়া যাইতেছেন; ডারউইন মনুষ্য জাতির যে বৃত্তান্ত লিখিয়া জনসমাজে চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা যাঁহাদের দ্বারা আরও বিষদরূপে উল্লিখিত হইয়াছিল; ডাল্টন প্রকাশিত

পরমাণবিক বিজ্ঞান দ্বারা যে পদার্থতত্ত্ব শিক্ষার অত্যাশ্চর্য্য উপায় প্রচলিত হইয়াছে, তাহা কনদ মহাত্মা দ্বারা বৈশেষিক দর্শনে বহুকাল পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল; যে জাতি জড় জগৎকে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতি পঞ্চবিধ অবস্থায় শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক দিগের অদ্যাপি জ্ঞান হয় নাই; যে জাতির ব্যায়াম প্রক্রিয়াবিশেষ (হট যোগ) অদ্যাপি সভ্যতম জাতিদিগের মধ্যে বর্ণমালা রূপেও পরিগণিত হয় নাই; যে জাতির জড় চেতন ও শুদ্ধ চৈতন্য বা ঐশ্বরিক তত্ত্বের নিগূঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা লইয়া এখনও কত বাদানুবাদ চলিতেছে; যে জাতি যোগবলে কুম্ভক দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অবরুদ্ধ করিয়া বিশ্ববিধাতার স্বাভাবিক নিয়ম অতিক্রম করিয়াছিলেন; সেই জাতির সেই মনুষ্যদিগের সন্তান কি আমরা? আমরা কি সেই আর্য্যকুলগৌরব মহাত্মাদিগের বংশ-সম্ভূত বলিয়া জনসমাজে পরিচয় দিতে পারি? কখন না, কখন না! তাঁহাদের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের পশুর অবস্থা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিব। তাঁহারা যে সকল কীর্ত্তি দ্বারা অক্ষয় খ্যাতি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি আমরা অনুষ্ঠান করি? তাঁহারা জড় তত্ত্ব, জড় চেতন তত্ত্ব এবং শুদ্ধ-চৈতন্য তত্ত্ব বিষয়ক যে সকল রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা কি তাহা অন্ততঃ সম্ভোগ করিতেও প্রয়াস পাইয়া থাকি? তবে আমরা আর্য্য-সন্তান কিসে হইলাম? কিরূপেই বা মনুষ্য বলিয়া অভিমান করি?

স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, যাঁহারা স্বাধীন জাতি, যাঁহারা মনুষ্য, তাঁহারাই মানসিক এবং দৈহিক উন্নতি সাধন করিয়া দুর্ব্বলদিগের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন। অতএব আমরা সেই মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য চেষ্টা না করি কেন? আমরা পশুভাব হইতে উন্নতি লাভের চিন্তা এককালে জলাঞ্জলি দিয়া যেন নির্ব্বিবাদে পৈতৃক গচ্ছিত ধন দ্বারা দিনযাপন করাই একমাত্র মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছি?

তাই আমাদের দেশীয়দিগকে কর যোড় করিয়া বলিতেছি, তাঁহারা আপনাপন অবস্থা চিন্তা করিয়া দেখুন! কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া মনুষ্যপদবাচ্য হইতে অভিলাষ করিয়াছেন? যে দুইটী কার্য্য দ্বারা মনুষ্য হওয়া যায়, তাহা কি তাঁহারা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন? অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য বিদ্যাভ্যাস এবং ইন্দ্রিয় শক্তি রক্ষা করাই হ'ল দৈহিক ব্যায়াম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক, খ, গ, ঘ, উপাধিতে মনুষ্য হওয়া যায় না,

সরকার বাহাদুরের বাহাদুরি উপাধিতে মনুষ্য হওয়া যায় না। কারণ উভয়ই অর্থকরী বিদ্যার জন্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। সরকারি উপাধি শ্রবণ সুখকর কিন্তু তাৎপর্য্য বহির্গত করিলে কি জানা যাইবে? সেই ব্যক্তির কোন কার্য্যবিশেষে দক্ষতা জন্মিয়াছে; তাহাতে কি মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি হয়? সকল দেশেই সর্ব্ব সময়ে সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে উপাধিবিশেষ দ্বারা ভূষিত করা হয়, কিন্তু ইতিহাস কি তাহাদের গণনায় স্থান দেয়? না রাজ-কর্ম্মচারীদিগের ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিবার জন্য কেহ কখন লালায়িত হইয়াছেন? এই ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমান রাজত্বকালীন যে সকল উপাধি প্রচলিত ছিল, তাহার কি কোন চিহ্ন আছে? কিন্তু ব্যাস, কপিল, নারদ, মনু, কালীদাস, ভবভূতী, ব্যোপদেব ও পাণিনি প্রভৃতি মহাত্মারা কি জন্য পৃথিবীর অক্ষয় খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন? তাঁহারা কি অর্থকরী বিদ্যায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, অথবা মানসিক উন্নতিই তাহার কারণ? অর্থ এবং স্ত্রী-সম্ভোগ করা তাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, অথবা তাহা হইতে তাঁহারা নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতেন?

যাঁহারা মনুষ্য বলিয়া অদ্যাপি মনুষ্যসমাজে পরিগণিত হইয়াছেন, তাঁহারাই মানসিক এবং কায়িক উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

এক্ষণে যে প্রকার অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে মানসিক শক্তি কাহাকে বলে, তাহাই আমরা এখনও শিক্ষা করি নাই। বিভিন্ন দেশীয় ব্যক্তিদিগের মানসিক শক্তিপ্রসূত ফল লইয়া আমরা আনন্দে অজ্ঞান বালকের ন্যায় দিন যাপন করিতেছি। যাহা শিক্ষা দিবার জন্য আমরা সতত লালায়িত, কিন্তু আমরা তাহার কারণ জ্ঞান লাভ করিলাম কৈ? কৈ কে সেই কার্য্য করিবার জন্য চিন্তিত? আমাদের দেশে মানসিক উন্নতির জন্য যে সকল বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কি? তাহাতে মানসিক উন্নতি কত দূর হইয়াছে ও হইবে? যাঁহারা বর্ত্তমান বিদ্যানুসারে মানসিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা কেবল অর্থোপার্জ্জনক্ষম হইতেছেন মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক মনুষ্যোচিত উন্নতি কি করিলেন, তাহা একবার কি চিন্তা করিয়া দেখেন? অর্থ ছিল না কোন্ সময়ে? ধনী নাই কোন দেশে? কিন্তু কয়জন ধনীর নাম পৃথিবীর গৃহে গৃহে জল্পনার সামগ্রী? কোন্ ধনীকে কে গণনা করেন? ইতিহাস কোন্ ধনীর কথা উল্লেখ করেন?

এই ভারতবর্ষে কত লোক ধনী ছিলেন, তাহার সীমা নাই। কে তাহাদের নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন? কিন্তু কপিল, কালীদাস প্রভৃতি আর্য্যেরা কোন যুগে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা ধনী ছিলেন কি না তাহার কোন সাক্ষ্য নাই এবং তজ্জন্য তাঁহারা এক্ষণে সম্মানিত হইতেছেন না। তাঁহারা তাৎকালীক রাজাদিগের দ্বারা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া যে তাঁহাদের গৌরব বিস্তার হইয়াছে তাহাও নহে, তবে কি শক্তিতে তাঁহাদের চিরস্থায়ী কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীয়মান হইতেছে? তাঁহারা কেহ বিলাতে গমন করিয়া বিভিন্ন জাতীয় পরিচ্ছদ ও আহার করিয়া মানবদেহের উচ্চতম শক্তি প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা সিভিলিয়ান, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, উকীল, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়া মানবকুলতিলক হন নাই। তাঁহারা টাউন হলে চীৎকার করিয়া অথবা সংবাদ পত্রে আত্মগ্লানি, পরকুৎসা বা রাজ-সরকারকে কটু কথা বলিয়া অনন্ত খ্যাতি সংস্থাপন করিয়া যান নাই? তাঁহারা মানসিক—মনুষ্যদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য—মানসিক উন্নতির প্রসাদে এই সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যান্য সভ্য মনুষ্যেরা যে ভারত সন্তানদিগকে অদ্যাপিও আর্য্য শব্দে উল্লেখ করেন, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে কি আমরা অসমর্থ? তাহা কি সেই আর্য্যদিগের প্রসাদাৎ নহে? নতুবা আমরা যে কি হইয়াছি, আমাদের আর্য্যের লক্ষণ যে কি আছে, তাহা মনুষ্যের চক্ষে গোপন রাখিবার উপায় নাই।

তাই বলিতেছি যে, আমরা মনুষ্য হইব কবে? অদ্যাপিও মনুষ্য হইবার কোন উপায় উদ্ভাবন হয় নাই। যাহা কিছু হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে ক্রমে অনন্ত পশু হইয়া যাইব, তাহার তিলার্দ্ধ সংশয় নাই।

আমাদের অবস্থা কি, একবার চিন্তা করিয়া দেখা হউক। যাঁহারা মনুষ্য অর্থাৎ মানসিক এবং কায়িক শক্তিতে পূর্ণ বলীয়ান, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন তুলনা হইতে পারে কি না? মনুষ্য যাঁহারা, তাঁহারা স্বাধীন অর্থাৎ কোন বিষয়ে পর মুখাপেক্ষী নহেন। স্বাধীন ভাব নানা প্রকার। স্বাধীন বলিলে সচরাচর যে ভাব বুঝাইয়া থাকে, তাহা আমরা বলিতেছি না। আমরা স্বাধীন অর্থে মানসিক স্বাধীনতা বুঝি। কারণ কোন রাজার অধীনে না থাকিলে যে স্বাধীন শব্দ প্রয়োগ হয়, তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। এ পক্ষে স্বাধীন শব্দ বিচার করিলে এমন কি রাজাকেও স্বাধীন বলা যাইতে পারে না, কারণ তিনিও নিয়মের অধীন। মানসিক

স্বাধীনতায় নিয়ম স্থান পায় না। যদিও সময়ে সময়ে স্বাধীন ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া অনেকের বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু তেজীয়ান স্বাধীন ব্যক্তির তাহাতে মানসিক শক্তি কি পরাজিত হইয়াছে? কায়িক স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করা যায় কিন্তু মানসিক শক্তি কাহারও আয়ত্ত হইবার নহে। তবে ইচ্ছা করিলে সে নিজে পরাজয় স্বীকার করিতে পারে। এই জন্য কায়িক স্বাধীনতাপেক্ষা আমরা মানসিক স্বাধীনতার এত পক্ষপাতী। বিশেষতঃ, আর্য্যেরা এই পন্থায় গমন করিয়া পৃথিবীকে চমকিত করিয়াছিলেন এবং অদ্যাপিও করিতেছেন। পৈতৃক শক্তি যাহা, তাহা বংশানুক্রমে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং তাহাই আমরা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি।

কেশবচন্দ্র সেন যে পৃথিবীব্যাপী অক্ষয় নাম বিস্তার করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, তাহা তাঁহার কোন্ স্বাধীনতা গুণে? কায়িক না মানসিক? কিন্তু আমাদের এমনই দেশের দুরবস্থা, এমনই পশু আমরা যে ইহার মর্ম্ম কথা বুঝিয়া তদনুযায়ী জীবন গঠন করিতে পারিলাম না। আমরা যে কাহাকে লক্ষ্য করিতেছি, কি যে জীবনের আদর্শ, তাহা কেহ কি স্থির করিয়া দিতে পারেন? বৎসর বৎসর উকীলের দল লইয়া দেশ করিবে কি? ডাক্তার লইয়া কি লভ্য হইবে? তিসি ভুষির মহাজন দ্বারা কি পশুত্ব বিদূরিত হইবে? চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক ও ঈশ্বর বিশ্বাসী মনুষ্য চাই। তবে দেশের উন্নতি হইবে, তবে দেশে মনুষ্য হইবে, তবে ভারত-জননীর ক্রোড়ে তাঁহার গর্ভজাত সন্তান বলিয়া আমরা শোভা পাইব।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইবে, চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক ভিন্ন কি কেহ মনুষ্য নহেন? আমরা তাহা অকপটে স্বীকার করি। যে পদার্থবিজ্ঞান জানিল না, যে আপনাকে চিনিল না, যে ঈশ্বরের অলৌকিক অব্যক্ত সৃষ্টি রচনা বুঝিল না, যে তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিয়া নূতন নূতন ভাব প্রকটিত করিতে পারিল না, তাহাকে কোন্ সূত্রে মনুষ্য বলিয়া মনুষ্য নামের কলঙ্ক করিব? আমরা বাঙ্গালীও মনুষ্য, আর ইংলণ্ড, আমেরিকা, রুষ, চীন, তাতার প্রভৃতির মনুষ্যেরাও মনুষ্য। একজন ব্যক্তি নিজ মানসিক শক্তিবলে তাড়িৎ শক্তি আবিষ্কার করিয়া দিল, তাঁহার দ্বারা অদ্য পৃথিবীতে কোটী কোটী ব্যক্তি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সুখে দিন যাপন করিয়া যাইতেছেন। এই ব্যক্তিকে আমরা কি বলিব? আমরা যে মনুষ্য, তিনিও কি তাই? না তিনিই মনুষ্য, আর আমরা পশু। কোথায় সেই মনুষ্য, যাঁহার মস্তিষ্কের প্রতাপে অদ্য

হোমিওপ্যাথির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ? তিনিও কি আমাদের মত মনুষ্য ছিলেন?

যেমন, বলদ ও ঘোটক সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া রক্ষকের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দেয়, সেইরূপ আমরা মনুষ্যদিগের জন্য উকীলী, ডাক্তারী, ব্যবসাদি দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিয়া তাহাদের উদর পূর্ণ করিতেছি। দেশের অর্থ প্রতিদিন কত বহির্গত হইয়া যাইতেছে, তাহার কি হিসাব কেহ রাখেন? হিসাব অন্যত্রে দেখিতে যাইবার আবশ্যক নাই; নিজ নিজ গৃহই তাহার পুস্তক। কে কত উপার্জ্জন করিলেন এবং কিসে কত ব্যয় হইল, একবার সকলেই দেখুন দেখি! প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শয়ন কাল পর্য্যন্ত যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদিগের উৎপত্তির স্থান কোথায়? আমাদের মস্তিষ্কের জড়শক্তিসম্ভূত অথবা অপরের? চুরুট, দেশলাই, চা, বিস্কুট, দন্তমঞ্জন, বুরুশ, ক্ষুর, ছুরি, কাঁচি, সূচিকা, আলপিন, সাবান, তৈল, পরিধেয় বস্ত্র, লেখা পড়া শিক্ষা করিবার উপযোগী স্লেট, পেন্সীল, কাগজ, কলম, কালি ও পুস্তকাদি; বিলাসীদিগের নিমিত্ত নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য, আহারীয় পদার্থ, শকট এবং শয্যা প্রভৃতি যাবতীয় দৈনিক সামগ্রী সকল কোথা হইতে আসিতেছে, তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার কাহার কি আবশ্যক নাই?

যে সকল ভাব লইয়া মনের জড়-চৈতন্য শক্তি লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহা আমাদের কিম্বা ভিন্ন দেশীয়ের? মিল, স্পেন্সর, কম্‌ট, হাক্‌সিল, কার্লাইল প্রভৃতি মনুষ্যদিগের মস্তিষ্ক-কুসুম অর্থের দ্বারা ক্রয় পূর্ব্বক গলভূষণ করিয়া মহানন্দে আস্ফালন করিতেছি; মোক্ষমূলার, কোল-ব্রুক, উইলসন, ডাউসন প্রভৃতি মহাত্মারা যে সকল চৈতন্য-শক্তিবিধায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন, তাহাই আমাদের ঋষিবাক্য হইয়া গিয়াছে; কিন্তু হায়! আমরা এমনই পশু যে ইহারা কি দিল, কি প্রাপ্ত হইলাম, কাহাদের ধন কে কিরূপে প্রদান করিতেছে, তাহা একবার বুঝিয়া দেখি-বারও আমাদের সামর্থ্য নাই।

যে কার্য্যে আমরা মন সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদের উপকারিতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ইহাতে মানসিক উন্নতি হয় সত্য। উকীলী, ব্যারিষ্টারী স্বাধীন কার্য্যও বটে। ইহা দ্বারা নানাবিধ বৈষয়িক সূক্ষ্মতম ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাকে প্রকৃত মানসিক

উন্নতি বলা যায় না; কারণ উকীল ও ব্যারিষ্টারদিগের উদ্দেশ্য কি? যখন ভ্রাতৃবিচ্ছেদ উপস্থিত হইবে, যখন সহোদর সহোদরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে, তখন ইঁহারা উভয় পক্ষে গমন করিয়া তাহাদের সঞ্চিত ধনে অংশ স্থাপন পূর্ব্বক উদর পূর্ণ করিয়া লইবেন। অর্থাৎ গৃহবিচ্ছেদ কামনাই এই ব্যবসার সূত্রপাত; সুতরাং এই ব্যবসার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই দেশের অকল্যাণ, ততই পরস্পর বিবাদের হেতু হইবে এবং তন্নিবন্ধন দেশের বিপত্তিও ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে।

চিকিৎসকের দ্বারা দেশের উপকার কি? রোগী না হইলে ডাক্তারদিগের উদরান্ন চলিবে না; সুতরাং যাহাতে লোকে সর্ব্বদাই রোগাক্রান্ত হয়, তাহাই তাঁহাদের প্রার্থনা। যখন কোন বিশেষ পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। যেমন, যুদ্ধের পর জয়লাভ করিয়া পরাজিত ব্যক্তিদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ করা হয়, ডাক্তারও প্রায় তদ্রূপ। দর্শণীর এত মুদ্রা, ঔষধের এত, আণুবীক্ষণিক পরীক্ষার জন্য এত অর্থ প্রদান করিতে হইবে বলিয়া তাহার সর্ব্বস্ব শোষণ করিতে পারিলে চিকিৎসক কখন তাহা পরিত্যাগ করেন না। এই প্রকারই অধিক, সহৃদয় ব্যক্তিও থাকিতে পারেন; অতএব এই শিক্ষার উপকারিতা কি? ইহাতে মানসিক শক্তি বিস্তৃত করিলেও আপনার ও দেশের উপকার কি হইবে? যে কোন ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন, এতএব তদ্দ্বারা কিরূপে মনুষ্য হওয়া যাইবে?

আমাদের দেশের লোকেরা জীবনের লক্ষ্য কি করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কার্য্য দেখিলেই প্রতীতি হইবে। কি উপায়ে রাজসরকারের ভৃত্য হওয়া যায়, তাহাই জীবনের অদ্বিতীয় উপায় এবং যে কেহ তদবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহারা তাহাই কোটী জন্মের পুণ্যফল জ্ঞানপূর্ব্বক অহঙ্কারের উচ্চতম সোপানে উপবেশন করিয়া আত্মশ্লাঘায় দশদিক প্রতিধ্বনিত করেন। ভৃত্যের সাজে দেহ সুসজ্জিত ও "হ, জ, ব, র, ল" উপাধি দ্বারা শিরঃভূষণ করিয়া মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র লজ্জার উদ্রেক হয় না। আই স্মরণ করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা মনুষ্য হইবেন কবে? যদ্যপি মনুষ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজে তাঁহারা পরিগণিত হইবেন কিন্তু সে আশা কতদূর ফলবতী হইবে, তাহা একবার পুরাতন ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে সমুদায় জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

কথিত হইল যে, বিজ্ঞানলাভ এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী হওয়াই মনুষ্য হইবার একমাত্র উপায়। বিজ্ঞান দ্বারা এই দেহ-বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়, সৌর জগৎ কি অদ্ভুত কৌশলে পরিচালিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, উদ্ভিদেরা যে অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থার অন্তর্গত, তাহা আমাদের পরিদৃশ্যমান হয়, জড় ও জড়-চেতনদিগের ইতিবৃত্ত আনুপূর্ব্বিক অবগত হওয়া যায় এবং সর্ব্বশেষে যখন যাঁহার মানসিক শক্তি ইত্যাকার যাবতীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রে অধিকার সংস্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তখন তাঁহার শুদ্ধ-চৈতন্য বা ঈশ্বর বিষয়ক কার্য্যকলাপ দর্শন করিবার শক্তি লাভ হয় এবং তিনিই তখন প্রকৃত মনুষ্যশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশপথ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ফলে, মনুষ্য হইতে হইলে ঈশ্বর-জ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহার ঈশ্বর বোধ আছে, যাঁহার হৃদয়ে ঐশ্বরিক-ভাব ব্যতীত অন্যভাব স্থান না পায়, তাঁহারা কি প্রকার মনুষ্য? তাঁহারা কি আমাদের ন্যায় প্রতারক, প্রবঞ্চক, ভ্রাতৃদ্বেষী, লম্পট, বিশ্বাসঘাতক; না তাঁহাদের সকল বিষয়ই সাধুভাবে পরিপূর্ণ? যদ্যপি সকলেই ঈশ্বরপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই স্বার্থবিহীন হইবেন; ফলে গৃহবিচ্ছেদ বা অর্থ লইয়া লোভ জন্মিবে না, অতএব উকীল ব্যারিষ্টারের প্রয়োজন থাকিবে না। যাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা সদাচারী, শারীরিক মানসিক দৌর্ব্বল্যজনক কার্য্য হইতে বিরত থাকায় পীড়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন, সুতরাং সে স্থলে চিকিৎসকের আবশ্যকতা একেবারেই থাকে না*।

যাঁহাদের ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাঁহাদেরই প্রকৃত মনুষ্য বলে। এতদ্ভিন্ন সেই পথাবলম্বীদিগকেও মনুষ্য বলিতে পারা যায় কিন্তু ঈশ্বর অবিশ্বাসী যাঁহারা, তাঁহারা কোন মতে মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারেন না। অন্যান্য পশুদিগের ন্যায় আহার ও মৈথুনাদি ক্রিয়া ব্যতীত তাঁহাদের

* কেহ বলিতে পারেন যে আহার ব্যতীত জীবন রক্ষা হয় না, অতএব আহারের জন্য ধনোপার্জ্জন আবশ্যক। ধনোপার্জ্জন করিতে হইলে তদ্‌সংক্রান্ত উপায়াদি অবগত হওয়া উচিত। এ কথায় কাহার আপত্তি হইতে পারে না কিন্তু ইহাকেই যাঁহারা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞান করেন, তথায় মনুষ্য ভাবের বিপর্য্যয় হয়, কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বর জ্ঞান লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্যান্য কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই প্রকৃত মনুষ্য কহা যায়।

জীবনের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নাই, সুতরাং এ প্রকার ব্যক্তিদিগকে পশু ভিন্ন আর কি বলা যাইবে?

আমাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া অনেকেই বিরক্ত হইতে পারেন এবং আমরাও জানি যে, সত্য কথা বলিতে গেলে পরম বন্ধুর নিকটও বিরাগ ভাজন হইতে হয়, কিন্তু আমরা সত্যের দাস, সত্য কথা এবং আপনাদের সরল বিশ্বাস প্রকাশ করিতে কখনই পৃষ্ঠদেশ দেখাইব না।

আমাদের দেশ এক্ষণে হুজুকে হইয়াছে। একটা কেহ কিছু বলিলে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক কারণ জ্ঞান লাভ না করিয়া অমনি সেই দিকেই অবনত হইয়া থাকেন। আমরা একে দুর্ব্বল, যাহা কিছু বল থাকা সম্ভব, তাহা কুপথে প্রধাবিত হইলে ব্যয়িত হইয়া যায় এবং বলপ্রয়োগের প্রকৃত সময় আসিলে আর তাহার দ্বারা কোন কার্য্যই হইতে পারে না। এই জন্য আমরা বলিতেছি যে, যে সূত্রে আর্য্যেরা একদিন পৃথিবীর বক্ষে বিরাজিত ছিলেন, যে সূত্রে বর্ত্তমান সভ্যজাতীরা মনুষ্যের আকার ধারণ করিতেছেন, আমরা সেই সূত্র অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। মানসিক শক্তি উন্নতি করিতে না পারিলে কিছুই হইবে না, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে বার বার বলিবার আবশ্যক নাই। কারণ, তাঁহারা প্রত্যেক ইতিহাসে তাহা পাঠ করিতেছেন; অথবা যাঁহারা সভ্যতম দেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন।

আর্য্যদিগের গ্রন্থের উপদেশ দূরে থাক, আজ শতাধিক বর্ষ পর্য্যন্ত ইংরাজেরা কত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, মনুষ্য করিবার জন্য বিবিধ বিজ্ঞান মন্দির করিয়া দিলেন, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু আমরা এমনি পশু যে, তাহার কোন উপকারিতা লাভ করিতে পারিলাম না। যাহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতেছেন, তাঁহারা তদনন্তর সেই বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ককে উকীলী ব্যারিষ্টারী অথবা সরকারী কার্য্যে সংলগ্ন করিতেছেন।

হায় হায়, তাই বার বার, হায় হায় করিতেছি, তবে আমরা মনুষ্য হইব কবে? মনুষ্যদিগের সহবাসে যখন মনুষ্যত্ব লাভ করিবার সূত্রে শিক্ষা হইল না, তখন আমাদের উপায় কি? তাঁহাদের কি দৃষ্টান্ত লইলাম? পোষাক, অখাদ্য-ভক্ষণ, আর সাহেবী-মেজাজ! তাঁহাদের অসামান্য অধ্যবসায় দেখিলাম না, মানসিক শক্তি লাভ করিবার প্রণালী উপেক্ষা করিয়া বাল্যবিবাহের

প্রবাহ আরও বিশেষ অনুষ্ঠানের সহিত পরিচালিত করা হইল, জাতীয় একতা রত্নহার তাঁহারা আমাদের বার বার দেখাইলেন, আমরা তাহা আরও বিকৃত করিয়া ফেলিলাম এবং জাতীয় কথা কি পারিবারিক সূত্রও বিচ্ছিন্ন করিতে বিলক্ষণ শিক্ষা করিলাম। তাই বলিতেছি, হায় হায়, আমরা করিলাম কি? তবে আর আমরা মনুষ্য হইব কবে! অতএব আমাদের সদুপায় কি?

আমাদের যেরূপ শোচনীয়াবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সম্প্রতি আশা-ভরসা কিছুই নাই। কস্মিন্‌কালেও যে হইবে, তাহার সুরাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

যখন কোন মহাত্মা কোন প্রকার সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া দেশের অবস্থা উন্নত করিতে সচেষ্টিত হন, তখন দশজন দশ দিক্ হইতে দশ প্রকার প্রতিবাদ উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার গতিরোধ করিয়া আপনাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর অধঃক্ষেপ করিয়া ফেলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে দেশের দুর্গতি প্রবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে।

এক্ষণে পূর্ব্বাপর পক্ষ বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, কাহার দোষে মহতোদ্দেশ্য সকল অঙ্কুরিত হইবামাত্রই অযথাক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আমরা যে পর্য্যন্ত বুঝিতে সক্ষম, তদ্দ্বারা উভয়পক্ষদিগেরই সমূহ দোষ স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাই। কারণ, যখন কোন কার্য্য করিবার সঙ্কল্প হয়, তখন কিরূপে এবং কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিলে আশু বিশৃঙ্খলজনিত গোলযোগ উপস্থিত না হইয়া নিঃশব্দে কার্য্য সাধন হইতে পারিবে, তাহার সদ্‌যুক্তি এবং প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করিয়া সমাজে প্রচলিত করা দূরদর্শী বিজ্ঞের অভিপ্রায়। সকল কার্য্যেরই সময় আছে এবং ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অপেক্ষা করিতে পারিলে সময়ে সময়ানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিকিৎসকেরা একদিনে এক ডোজ্ কুইনাইন প্রদান করিয়া রোগীর রোগ অপনয়ন করিতে কখন অগ্রসর হইতে পারেন না। তাঁহারা জানেন যে, কোন ব্যক্তি হয় ত প্রত্যহ ২০ গ্রেণ সেবন করিয়া, কোন প্রকার যন্ত্রণা প্রাপ্ত না হইয়া, আরোগ্য হইবে এবং কাহার শারীরিক অবস্থাক্রমে এক গ্রেণও প্রদান না করিয়া পথ্য এবং জল বায়ু পরিবর্ত্তন দ্বারা পীড়ার লাঘব হইবে। এস্থানে ব্যবস্থা পাত্রানুযায়ী হইতেছে।

অথবা কৃষকেরা যেমন কোন্ ভূমিতে কোন প্রকার শস্য আরোপণ করিতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বপ্রথমে ভূমির অবস্থা নিরূপণ করিয়া থাকে। যদ্যপি তাহা

না করিয়া অযথাক্রমে বীজ বিকীর্ণ করে, তাহা হইলে কোথাও কৃতকার্য্য এবং কোথাও বা হতাশ হইবার সম্ভাবনা।

বালকেরা যে সময়ে কোন বিদ্যালয়ে পাঠার্থী হইয়া গমন করে, সে সময়ে শিক্ষকেরা তাহার অবস্থাসঙ্গত শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিয়া দেন। বালকের অভিমত কখন কোন কার্য্য হয় না এবং শিক্ষকও পরীক্ষা না করিয়া যথেচ্ছাচারীর ন্যায় ব্যবস্থা করিতে পারেন না।

এইরূপ যখন যে কোন প্রকারে কার্য্য করিবার উদ্যোগ করা যায়, তখনই মহানুভবদিগের চিরপ্রসিদ্ধ উপদেশ বাক্য দেশ কাল পাত্র বিচার পূর্ব্বক পদক্ষেপ করা বিধেয়। এই পরামর্শ বাক্য যাঁহারা যে পরিমাণে প্রতিপালন করেন, তাঁহারা সেই পরিমাণে সুযশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যাঁহারা যে পরিমাণে অবহেলা করেন, তাঁহারা সেই পরিমাণে নিরাশ হইয়া থাকেন।

যে দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তথায়ই দেশ কাল পাত্র বিচার করিবার প্রণালী জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তাই তাঁহারা যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাহাতেই আশানুরূপ সিদ্ধমনোরথ হইয়া থাকেন কিন্তু আমাদের কি দুরদৃষ্ট যে, এদেশের মহাত্মারা মহাত্মা হইয়াও দেশ কাল পাত্রের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বালকের ন্যায় মনের উচ্ছ্বাসে কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, সুতরাং তাঁহাদের বৃথা প্রয়াস হইয়া যায়। ইহাকে প্রথম দোষ বলিলাম।

দ্বিতীয় কারণ, স্বার্থপরতা। আমি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছি, যাহাতে আপনার স্বার্থ চরিতার্থ হইবে, অন্যে তাহা না করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ বিরাগভাজন হইরা কটু-কাটব্যের তাড়নায় দূরীভূত হইয়া যাইবে। এমন স্থলে যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহার বিচিত্র কি?

যাঁহারা স্বার্থপর, তাঁহারা অপ্রেমিক। প্রেমশূন্য হৃদয় কি কখন কাহার মঙ্গল সাধন করিতে পারেন? আমাদের দেশে প্রেম নাই বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। যাহারা আপন পিতা মাতাকে ভালবাসিতে জানে না, যাহারা ভাই ভগিনিকে স্বার্থ-ভঙ্গের জন্য বাটী হইতে দূর করিয়া দেয়, যাহাদের প্রতিবাসীদিগের সর্ব্বনাশ কামনা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, যাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান আপন স্ত্রীপুত্র-প্রতিপালন এবং কর্ম্মজ্ঞান তাহাদেরই সেবা, এমন জাতির দ্বারা কি একটা সর্ব্বসাধারণ প্রীতিকর কার্য্য সমাধা হইবার সম্ভাবনা?

যে সকল মহাত্মারা সময়ে সময়ে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা পাইয়া

থাকেন, তাহা বাস্তবিক আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছার জন্য নহে। তাহা যদি হইত, তবে নিশ্চয়ই সকল কথায় প্রেমের আভাস থাকিত এবং পক্ষ বিপক্ষ উভয়েই প্রেমে আয়ত্ত হইয়া আসিত।

পুস্তক পাঠে অন্যান্য সভ্যদেশীয়দিগের রীতি নীতি এবং নাম বিস্তারের উপায় জ্ঞাত হইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। দশ জনের সমক্ষে যাহারা দশটা কথা বলিবার শক্তিলাভ করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ দেশহিতৈষী ভাবের পরা-কাষ্ঠা দেখাইতে আরম্ভ করিয়া থাকেন। শব্দ বিন্যাসের মাধুর্য্যে, অলঙ্কারের ছটায়, কণ্ঠ ও বক্ষের দোর্দ্দণ্ড বিক্রমে, শ্রোতৃবর্গের হৃদয়-তন্ত্রী আঘাত করিয়া সাময়িক উত্তেজনা করিয়া থাকেন; এই পর্য্যন্ত শক্তি এদেশে আসিয়াছে। কারণ ইহারই জন্য অধুনা লোকে সাধন করিতেছেন। যাহা সাধন করা যায়, তাহাই লাভ হয়, সুতরাং বক্তৃতা শক্তিতে সিদ্ধ।

মহাত্মা যাঁহাদের বলিয়াছি, তাঁহারা এই শ্রেণীর সিদ্ধপুরুষ। যে ব্যক্তির যাহাতে অধিকার, সেই ব্যক্তির শিষ্যও সেই প্রকারে গঠিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানীর শিষ্য জ্ঞানী, পণ্ডিতের শিষ্য পণ্ডিত, বিজ্ঞানীর শিষ্য বিজ্ঞানী, প্রেমি-কের শিষ্য প্রেমিক, প্রতারকের শিষ্য প্রতারক এবং চোরের শিষ্য চোরই হয়। অতএব বক্তৃতা দ্বারা আত্মগৌরব-বিস্তারাকাঙ্ক্ষীদিগের শিষ্যও সেই-জন্য আত্ম গৌরবাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকেন।

তৃতীয় কারণ, জ্ঞান-গরিমা। স্বদেশীয় কিম্বা বিদেশীয় দশখানা পুস্তক পাঠ করিতে পারিলেই আমাদের দেশের লোকেরা যথেষ্ট মনে করিয়া থাকেন। যে কোন কথা বলেন, যে কিছু অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, সকলেরই ভিত্তি, গড়ন, আসবাব তাহারই দ্বারা সংগঠিত হইয়া থাকে।

যে কার্য্য করিতেছেন বা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহার কারণ জ্ঞানলাভ না করিয়া আপনার সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের দ্বারাই তাহা সমাধা করিবেন বলিয়া ধাবিত হইয়া যতই বিফল হইতে থাকেন, ততই আত্মগরিমার দুর্গন্ধময় বায়ু প্রবাহিত হইয়া দশদিক কলুষিত করিয়া ফেলে। এইরূপে তিনি নিজে চিৎকার ও পরিশ্রমের বিনিময়ে এক কপর্দ্দক প্রকৃত সারবান বিনিময় না পাইয়া কতকগুলি করতালী লইয়া সকলকে ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক বিষাদ সিন্ধুতে বিশ্রাম করিয়া জীবনের কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়া চলিয়া যান।

পরপক্ষেও বিশেষ দোষ আছে। তাঁহারা কোন ব্যক্তির নিকট নূতন

কথা শ্রবণ করিলে অমনি সকলে মিলিয়া কি উপায়ে তাঁহাকে উদ্যমহীন করিতে পারিবেন, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় হয় এবং যাহা শ্রবণ করেন, তাহা কাহার নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া বুদ্ধিতে যাহা আইসে, অমনি মাথা মুণ্ডু বলিয়া তাহাই প্রকাশ্য স্থানে চিৎকার করিয়া থাকেন এবং সুবিধা হইলে সংবাদ পত্রাদিতেও তাহা অকুতোভয়ে প্রকাশ করিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করেন। কোন বিষয় লইয়া এক ঘণ্টা চিন্তা করিয়া দেখেন না। মস্তিষ্ককে যেন জন্মের মত বিদায় দিয়া পরের মুখাপেক্ষা, পর মুখবিগলিত কথাগুলি লইয়া জপমালা এবং সাত রাজার ধনের মত আনন্দের সামগ্রী মনে করিয়া লন, সুতরাং এমন ক্ষেত্রে এমন সর্ব্বনাশকারী পঙ্গপাল যে স্থানে, সে স্থানে যদ্যপি ভাগ্যবশতঃ কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব হয়, তাহা সর্ব্বতো-বিধায় বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই সকল কারণে আমাদের দেশ ছারখার হইতেছে। তাই ভাবিতেছি যে, আমাদের দেশের উপায় কি হইবে? সকলেই যদ্যপি স্বার্থ ব্যতীত কথা না কহিবেন, সকলেই যদ্যপি নিজ স্বার্থ পুষ্টিসাধন পক্ষে যত্নবান থাকিবেন তাহা হইলে আপনার ও দেশের উন্নতি চিরকালের জন্য দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া রহিল। যাঁহারা অজ্ঞানী, অশিক্ষিত, নির্ধন, নিরুপায়, তাঁহাদের দ্বারা কোন কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু শিক্ষিত হইয়া, পণ্ডিত হইয়া, সাধক হইয়া, ধনী হইয়া যদ্যপি আপনাকেই স্ফীত করিবার জন্য প্রতিনিয়ত লালায়িত থাকি-লেন, তাহা হইলে আপনার নিজ মঙ্গল ও দেশের জন্য আর কোন্ সময় চিন্তা করিবেন? সকলেই ইতিহাস পড়িতেছেন, এক্ষণে অনেকেই ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া তদ্স্থান সকল দেখিয়া আসিতেছেন, তথাপি আত্মো-ন্নতি এবং স্বদেশহিতৈষীতা কিরূপে করিতে হয়, তাহার কিছুই জ্ঞান হইল না; তথায় অর্থের ব্যবহার কি নিজ ভোগ বিলাসের জন্যই ব্যয়িত হয়? না— স্বধর্ম্ম বিস্তার ও নানাবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রালোচনায় এবং অন্যান্য দাতব্য প্রভৃতি মহৎ কার্য্যে সাহায্য করিয়া, নিজের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন এবং দেশের অবস্থা উন্নতি সোপনে উত্থিত করিয়া যান?

সকলেই স্বার্থপর স্বীকার করি এবং সামান্য বিষয়ীরা জ্ঞানালোচনা বা ধর্ম্মাদি ব্যতীত কিরূপে বা তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে? কিন্তু সুশি-ক্ষিত পণ্ডিতগণের তাঁহাদের পাণ্ডিত্যগুণে কিয়দ্‌পরিমাণে মহত্ত্ব শিক্ষা করা উচিত এবং তাহার কার্য্য প্রকাশ না পাইলে বিদ্যার অগৌরব হয়। আবার

বিদ্যার গৌরব রক্ষা করিতে গেলে স্বার্থপরতা আসিয়া অধিকার করে। তবে উপায় কি? এইরূপে যদ্যপি চিরকাল চলিতে থাকে, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন কি কখন হইবে?

আমরা আজ কাল দেখিতেছি যে, অনেকেই স্বার্থশূন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। দেশের উন্নতি সাধনের জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, কিন্তু করিলে কি হইবে? তাঁহাদের কার্য্যের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অনেকে নানাবিধ হেতু দ্বারা বিঘ্ন জন্মাইবার প্রয়াস পাইতেছেন, সুতরাং ইহাতে সাধারণের যে পরিমাণে উপকার হওয়া উচিত, তদপেক্ষা ব্যাঘাত হইতেছে।

প্রকৃত বন্ধু এবং উপকারী যিনি হইবেন, তাঁহার স্বার্থপরতা ভাব এককালীন বিদূরিত এবং সকল কার্য্যই নিঃস্বার্থ প্রেমপূর্ণ হইবে। তিনি আপন পর জ্ঞান করিবেন না। কিসে লোকের উপকার হইবে, এই চিন্তাই তাঁহার চিন্তার বিষয়, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া আবশ্যক বোধ করিলেই তিনি কার্য্য করিয়া থাকেন। যাঁহাকে এই প্রকার ভাবাপন্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাঁহারই কথা শিরোধার্য্য এবং সেই পথে চলিলে বিপদপাতের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

যে পর্য্যন্ত এদেশে স্বার্থপরতা ও আত্মাভিমান একেবারে সমূলোৎপাটিত না হইয়া যাইবে, সে পর্য্যন্ত কোন পক্ষে কোন সদুপায় কিম্বা কোন প্রকার কল্যাণ আশা হইতে পারে না। এইরূপে আমরা যে পর্য্যন্ত সংসারের সহিত শৃঙ্খলিত হইয়া থাকিব, সে পর্য্যন্ত কামিনী-কাঞ্চন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন বস্তুর প্রয়োজন আছে কি না তাহা বুঝিবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিবে, কিন্তু যখন সংসারে উপর্য্যুপরি হতাশের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, যখন আমাদের সুখ ও শান্তিপ্রদ কামিনী-কাঞ্চন অভিলষিত ও আকাঙ্ক্ষিত স্পৃহা চরিতার্থ করিতে অসমর্থ হয়; যখন সংসার মরুভূমি শ্মশানক্ষেত্র বলিয়া জ্ঞান হয়, যখন বড় সাধের কামিনী-কাঞ্চন প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতারণা করিতে আরম্ভ করে, যখন মন পাষাণবৎ হইয়া দাঁড়ায়, যখন প্রাণের শান্তি অদৃশ্য হয়, তখন জীবনের লক্ষ্য কি আর কিছু আছে? শান্তিচ্ছায়া প্রাপ্ত হইবার কি অন্য স্থান আছে? এই কথা প্রতিনিয়ত প্রাণের ভিতর প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। উদ্দেশ্য বস্তু যে স্থানে স্থাপন করিতে হয়, সে স্থান যে পর্য্যন্ত শূন্য না হইবে, সে পর্য্যন্ত তথায় অন্য ভাব আসিতে পারে না। আমরা

বাল্যকাল হইতেই কামিনী-কাঞ্চনের দাসানুদাস হইব বলিয়া পিতা মাতার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি, সে স্থলে তাঁহারা শিক্ষা গুরুর কার্য্য করিয়াছেন, সেই ভাবে মন ধারণা করিতে শিখিয়াছে; উদ্দেশ্য বস্তু তাহারাই হইয়াছে সুতরাং এই অবস্থায় যাঁহারা লোকের দেখিয়া বা শুনিয়া গুরুকরণ করিতে চাহেন বা তাহা করিয়া থাকেন, তাহাদের মনের ধারণানুসারে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। মোট কথা হইতেছে এই যে, কোন বস্তুর অভাব না হইলে তাহা লাভের চেষ্টা হয় না এবং তাহা প্রাপ্ত হইলেও তাহার যত্ন থাকে না। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ করা, এ কথা যাঁহার যে পর্য্যন্ত জ্ঞান না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার সে পথে জোর করিয়া যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, অনেকে দল বাঁধিয়া ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন, অনেকে গুরুকরণ করিয়া জপ তপাদি করিতে যত্নবান হন এবং অনেকে দেবতা ঠাকুর পূজা করিয়াও সুখী হইয়া থাকেন। সেই ব্যক্তিরাই যখন বিধির বিপাকে সাংসারিক অমঙ্গলসূচক কোন প্রকার দুর্ঘটনায় পতিত হন, তখন তাহারা অমনই ধর্ম্মকর্ম্ম একেবারে অতল জলধিস্রোতে নিক্ষেপ করিয়া জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত কালাপাহাড়বিশেষ হইয়া দিন যাপন করেন। এই সকল ব্যক্তির যগুপি ঈশ্বরেই জীবনের একমাত্র সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য থাকিত, তাহা হইলে সাংসারিক ভাল মন্দে সে ভাব কখন বিদূরিত হইতে পারিত না। রামকৃষ্ণদেব কহিতেন :—

১১১। যে একবার ওলা মিছরির স্বাদ পাইয়াছে, সে কি আর চিটে গুড়ের জন্য লালায়িত হয়? অথবা যে একবার তেতালায় শয়ন করিয়াছে, সে কি কখন দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে শয়ন করিতে পারে?

এই জন্য বলা যাইতেছে যে, গুরুকরণ করিবার পূর্ব্বেই শিষ্য জীবনের লক্ষ্য অবশ্যই স্থির করিয়া লইবেন।

লক্ষ্যহীন হইয়া কোন কার্য্য করাই কর্ত্তব্য নহে, একথা বলা নিতান্ত বাহুল্য, কিন্তু অবস্থাচক্রে মনুষ্যেরা এমনই অভিভূত হইয়া পড়ে যে, তাহারা সর্ব্বাগ্রেই লক্ষ্যহারা হইয়া যায়। এক করিতে যাইয়া অপর কার্য্য করিয়া বসে। যেমন, আমরা যখন দুই পাঁচ জন একত্রিত হইয়া গল্প করিতে

বসি, তখন একটী প্রসঙ্গ হইতে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে, কি সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক, কি রাজনৈতিক, কি ঐন্দ্রজালিক সকল প্রকার প্রসঙ্গের স্রোত চলিয়া যায়। আমরা নির্দ্দিষ্ট বস্তুতে মনার্পণ করিয়া রাখিতে পারি না, তাহাই ইহার কারণ। অতএব লক্ষ্যহীন হইয়া কোন কার্য্য করা উচিত নহে, এই কথা যে পর্য্যন্ত যাহার স্থির ধারণা না হয়, সে পর্য্যন্ত সে ব্যক্তির গুরুকরণ করা সর্ব্বোতোভাবে অবিধেয়।

ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, শিষ্যেরা দুই দশ দিন স্থির হইয়া একভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না। কেহ একবার নাম জপ করিয়াই গুরুর নিকট আরক্তিম চক্ষে উপস্থিত হওন পূর্ব্বক কহিয়া থাকেন, মহাশয়! কৈ ঈশ্বর দর্শন কেন হইল না? গুরু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, বাপুহে! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর। শিষ্য অমনি রোষভরে স্থানান্তরে যাইয়া নাম লেখাইয়া ফেলিলেন। এস্থানেও অধিক দিন থাকার সম্ভাবনা হইল না। এই প্রকার চঞ্চলচিত্তবিশিষ্ট ব্যক্তিরা কস্মিন্‌কালে কোন জন্মেও যে ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবে, তাহার কোন হেতু নাই। ভগবান্‌কে লাভ করান গুরুর আয়ত্তাধীন নহে। শিষ্য নিজ ভক্তিতে ও বিশ্বাসেই লাভ করিয়া থাকেন। যেমন আপন মুখেই আহার করিতে হয়, তবে দ্রব্যের স্বাদ বুঝা যায়; একজন খাইলে তাহা অপরের অনুভবনীয় নহে। কোন কোন শিষ্য কেবল উপদেশ সংগ্রহ করিয়া উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন। কোথায় একটী ভাল উপদেশ পাওয়া যাইবে, এই চেষ্টায় ধর্ম্মচর্চ্চার ছলে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বা সাধুর নিকট কিম্বা যথায় সাধু প্রসঙ্গ হয়, সেই স্থানে কিয়দ্দিবস গমনাগমন পূর্ব্বক, এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া আচার্য্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া উঠিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর শিষ্যেরা অতিনীচ প্রকৃতি-বিশিষ্ট বলিয়া দেখা যায়। তাঁহারা যখন কোন পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন, তখন প্রায়ই অন্যান্য গ্রন্থ হইতে কোথাও যত্ব নত্ব ভুল করিয়া এবং 'করেন' স্থানে 'করিয়া,' ইত্যাকার রহস্য-জনক পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নিজ নাম দিয়া নাম বাহির করিয়া থাকেন। কোথাও কোন গ্রন্থের অগ্রভাগ, অন্য গ্রন্থের মধ্যদেশ এবং অপর গ্রন্থের শেষভাগ অপহরণ পূর্ব্বক অদ্ভুত সামগ্রীর সৃষ্টি করেন। এই প্রকার গ্রন্থের দ্বারা কোন পক্ষেরই উপকার হয় না। এই শ্রেণীর শিষ্যদিগের অবগত হওয়া আবশ্যক যে, অনুষ্ঠিত কার্য্যের লক্ষ্য কি? পুস্তকের দ্বারা কি লাভ হইবে? পুস্তকাদি প্রকাশের উদ্দেশ্য

এই যে, কোন প্রকার নূতন নূতন ভাব প্রদান করা, যদ্দ্বারা সাধারণের বাস্তবিক কল্যানের সম্ভাবনা। যেমন, আমাদের শাস্ত্রাদি দৃষ্টান্তের নিমিত্ত গৃহীত হউক। ইহা দ্বারা কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণের আশঙ্কা কোথায়? কিন্তু আজ্‌ কাল সেই শাস্ত্রাদি দোকানদারদিগের হস্তে পতিত হইয়া কত রকমের ব্যবসা খুলিয়া গিয়াছে! এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে বটে যে, শাস্ত্র রক্ষা করা উচিত, কিন্তু কলিকাতার বটতলায় বাঙ্গালা তর্জ্জমা দিয়া যে শাস্ত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তদ্‌পক্ষে ব্যবসায়ীরা কোন মতে দৃষ্টি রাখিতে পারেন না। পুস্তক সস্তা হওয়া চাই, এক টাকায় পঞ্চাশ খানি একসের ওজনের গ্রন্থ দিতে হইবে! ফলে যাহা হয় একটা হইলেই হইল। বাস্তবিক কথা এই যে, ব্যবসায়ীরাও লাভ করিতে পারেন না এবং যাঁহারা গ্রন্থ ক্রয় করেন, তাঁহাদেরও বিশেষ সুবিধা হয় না কিন্তু লাভের মধ্যে কতকগুলি জ্যেঠামহাশয় প্রস্তুত হন। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত শিষ্যদিগকে গুরুকরণ করিয়া শুদ্ধ চিত্তে শুদ্ধ দেহে বার তিথির ক্রমানুসারে পরিচালিত হইতে হইত, এক্ষণে সেই গ্রন্থাদি কলু ঘানিতে বসিয়া পাঠ করিতেছে, মুদি এক দামড়ীর লবণ বিক্রয়ের বুদ্ধিতে তাহা পাঠ করিয়া জ্ঞানী হইতেছে এবং নব্যযুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ, অর্থকরী বিদ্যায় পরিপক্ক মস্তিষ্কে তাহার ভাব ধারণ করিয়া প্রকাশ্য স্থানে ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মের প্রসঙ্গ হইলে অমনি শাস্ত্রের হিল্লোল উঠিয়া যায়। অমুক শাস্ত্রে একথা বলে, অমুক শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ নাই, এই হয়, এই হয় না ইত্যাদি, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডপতিও যেন তাঁহাদের করস্থিত গণনার মধ্যে এবং বাজারের শাক মাছ অপেক্ষাও সুলভ বস্তু, অতএব গ্রন্থ ছাপাই-লেই যে শিষ্যের কার্য্য হইল, তাহা নহে। আমাদের প্রভু রামকৃষ্ণদেব কহিতেন ঃ—

১১২। গুরু মিলে লাখ্ লাখ, চেলা নাহি মিলে এক।

এই কথার ভাবে যাহা বুঝা যাইতেছে, তাহাই এখনকার প্রকৃত বাজার। সকলেই উপদেষ্টা হইতে চাহেন, উপদেশ লইতে কেহ প্রস্তুত নহেন। এই অবস্থায় কেহ কখন ঈশ্বর লাভ করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে, জীবনের লক্ষ্য কি, তাহা উত্তমরূপে সাব্যস্থ করিয়া গুরুকরণ পূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞানুযায়ীকে একচিত্তে কিয়দ্দিবস স্থিরভাবে থাকিতে

পারিলে তবে অভিলষিত উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ করিবার একদিন প্রত্যাশা করিলেও করা যাইতে পারে। যেমন, বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তানই পিতার বিষয়াদি লাভ করে, জারজ পুত্র তাহা পায় না, তেমনি গুরুকরণ দ্বারা প্রাপ্ত মন্ত্রই সিদ্ধমন্ত্র জানিতে হইবে। আজ কাল ছাপার পুস্তকের দ্বারা সমুদয় দেবদেবীর বীজ মন্ত্র জানিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে বলিয়া অনেকে তাহা অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছেন এবং কেহ কেহ সাধন ভজনও করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার কি ফল হয়? সর্ব্বতোভাবে বিফল হইয়া থাকে। শিষ্য হওয়া চাই, গুরুকরণ চাই, তবে মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। প্রভু কহিতেন যেঃ—

১১৩। পঞ্জিকায় লেখা থাকে যে, এ বৎসর ২০ আড়ি জল হইবে, কিন্তু পঞ্জিকা নিংড়াইলে এক ফোটাও জল বাহির হয় না; সেই প্রকার বীজমন্ত্রে দেব দেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা কোন কার্য্যই হইতে পারে না।

গুরুকরণ করা যে আনন্দের বিষয়, ভুক্তভোগীরা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। যেমন স্ত্রীলোকের স্বামী, তেমনই আমাদের গুরু। যাঁহার স্বামী আছে, পৃথিবীতে তাঁহার দুঃখের বিষয় কিছুই থাকে না; তেমনই গুরু থাকিলে আর কোন ভয় থাকে না। যেমন বালকের মাতা তেমনই আমাদের গুরু। আমরা যখন কোন বিষয়ের জন্য অভাব অনুভব করিয়া থাকি, তখনই সে অভাব সেই ভাবের ভাবুকের নিকট হইতে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবার উপায় বলিয়া জানি। ব্যভীচারিণীরা যেমন স্বামীর রসাস্বাদন করিতে একেবারেই আসক্তা নহেন, তেমনই গুরুত্যাগী বা গুরুবিদ্বেষী ভ্রষ্টাচারীরা গুরু কি বস্তু,তাহা কখন বুঝিতে সমর্থ নহে। এই নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে, জীবনের লক্ষ্য নিরূপণ করিয়া তবে যেন কেহ ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন। একথা যেন মনে থাকে যে, স্বামীবিহীনা স্ত্রী অলঙ্কারাদির দ্বারা বিভূষিতা হইলে তাহাকে লোকে বেশ্যা বলিয়া ঘৃণা করে, সেই প্রকার অশেষবিধ শাস্ত্রে শিক্ষিত হইয়া দীক্ষিত না হইলে তাহার দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকে না।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে,গুরুর নিকট শিষ্যের কি প্রকার আচার ব্যবহার

হওয়া উচিত। গুরুশব্দ যদিও এই স্থানে উল্লিখিত হইল, কিন্তু একথা প্রত্যেক উপদেষ্টার প্রতি জানিতে হইবে।

একথা সত্য যে, গুরুকরণ করিবার পূর্ব্বে গুরুজ্ঞান লাভের জন্য পাঁচ জন জ্ঞানী বা ভক্তদিগের সঙ্গ করা অত্যাবশ্যক। তাঁহারা কে কি বলেন, তাহা শান্তচিত্তে—বাচালতা কিম্বা উদ্ধত স্বভাবের কোন পরিচয় না দিয়া, অতি সাবধানে 'কেবল' শ্রবণ করিয়া যাইতে হইবে। যে কথা বুঝিতে না পারা যাইবে, তাহা 'কেবল' বুঝিবার নিমিত্ত পুনরায় জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে; এইরূপে নানা স্থানের নানাভাব দেখিয়া, যে স্থানে মনের মিল হইবে, তাহার হৃদয়ের সেইটী ভাব বলিয়া তখন সাব্যস্থ করা বিধেয়। ভাব লাভ করিবার পর গুরুকরণের সময়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, যাহার মন যাঁহাতে আপনি ভক্তি সহকারে যাইবে, তিনিই তাঁহার গুরু। ইহাতে কুলগুরু ত্যাগ করিবার কোন কথা হইতেছে না। অথবা কুলগুরুতে ভাবের বিপর্য্যয় হইলে কিম্বা কুলগুরু বংশে কেহ না থাকিলে অন্যকেও গুরু করা যায়। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ অর্থের জন্য নহে, তাহা পারমার্থিক জানিতে হইবে; অতএব পরমার্থ-তত্ত্ব যথায়,যাঁহার নিকটে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা,তিনিই গুরুপদবাচ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিষ্যদিগের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, যেন গুরুদত্ত ধনের কোন মতে অবমাননা না হয়। অনেক স্থলে গুরু কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভাব ব্যতীত অন্য ভাবও শিক্ষা হইয়া যায়। অন্য ভাবের শিক্ষার সময় গুরুদত্ত ভাবের পরিপক্কাবস্থার পর জানিতে হইবে। এই নিমিত্ত বলা যাইতেছে যে, আপন ভাব যে পর্য্যন্ত বিশেষরূপে পরিপুষ্টি না হয়, সে পর্য্যন্ত অন্যভাব মানসক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে দেওয়া অন্যায়। প্রভু কহিতেন,

১১৪। যতদিন গাছ ছোট থাকে, ততদিন তাহাকে বেড়া দিয়া রাখিতে হয়। তাহা না করিলে ছাগল গরু পাতা খাইয়া ফেলিবে। যখন গাছটী বড় হয়, তখন তাহাতে হাতী বাঁধিয়া দিলেও ক্ষতি হয় না, সেই জন্য ভাব শিক্ষার পর তাহা ধারণা করিবার নিমিত্ত আপনাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিতে হইবে।

আমরা সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছি এই যে, গুরু যে কথাগুলি বলিয়া দিবেন, সেই কথা গুলি, সতী স্ত্রীর ন্যায় প্রতিপালন করিতে পারিলেই আর কোন চিন্তা থাকিবে না।

ঈশ্বর লাভ।

—:*:—

১১৫। ঈশ্বর কল্পতরু। যে তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই লাভ করিয়া থাকে। কামনা ভাল কি মন্দ, তাহা ঈশ্বর বিচার করিয়া দেখেন না; এই নিমিত্ত তাঁহার কাছে অতি সাবধানে কামনা করিতে হয়।

"একদা কোন ব্যক্তি পথ ভ্রমণ করিতে করিতে অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে যাইয়া উপস্থিত হয়। পথিক রৌদ্রের উত্তাপ এবং পথ পর্য্যটনের ক্লেশে অতিশয় শ্রমযুক্ত হইয়া কোন বৃক্ষের নিম্নে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রান্তি দুর করিতে করিতে মনে করিল যে, এই সময় যদ্যপি শয্যা পাওয়া যায়, তাহা হইলে সুখে নিদ্রা যাই। পথিক কল্পতরুর নিম্নে বসিয়াছিল তাহা জানিত না, তাহার মনে যেমন প্রার্থনা উঠিল, অমনি তথায় উত্তম শয্যা উপস্থিত হইল। পথিক নিতান্ত বিস্মিত হইয়া তদুপরি শয়ন করিল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, যদাপি এই সময়ে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া আমার পদ সেবা করে, তাহা হইলে এই শয্যায় শয়ন সুখ সমধিক বৃদ্ধি হয়। মনে সঙ্কল্প হইবামাত্র, অমনি এক নবীনা ষোড়শী পথিকের পাদমূলে আসিয়া উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণ ভরিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। পথিকের বিস্ময় এবং আনন্দের আর পরিসীমা থাকিল না। তখন তাহার জঠরানলের উত্তপ্ততা অনুভব হইল এবং মনে করিল, যাহা চাহিলাম তাহাই পাইলাম,তবে কি কিছু ভোজ্যদ্রব্য পাওয়া যাইবে না? বলিতে না বলিতে, অমনি তাহার সম্মুখে চব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, নানাবিধ পদার্থ যথানিয়মে প্রস্তুত হইয়া যাইল। পথিক উদর পূর্ণ করিয়া পালঙ্কে হস্ত পদ বিস্তৃত করণ পূর্ব্বক শয়ন করিয়া সে দিনকার ঘটনা স্মরণ

করিতে করিতে তাহার মনে হইল যে, এই সময়ে যদি একটা ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কি হয়? মনের কথা মন হইতে অন্তর্হিত হইতে না হইতেই, অমনি অতি ভীষণাকার একটী ব্যাঘ্র এক লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পথিককে আক্রমণ করিল এবং দংষ্ট্রাঘাতে তাহার গ্রীবাদেশ হইতে শোণিত বহির্গমন করিয়া পান করিতে লাগিল। পথিকেরও জীবদ্দশা শেষ হইল।" সাংসারিক জীবের অবিকল ঐ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বর সাধন করিয়া বিষয় কিম্বা পুত্রাদি অথবা মান সম্ভ্রমাদি কামনা করিলে তাহা লাভ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে ব্যাঘ্রের ভয়ও আছে, অর্থাৎ পুত্রবিয়োগ শোক, মানহানি এবং বিষয় চ্যুতিরূপ ব্যাঘ্রের আঘাত স্বাভাবিক ব্যাঘ্র হইতে লক্ষগুণে ক্লেশদায়ক। তাহা সংসারীদিগের অবিদিত নাই। এই নিমিত্ত প্রভু বলিতেন:—

১১৬। বিষয়, পুত্র কিম্বা মান সম্ভ্রমের জন্য ঈশ্বর সাধনা না করিয়া, যে ঈশ্বর লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, তাহার নিশ্চয়ই ঈশ্বর দর্শন লাভ হয়।

ঈশ্বর দর্শন, একথা বর্ত্তমানকালে উপহাসের কথা, যাঁহারা উপহাস করেন, তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম বলিয়া বুঝা যায়। তাঁহাদের জানা উচিত, যে কার্য্য করে, সেই তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধে দুই চারি খানা পুস্তক পড়িয়া তাঁহাকে স্থির করিয়া ফেলা অতি বালকবৎ কার্য্য। "যে সূতার কর্ম্ম করে, সেই কোন্ সুতা কোন্ নম্বরের জানিতে পারে।" "সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে নেশা হয় না, তাহা উদরস্থ হওয়া চাই।" সেইরূপ ঈশ্বরকে যে এক মনে প্রাণপণে ডাকে, সেই তাঁহাকে দেখিতে পায়। কার্য্য না করিলে কি কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয়?

১১৭। ঈশ্বরকে যদি দেখাই না যায়, তাহা হইলে আর দেখিবে কি? যদ্যপি তাঁহার কথাই না শুনা যায়, তাহা হইলে শুনিবে কি? মায়াটা যাঁর এত সুন্দর, যাহা কিছুই নহে, তাহার কাণ্ড কারখানা যখন এত আশ্চর্য্য, তখন তিনি যে কত সুন্দর, তাহা কে না বুঝিতে পারে?

১১৮। ঈশ্বর দর্শন করিবার জন্য কে লালায়িত হয়? বিষয় হইল না বলিয়া লোকে তিন ঘটি কাঁদিবে, পুত্রের ব্যায়রাম হইলে পাঁচ ঘটি কাঁদিবে, কিন্তু ঈশ্বর লাভ হইল না বলিয়া এক ফোঁটা জল কে ফেলিয়া থাকে? যে কাঁদিতে জানে, সে ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে।

১১৯। ঈশ্বর লাভ করা দুই প্রকার। প্রথম, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সহিত মিলনকে বলে এবং দ্বিতীয়, ঈশ্বরের রূপ দর্শন করাকে বলে। এই দুই পন্থাকে জ্ঞান এবং ভক্তি কহা যায়।

আমরা গুরুকরণ প্রস্তাবে কহিয়াছি যে, গুরুকেই ঈশ্বর জ্ঞান করিতে হইবে। এক্ষণে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদ্যপি জীবাত্মা এবং পরমাত্মার সহিত মিলনকে অথবা অন্য কোন প্রকার রূপ দর্শনকে ঈশ্বর লাভ কহা যায়, তাহা হইলে গুরুকে ঈশ্বর বলিবার হেতু কি? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গুরু যাহাকে যাহা বলিবেন, সেই কথাটী ঈশ্বরের মুখের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। গুরু যদ্যপি কোন প্রকার ধ্যেয় বস্তু অর্থাৎ দেবদেবীর রূপাদি প্রদান করেন, তাহা হইলে গুরুবাক্যে বিশ্বাসের নিমিত্ত সে শিষ্যকে তাহাই করিতে হইবে। তাঁহাকেই গুরু এবং ইষ্ট, এইরূপে এক জ্ঞান করিতে হইবে। যিনি ঈশ্বর, আমার ধ্যেয় বস্তু, তিনিই নররূপে আমায় দীক্ষিত করিলেন; যে পর্য্যন্ত সেই ঈশ্বর মূর্ত্তি সাক্ষাৎকার না হয়, সে পর্য্যন্ত এই ভাবেই কার্য্য চলিবে। এই প্রকার ভাবে কোন দোষ হয় না।

যে স্থানে গুরু অন্য কোন ধ্যেয় বস্তু না দিয়া তাঁহার নিজ রূপই ধ্যান করিতে উপদেশ দেন, সে স্থানে সাধকের তাহাই করা কর্ত্তব্য। সচরাচর এই ভাব সাধারণ গুরুদিগের মধ্যে দেখা যায় না। তাঁহারা নিজে ইষ্ট হইতে আশঙ্কা করেন বলিয়াই এপ্রকার উপদেশ প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন; বাস্তবিক কথাও বটে, যিনি আপনার পথ্যের জন্য ব্যতিব্যস্ত হন, আপনার ভাবী অবস্থা চিন্তা করিয়া কূল কিনারা দেখিতে পান না, তিনি কেমন করিয়া আর একজনের ঈশ্বর হইবেন? যিনি নিজে ঈশ্বর, অবতার লে

নররূপ ধারণ করেন, তিনিই নিজে ইষ্ট এবং নিজেই গুরু হইয়া থাকেন। তিনি আপনি গুরু হইয়া দীক্ষা দেন এবং আপনি ইষ্টস্থান অধিকার করিয়া বসেন। এই কথার দ্বারা আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত শিষ্যভাবে কোন দোষ ঘটিতেছে না। শিষ্য যদ্যপি মনুষ্য দীক্ষা গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করেন, তাহা হইলে শিষ্যের কার্য্য অবশ্যই সাধন হইয়া যাইবে।

১২০। আত্মা স্বপ্রকাশ আছেন, কেবল অহং এই জ্ঞান, যবনিকা স্বরূপ পড়িয়া স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন ; অহং জ্ঞান বিলুপ্ত হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। আত্মজ্ঞান সঞ্চারিত হইলে পরমাত্মার সহিত শীঘ্রই দেখা হইয়া থাকে।

১২১। প্রথমে অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। অভিমান আত্মজ্ঞান দ্বারে স্থূল বৃক্ষস্বরূপ আছে। জ্ঞান-রূপ কুঠার দ্বারা তাহার মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেলিলে তবে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

১২২। অভিমান রাবিশের ঢিপির ন্যায়। তাহার উপর জল পড়িলে গড়িয়া যায়। সেইরূপ অহংকারের মূর্ত্তিমান হইয়া যদ্যপি জপ ধ্যান বা কোনরূপ ভক্তি করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে কোন ফলই হয় না। জ্ঞানরূপ কোদাল দ্বারা অভিমান রাবিশ্ কাটিয়া ফেলিলে অচিরাৎ আত্মদর্শন হইয়া থাকে।

১২৩। জীবাত্মা লৌহের সূচিকাস্বরূপ হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, মস্তকে পরমাত্মা চুম্বক-প্রস্তরের ন্যায় বাস করি-তেছেন। কাম, ক্রোধ, ইত্যাদি রিপু সকল জীবাত্মা সূচি-কার অগ্রভাগে কর্দ্দমের ন্যায় আবৃত হইয়া রহিয়াছে। ভক্তি সহকারে অনবরত নয়নবারি ঢালিতে পারিলে কর্দ্দম

সদৃশ রিপুগণ ক্রমে বিধৌত হইয়া যাইলে, অমনই পরমাত্মা চুম্বক জীবাত্মা সূচিকাকে আকর্ষণ করিয়া লইবে।

১২৪। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে মায়াবরণ আছে। এই মায়াবরণ সরাইয়া লইলে উভয়ের সাক্ষাৎ হইবার আর বিলম্ব থাকে না। যেমন, অগ্রে রাম, মধ্যে সীতা এবং পশ্চাতে লক্ষণ। এস্থলে রাম পরমাত্মা এবং লক্ষণ জীবাত্মা স্বরূপ, মধ্যে জানকী মায়াবরণবিশেষ। জানকী যতক্ষণ মধ্যে থাকেন, ততক্ষণ রামলক্ষ্মণের দেখা সাক্ষাৎ হয় না; জানকী একটু সরিয়া দাঁড়াইলে লক্ষণ রামকে দেখিতে পাইয়া থাকেন।

জ্ঞান বা আত্মতত্ব পক্ষে ঈশ্বর দর্শন এই প্রকারে হইয়া থাকে। ভক্তি মতে রূপাদি দর্শন হওয়ায় তথায় সেব্যসেবক ভাবের কার্য্য হইয়া থাকে।

১২৫। হয় আমি, কিম্বা তুমি, না হয় তুমি এবং আমি, এই তিনটী ভাব আছে। যাহা কিছু আছে, ছিল এবং হইবে, তাহা আমি, অর্থাৎ আমি ছিলাম, আমি আছি এবং আমি থাকিব, কিম্বা তুমি এবং সমুদয় তোমার, অথবা তুমি এবং আমি তোমার দাস বা সন্তান। এই ত্রিবিধ ভাবের চরমাবস্থায় ঈশ্বর লাভ হয়।

এই ভাবত্রয় বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মীমাংসা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে। জড়-জগতের কোন পদার্থ ই নশ্বর নহে। সকল বস্তু চিরকাল সমভাবে থাকে। দেহে যে পঞ্চভূত এক্ষণে রহিয়াছে, তাহা দেহান্তের পরও থাকিবে। জলে জল, ক্ষিতিতে ক্ষিতি, তেজে তেজ, ইত্যাদি মিশাইয়া যায়। এক্ষণে যাহা ছিল, তাহা পরেও রহিল। এই পঞ্চভূত দ্বারা দেহ পুষ্টি হয়, সেই দেহ হইতে দেহের উৎপত্তি এবং তাহা জড় পদার্থ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত পঞ্চভূতেরও তৃতীয়াবস্থা কহা যায়, অথচ তাহা আছে, ছিল এবং থাকিবে।

১২৬। পরমাত্মা ঈশ্বর স্বরূপ। মায়াবরণ দ্বারা আপনার চক্ষু আপনি বন্ধ করিয়া অন্ধের খেলা খেলিতেছেন। তিনি মায়াবৃত যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ জীব শব্দে অভিহিত হন, মায়াতীত হইলেই শিব বলা যায়।

এই সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে, চিরকাল ইহার পক্ষাপক্ষ বিচার হইয়া আসিতেছে; তদ্‌সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারাংশ গ্রহণ করাই সুবোধের কার্য্য। আমরা যেই হই, তাহা লইয়া বিচার করাপেক্ষা মায়া কাটাইবার চেষ্টা করা উচিত। মায়াবরণ যে পর্য্যন্ত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত দুঃখের অবধি থাকিবে না। সেই পর্য্যন্ত লোককে অজ্ঞান কহা যায়।

১২৭। মনুষ্যেরা ত্রিবিধাবস্থায় অবস্থিতি করে, ১ম অজ্ঞান, ২য় জ্ঞান, ৩য় বিজ্ঞান।

মনুষ্যেরা যে পর্য্যন্ত সংসার-চক্রে চক্রবৎ ঘুরিয়া বেড়ায়, আমি কি, কে, এবং কি হইব, ইত্যাকার জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া পশুবৎ আহার বিহার করিয়া দিনযাপন করে, তত দিন তাহাদের অজ্ঞানী কহে। আমি কি, কে, ইত্যাকার জ্ঞান জন্মিলে তাঁহাকে আত্মজ্ঞানী বলিয়া কথিত হয়। এ প্রকার ব্যক্তির মন সংসারের হিল্লোলে পতিত হইলেও বিশেষ কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। আত্মজ্ঞান লাভ হইবার পর সচ্চিদানন্দের বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করাকে বিজ্ঞানাবস্থা কহা যায়। যে স্থানে আমি দাস বা সন্তান ভাব থাকে, তাহাকে ভক্তিযোগ কহে।

১২৮। ভক্তিযোগ দ্বিবিধ, জ্ঞান-ভক্তি, এবং প্রেম-ভক্তি। ঈশ্বর আছেন, এই স্থানে নাম সংকীর্ত্তন, অর্চ্চনা, বন্দনা, শ্রবণ, আত্ম-নিবেদন, ইত্যাদি যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে, তাহাকে জ্ঞান-ভক্তি কহে। দর্শনের পর এই সকল কার্য্য করিলে তাঁহাকে বিজ্ঞান বা প্রেম-ভক্তি বলা যায়।

যখন আমরা সাকার পূজা করিয়া থাকি, তখন সেই মূর্ত্তির স্বরূপ রূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাঁহাকে জ্ঞানে উপলব্ধি হইয়া থাকে।

সাকাররূপ দর্শন, কেবল প্রস্তর কিম্বা মৃত্তিকা অথবা কাষ্ঠের মূর্ত্তি দেখাকে শেষ দর্শন বলে না। সাধক যখন প্রকৃত সাকার দেখিবার জন্য ব্যাকুলিত হন, তখন ঐরূপ স্বরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। যে কৃষ্ণকে প্রস্তরে দেখিতে-ছিলেন, তাঁহাকে জ্যোতিঃঘন অথবা অন্য কোনরূপে দেখিবেন, সে সময়ে তিনি যেরূপ ধারণ করেন, তদ্দর্শনে সাধকের যে ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহাকে বিজ্ঞান বা প্রেম ভক্তি কহে। এ ক্ষেত্রে ভক্তির কার্য্য একই প্রকার কিন্তু ভাবের বিশেষ তারতম্য আছে।

ঈশ্বর লাভ করিবার যে দুইটী আদিভাব, অর্থাৎ জ্ঞান এবং ভক্তি কথিত হইল, তাহার দ্বারা আমরা কি বুঝিলাম? জ্ঞান ভক্তি লইয়া সাধকদিগের সর্ব্বদাই ভ্রম জন্মিয়া থাকে। কোন মতে জ্ঞানকে এবং কোন মতে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা যে মতাবলম্বী, তাঁহারা সেই মতটীকে উত্তম বলিয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দুইটী ভাব সাধকদিগের অব-স্থার কথা মাত্র। প্রভু কহিয়াছেন যে, শুদ্ধ জ্ঞান এবং শুদ্ধ ভক্তি একই প্রকার। অতএব যথায় জ্ঞান ভক্তি লইয়া বিচার হয়, তাহা অজ্ঞান প্রযুক্তই হইয়া থাকে। যেহেতু তাঁহার উপদেশ মতে আমরা অবগত হইয়াছি, "যে এক জ্ঞান জ্ঞান, বহু জ্ঞান অজ্ঞান", যাহার মনে ভগবান্ লইয়া বিচার উঠে, সে স্থানে জ্ঞান সঞ্চার হয় নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে।

জ্ঞান এবং ভক্তি যদিও দুইটী কথা প্রচলিত আছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান ছাড়া ভক্তি এবং ভক্তি ছাড়া জ্ঞান থাকিতে পারে না। যদ্যপি জ্ঞান ও ভক্তির তাৎপর্য্য বহির্গত করিয়া পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, জ্ঞান পন্থায় কিম্বা ভক্তি পন্থায় জ্ঞান ভক্তির কার্য্যই হইয়া থাকে। জ্ঞানমতে ভগবানের প্রতি মন রাখিয়া কার্য্য করিতে হয়, ভক্তিমতেও অবিকল সেই ভাব দেখা যায়। এই উভয়বিধ মতেই উদ্দেশ্য ভগবান্, তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত যে কার্য্য করা যায়, তাহাকে সাধন ভজন বলে। জ্ঞান পন্থার চরমাবস্থায় যখন জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হন, তখন সাধকের যে অবস্থা হয়, ভক্তিমতে তন্ময়ত্ব লাভ করিলে আপনার অস্তিত্ব বোধ না থাকায় জ্ঞানীর পরিণামের ন্যায় ভক্তেরও ঐ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। জ্ঞান ও ভক্তির চরম ফল-বিচার করিয়া যদিও একাবস্থা দেখান হইল, কিন্তু সাধনকালে উভয় মতের স্বতন্ত্র প্রকার ব্যবস্থা আছে। জ্ঞান মতে জগৎ সংসারকে বিশ্লিষ্ট করিয়া মহাকারণের মহাকারণে গমন করিবার নিমিত্ত আপনাকে প্রস্তুত করিতে হয়।

সুতরাং তথায় সর্ব্বত্রেই বিবেক বৈরাগ্যের কার্য্য দেখা যায়। জ্ঞানী সাধক প্রথমেই সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্ত নিরোধ দ্বারা সমাধিস্থ হইবার জন্য চেষ্টা করেন। এই অবস্থা লাভের জন্য তাঁহাকে কামিনী-কাঞ্চনের সম্বন্ধ এককালে ছেদন করিয়া থাকিতে হয়। তাঁহাকে তন্নিমিত্ত নেতি ধৌতি প্রক্রিয়াদি ও হটযোগ প্রভৃতি বিবিধ যোগ দ্বারা শরীর এবং মন আপনার আয়ত্তে আনিবার নিমিত্তও কার্য্য করিতে হয়। যখন আসনাদি আয়ত্ত হইয়া আইসে, যখন প্রণায়াম দ্বারা মন স্থিরীকৃত হয়, তখনই সাধকের ধারণা শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। ধারণা শক্তি হইলেই সমাধির আর অধিক বিলম্ব থাকে না। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান ধারণা এবং সমাধি, এই পঞ্চবিধ অবস্থার তাৎপর্য্য কি ?

মন লইয়া সাধন। যাহাতে মন স্থির হয়, তাহাই আমরা করিতে বাধ্য হইয়া থাকি। জ্ঞান পথে মন স্থির করিবার উপায় যোগ। যোগের যে পাঁচটী অবস্থা উক্ত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই, প্রথমে নেতিধৌতি দ্বারা পাকাশয় এবং অন্ত্র পরিষ্কার করিতে হয়। সাধকেরা আহারের কিয়ৎকাল পরে তাহা বমন করিয়া ফেলেন এবং পাকাশয় পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত জলপান পূর্ব্বক পুনরায় তাহা উদ্গীরণ করিয়া থাকেন। পরে অন্ত্রস্থিত ক্লেদাদি পরিত্যাগ করণান্তর বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক অন্ত্র মধ্যে জল প্রবিষ্ট করাইয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করেন এবং তাহা পুনরায় বহিষ্কৃত করিয়া থাকেন। পাকাশয়ের অজীর্ণ পদার্থ এবং অন্ত্রে মলাদি থাকিলে বায়ু বৃদ্ধি হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা মনশ্চাঞ্চল্যের কারণ হইয়া থাকে।

শরীরকে যে অবস্থায় রক্ষা করা যাইবে, তাহার অবস্থান্তর জনিত মনে কোন প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হইতে পারিবে না। সকলেই জানেন যে, এক অবস্থায় অধিকক্ষণ বসিয়া থাকা যায় না। দীর্ঘকাল এক অবস্থায় বসিয়া থাকিবার নিমিত্ত আসনের সাধন করিতে হয়। মনের স্থৈর্য্য সাধন করা প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু ধারণ করা যায়। বায়ু ধারণ করিবার হেতু, প্রভু কহিতেন :—

১২৯। জল নাড়িলে তন্মধ্যস্থিত সূর্য্য কিম্বা চন্দ্রের প্রতিবিম্ব যেমন দেখা যায় না, স্থির জলে উহাদের দেখিতে হয়, সেইরূপ স্থির মন না হইলে ভগবানের প্রতিবিম্ব

দেখা যায় না। নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা মন চঞ্চল হয়, অতএব যে পরিমাণে নিশ্বাস প্রশ্বাস কমান যাইবে, সেই পরিমাণে মন স্থিরও হইবে।

এই নিমিত্ত নেতিধৌতি দ্বারা আভ্যন্তরিক ক্লেদাদি পরিষ্কার করিবার বিধি প্রচলিত আছে।

প্রাণায়াম প্রক্রিয়া দ্বারা বায়ু ধারণ এবং অন্ত্রাদি শুদ্ধ করিয়া আভ্যন্তরিক বায়ু-বৃদ্ধি নিবারণ করিতে পারিলে ধ্যান করিবার অধিকারী হওয়া যায়। ধ্যান পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত, স্থুল সূক্ষ্ম কারণ মহাকারণাদি চিন্তা করিতে হয়। প্রভু কহিয়াছেন ঃ—

১৩০। প্রদীপশিখার মধ্যে যে নীলাভাযুক্ত অংশটী আছে তাহাকে সূক্ষ্ম কহে, সাধক সেই স্থানে মন সংলগ্ন করিতে চেষ্টা করিবে। সূক্ষ্মে মন স্থায়ী হইলে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ-গামী হইবে।

দীপশিখাকে ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করা যায়। শিখার সর্ব্ব বহির্ভাগে অর্থাৎ বায়ুর সংযোগাংশ স্থানটী দীপ্তিহীন হইয়া থাকে। দীপ্তিহীন অংশের অব্যবহিত পরে দীপ্তিপূর্ণাংশ, দীপ্তিপূর্ণাংশের পরে নীলপ্রভ-দীপ্তিবিহীন ভাগ-ইহাকেই প্রভু সূক্ষ্ম কহিয়াছেন। দীপ্তিহীন নীলভাগের পর তৈল। এস্থানে তৈল স্থুল, সূক্ষ্ম দীপ্তিহীন নীলবর্ণযুক্ত শিখা, তদপরে দীপ্তিপূর্ণাংশ, সর্ব্বশেষে দীপ্তিহীন শ্বেতাংশ। এই বিচার সাধক ইচ্ছাক্রমে ভগ্নাংশ ও তস্য ভগ্নাংশে পরিণত করিতে পারেন। মনকে যত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মে লইয়া যাওয়া যায়, স্থুল জগৎ হইতে ততই অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা। ইহার কারণ ঈশ্বর নিরূপণ প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি। এই প্রকারে ধ্যান সিদ্ধ হইলে তখন তাহাকে ধারণা কহে। কারণ প্রথমে স্থুলের ধ্যান, স্থুল ধারণা হইলে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের পর কারণ। যখন কারণ পর্য্যন্ত ধারণা করা যায়, তখন মহাকারণে গমন করিবার আর বিলম্ব থাকে না। মহাকারণে গমন করিলেই সমাধিস্থ হওয়া যায়।

১৩১। সমাধি দুই প্রকার, ১ম নির্ব্বিকল্প, ২য় সবিকল্প।

জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, বা ধ্যান, ধেয়, ধ্যাতা অর্থাৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দে আপনাকে একীকরণ করিয়া ফেলিলে যে অবস্থা হয়, তাহাকে নির্ব্বিকল্প

সমাধি কহে। ইহার দৃষ্টান্ত নিদ্রাকাল। যে সময়ে আমরা গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ি, তখন আমি কিম্বা অন্য কেহ আছে কি না, এবম্বিধ কোন প্রকার জ্ঞান থাকে না। নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা সেই প্রকার বুঝিতে হইবে।

সবিকল্প সমাধিতে জড় কিম্বা জড়-চেতন পদার্থ বলিয়া যাহা কথিত হয়, এতদ্জ্ঞান সত্ত্বেও যে অখণ্ডবোধক সর্ব্বচৈতন্য স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, তাহাকে সবিকল্প সমাধি কহা যায়। যে সাধকের এই প্রকার জ্ঞান সঞ্চার হয়, তিনি তখন যাহা দেখেন, যাহা কহেন, বা যাহা শ্রবণ করেন, সকলই চৈতন্যের মূর্ত্তি বা ভাব বলিয়া বুঝিতে পারেন, সেস্থলে সেই ব্যক্তির বহুজ্ঞান সত্ত্বেও তাহা এক জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি যাহা দেখেন তাহাই চৈতন্যময়, তখন "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণস্ফূরে"। "যে দিকে ফিরাই আঁখি, গৌরময় সকলই দেখি"। এই ভাবকে সবিকল্প সমাধি বলে। সবিকল্প সমাধি ভক্তিমতের চরমাবস্থায় হয়, যাহা মহাভাব সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে।

১৩২। ভক্তিমতে প্রথমে নিষ্ঠা, পরে ভক্তি, তদ্‌পরে ভাব, পরিশেষে মহাভাব হয়।

নিষ্ঠা। গুরুমন্ত্র বা উপদেশের প্রতি মনের একাগ্রতা সংরক্ষার নাম নিষ্ঠা। নৈষ্ঠিক ভক্তের স্বভাব সতী স্ত্রীর স্বভাবের ন্যায় হইয়া থাকে। সতী স্ত্রী আপনার স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষকে দেখেন না, অন্যপুরুষের কথা শ্রবণ করেন না এবং অন্য পুরুষের গাত্রের বাতাস আপনার গাত্রে সংস্পর্শিত হইতে দেন না, আপন স্বামী কার্ত্তিকের ন্যায় রূপবান হউক বা গলিত কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তের ন্যায় কুৎসিতই হউক, তাঁহার নিকট কন্দর্পের ন্যায় পরিগণিত হয়। সতী স্ত্রী আপন পতিকে ঈশ্বর স্বরূপ জ্ঞান করেন এবং স্বামীর সেবা, স্বামীর পূজা ও যাহাতে স্বামীর তৃপ্তি সাধন হয় এবং তিনি সন্তুষ্ট থাকেন, ইহাই তাঁহার এক মাত্র ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। নৈষ্ঠিক ভক্তের চরিত্র এইরূপে সংগঠিত করিতে হয়। তিনি আপন ইষ্টকেই সর্ব্বস্ব ধন জ্ঞান করেন। ইষ্ট ছাড়া সকল কথাই অনিষ্টকর বলিয়া তাঁহার ধারণা থাকে। তাঁহার সকল কার্য্য সকল ভাব ইষ্টের প্রতি ন্যস্ত হয়। ইষ্ট কথা, ইষ্ট পূজা, ইষ্টের গুণ গান ব্যতীত, অন্য ভাবে মনোনিবেশ করাকে পাপ বলিয়া নৈষ্ঠিক ভক্তের বিশ্বাস। তিনি অন্য দেবদেবী পূজা করিয়া

কিম্বা তীর্থাদি দর্শন ও পূতনীরে অবগাহন দ্বারা আপনাকে পবিত্রজ্ঞান করেন না। প্রভু কহিয়াছেন যে, নৈষ্ঠিক ভক্তের দৃষ্টান্ত হনুমান। হনুমান রাম সীতাকেই ইষ্ট জানিতেন। শ্রীরামচন্দ্র কানন বাস হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যখন রাজদণ্ড ধারণ করেন, সেই সময় হনুমানকে পারিতোষিক স্বরূপ এক ছড়া বহুমূল্যের মুকুতার মালা প্রদান করিয়াছিলেন। হনুমান দন্তের দ্বারা সেই মুকুতাগুলি একটী একটী করিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহাকে মুকুতাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে আমার রাম সীতা আছেন কি না তাহাই দেখিতেছিলাম। এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে, মুকুতার ভিতর কি জন্য রাম সীতা থাকিবেন?

হনুমানের বুদ্ধি আর কত হইবে? হনুমান সেই ঘটনায় পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত আপন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ পূর্ব্বক রাম সীতার মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া অবিশ্বাসীদিগের আশ্চর্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। হনুমানের সহিত এক বার নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণবাহন গরুড়ের রাম কৃষ্ণ লইয়া বাদানুবাদ হয়। গরুড় শ্রীকৃষ্ণের আদেশে নীলপদ্ম আনিতে গমন করেন। যে জলাশয়ে পদ্ম ফুটিয়াছিল, তথায় হনুমান বাস করিতেন। হনুমান পথ ছাড়িয়া না দিলে পদ্ম আনা যায় না, সুতরাং গরুড়কে হনুমানের নিকট পদ্মের কথা কহিতে হইয়াছিল। হনুমান এই কথা শুনিয়া কহিলেন যে, ঐ পদ্ম আমি সীতা রামের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি। কৃষ্ণ কে? তিনি যেই হউন, তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এই কথা শ্রবণ করিয়া গরুড় মহাশয় কহিতে লাগিলেন, হনুমান! তুমি ভক্ত হইয়া আজপর্য্যন্ত রামকৃষ্ণের ভেদাভেদ বুঝিতে পার নাই। যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ, ভেদজ্ঞান করিলে মহা অপরাধ হয়। হনুমান তচ্ছ্রবণে বলিলেন যে, তাহা আমি বিশিষ্টরূপেই অবগত আছি, যে রাম সেই কৃষ্ণ বটে, তথাপি পদ্মপলাশলোচন শ্রীরামচন্দ্রই আমার সর্ব্বস্বধন জানিবে। গরুড় যাহা বলিয়াছেন তাহাও সত্য এবং হনুমানের কথাও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ রাম কৃষ্ণ অভেদ এবং রাম কৃষ্ণেও প্রভেদ আছে। যেমন মনুষ্য। মনুষ্য বলিলে এক শ্রেণীর জীব বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। তথায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, কাফ্রি প্রভৃতি জাতির প্রতি কোন ভাবই আসিতে পারে না কিন্তু জাতিতে আসিলে এক মনুষ্য শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। হিন্দুও মনুষ্য, মুসল-

মানাদিও মনুষ্য, অতএব সকলকে মনুষ্য বলিলেও ঠিক্ বলা হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতি ধরিয়া তাহাদিগের স্বতন্ত্র জ্ঞান করিলেও মিথ্যা কথা বলা হয় না। যেমন এক মাটি হইতে জালা, কলসি, ভাঁড়, খুরি প্রদীপাদি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। জালা এবং প্রদীপকে তুলনা করিলে ভাবে এক পদার্থ বলিয়া কেহ স্বীকার করিতে পারেন না কিন্তু উপাদান কারণ হিসাব করিলে তাহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ লক্ষিত হইবে না। সেই জন্য গরুড় এবং হনুমানের ভাব দুইটীকেই সত্য বলিতে হইবে।

যদিও গরুড় এবং হনুমানের ভাবদ্বয়কে সত্য কহা হইল, কিন্তু ভক্তি মতে হনুমানের ভাব শ্রেষ্ঠ এবং গরুড়ের ভাবে জ্ঞান মিশ্রিত থাকায়, শুদ্ধ ভক্তি না বলিয়া উহাকে জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি বলিতে হইবে। প্রভু কহিয়াছেন, যখন পাণ্ডবেরা রাজসূয় যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে অপরাপর দিক্‌দেশীয় নরপতিগণ হস্তিনায় আগমন পূর্ব্বক রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট সমাগত হইয়া মস্তকাবনত করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে লঙ্কাধিপতি মতিমান বিভীষণও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বিভীষণ যে সময়ে যুধিষ্ঠিরের সভায় আগমন করেন, সে সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিভীষণ আসিতেছেন দেখিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরের অগ্রে মস্তকাবনত করিয়া রাজ সম্মান প্রদান পূর্ব্বক স্থানান্তরে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিভীষণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াও কোনমতে মস্তকাবনত করিলেন না। বিভীষণের এই প্রকার ভাবান্তর এবং রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরের প্রতি অসম্মানের ভাব প্রদর্শন করায় শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, বিভীষণ! তুমি এপ্রকার সৌজন্যতাবিহীন কার্য্য কেন করিলে? বিভীষণ অতি দীনভাবে কহিলেন, প্রভু! রাজচক্রবর্ত্তীর আমি অবমাননা করি নাই, এই দেখুন, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিতেছি; মস্তকাবনত করি নাই তাহার কারণ আপনি অবগত আছেন। এ মস্তক এখন আমার নহে, এ যে ত্রেতাযুগে প্রভু আপনি রামরূপে অধিকার করিয়া লইয়াছেন! শ্রীকৃষ্ণ অধোবদন হইয়া রহিলেন।

আমরা নিষ্ঠা ভক্তির জলন্ত ছবি দেখিয়াছি। আমাদের প্রভু রামকৃষ্ণের বিষ্ণুনামক একটী ভক্ত ছিল। বিষ্ণু প্রভু ব্যতীত জগতে আর দ্বিতীয় কাহাকে জানিত না। সে নিতান্ত বালক, তাহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের ন্যূন ছিল। বিষ্ণুর পিতা উচ্চবেতনের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পুত্র ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিয়া বিকৃত হইয়া যাইবে, তাহা তিনি নিতান্ত ঘৃণা করিতেন। বিষ্ণু

গোপনে গোপনে প্রভুর নিকট আসিত, এজন্য প্রভু তাহাঁকে সাবধান হইতে বলিতেন। ভক্তের প্রাণ বারণ মানিবে কেন? সে তাহা শুনিত না। ক্রমে তাহার পিতা নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তাহাকে কখন গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, কখন প্রহার করিতেন এবং কখন বা অশ্রাব্য বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিতেন। যখন গুরুতর ব্যাপার হইয়া উঠিল, যখন বিষ্ণুর প্রভু-দর্শনে প্রতিবন্ধক জন্মিতে লাগিল, তখন একদিন সে তাহার পিতা মাতাকে কহিল যে, এই আধারটা তোমাদের, সেই জন্য এত অত্যাচার করিতেছ। আমি কোন মন্দকর্ম্ম করি নাই, সুরাপান কিম্বা বেশ্যাশক্ত হয় নাই, পরমার্থ লাভের জন্য গুরুপাদপদ্ম দর্শন করিতে যাই, তাহা তোমাদের অসহ্য হইল! আমিও তোমাদের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছি, অতএব তোমাদের দেহ তোমরা গ্রহণ কর। এই বলিয়া সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা সে আপনার গলদেশ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল।

নৈষ্ঠিক ভক্তি এবং গোঁড়ামী এই দুইটীর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাব। অনেক বৈষ্ণব আছেন, যাঁহারা কালী নাম উচ্চারণ করাকেও ব্যভিচার ভাব মনে করিয়া "সেহাই" শব্দ এবং কোন দ্রব্য কাটিবার সময়, "বানান" শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন; ইহাকেই গোঁড়ামী বলে। প্রভু কহিতেন, কোন স্থানে এক বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন। তাঁহার একাগ্রতা এবং ভক্তির পরাক্রমে বিষ্ণু প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। ঠাকুর বরপ্রদান করিবার পূর্ব্বে কহিলেন, দেখ বাপু! তোমার ভক্তিতে আমি প্রত্যক্ষ হইয়াছি বটে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত শিবের প্রতি তোমার দ্বেষ ভাব না যাইবে, সে পর্য্যন্ত আমার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিবে না। সাধক এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক হেঁটমুণ্ডে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুও তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন।

সাধক পুনরায় অতি কঠোরতার সহিত সাধন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সাধনায় ঠাকুরকে অস্থির করিয়া তুলিল, সুতরাং পুনরায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ হইতে হইল। এবারে ভগবান্ অর্দ্ধবিষ্ণু এবং অর্দ্ধশিব লক্ষণাক্রান্ত হইলেন। ভক্ত ইষ্টদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া অর্দ্ধ আনন্দিত এবং অর্দ্ধ নিরানন্দযুক্ত হইলেন। তিনি অতঃপর ইষ্টদেবের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে চরণ ধৌত করিবার সময় বিষ্ণু লক্ষণাক্রান্ত পদটী ধৌত করিলেন। শিবলক্ষণাক্রান্ত পদটী স্পর্শ করা দূরে থাকুক, একবার দৃক্‌পাতও করিলেন না। পরে ঐরূপে ইষ্টের অর্দ্ধাঙ্গ অর্চ্চনা করণান্তর শিব লক্ষণাক্রান্ত অর্দ্ধ

নাসারন্ধ্র বাম হস্তদ্বারা সঞ্চালন পূর্ব্বক ধূপ দ্বারা তিনি আরতি করিতে লাগিলেন। এতদ্দৃষ্টে বিষ্ণুঠাকুর বিরক্তির ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, আরে ক্রূরমতি! তোকে অভেদ হরহরি মূর্ত্তি দেখালেম, তথাপি তোর দ্বেষভাব অপনীত হইল না। আমিও যে, হরও সে, আমাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই, তথাপি তুই আমার কথা অবহেলা করিয়া সম্পূর্ণ দ্বেষ ভাবের কেবল পরিচয় নহে, কার্য্য করিলি! আমি কি করিব! কার্য্যের অনুরূপ ফল লাভ করা আমারই নিয়ম। অতএব তুই যাহা মনে করিয়াছিস্, তাহাই হইবে কিন্তু দ্বেষ ভাবের নিমিত্ত অনেক বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইবে, এই বলিয়া প্রভু অদৃশ্য হইলেন। সাধক আর কি করিবেন, ঠাকুরের প্রতি কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া গ্রামবিশেষে আসিয়া বসতি করিলেন। ক্রমে প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনী সাধকের সাধন বিবরণ আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাত হইল। কেহ তাঁহাকে ভালবাসিতে লাগিল, কেহ বা অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিল এবং কেহ বা মাঝামাঝিরূপে থাকিল। পাড়ার ছেলেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া শিব শিব বলিয়া করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ছেলেদের জ্বালায় তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল এবং সর্ব্বদা তাহাদের অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিল। সাধক আর কুঠীরের বাহির হইতে পারিতেন না, তাঁহাকে দেখিলেই ছেলেরা অমনই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শিব শিব বলিয়া করতালি দিত। সাধক নানাবিধ চিন্তা করিয়া পরিশেষে দুই কর্ণের উপরে দুইটী ঘণ্টা বাঁধিতে বাধ্য হইলেন। যেই বালকেরা শিব শিব বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিত, সাধক অমনই মস্তক নাড়িয়া ঘণ্টার ধ্বনি করিতেন। ঘণ্টানিনাদ তাঁহার কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া শিব শব্দ প্রবেশ পক্ষে প্রতিবন্ধক জন্মাইতে লাগিল। সাধক পরে ঘণ্টাকর্ণ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ঘেঁটুঠাকুর গ্রাম্য ঠাকুর বটেন এবং যেরূপে তাঁহার পূজা হয়, তাহা সকলেরই জানা আছে।

১৩৩। গৃহস্থের বধূ যেমন আপনার স্বামীকেই স্বামী জানে, তাই বলিয়া কি শ্বশুর, ভাশুর, দেবরকে ঘৃণা করিবে, না সেবা শুশ্রূষা করিবে না? তাঁহাদের সেবা করা এবং কাছে শোয়া এক কথা নহে।

ভগবান্ নানা ভক্তের নিমিত্ত নানাবিধরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ভগবান্ এক, তিনি বহু নহেন, তিনি একাকী অনন্ত প্রকার আকৃতি এবং ভাব ধারণ করিয়া থাকেন; বিজ্ঞানী সাধক তাহা জানেন। একের বহুরূপ জ্ঞাত হইয়া নৈষ্ঠিক-ভক্ত আপন অভীষ্টদেবের পক্ষপাতী হইবেন, কিন্তু কোন-রূপে অন্য রূপের অবমাননা করিবেন না। অপমান করিলে আপন ইষ্টেরই অপমান করা হয়। যিনি আমার পতি, তিনি অপরের ভাশুর কিম্বা দেবর অথবা তাঁহার কাহারও সহিত অন্যকোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে; যদ্যপি বাহ্যিরের কোন সম্বন্ধ ধরিয়া তাঁহার অপমান করি, তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষে আপন স্বামীরই বিরুদ্ধাচারিণী হইব, তাহার ভুল নাই।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যেমন গোঁড়ামীর কথা বলা হইল, তেমনই অন্যান্য সম্প্রদায়েও গোঁড়ামী আছে। এই গোঁড়ামীর নিমিত্তই সম্প্রদায় সৃষ্টি হয় এবং পরস্পর বিবাদ কলহ তাহারই ফল। শাক্তেরা বৈষ্ণবকে তিরস্কার করেন, বেদান্তবাদীরা সাকার পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করেন, ব্রাহ্মেরা হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া দুর্ব্বাক্যবাণ বরিষণ করেন, খৃষ্টেরা তাঁহাদের সম্প্রদায় ব্যতীত সমুদয় ধর্ম্মকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিঘোষণা করেন। এইরূপে সমুদয় সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিরা আপনাপন ধর্ম্মভাব অন্যান্য ধর্ম্মভাব হইতে অভ্রান্ত সত্য এবং সারবান জ্ঞান করিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই ভাবটীকে গোঁড়ামী কহে। এই স্থানে সাম্প্রদায়িক ভাব কাহাকে বলে, তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বর্ণনার নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। কারণ, আমাদের দেশ ধর্ম্মের গোঁড়ামীর জন্যই এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। এই গোঁড়ামীর নিমিত্তই পরস্পর দ্বেষাদ্বেষী ভাব বর্দ্ধিত হইয়া আত্ম-বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, গোঁড়ামীর নিমিত্তই এক সম্প্রদায় সংখ্যাতীত শাখা সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া থাকে।

সকলেই মনে করেন যে, তাঁহারই অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রকৃত পথ এবং তন্নিমিত্ত অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য এইরূপে প্রতিবেশীদিগের গৃহে প্রবাসে থাকিয়া বিদেশী ব্যক্তির দ্বারে উপস্থিত হইয়া, আত্মধর্ম্মের মর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া প্রতিনিয়ত ব্যতিব্যস্ত থাকেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং মহান অভিপ্রায় চিন্তা করিলে চরণরেণু প্রার্থনা করিতে হয়। কারণ, তাঁহাদের আত্মসুখস্পৃহা আপন ভোগ বিলাস আত্ম-পদমর্য্যাদা বিস-

র্জ্জন দিয়া, অনাথ অসহায় অসভ্যদিগের ন্যায় ভ্রমণ করিবার কারণ কি? পরানর্থ সাধন কিম্বা পরমঙ্গল কামনা? সাধারণের কল্যাণ বাসনাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাহার ভুল নাই। ধর্ম্মের শান্তি মলয়ানীল সংস্পর্শে লীলাধামের যন্ত্রনার অবসান হয় তাহা তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন, তন্নিমিত্ত অন্যের জন্য তাঁহাদের প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া থাকে। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, ঈশ্বরের চরণাশ্রয় ব্যতীত জগজ্জনের দ্বিতীয় গত্যন্তর নাই। তাঁহারা জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ নশ্বর, দেহ নশ্বর, দেহাধার নশ্বর, দেহের আনুষঙ্গিক উপকরণাদিও নশ্বর। তাঁহারা অন্তরে দেখিয়াছেন যে, ভবধামের কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, সকলই পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং তাহারা অবিচ্ছেদ প্রীতিপ্রদ নহে। তাই তাঁহারা স্বার্থপরতাভাব চূর্ণ করিয়া শান্তি নিকেতন প্রদর্শন করিয়া দিবার জন্য নিঃস্বার্থভাবে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের নিকট কি জন্য এমন নিঃস্বার্থ সাধুদিগের সাধু প্রার্থনা সাদরে পরিপূরিত হইতেছে না? কেন তাঁহাদের দেখিলে সকলে না হউন, অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন? কেনই বা তাঁহাদের লইয়া সকলে বিদ্রূপ ও কুকথার প্রস্রবণ খুলিয়া দেন? কেনই বা তাঁহারা নিঃস্বার্থ মাঙ্গলিক কার্য্যের বিনিময়ে তিরস্কৃত ও বিতাড়িত হইয়া থাকেন? তাহা নির্ণয় করা অতীব আবশ্যক। কোন্ পক্ষের দোষ এবং কোন্ পক্ষের গুণ, তাহা স্থির না করিলে এ প্রকার অত্যাচার কস্মিন্ কালে স্থগিত হইবে না।

ধর্ম্ম লইয়া বিচার করিয়া দেখিলে কাহার সহিত কোন প্রকারে মতভেদের কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধর্ম্ম কি? অর্থাৎ জগদীশ্বরের উপাসনা। জগদীশ্বর এক অদ্বিতীয়, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্বাস। এমন কি, যে বালকের সামান্য জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারাও তাহা বলিয়া থাকে। যদ্যপি সকলে ঈশ্বর বলিয়া ধাবিত হন, যদ্যপি তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং ভাবীগতি ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে সকলের ধর্ম্ম এক, একথা কিজন্য স্বীকার না করা যাইবে?

যদ্যপি সকলের হৃদয়ের ভাব একই হয়, তাহা হইলে এক কথায় পরস্পর মতভেদের তাৎপর্য্য কি? কেহ বলিলেন, দুইএর সহিত দুই যোগ করিলে চারি হয়, এ কথায় কাহার অনৈক্য হইবে? যদ্যপি চারের স্থানে পাঁচ কিম্বা তিন কহা যায়, তাহা হইলে গোলযোগ উপস্থিত হইবারই কথা।

এইজন্য যে ধর্ম্মপ্রচারকদিগের দ্বারা মতভেদের হেতু উপস্থিত হইয়া থাকে, তাঁহাদের মধ্যেই প্রকৃত ধর্ম্মভাব নাই বলিয়া সাব্যস্থ করিতে হইবে।

এই স্থানে জিজ্ঞাস্য হইবে যে, তবে কি ধর্ম্মপ্রচারকেরা প্রতারক, স্বার্থপর এবং ধর্ম্মব্যবসায়ী ? তাঁহাদের কি তবে ধর্ম্মবোধ হয় নাই ?

এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কথিত হইবে যে, যাঁহারা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-প্রচারক, তাঁহাদের প্রকৃত ঈশ্বরভাব নাই, তাহাও সম্পূর্ণ কারণ নহে, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান লাভ হয় নাই, এ কথায় সংশয় হইতে পারে না। যেমন একটী বৃত্তের কেন্দ্র বা মধ্যবিন্দু হইতে পরিধির যে কোন স্থানে বা বিন্দুতে রেখা অঙ্কিত করা যায়, তাহারা সকলেই পরস্পর সমান বলিয়া উল্লিখিত। এক্ষণে যদ্যপি ঈশ্বরকে মধ্যবিন্দু মনে করা যায় এবং আমরা পরিধির প্রত্যেক্ বিন্দু-বিশেষ হই, তাহা হইলে আমাদের নিকট হইতে ঈশ্বর একই ভাবে দৃশ্য হইবার কথা। আমার সহিত ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ, অন্য ব্যক্তিরও অবিকল সেই সম্বন্ধ হইবে, কিন্তু পরিধির বিন্দুতে দণ্ডায়মান হইয়া বিচার করিতে থাকিলে কখন এই মীমাংসা প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। কারণ, আমার বিন্দু হইতে ঈশ্বর বিন্দুর যে ব্যবধান, দ্বিতীয় বা ততোধিক ব্যক্তির বিন্দু হইতে সেই পরিমাণে ব্যবধান আছে কি না, তাহা দুই স্থান হইতে জানিবার উপায় আছে। হয় প্রত্যেক বিন্দুতে গমনপূর্ব্বক আপনাবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, না হয় ঈশ্বরবিন্দুতে দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে হইবে। তখন এই শেষোক্ত স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক পরিধির বিন্দুসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর হইতে সকলেই সমান ভাবে রহিয়াছেন।

সেইরূপ ঈশ্বর এক, তাঁহার অনন্তভাব অনন্তজীবে অবস্থিতি করিতেছে। ঈশ্বর মধ্যবিন্দু। কারণ, সেইস্থান হইতে সমুদয় ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে এবং জীবগণ পরিধির বিন্দু, কারণ তাহা তাঁহা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। যদ্যপি ঈশ্বরের প্রকৃত-ভাব জানিতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরবিন্দুতে গমন করাই মনুষ্যদিগের একমাত্র সুলভ প্রণালী। প্রত্যেক ভাব শিক্ষা করিয়া পরিশেষে কারণ সাব্যস্থ করা খণ্ড জীবের কর্ম্ম নহে।

যদ্যপি আমরা সাম্প্রদায়িক প্রচারকদিগকে এই নিয়মের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলে তাঁহাদের পরিধির বিন্দুতে দেখিতে পাইব।

তাঁহারা এ পর্য্যন্ত ঈশ্বর বিন্দুতে গমন অথবা পরিধির অন্ততঃ একটী বিন্দুও অবলোকন করেন নাই। তাঁহারা আপন বিন্দু হইতে ঈশ্বর বিন্দু দেখিয়া থাকিবেন কিন্তু তাহাতে গমন করিতে পারেন নাই। এইজন্য তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা অন্য বিন্দুর ব্যক্তিও নিজ ভাবে বুঝিয়া থাকেন, সুতরাং প্রচারকের কথায় কেন কর্ণপাত করিবেন এবং যেস্থানে কাহাকে আপন বিন্দু অর্থাৎ ভাব পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়, তথায় সেই ব্যক্তি তাহার বিন্দু হইতে ঈশ্বরবিন্দু আদৌ অবলোকন করেন নাই। সেইজন্য লোকে সম্প্রদায়বিশেষে প্রবেশ করিয়া আবার কিয়দ্দিবস পরে তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন।

উপরি উক্ত পরিধির বিন্দু অর্থাৎ যাহার যে ভাব তাহাতে সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বে কেবল সাধন-প্রবর্ত্তের অবস্থায় কিয়দ্দূর গমন করিয়া প্রচারক শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও কাহারও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। এই অবস্থার প্রচারকদিগের ধর্ম্মকে প্রকৃত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলে।

আমরা তাই বার বার বলিতেছি যে, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রচারকদিগের আর স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আত্মদৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। যাহাতে নিজেরা ঈশ্বরবিন্দুর নিকট গমন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টায় নিযুক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। তাঁহাদের জানা উচিত যে, ঈশ্বর অভিপ্রায় সকলের, ঈশ্বরের নিকট গমন করিবার জন্য সকলেই লালায়িত। ঈশ্বর অন্তর্যামী, তিনি যখন লোকের প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর, মনের মন; যখন আমাদের হৃদয়ে কুভাব বা পাপ ক্রিয়ার সূচনা হইলে তাহা তাঁহার গোচর হয় এবং তিনি তাহার দণ্ডবিধান করেন, তখন তাঁহার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইলে, যে ভাবেই হউক, যে নামেই হউক, সাকার মূর্ত্তিতেই হউক আর নিরাকার ভাবনাতেই হউক, মনুষ্য মূর্ত্তি দেখিয়াই হউক কিম্বা গাছ পাথরের সম্মুখেই হউক, প্রকৃত ঈশ্বর-ভাব মানসক্ষেত্রে সমুদিত থাকিলে ঈশ্বর লাভ অবশ্যই হইবে, ইহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না। যদ্যপি ইহাতে আপত্তি হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধেও আপত্তি হইবে এবং পাপমতি কেবল মনের গর্ত্তস্থ থাকিলে—কার্য্যে পরিণত নহে—তাহা ঈশ্বর জানিতে পারেন না এবং তাহার জন্য কেহ দায়ী নহেন—একথা বলিলে কোন কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপুস্তকের আদেশ খণ্ডিত হইয়া যাইবে, কিন্তু আমরা

সামঞ্জস্য ভাব সর্ব্বত্রেই দেখিতে পাই, সেইজন্য ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি বিশ্বাস করিয়া ভাবের অনুরূপ ফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে আমাদের এক পরমাণু অবিশ্বাস নাই।

আমরা সেইজন্য পুনর্ব্বার সমুদায় ব্যক্তিদিগকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি, তাঁহাদের অন্তরে অন্তরাত্মা ভগবান্ যে ভাব প্রদান করিয়াছেন, তাহা কাহার কথা শ্রবণে, কিম্বা কোন পুস্তক পাঠে, অথবা কোন সাধকের অবস্থা দেখিয়া তদনুবর্ত্তী হওয়া নিতান্তই ভ্রমের কথা। সাবধান! সাবধান! কিন্তু যে ভাব আপনার প্রাণের সহিত সংলগ্ন হইয়া যাইবে, তাহাই তাঁহার নিজ ভাব বলিয়া জানিতে হইবে। সেই ভাবে উপাসনা বা পূজার্চ্চনাদি কিম্বা ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিভক্তি প্রদান করিবার যে কোন প্রণালী বা যাহা কিছু মনে উত্থিত হইবে, তাহাতেই মনোসাধ পূর্ণ হইবে। তাঁহার নিকট বিধি নাই, ব্যবস্থা নাই। তিনিই বিধি, তিনিই ব্যবস্থা। যে কেহ তাঁহার শরণাগত হন, দয়াময় স্বয়ংই ব্যবস্থাপক হইয়া তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া দেন। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ কথা। ফলে, আপন ভাবে আপনি থাকিলে নৈষ্ঠিক ভাবের কার্য্য হয়। আপনভাব অপরের ভাব অপেক্ষা উত্তম জ্ঞান করিয়া তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা করাকে সাম্প্রদায়িক বা গোঁড়ামী ভাব কহে।

যেমন একজাতীয় পদার্থ দ্বারাই মানবগণ জন্মিয়া থাকে। তাহাদের উপাদান কারণগুলিও একই প্রকার। সমুদায় এক প্রকার হইয়াও প্রত্যেক মনুষ্যকে স্বতন্ত্র দেখায়। কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সমান নহে, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাব স্বতন্ত্র প্রকার জানিতে হইবে। এই স্বভাবগত সকলেরই ভাব আছে। যে পর্য্যন্ত এই ভাব প্রস্ফুটিত হইতে না পারে, সে পর্য্যন্ত যে কেহ যে রূপে অন্যভাব তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইবেন, তাহা সময়ে পুনরায় প্রক্ষিপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। স্বভাবগত ভাব প্রদান করাই দীক্ষা গুরুর কার্য্য। এই নিমিত্ত আমাদের প্রভু ব্যক্তিগত উপদেশ দিতেন, সুতরাং তাঁহার নানা ভাবের ভক্ত সৃষ্ট হইয়াছেন; তিনি তজ্জন্য কহিতেন যে—

১৩৪। মাতা কাহার জন্য লুচি, কাহার জন্য খৈ বাতাসার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক সন্তানের স্বতন্ত্র প্রকার ব্যবস্থা হইল বলিয়া মাতার স্নেহের তারতম্য বলা

যায় না। যাহার যেমন অবস্থা, তাহার সেইরূপই ব্যবস্থা হওয়াই কর্ত্তব্য।

এস্থলে অবস্থাগত কার্য্যই দেখা যাইতেছে, অতএব স্বভাবগত ধর্ম্মভাবকেই নৈষ্ঠিক ভাব কহে।

স্বভাবগত ধর্ম্ম কাহাকে কহে এবং তদ্দ্বারা আমাদের কি প্রকার লাভালাভের সম্ভাবনা, তাহা এ স্থানে পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইতেছে।

স্বভাবগত ধর্ম্ম বা স্বধর্ম্মাচরণ কিম্বা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে প্রতিপালন করিবার বিধি আছে। স্বভাবগত ধর্ম্ম কি, তাহা দীক্ষা গুরুই জানেন কিন্তু সকলের দীক্ষা গুরু, দীক্ষা গুরুর ন্যায় না হওয়ায়, স্বধর্ম্ম নির্ণয় পক্ষে প্রথমে কিঞ্চিৎ প্রত্যবায় ঘটিয়া থাকে। এই নিমিত্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতি রামকৃষ্ণদেব বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, ইহাদের বর্ণানুসারেও তিনি উপদেশ দিতেন। ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত তিনি একাকার করিতেন না। ইহার দ্বারা তাঁহার জাতিভেদের ভাব প্রকাশ পায় নাই, তাহা যথা স্থানে প্রদর্শিত হইবে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করা সাধকদিগের প্রথম কার্য্য, তাহাতে নৈষ্ঠিকভাব পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। আমরা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এই স্থানে কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রভু কহিয়াছিলেন যে, চৈতন্যদেব এবং রায় রামানন্দ ঠাকুরের সহিত গোদাবরী তীরে এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল, যথা।

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণ বিষ্ণুভক্তি হয়॥

স্বধর্ম্মাচরণ করা বিষ্ণুভক্তি লাভের এক মাত্র উপায়। ইহার মর্ম্ম এইরূপে কথিত হয় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, যাহারা যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদের সেই সেই বর্ণানুসারে পরিচালিত হইতে হইবে, কারণ যে যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার আকৃতি প্রকৃতিতে সেই কুলের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং কুলগত রীতি নীতিও তাহার স্বভাবসঙ্গত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই মতে ব্রাহ্মণকুলের

ব্রহ্মচর্য্যভাব স্বভাবসিদ্ধ হওয়াই কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়কুলে উগ্রভাবাপন্ন এবং রাজকার্য্যাদি পরায়ণ হওয়া, বৈশ্যের ব্যবসা বৃত্তিতে এবং শূদ্রের নিকৃষ্ট কার্য্যে রতিমতি হইবা রই কথা। যদ্যপি স্বধর্ম্ম অর্থে কেবল বর্ণগত ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাহা হইলে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ঈশ্বর লাভ হইবার কোন কথাই থাকে না। ব্রাহ্মণ ব্যতীত ঈশ্বর রাজ্যে গমন করিবার আর কাহারও অধিকার থাকিতে পারে না। এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণেরা বেদাদি গ্রন্থে আপনাদের একাধিপত্য স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বধর্ম্মের অর্থ যদ্যপি বর্ণগতই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর সৃষ্টিকাল হইতে অদ্যাপি কি অন্য বর্ণের কেহই ঈশ্বর লাভ করেন নাই? সে কথা বলিবার অধিকার কি? ধর্ম্মরাজ্যের ইতিহাসে অন্যান্য বর্ণের কথা কি—নীচ শূদ্র এবং যবনাদি পর্য্যন্ত ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হইয়াছেন বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলিলে, ইহার অন্য তাৎপর্য্য বাহির করিতে হইবে। প্রভু কহিয়াছেন:—

১৩৫। ব্রাহ্মণের ঔরসজাত পুত্র ব্রাহ্মণ বটে কিন্তু কেহ বেদপারদর্শী হয়, কেহ ঠাকুর পূজা করে, কেহ ভাত রাঁধে, এবং কেহ বেশ্যার দ্বারে গড়াগড়ি খায়।

এই উপদেশে স্বধর্ম্মাচরণের ভাবই বলবতী হইতেছে। প্রভুও এ কথা বলিয়াছেন যে, বর্ণগত ভাব প্রতিপালন করাই সকলের কর্ত্তব্য। এক্ষণে এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইবে। প্রভু কহিয়াছেন:—

১৩৬। মনুষ্যদেহ এক একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। মস্তকে স্বর্গ, বক্ষঃগহ্বরে মর্ত্ত, এবং উদর গহ্বরে পাতাল। আত্মতত্ত্ববিদেরা এইরূপে দেহকে পর্য্যবসিত করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা সকলই আমি এবং আমার বলিয়া জ্ঞান করেন।

এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বর্ণাশ্রম এবং স্বধর্ম্মাচরণ ভাবদ্বয় অনায়াসে মীমাংসা করিতে পারিব। প্রত্যেক জীবকে চারিটী অবস্থায় বিভাগ করিলে

এই বর্ণ চতুষ্টয় সিদ্ধান্ত হইয়া যায়। প্রথম শূদ্র, ইহা জীবের বালকাবস্থাকে কহে, কারণ এই অবস্থায় কার্য্যের ধারাবাহিক জ্ঞান থাকে না, নীচ কার্য্যাদিতে তাহারা সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকে। জীবের দ্বিতীয়াবস্থা বা যৌবনকালকে বৈশ্য কহা যায়। এই সময়ে তাহারা লাভালাভের কার্য্য করিয়া থাকে। তৃতীয় ক্ষত্রিয় বা জীবের প্রৌঢ়াবস্থা। এই সময়ে রাজ্যশাসন করিতে হয়। তত্ত্বপক্ষে আত্মশাসনের ভাব বুঝিতে হইবে। প্রৌঢ়াবস্থাটী অতি ভীষণ কাল বলিয়া জানিতে হইবে; কারণ এই সময়ে যগুপি কেহ আপনাকে সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে পরিণামে অতিশয় ক্লেশ পাইতে হয়। মনোরাজ্যে যাহাতে কাম ক্রোধাদি রিপুগণ এবং তাহাদের বংশাবলী অর্থাৎ রিপুদিগের বিবিধ কার্য্য প্রসূত ফল দ্বারা যে সকল উপদ্রব হইয়া থাকে, সে সকল যাহাতে নিবারণ করিয়া রাখা যায়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া এই অবস্থার কার্য্য। যে ব্যক্তি আত্মশাসন করিতে কৃতকার্য্য হন, তাঁহার চতুর্থাবস্থাকে ব্রাহ্মণ কহে। জীবের এই অবস্থায় ব্রহ্মলাভ হয়। এই অবস্থার পর আর বর্ণাদির বর্ণনাও নাই।

বর্ণ ধর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণের কথা যাহাই উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাকে সত্ত্বগুণ কহে। যে মনুষ্য এই গুণাক্রান্ত হইবেন, তিনিই ঈশ্বর লাভ করিবেন, সুতরাং তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সময় যে যবন হরিদাস ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া বৈষ্ণবচূড়ামণী হইয়াছিলেন, তাহার কারণ এইরূপ জানিতে হইবে। রজঃ তমঃ ভাবে ঈশ্বর লাভ হয় না, তাহা সম্পূর্ণ সাংসারিক ভাবের কথা। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য রজোগুণের দৃষ্টান্ত, শূদ্র তমোগুণের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হয়। এই নিমিত্ত এই ত্রিবিধ বর্ণের ঈশ্বর লাভ হইতে পারে না। যে ব্যক্তির যখন যেমন অবস্থা থাকে, সেই ব্যক্তি তখন সেইরূপে পরিচালিত হইতে বাধ্য হয়। তাহার সে অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাইবার উপায় নাই। অবস্থাগত ভাবই সকল কার্য্যের আদি কারণ হইয়া থাকে সুতরাং তাহাই তাহার বর্ণ এবং স্বভাব। বর্ণধর্ম্ম এবং স্বধর্ম্ম ফলে একই কথা।

১৩৭। স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা জীব সরল এবং কপটতা পরিশূন্যাবস্থা লাভ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মনুষ্যগণ এক প্রকার পদার্থ দ্বারা সকলে

গঠিত। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি যবন, কি ম্লেচ্ছ, কি সভ্য, কি অসভ্য, প্রত্যেক নর নারীর দেহ একই রূপে, একই পদার্থে, একই প্রকার যন্ত্রে এবং একই ক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। অস্থি, শোণিত, মাংস, বসা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, এবং ফুস্ ফুস্, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল বিভিন্ন প্রকারে গঠিত হয় নাই, অথবা কোথাও তাহাদের কার্য্যের তারতম্য দেখা যায় নাই। ক্ষুধায় আহার ও পিপাসায় জল পান করা, দুঃখে বিমর্ষ ও সুখে আনন্দিত হওয়া, ইত্যাদি দৈহিক কার্য্যে জাতিভেদে স্থানভেদে কিম্বা কার্য্যভেদে, কস্মিন্‌কালে পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায় না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সকলই এক হইয়াও ভেদাভেদ জ্ঞানের এবং কার্য্য বিভিন্নতার তাৎপর্য্য কি? বাস্তবিক, ক্ষুধায় আহার করিতে হয়, তাহা দেহীর ধর্ম্মবিশেষ কিন্তু আহারীয় দ্রব্যের সতত বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। কাহার আহার আতপ তণ্ডুল ও দুগ্ধ ঘৃত, কাহার চব্য চুষ্য লেহ্যপেয় এবং কাহার মদ্য মাংস ব্যতীত পরিতৃপ্তি লাভ হয় না। গমনে বা উপবেশনে, ভ্রমণে বা দণ্ডায়মানে, আলাপনে কিম্বা মৌনভাবে, প্রত্যেক মনুষ্যের বিভিন্নতা আছে। এই বিভিন্নতার কারণ আমরা স্বভাবকে অর্থাৎ গুণকে নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই ভাবের স্বাতন্ত্র্যই জগদীশ্বরের বিচিত্র অভিনয়। এক মাতৃগর্ভে পাঁচটী সন্তান জন্মিল। মাতা পিতার শোণিত শুক্র এক হইয়াও পাঁচটী পঞ্চ প্রকারের হইয়া যায়। *

সন্তানের জন্মকালীন পিতা মাতার শারীরিক এবং মানসিক ভাবের এবং যে সময়ে, যে কালে এবং নক্ষত্র রাশির যে অবস্থায় সন্তান জন্মিয়া থাকে, সেই

---

* এই বিষয়ের বিবিধ মতভেদ আছে, কিন্তু তৎসমুদয় সিদ্ধান্ত-বাক্য বলিয়া গ্রাহ্য নহে। কারণ, যাঁহারা সন্তানের জন্মকালীন পিতা মাতার মানসিক অবস্থার প্রতি বিভিন্নতার কারণ নির্দ্দেশ করেন, তথায় দেহগত কারণের অভাব হইয়া পড়ে। দেহগত কারণ সন্তানে প্রকাশিত হয়। তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত। যাহার পিতার কোন প্রকার ব্যাধি থাকে, তাহার সন্তানের সেই ব্যাধি প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাহার যে প্রকার অবয়ব, তাহার সন্তান সন্ততিরও অবয়বে তত্তৎবিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তানের দেহ পিতা মাতার দৈহিক অবস্থা দ্বারা সংগঠিত হয় এবং স্বভাবও তাঁহাদের স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেহ লইয়া প্রায় কাঁহার সন্দেহ হয় না, কারণ তাহা প্রত্যক্ষ বিষয়। স্বভাব লইয়াই গোলযোগ হইয়া থাকে। পণ্ডিতের সন্তান মূর্খ হয় কেন? জ্ঞানীর সন্তান অজ্ঞানী হয় কেন? আবার মূর্খের এবং অজ্ঞানীর পুত্র পণ্ডিত এবং জ্ঞানীও হইতেছে। ইহার মীমাংসা করা যারপরনাই কঠিন কিন্তু আমরা গুরুপ্রসাদে যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহাই এস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইব।

সময়ের ফলানুসারে তাঁহার দেহের অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। যেমন, পিতা মাতার সুস্থদেহ থাকিলে বলিষ্ঠ সন্তান হয়, তেমনই স্বাভাবিক মানসিক-শক্তি সতেজ থাকিলে নিজ স্বভাববৎ সন্তান হইবার সম্ভাবনা। সন্তানোৎপাদনকালে যদ্যপি বিকৃত স্বভাব হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই সন্তানের বিকৃত স্বভাবই হইবে। এই নিমিত্ত আমাদের রতিশাস্ত্রে রতিক্রিয়ার নানাবিধ ব্যবস্থা আছে। যেমন, একটী বৃক্ষ ভালরূপে জন্মাইতে হইলে, ভাল ভূমি, ভাল বীজের আবশ্যক হয়, সেই প্রকার সুসন্তানের নিমিত্ত ভাল পিতা মাতার প্রয়োজন। পূর্ব্বে রতি ক্রিয়ার ব্যবস্থানুসারে অনেকেই চলিতেন, এক্ষণে রতিক্রিয়া আত্ম সুখের জন্যই হইয়া থাকে। অনেকে ইহুদি বিবি ভাবিয়া আপন স্ত্রীতে সে সাধ মিটাইয়া লইয়া থাকেন; সে স্থলে বিকৃত স্বভাব হেতু অস্বাভাবিক সন্তান জন্মিয়া থাকে এবং স্ত্রীর যদ্যপি ঐ প্রকার স্বভাবচাঞ্চল্য ঘটে, তাহা হইলেও বিকৃত ভাবের সন্তান হইবে। বেশ্যাসন্তান এবং সুসন্তানের এই মাত্র প্রভেদ।

সুসন্তান যে প্রক্রিয়ায় জন্মে, বেশ্যাসন্তানও সেই প্রক্রিয়ায় জন্মিয়া থাকে কিন্তু সচরাচর ইহাদের মধ্যে যে তারতম্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ স্বভাবের বিকৃত-ভাবকে পরিগণিত করিতে হইবে। এস্থলে মাতা পিতা উভয়েরই বিকৃত স্বভাব হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। যে স্থানে তাহা না থাকে, তথায় সুসন্তান জন্মিবারই সম্ভাবনা।

এইরূপে সন্তানেরা স্বভাব লাভ করিয়া থাকে বলিয়া, কুলগত ধর্ম্মকে অনেক সময়ে স্বধর্ম্ম বলা যায় না। যেমন হিন্দুর গৃহে সাহেবি ঢংএর সন্তান জন্মিল। এ স্থানে তাহার হিন্দু-ভাব বিবর্জ্জিত হইবার কারণ কি? বোধ হয় জন্মকালীন্ তাহার পিতার কিম্বা মাতার সাহেবি স্বভাব ছিল, তাহা না হইলে সন্তানে সে স্বভাব কেমন করিয়া আসিল? অনেকে বলেন যে, স্বভাব দেখিয়া স্বভাব গঠন করা যায়, সে কথা আমরা অবিশ্বাস করি।

জগদীশ্বর মনুষ্যদিগকে একপদার্থ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন বটে কিন্তু প্রত্যেকের স্বভাব স্বতন্ত্র করিয়াছেন। ব্যক্তি মাত্রেই তাহার দৃষ্টান্ত; তজ্জন্য সকলের স্বধর্ম্মাচরণও স্বতন্ত্র কহিতে হইবে।

বাল্যাবস্থা হইতে মনুষ্যদিগের পরিবর্ত্তনক্রমে তাহাদের স্বভাব যেমন পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে, সেই পরিমাণে নানাবিধ বাহ্যিক অস্বাভাবিক ভাব দ্বারা উহা আবৃত হইয়া আইসে। যে ব্যক্তি যেমন অবস্থায় যে প্রকার সংসর্গে

থাকিবে, তাহার স্বভাব সেই প্রকার ভাবে আবৃত হইয়া যাইবে। তাহার এই আবরণ এমন অলক্ষিত এবং অজ্ঞাতসারে পতিত হইয়া যায় যে, তাহা স্বভাবাভিজ্ঞ ব্যতীত কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রত্যেকের স্বভাবে এই প্রকার অগণন আবরণ পতিত থাকায়, তাহার নিতান্ত অস্বাভাবিকাবস্থা বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। যেমন, একব্যক্তি সত্ত্বগুণী স্বভাব-বিশিষ্ট, বাল্যাবস্থায় রজোগুণী বয়স্যদিগের দ্বারা রজোগুণ প্রাপ্ত হইয়া স্বভাব হারাইয়া ফেলিল; পরে বিবাহের পর যদ্যপি তমোগুণাক্রান্ত স্ত্রী লাভ হয়, তাহা হইলে তাহার ঐ স্বভাব প্রাপ্ত হইবার সম্পূর্ণই সম্ভাবনা। এইরূপ উদাহরণ প্রতিগৃহে প্রত্যক্ষ হইবে। স্ত্রী হউক কিম্বা পুরুষই হউক, যাহার স্বভাব অস্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারই স্বভাব-হারাণ স্বভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার সে অবস্থা অন্যান্য কারণবশতঃ সংঘটিত না হয়, তাহার অস্বাভাবিকাবস্থা কদাচিৎ উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন কোন বালক নিজের অভিপ্রায়ানুসারে সর্ব্বদাই পরিচালিত হয়। পিতা মাতার কিম্বা বয়স্যের কথা মনোমত না হইলে কখনই শুনে না। যুবাকালেও কাহার কথা স্বাভিপ্রায় বিরুদ্ধ হইলে গ্রাহ্য করে না, বৃদ্ধকালেও এই প্রকার ব্যক্তিকে স্বভাব অতিক্রম করিতে দেখা যায় না।

এক্ষণে সংসারে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখা যাউক। প্রত্যেক নরনারীর স্বভাব পরীক্ষা করিয়া দেখা হউক, কে কোন প্রকার অবস্থায় অবস্থিত? পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, কাহার স্বাধীন প্রকৃতি, কাহার পরাধীন প্রকৃতি এবং কাহারও প্রকৃতি কাহারও সহিত সম্পূর্ণ মিলিত হইয়া রহিয়াছে।

যাহার স্বভাব স্ব-ভাবে আছে, সেই স্থানেই স্বাধীনভাব লক্ষিত হয়। পরাধীন স্বভাব স্ব ভাব বিচ্যুতিকে কহে এবং যে স্থানে উভয়ের এক স্বভাব, সেই স্থানে মিলনের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এই স্বাভাবিক নিয়ম সর্ব্বত্রেই প্রযুজ্য হইতে পারে। যখন কেহ কাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চাহেন, তাঁহাদের পরস্পর প্রাকৃতিক মিল না হইলে, প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপন কখনই হয় না। মাতালের সহিত সাধুর সদ্ভাব অথবা ক্রোধ পরায়ণ ব্যক্তির শান্তগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত মিলন হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; কিম্বা সুপণ্ডিতের সহিত মুর্খের প্রণয় অথবা ধনীর সহিত দরিদ্রের ঘনিষ্টতা হওয়া যারপরনাই অস্বাভাবিক কথা, কিন্তু যখন কোন দুর্ব্বিপাকবশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে এই প্রকার বিপরীত প্রকৃতির

ব্যক্তিরা একস্থানে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়, তখন প্রবল অর্থাৎ যাহার প্রকৃতি স্বভাবে আছে, তাহার নিকট দুর্ব্বল অর্থাৎ যাহার স্বভাব বিলুপ্ত হইয়াছে, সে পরাজিত এবং তাহার আয়ত্তে আনীত হইয়া থাকে।

স্বভাব এবং অস্বভাবকে প্রকৃত এবং বিকৃতাবস্থা বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে। যেমন হরিদ্রা ; ইহার সহিত যে পরিমাণে হরিদ্রা মিলিত করা হউক, হরিদ্রা কখনই বিকৃত হয় না কিন্তু চূণ মিশাইলে উহা বিবর্ণ হইয়া, না হরিদ্রা না চুণ, অর্থাৎ তৃতীয় প্রকার পদার্থে পরিণত হইয়া যায়। যদ্যপি হরিদ্রার পরিমাণ অধিক হয়, তাহা হইলে বিকৃত পদার্থটী হরিদ্রার মধ্যেই নিহিত থাকিবে অথবা চূণ অধিক হইলে ইহারই প্রাধান্য থাকিয়া যাইবে। যেমন গঙ্গাজলে এক কলসী দুগ্ধ নিক্ষেপ করিলে দুগ্ধের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না অথবা এক কলসী দুগ্ধে কিয়ৎপরিমাণে জল মিশ্রিত করিলে জলীয়াংশ অলক্ষিতভাবে থাকে।

আমাদের দেশে বিবাহের সময় পাত্র পাত্রীর জন্ম পত্রিকা দেখিয়া উভয়ের স্বভাব অর্থাৎ গণ এবং বর্ণাদি * নিরূপণ করিবার প্রথা ছিল। এক্ষণে সে প্রথা পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকৃত ফলে পিতৃ পিতামহের কুসংস্কার বলিয়া প্রায় অধিকাংশ স্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। যদ্যপি জন্ম পত্রিকা দ্বারা পাত্রের নরগণ সাব্যস্থ হয়, তাহা হইলে পাত্রীর নরগণ কিম্বা দেবগণ না হইলে বিবাহের সুফল লাভ হয় না। কন্যার নরগণ হইলে পাত্রের দেবগণ কিম্বা নরগণ হওয়া আবশ্যক। যদি পাত্রের রাক্ষসগণ হয়, তবে কন্যার দেবগণ কিম্বা রাক্ষসগণ হওয়া উচিত। অর্থাৎ উভয়ে নরগণ, দেবগণ কিম্বা রাক্ষসগণ অথবা একজন দেবগণ হইলে তাহার সহিত অন্যগণ মিলিতে পারে। ইহা নির্ব্বাচন পূর্ব্বক কার্য্য করিলে স্বাভাবিক পরিণয় বলিয়া কথিত হয় এবং এই প্রকার দম্পতী প্রকৃত দাম্পত্য সুখাস্বাদন করিয়া থাকে। যে স্থানে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য সমাধা হয়, সেই স্থানে যাবতীয়

---

* ইতিপূর্ব্বে বর্ণ সম্বন্ধে যে মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহা অশাস্ত্রীয় নহে বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি। পাঠক পাঠিকাগণ এক্ষণে উহা আরও সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন। ব্রাহ্মণকুলে অনেকে শূদ্র বর্ণ এবং শূদ্রবংশেও অনেকে বিপ্রবর্ণ বলিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আমরা বর্ণাশ্রম তত্ত্বপক্ষে যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছি, তদ্দ্বারা সামাজিক ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা অথবা অমান্য করিবার অভিপ্রায়ে নহে। ব্রাহ্মণ বলিলে তাঁহাদের কুলতিলকদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হইয়া চির অশান্তির আলয় হইয়া থাকে। আমরা যে সকল সামাজিক দুর্ঘটনায় নিয়ত প্রপীড়িত হইতেছি, তাহা এইরূপ নানা প্রকার অস্বাভাবিক ঘটনার বিষময় ফল জানিতে হইবে।

বিবাহকালীন পাত্র পাত্রীর স্বভাব অবধারণ করা যারপরনাই প্রয়োজনীয় কার্য্য। কারণ উভয়ে সমভাব বিশিষ্ট হইলে সকল কার্য্যই সমভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যদ্যপি স্ত্রী সত্বগুণা এবং তাহার স্বামী তমোগুণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে এক জনকে ঈশ্বর চিন্তা, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কার্য্য কলাপে, সাধু ভক্তদিগের সেবাদিতে সতত তৎপর দেখা যাইবে এবং আর একজন তদ্বিপরীত অর্থাৎ দেবতায় বিদ্বেষ ভাব, সাধু ভক্তদিগের প্রতি কুব্যবহার এবং সদনুষ্ঠানে কালান্তক যমসদৃশ ভাব অবলম্বন করিবে। অতএব কি স্বামী, কি স্ত্রী, উভয়ের স্বভাব সমগুণযুক্ত না হইলে, সে স্থানে পরস্পরের অস্বাভাবিক কার্য্য বা অধর্ম্মাচরণ সংঘটিত হইয়া যাইবে।

স্ত্রী পুরুষের স্বভাব নিরূপণ করিবার আরও আবশ্যকতা আছে। মনুষ্যগণ সামাজিক জীব। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে একত্রে বাস না করিলে সৃষ্টির বৃদ্ধির অন্য উপায় জগদীশ্বর উদ্ভাবন করেন নাই। সুতরাং স্ত্রী পুরুষ সংযোগ স্বাভাবিক নিয়ম। যদ্যপি তাহাই জগদীশ্বরের নিয়ম হয়, তাহা হইলে যাহাতে চিরকাল উভয়ের হৃদয়ে চিরশান্তি বিরাজ করিতে পারে, তাহাও অস্বাভাবিক কামনা নহে। এই শান্তি-স্থাপন সুমিলনের ফল, অতএব পরস্পরের স্বভাব মিলিত হওয়ার পক্ষে দৃষ্টি রাখা স্বধর্ম্মাচরণ মধ্যে পরিগণিত।

মনুষ্যগণের প্রথম কার্য্য স্বধর্ম্মাচরণ; ইহা সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় ভাবেই আবশ্যক। কারণ মনুষ্যদিগের সমাজে লিপ্ত হওয়া প্রথম কার্য্য। এই জন্য বিবাহাদিতে স্বভাব অবলোকন করা কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যদ্যপি সমাজে লিপ্ত হইবার সময় স্বধর্ম্ম রক্ষিত হয়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। অনেকে এই স্থানে তাঁহাদের নিজ নিজ অবস্থা দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়া লইবেন। যে দম্পতী সম-স্বভাব-বিশিষ্ট, তাঁহারা যখন তত্ত্বরসে আর্দ্র হন, তখন পরস্পরের সহায়তায় পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন এবং যথায় তাহার বৈপরীত্য ভাব থাকে, তথায় উভয়েরই যে কি ক্লেশ, যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারা বুঝিয়া লউন অথবা এ সকল যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন, তাঁহারা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সমাজে নিরীক্ষণ করুন। যেমন মনুষ্যের বাল্য, পৌগণ্ড

বা কিশোর, যুবা, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ কালাদি বিভাগ আছে, সেই প্রকার সমাজ এবং অধ্যাত্মতত্ত্বও জীবের দুইটী অবস্থার কথা। অতএব সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা কাহাকে বলে, যদিও আভাসে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

সমাজ কাহাকে কহে? যে স্থানে যে কালে এবং যাহাদিগের সহিত বাস করা যায়, তাহাকে সমাজ কহে। অতএব সমাজ বন্ধন, দেশ, কাল, এবং পাত্র বিচার দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। সেই জন্য স্বধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইতে হইলে ইহাদেরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

দেশ। যাহাতে অর্থাৎ যে স্থানে আমরা বাস করি, তাহাকে দেশ কহে। আমরা যেমন এক পদার্থসম্ভূত হইয়া বিবিধ প্রকার হইয়াছি, তেমনি দেশও এক প্রকার পদার্থ দ্বারা গঠিত হইয়া নানা স্থানে নানাবিধ আকৃতি এবং প্রকৃতি ধারণ করিয়া স্থূলে বিভিন্নাকারে পরিণত হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি ভেদ নির্ম্মায়ক পদার্থদিগের হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, সুতরাং গুণের প্রভেদে কার্য্যেরও প্রভেদ হইয়া যায়। এইরূপে পৃথিবী এক হইয়াও বহুবিধ প্রকৃতিবিশিষ্ট বিবিধ দেশে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কারণ একদেশ লবণাধিক্য বশতঃ মনুষ্যের বাস কষ্টকর হইয়া থাকে এবং আর এক দেশ লবণ লাঘবতার নিমিত্ত সুন্দর বাসোপযোগী বলিয়া কথিত হয়। একদেশ পদার্থবিশেষের আতিশয্য বিধায় প্রাণীনিবাসের অনুপযুক্ত বলিয়া উল্লিখিত এবং আর এক দেশ পদার্থ বিশেষের অস্তিত্ব প্রযুক্ত স্বাস্থ্যকর বলিয়া জ্ঞান করা যায়। যে দেশ যে পদার্থ প্রধান, সেই দেশ সেই পদার্থের ধর্ম্মে অভিহিত হয়, সুতরাং এ প্রকার দেশে বাস করিতে হইলে দেশের ধর্ম্ম অর্থাৎ ঐ স্থানের নির্ম্মায়ক পদার্থদিগের গুণাগুণ অগ্রে জ্ঞাত হওয়া বিধেয় এবং মনুষ্যস্বভাব তাহাই করিয়া থাকে। যখন কেহ কোন দেশ হইতে অন্য দেশে গমন করেন, তখন গন্তব্য দেশের অবস্থা অবগত হইবার প্রথা প্রচলিত আছে। দার্জ্জিলিং অথবা সিমলা গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে, ভাবী শৈত্য নিবারক ঊর্ণা বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিবার নিয়ম আছে এবং শীতপ্রধান দেশ হইতে উষ্ণপ্রধান দেশে আগমন-কালীন দেশানুরূপ ব্যবস্থা করিতে সকলেই বাধ্য হইয়া থাকেন।

যে দেশে যে পরিমাণে বাস করা হয়, সেই দেশের ধর্ম্মও অধিক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। যতই দেশের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হইয়া আইসে, সেই দেশের

গুণানুযায়ী স্ব স্ব অবস্থাও মিশ্রিত করিয়া উন্নতি সোপানে উত্থিত হইবার সুবিধা হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারপ্রসূত সুখ সমৃদ্ধি তাহার দৃষ্টান্ত।

যে দেশের ভূমি অতিশয় নিম্ন এবং লতাগুল্মাদি দ্বারা সূর্য্য রশ্মি অবরোধ হওয়া প্রযুক্ত সতত আর্দ্রাবস্থায় থাকিয়া যায়, সে স্থানে ম্যালেরিয়া * নামক ব্যাধির নিতান্ত সম্ভাবনা, কিন্তু এক্ষণে যে উপায়ে ঐ ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে, তাহাও স্থানিক কারণ বহির্গমনে নিরূপিত হইয়াছে। এইরূপে বিষাক্ত পদার্থদিগের শক্তি হানি করিয়া বিষঘ্ন দ্রব্যের আবিষ্কার হইয়াছে এবং অসৎ কার্য্যের ঔষধ স্বরূপ মাঙ্গলিক কার্য্যবিধিও স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে দেশের কার্য্যসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ইহারা স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনে প্রকাশিত হয়, অথবা আমাদিগের দ্বারা তাহাদের সাহায্য হইয়া থাকে।

যে সময়ে যে কারণে যে পদার্থ সংযোগ হইলে যে পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। এ কথা কাহার অন্যথা করিবার অধিকার নাই। দুগ্ধে অম্ল প্রয়োগ করিলে উহা বিকৃত হইয়া যায়। এই প্রকার পরিবর্ত্তন কেহই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ নহে; তৈলের সহিত চূণের জল আলোড়িত করিলে সাবানের ন্যায় পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাও কাহার বিপর্য্যয় করিবার শক্তি নাই। দুইটী পদার্থ ঘর্ষণ করিলে উত্তাপ উপস্থিত হয়, তাহার অন্যথা করা কাহার সাধ্য? পশ্মি বস্ত্র দ্বারা কাচ দণ্ড ঘর্ষিত হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লঘু পদার্থদিগকে আকর্ষণ করিবার শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা কোন্ ব্যক্তির শক্তিসম্ভূত? যে দেশ যে পদার্থ দ্বারা সংগঠিত বা যে পদার্থ যে যে পদার্থের সহিত যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করিবার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সেই পদার্থ একত্রিত হইলেই তাহাদের সংযোগের ফল তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি হইয়া যায়। মনুষ্যেরা স্ব স্ব দেশের এই প্রকার নানাবিধ ধর্ম্ম অবলোকন করিয়া তাঁহাদের দেহের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় পূর্ব্বক তদ্বিবরণাদিকে দেশীয় ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

দেশের গঠন সতত পরিবর্ত্তনশীল। গঠন পরিবর্ত্তনে দেশীয় ধর্ম্মেরও

* ম্যালেরিয়ার কারণ এইরূপে কথিত হয়। ইহার অন্যান্য কারণও আছে, কিন্তু বিশেষ সিদ্ধান্ত কি, তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই।

পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা। এইরূপ অবস্থাকে কাল কহে। যেমন শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম ইত্যাদি।

যখন যে সময় বা কাল উপস্থিত হয়, তখন তৎকালোচিত কার্য্যকে কাল ধর্ম্ম কহে। কালধর্ম্ম অতিক্রম করা অসাধ্য, তাহার কারণ এই যে, যদি কেহ বর্ষাকালে বৃষ্টি ধারায় সর্ব্বদা অভিষিক্ত হয়, তাহার স্বাস্থ্য অচিরাৎ ভঙ্গ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি শীতকালের পাষাণভেদী শিশিরবিন্দু নিপতনে আর্দ্র হইয়া থাকে, তাহার শারীরিক স্বধর্ম্মের বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়। সূর্য্যোদয়ে প্রাতঃ সময় বা কাল বলিয়া উক্ত হয়। এই সময়ে পৃথিবীর এক অবস্থা, যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিকই রসাল দেখায়। মনুষ্যগণ বিশ্রাম মন্দিরে সর্ব্বসন্তাপহারিণী রসবতী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়গত হইয়া সমস্ত দিবসের ব্যয়িত শরীর গঠনের পূর্ণতা লাভে সরস হয়। বৃক্ষ, লতা এবং দূর্ব্বাদলাদি নিশির শিশির সংযোগে সকলেই রসলাভ করিয়া থাকে। যতই নক্ষত্র চক্রের পরিবর্ত্তন হয়, ততই সময়ও পরিবর্ত্তন হইয়া সময়োচিত ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে থাকে। যাহারা সেই সাময়িক ধর্ম্মের বশবর্ত্তী, তাহারা অগত্যা তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে বাধ্য হইয়া পড়ে। যাহাদের অরুণোদয়ে সরস দেখাইয়াছে, তাহারা মধ্যাহ্ন কালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর করজালে আকৃষ্ট হইয়া নীরস হইয়া আইসে। আবার সায়ংকালে মধ্যাহ্ন সময়ের বিপরীত আকার ধারণ করায়, নীরস পদার্থেরা পূর্ব্ব প্রকৃতিস্থ হইবার সুরাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা কালের বা সময়ের অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য, তাহাদের পাত্র কহে।

পৃথিবীর যে স্থান যে প্রকারে নির্ম্মিত, সেই স্থানের ধর্ম্মানুসারে তথাকার ব্যক্তিরা আপনাপন দেহ রক্ষার্থ উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। শীত প্রধান দেশীয়গণ শরীরাবরণ এবং গৃহে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিতাবস্থায় রাখিয়া হিমের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং উষ্ণ প্রধান দেশের অধিবাসীরা শীতল বায়ু সেবন এবং শৈত্য পদার্থ ভোজনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া থাকে। মনুষ্যদিগকে যখন দেশীয় ধর্ম্মে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়, তখন তাঁহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ দেশকেই বলিতে হইবে। উষ্ণকালে শীতল দ্রব্য ভক্ষণের কারণ, দেশ এবং পাত্রের মধ্যে সমতা স্থাপন করা *।

---

* যে উত্তাপে শরীরের কার্য্য বিশৃঙ্খল না ঘটে অর্থাৎ মনুষ্য জীবিত থাকিতে পারে, সেই উত্তাপে দেশের অর্থাৎ বাহিরের উত্তাপ বায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে দৈহিক কার্য্যের সমতা

এক্ষণে এই সমতা স্থাপনের আদি কারণ দেশকেই কহিতে হইবে এবং পাত্রকে কার্য্য বলিলে অসঙ্গত হইবে না। ফলে দেশ, কাল এবং পাত্র বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলিলে, কারণ এবং কার্য্যে পরিণত হইয়া যায়। এই কারণ এবং কার্য্য লইয়াই সমাজ বন্ধন হইয়া থাকে। যে স্থানে যে প্রকার কারণ এবং কার্য্য, সে স্থানের সমাজ তদনুযায়ী হওয়া স্বভাবসিদ্ধ এবং স্বভাবের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে তাহাই সমাধা হইয়া থাকে। আমরা এই জন্য এই পৃথিবীর নানা দেশে নানা প্রকার জাতির নানা প্রকার রীতি নীতি, বিবিধ কার্য্য কলাপ দর্শন করিয়া থাকি। এই জন্য এক সমাজ আর এক সমাজের সমান নহে, এই জন্যই এক জাতির স্বভাব আর এক জাতির স্বভাবের সমান নহে এবং এই জন্যই এক ব্যক্তির প্রকৃতি দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রকৃতির সহিত সমান নহে।

আমরা যদ্যপি আপনাপন দেহকে দেশ বলিয়া উল্লেখ করি, তাহা হইলে সকল বিবাদ এককালে ভঞ্জন হইয়া যাইবে। যেমন নানা প্রকার পদার্থ-যোগে দেশ সংঘটিত হয়, সেই প্রকার বিবিধ পদার্থ সংযুক্ত হওয়ায় দেহ গঠিত হইয়াছে। এই পদার্থদিগের যখন যে প্রকার ক্রিয়া হয়, দেহেরও সেই প্রকার কার্য্য স্ব-ভাব সঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করা যায়। দেহের অন্যান্য পদার্থদিগের স্বভাব পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আবশ্যক নাই। আমরা জ্ঞানোপার্জ্জনের কারণ লইয়া কিঞ্চিৎ বিচার করিব।

মনুষ্যদেহে জ্ঞানের আধার মস্তিষ্ক, অথবা মস্তিষ্কের অবস্থাক্রমে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের গঠন এত জটিল এবং ইহার কোন্ অংশের কোন্ প্রকার কার্য্য, তাহা স্থূলে এক প্রকার স্থির হইয়াছে কিন্তু বিশেষ মীমাংসা হয় নাই। সকলে বুঝিয়াছেন যে, মনের স্থান মস্তিষ্ক এবং কেহ কেহ মস্তিষ্কের কার্য্যকেই মন কহেন। মন বলিয়া স্বতন্ত্র একটী পদার্থ কিছুই নাই *।

ভঙ্গ হইয়া যায় অথবা শীতলতা দ্বারা স্বাভাবিক উত্তাপ অপহৃত হইলেই উত্তাপ প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে। চিকিৎসকেরা যথায় বরফ খণ্ড প্রয়োগ এবং উষ্ণ জলের সেক প্রদান করিয়া থাকেন, তথায় সমতা রক্ষার অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে।

* মন লইয়া নানা মুনির নানামত প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন; কেহ বা মন অস্বীকার করিয়া জ্ঞানের প্রাধান্য করিয়া গিয়াছেন। মন স্বীকার করা যাউক বা নাই যাউক কিম্বা জ্ঞানের অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হউক বা নাই হউক, মস্তিষ্কের কার্য্যকে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

মস্তিষ্ক যখন যে অবস্থায় উপনীত হয়, তখন সেই অবস্থাসূচক কার্য্যকেই স্ব-ভাব কহে এবং এই স্বভাব অবগত হইয়া কার্য্য করিলে সেই ব্যক্তির স্বধর্ম্মাচরণ করা হয়। যেমন সদ্যপ্রসূত বালকের মস্তিষ্কের সহিত বয়োবৃদ্ধ-দিগের তুলনা হয় না। কারণ এক পক্ষে মস্তিষ্ক অপরিবর্দ্ধিত সুতরাং তাহার কার্য্যও সেই প্রকার অসম্পূর্ণ এবং আর এক পক্ষে পূর্ণ মস্তিষ্ক বিধায় তাহার কার্য্যও পূর্ণ হইয়া থাকে। অতএব যাহার যে অবস্থা, বা আভ্যন্তরিক কারণ যেরূপ হয়, সেই প্রকার কার্য্যই স্বভাবসিদ্ধ।

মনুষ্যেরা যখন এই প্রকার আত্মজ্ঞান লাভ করে, তখন তাহাদের তত্ত্ব-জ্ঞানের স্থূলভাব বলিয়া কথিত হয়। এই জ্ঞান হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া যাইলে উল্লিখিত ভাব তাহার প্রত্যক্ষ হইবে। তখন সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে যে, কারণ ব্যতীত কার্য্য কখন হয় না এবং সেই কারণ কাহার আয়ত্তাধীন নহে।

এই স্থূল আত্মজ্ঞান লাভ হইবার পর যখন সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তথায় কার্য্য বিভিন্নতা অথবা সমান কার্য্য দেখিতে পাইয়া এক কারণ কিম্বা বিভিন্ন কারণ আছে বলিয়াও বুঝিতে পারা যায় এবং কারণের প্রভেদও স্থির হইয়া থাকে। সেই বিভিন্ন প্রকার ভাব ধারণ করান কারণকে গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গুণ বোধ হইলে সেই জ্ঞানকে সূক্ষ্ম জ্ঞান কহে। যাহার এই সূক্ষ্ম জ্ঞান হয়, তাহারই মন সরল এবং কপটতাবিহীন হইয়া থাকে। ইহাই স্বধর্ম্মাচরণের চরমাবস্থা।

স্বধর্ম্মাচরণ যেরূপে বর্ণিত হইল, তাহাতে এই প্রতিপন্ন করা যাইতেছে যে, প্রত্যেক মনুষ্যের নিজ নিজ প্রকৃতি জ্ঞাত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করা বিধেয়।

যদ্যপি প্রত্যেকে এইরূপে আপনার প্রতি নিরীক্ষণ করেন, তাহা হইলে পরস্পর বিদ্বেষ ভাব অপনীত হইয়া যাইবে। কেহ কাহাকে ঘৃণা অথবা কেহ স্বয়ং উন্নত বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারিবেন না। আমাদের দেশে বসন্তকাল উদিত হইল বলিয়া হিমাচলবাসীদিগের দুরদৃষ্ট জ্ঞান করিব না। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দ্বারা বিভূষিত হইলেন বলিয়া নিম্নশ্রেণীর বালককে উপেক্ষা অথবা তাহার সহিত আত্মতুলনায় আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা কর্ত্তব্য নহে; সামাজিক উন্নত পদ লাভ করিয়া নিম্ন পদবীদিগকে তৃণবৎ জ্ঞান করা যারপরনাই অজ্ঞানের কার্য্য। সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের আভাস প্রাপ্ত

হইয়া যাঁহারা সকলকে অজ্ঞানী মনে করেন,তাঁহাদেরও তাহা অকর্ত্তব্য। কারণ যে স্থানে এই প্রকার দ্বেষভাব লক্ষিত হয়, সেই স্থানেই কার্য্য কারণ বোধে তথাকার কারণ জ্ঞান পরিশূন্যাভাব নিরূপিত হইবে। অতএব প্রত্যেক মনুষ্যের স্বধর্ম্ম অবগত হইয়া তাহাই ক্রমশঃ আচরণ করা ঈশ্বর লাভ করিবার একমাত্র কর্ত্তব্য।

স্বধর্ম্মাচরণ করিতে হইলে আমাদের আরও কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। মনের সহিত দেহের সম্বন্ধ আছে। যে প্রকার আহার এবং যে স্থানে বাস করা যায়, দেহের অবস্থা তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। দেহ পরিবর্ত্তিত হইলে মনও তদ্‌লক্ষণাক্রান্ত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত যে সাধক ঈশ্বর লাভ করিবেন, তিনি এই সকল বিষয়েও দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩৮। যাহার যাহাতে রুচি, সে তাহাই আহার করিতে পারে।

১৩৯। ঈশ্বর লাভের জন্য যাহার মন ধাবিত হয়, তাহার আহারের দিকে কখনই দৃষ্টি থাকে না।

১৪০। যে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে না চায়, তাহার হবিষ্যান্ন গোমাংস শূকরমাংসবৎ হইয়া যায়, আর যে শূকর গরু ভক্ষণ করিয়া হরিপাদপদ্ম লাভের নিমিত্ত ব্যাকুলিত হইয়া থাকে, তাহার সেই আহার হবিষ্যান্ন ভক্ষণের ন্যায় কার্য্য করে।

প্রভু রামকৃষ্ণের এই উপদেশের দ্বারা সাধকের স্বভাব বিকশিত হইতেছে, আমরা সর্ব্বপ্রথমে ভোজ্য পদার্থ লইয়া কিঞ্চিৎ বিচার করিয়া পরে প্রভুর ভাব ব্যক্ত করিব। ভোজ্য পদার্থ ব্যতীত দৈহিক পরিবর্দ্ধন ও বলাধান সাধন হইবার দ্বিতীয় উপায় আর নাই। সন্তান যখন মাতৃগর্ভে অবস্থিতি করে, তখন যদিও ইহাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন প্রকার দ্রব্য ভক্ষণ করিতে দেখা না যায়, কিন্তু মাতৃ-শোণিত তাহার শরীরের সর্ব্বত্রে যথাক্রমে সঞ্চালিত হইয়া অনুবীক্ষণাতীতাবস্থা হইতে পরিবর্ত্তিতাকারে পরিণত করিয়া দেয়।

আমাদের শরীরের অবস্থাক্রমে আহারের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বাল্যাবস্থা

হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিন স্বতন্ত্র প্রকার দ্রব্যাদি ভক্ষণ করা বিধেয় বলিলেও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিরুদ্ধ কথা হইবে না। কারণ শরীর যে স্থানে যে সময়ে যেরূপ থাকিবে, সেই সকল অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ভোজ্য দ্রব্য নির্ব্বাচিত হওয়াই কর্ত্তব্য, কিন্তু এ প্রকার নিয়মে সর্ব্ব সাধারণের শরীরোপযোগী আহারীয় পদার্থ নিরূপণ করিয়া দেওয়া যারপরনাই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এইজন্য আমরা আহারের বৈজ্ঞানিক কারণ এবং তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদর্শন করিয়াই এ ক্ষেত্রে ক্ষান্ত হইব।

যে সকল পদার্থ দ্বারা দেহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে এবং যাহা ব্যতীত ইহার কার্য্য রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহাই ভোজন করা প্রয়োজন।

ভোজ্য পদার্থ নির্ব্বাচন করিতে হইলে দেহের উপাদান কারণ স্থির করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যে যে পদার্থের দ্বারা দেহ সংগঠিত হয়, সেই সেই পদার্থ ভক্ষণ করা আবশ্যক।

দেহ বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিলে, অক্সিজেন (oxygen) হাইড্রোজেন (hydrogen) নাইট্রোজেন (nitrogen) অঙ্গার (carbon) গন্ধক (sulphur) ফস্‌ফরাস (phosphorus) সিলিকন (silicon) ক্লোরিন (chlorine) ফ্লুরিন (fluorine) পোটাসিয়ম (potassium) সোডিয়ম (sodium) ক্যাল্‌সিয়ম (calcium) ম্যাগনিসিয়াম (magnesium) এবং লৌহ (iron) প্রভৃতি বিবিধ রূঢ় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রূঢ় পদার্থ যথানিয়মে পরস্পর পরিমাণানুসারে সংযুক্ত হইয়া শরীরের যাবতীয় গঠন, যথা, অস্থি, মাংস, মেদ, মজ্জা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

পদার্থবিজ্ঞান দ্বারা আহারীয় পদার্থ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা নাইট্রোজিনাস্ (Nitrogenous) অর্থাৎ নাইট্রোজেন (ইহা একটী রূঢ় পদার্থ, ভূবায়ুতে শতকরা ৭৯ ভাগে অবস্থিতি করে) ঘটিত এবং ননূনাইট্রোজিনাস্ (Non-Nitrogenous) অর্থাৎ নাইট্রোজেন বিবর্জ্জিত পদার্থ সকল। মাংসাদিকেই নাইট্রোজিনাস্ কহে; তন্মধ্যে গো, মেষ ও ছাগাদি শ্রেষ্ঠ। পক্ষী মাংস অপেক্ষা ইহাদের অণ্ড বিশেষ বলকারক। মৎস্যাদির মধ্যে গল্‌দা চিঙ্গড়ী এবং শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট মৎস্যাদিতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, গো মাংসে শতকরা ১৯, মেষে ১৮, শূকরে ১৬, অণ্ডে ১৪, (ইহার শ্বেতাংশে ২০ এবং হরিদ্রাংশে ১৬) ভাগ, নাইট্রোজেন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দুগ্ধাদিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দুগ্ধের মধ্যে গো, মহিষ, ছাগ, গর্দ্দভ এবং মাতৃস্তন্য দুগ্ধই প্রচলিত। গো মহিষে শতকরা ৪, মাতৃদুগ্ধে ২, ছাগে ৪, মেষে ৮ এবং গর্দ্দভে ২ ভাগ নাইট্রোজেন আছে।

উদ্ভিদ্ রাজ্যের কতকগুলি দ্রব্য নাইট্রোজেন সম্বন্ধে মাংসাদির সমতুল্য অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াও উল্লিখিত হইয়া থাকে। গম, ছোলা, মটর, যব, চাউল ইত্যাদি। গমে ১৮, ছোলায় ১৪, যবে ১৩ এবং চাউলে ৮ ভাগ নাইট্রোজেন প্রাপ্ত হওয়া যায়। *

নন্ নাইট্রোজিনাস্ পদার্থ বলিলে, ঘৃত, তৈল, শর্করা, ফল, মূল প্রভৃতি দ্রব্যাদিকে বুঝাইয়া থাকে। নাইট্রোজেন ঘটিত আহার দ্বারা মাংশপেশী, শোণিত ও জিলাটিন (সিরিসবৎ পদার্থ) উৎপাদিত হয় এবং নাইট্রোজেন বিবর্জ্জিত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শারীরিক উত্তাপ সংরক্ষিত হয় ও মেদ জন্মিয়া থাকে।

পার্থিব পদার্থ, প্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌গণের সহিত রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া যৌগিকাবস্থায় অবস্থিতি করে। সুতরাং তাহাদের স্বতন্ত্র বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ফলে আমাদের যে প্রকার শরীরের গঠন, তাহাতে এই উভয় শ্রেণী হইতে দেহের অবস্থানুসারে ভক্ষ্য দ্রব্য নিরূপণ করিয়া লওয়া যুক্তিসিদ্ধ।

এই নিমিত্ত দেহোপযোগী ভোজ্য পদার্থ সকল যথা নিয়মে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে উদ্ভিদ্, প্রাণী এবং পার্থিব পদার্থ হইতে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। এই নিয়মে আমাদের শাস্ত্রমতে ইহা তিন শ্রেণীতে বিভাজিত হইয়াছে। যথা, তামসিক, রাজসিক এবং সাত্বিক।

তমোপ্রধান ব্যক্তিদিগের জন্য মৎস্য, মাংস, অণ্ড, ঘৃত, দুগ্ধ, ফল, মূল, ময়দা, ছোলা প্রভৃতি আহারীয় পদার্থ বলিয়া যাহা কিছু গণনা করা যায়, তাহাই তাঁহাদের ভোজনের বস্তু। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা অতিশয় বলবান্। বলিষ্ঠ যাহারা তাঁহাদের কার্য্যও দুর্ব্বল বা সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা গুরুতর। সুতরাং কঠিন কার্য্যে যে পরিমাণে বল * ক্ষয় হয়, সেই পরিমাণে বল

---

* যে কার্য্যে যে পরিমাণে বল প্রয়োগ করা যায়, সেই কার্য্য সেই পরিমাণে সম্পাদিত হইয়া থাকে। যদ্যপি একমণ দ্রব্য উত্তোলন করিতে হয়, তাহা হইলে এক মণ বলের প্রয়োজন কিন্তু বালককে সেই কার্য্য সমাধা করিতে নিযুক্ত করিলে সে উহাকে উত্তোলন করা দূরে থাকুক, স্থানচ্যুত করিতেও অসমর্থ হইবে। এ স্থানে বালকের বলের অভাব জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে; যেমন বাষ্পীয় কলের পঞ্চাশ ঘোটকের বল একশত ঘোটকের বল কহা

উপার্জ্জন করাও আবশ্যক। তাহা না হইলে ভবিষ্যৎ কার্য্যের বিশৃঙ্খল সংঘটনার * সম্ভাবনা।

রজোগুণী ব্যক্তিরা তমোগুণীদিগের ন্যায় কার্য্য পরায়ণ নহেন, সুতরাং তাঁহাদের এতাদৃশ বলক্ষয় হয় না এবং আহারের জন্য যথেচ্ছাচারী হইতে হয় না কিন্তু তথায় আড়ম্বরের বিশেষ প্রাবল্য হয়। তাঁহারা মৎস্য মাংস প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্যই ভক্ষণ করিয়া থাকেন কিন্তু মাংসাদি না হইলে তমোগুণীদিগের ন্যায় যে দিন যাপন হয় না, এমন নহে।

সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা স্বভাবতঃই মানসিক কার্য্যাপেক্ষা কায়িক শ্রম স্বল্প পরিমাণে করিয়া থাকেন। কারণ ঈশ্বর চিন্তাদিতে তাঁহাদের অধিক সময় অতিবাহিত হয়। এই জন্য এই শ্রেণীর আহারেও অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা ন্যূনতা হইয়া থাকে।

যায়, অর্থাৎ একটী ঘোটক এক ঘণ্টায় যে পরিমাণে কার্য্য করিতে পারে, সেই সময়ে তাহা হইতে কার্য্যের যত গুণ বৃদ্ধি হইবে, তাহাকে তত ঘোটকের শক্তি বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, বল দুই প্রকার, পোটেন্স্যাল (Potential) এবং একচুয়াল (actual); যে শক্তি নিহিতাবস্থায় থাকে, তাহাকে পোটেন্স্যাল এবং তাহা প্রকাশিত হইলে একচুয়াল কহে। যেমন আমার শরীরে একমণ শক্তি আছে কিন্তু যতক্ষণ তাহার কার্য্য হয় নাই, ততক্ষণ তাহাকে পোটেন্স্যাল এবং দ্রব্য উত্তোলন করিবামাত্র সেই শক্তি প্রকাশ হওয়ায় তাহাকে একচুয়াল কহা যাইবে।

* এই স্থানে মত ভেদ আছে। কেহ বলেন যে কার্য্যকালে যে, বল ব্যয়িত হয়, তাহা বাস্তবিক শরীর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যায় না। যেমন একটী প্রদীপ হইতে অসংখ্যক প্রদীপ জ্বালিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে কি প্রথম প্রদীপ নিস্তেজ হইয়া থাকে? এ মর্ম্মে পণ্ডিতেরা নানাবিধ পরীক্ষাও করিয়াছেন এবং পরীক্ষার ফল দ্বারা তাঁহাদের মতও সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, কার্য্যকালীন শরীর গঠনের অতিরিক্ত ক্ষয় হয় না। আমাদের বিবেচনায় গঠনের ক্ষয় হউক বা নাই হউক, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? কিন্তু বলক্ষয় হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এই বলক্ষয়ের জন্য আহারের প্রয়োজন। তাহা না হইলে সকলেই আহারাভাবে পূর্ণ বলীয়ান হইয়া থাকিতেন। যদিও প্রদীপের দৃষ্টান্তে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শক্তিক্ষয়ের কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু তথায় যে পর্য্যন্ত দাহ্য বস্তু বর্ত্তমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহার বলক্ষয় হইবে না। যে মুহূর্ত্তে তৈলাদি নিঃশেষিত হইবে, প্রদীপও আপনি তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। তখন তাহাতে পুনরায় তৈল প্রদান না করিলে আর তাহা হইতে প্রদীপ জ্বালিবার সম্ভাবনা থাকিবে না ও তাহা আপনি জ্বলিবে না। এই স্থানে দাহ্য বস্তুতে বলের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতেছে।

উল্লিখিত হইল যে, তমো এবং রজোগুণী ব্যক্তিরা কায়িক এবং মানসিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এই সকল কার্য্য নানাপ্রকার। কায়িক কার্য্যে মাংসপেশী প্রভৃতি গণনাদি ও মানসিক কার্য্যে মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তন হেতু দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয় এবং তাহা অপনোদন করিবার জন্য জান্তব* এবং উদ্ভিদ পদার্থ ভক্ষণ করা অত্যাবশ্যক।

সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা সাধনে প্রবৃত্ত হইবার কাল হইতে, যত উত্তরোত্তর মানসিক উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকেন, ততই তাঁহাদের কায়িক পরিশ্রম লাঘব হইয়া আইসে, সুতরাং দৈহিক বলক্ষয় হয় না। প্রথমাবস্থায় রুটী, অন্ন, দুগ্ধ ও ফল মূলাদি ভক্ষণ করিলে যথেষ্ট হইবে। তদনন্তর তাঁহাদের যে প্রকার

---

* যাঁহারা অহিংসা পরমোধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া জীব হিংসায় বিরত হইয়া থাকেন, তাঁহারা উদ্ভিদ ও দুগ্ধাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আদেশ করেন। ইহাকে আমাদের সাত্ত্বিক আহার কহে। বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্বারা এই প্রসঙ্গের অতি সুন্দর মীমাংসা করা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে মাংসাদির বলকারক শক্তির সহিত গম ছোলা প্রভৃতি তুলনা করিয়া ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। কেন যে ইহাদের শ্রেষ্ঠ বলা হইল, তাহার কারণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। মনুষ্যদেহে উদ্ভিদ পদার্থ এবং দুগ্ধাদি যে প্রকার কার্য্য করিতে পারে, মাংসাদি দ্বারা সে প্রকার সম্ভবে না। কারণ পরীক্ষায় দৃষ্ট হইয়াছে যে, মাংস ভক্ষণ করিলে ইহার নাইট্রোজেন বিকৃত হইয়া (urea) নামক পদার্থবিশেষে পরিণত হয় এবং মূত্রের সহিত শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। দ্বিতীয় কথা এই, যে সকল জীবজন্তু ভক্ষণ করা যায়, তন্মধ্যে গো এবং মেষের মাংসই শ্রেষ্ঠ কিন্তু ইহারা উদ্ভিদ পদার্থ ভক্ষণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অনেকে অবগত আছেন যে, ভেড়ার মাংস বলকারক করিবার নিমিত্ত তাহাদের আহারের সহিত ছোলা মিশ্রিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।

মাংসাশীরা, ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুদিগের দৃষ্টান্ত প্রদান করিতে পারেন এবং তাহাদের দন্তের সহিত মনুষ্যদিগের দুই চারিটী দন্তের সাদৃশ্য দেখাইতে পারেন কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ স্থূল দৃষ্টান্ত মাত্র। কারণ দন্তের দ্বারা আহারীয় পদার্থেরা কেবল চর্ব্বিত হয়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারে না।

কোন পদার্থে কোন বিশেষ পদার্থ থাকিলেই যে তাহা ভক্ষণীয় বলিয়া কথিত হইবে, তাহা নহে। রাসায়নিক পরীক্ষায়, চিনিতে যে সকল রূঢ় পদার্থ, অর্থাৎ অঙ্গার হাইড্রোজেন অক্‌সিজেন প্রাপ্ত হওয়া যায়; কাগজেও তাহা আছে। তবে চিনির পরিবর্ত্তে কাগজ ভক্ষণ করা হউক? কিম্বা বিশুদ্ধ কয়লা, হাইড্রোজেন বাষ্প ভক্ষণ করিবার বিধান প্রদান করিলে বিজ্ঞানশাস্ত্র বিরুদ্ধ হইবে না। অথবা নাইট্রোজেনে ঘটিত দ্রব্যের স্থানে নাইট্রোজেন বাষ্প ব্যবহার করিলেও হইতে পারে? কিন্তু তাহা কি জন্য দেহের অভ্যন্তরে কার্য্যকারী হইতে পারে না? এই জন্য দেহের প্রয়োজনমত আহার প্রদানকরা বিধি বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়।

দৈহিক অবস্থা উপস্থিত হইবে, সেই পরিমাণে উপরোক্ত আহারীয় পদার্থও আপনি হ্রাস হইয়া আসিবে। যেমন, যে পরিমাণে শারীরিক জলীয়াংশের লাঘবতা জন্মায়, সেই পরিমাণে তৃষ্ণার উদ্রেক হয়। আহার সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

আহারীয় পদার্থদিগকে যে প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক অবস্থায় নাইট্রোজিনাস এবং ননুনাইট্রোজিনাস পদার্থ মিশ্রিত রহিয়াছে। তামসিক আহারে ইহাদের পরিমাণ অধিক, রাজসিকে তাহা হইতে ন্যূন এবং সাত্ত্বিকে সর্ব্বাপেক্ষা লঘু।

আহারীয় পদার্থ যে প্রকারে কথিত হইল, তাহাতে উদ্ভিদ্ রাজ্য হইতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করাই অতি কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। কারণ ইহাদের মধ্যে শরীর গঠন ও তাহা রক্ষা হইবার যে সকল পদার্থের আবশ্যক, তৎসমুদয় প্রয়োজনীয় পরিমাণেই আছে। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, গো কিম্বা মেষ মাংসে, যে প্রকার বলকারক পদার্থ আছে, গম ও ছোলাতে সেই প্রকার বলকারক পদার্থও আছে। মাংসাদি ভক্ষণে তাহারা বিকৃত হইয়া অন্য প্রকার আকারে শরীর হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায় কিন্তু গম ও ছোলার দ্বারা তাহা হয় না। অতএব বলকারক শক্তিসম্বন্ধে মাংসাদি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে এবং ইহা দ্বারা মানসিক বৃত্তি যে প্রকার পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাকে অস্বাভাবিক * বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এইজন্য সাধকদিগের মাংসাদি ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, আহার ব্যবস্থা করিতে হইলে কেবল ইহার

---

* দয়া এবং মমতা মনোবৃত্তির অন্তর্গত। মনুষ্যদিগের মানসিক শক্তি যতই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, অন্যান্য বৃত্তির সহিত ততই ইহারাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন সর্ব্বজীবে তাঁহাদের দয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাঁহাদের মনে দয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা কখনই স্বার্থপর হইতে পারেন না। কারণ আপনার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে অপরের উপকার কিরূপে সাধিত হইবে? আমি যদ্যপি না আহার করি, তাহা হইলে আমার ভক্ষ্যদ্রব্য আর একজন প্রাপ্ত হইতে পারে; অথবা আপনার অর্থের প্রতি আত্মসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাখিলে তাহা কখন অন্যকে প্রদান করা যায় না, কিম্বা সুযোগ পাইলেই আর একজনের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনার চিত্তচরিতার্থ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না।

যে স্থানে জীবহিংসা হইয়া থাকে, সেইস্থানে স্বার্থপরতার দোর্দ্দণ্ড আধিপত্য সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। আপন সুখে অন্ধ হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা পরিশূন্য হওয়া যারপরনাই মোহের কার্য্য। এই মোহভাব যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, অর্থাৎ তামসিক দশা যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, মনের অবস্থাও সেই পরিমাণে বিকৃত হইয়া আইসে।

গুণাগুণ বিচার করিয়া ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ যিনি আহার করিবেন, তাঁহার শারীরিক প্রয়োজন দেখিতে হইবে। এই প্রয়োজন দেশ এবং কালের অন্তর্গত, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আহার করিয়া থাকেন। এইরূপ পরিবর্ত্তন যে বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে বুঝিতে অপারক, তাহা নহে। সকলেই আপন শরীরের অবস্থা ন্যূনাধিক বুঝিতে পারেন। কি ভক্ষণ করিলে শরীর এবং মন সুস্থ থাকে, তাহা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিয়া দিতে হয় না কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহা জ্ঞাত হইয়াও আবশ্যকমতে পরিচালিত হইতে অনেকেই অশক্ত।

আমাদের দেশে যে প্রকার জল বায়ু এবং দেহ সম্বন্ধীয় যে প্রকার অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে লঘু আহার ব্যতীত জীবন রক্ষার উপায় নাই। পূর্ব্বে যাঁহারা দেশের প্রচলিত আহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন,তাঁহারা দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাঁহারা অন্নাদি ভক্ষণ করিয়া প্রায় শতবর্ষ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বক্ষে পরিভ্রমণ করিতেন কিন্তু এক্ষণে গো, মেষ শূকর পক্ষী ও নানাবিধ বিজাতীয় আহার দ্বারা পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত কয়জন জীবিত থাকেন? আমরা জানি যাঁহারা এই প্রকার বিজাতীয় অনুকরণ করেন,তাঁহাদের মধ্যেও শতকরা ৪৯ জন নানাপ্রকার ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন।

দেশীয় আহারের ব্যবস্থামতে যে উপকার হয়, তাহা অদ্যাপি আমাদের স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে। পুরুষেরা বিকৃত হইয়া অনেক স্থলে আপনাদিগের পরিবারও বিকৃত করিয়াছেন এবং তথায় বিকৃত ফলও ফলিয়াছে, কিন্তু যে স্থানে তাহা প্রবেশ করিতে পায় নাই, সে স্থানে অতি সুন্দর ভাব অদ্যাপি আছে। যদ্যপি প্রত্যেক পরিবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বৃদ্ধাদিগকেই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কে না জানেন যে, হিন্দুপরিবারের বিধবা স্ত্রীলোকেরা (বর্ত্তমান সময়ের নহে) অতি অল্পই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা এক সন্ধ্যা তণ্ডুল ও উদ্ভিদাদি ভক্ষণ করিয়া প্রায় প্রত্যেক্ মাসে ন্যূন সংখ্যা অষ্টাহ অনাহারে থাকিয়া যে প্রকার শারীরিক স্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ করেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

বিধবা স্ত্রীলোকেরা যে প্রকার ভোজন করিয়া থাকেন, তাহাকেই আমাদের দেশে ,সাত্বিক আহার কহে। ঈশ্বর লাভাকাঙ্ক্ষীদিগের এই আহার চিরপ্রসিদ্ধ।

কিন্তু এক্ষণে আমাদের শরীরের অবস্থা অতি দুর্ব্বল। কারণ এই সুদীর্ঘ কাল বিজাতীয় রাজশাসনে একে নবীন মনপাদপ পরাধীন অচলাবরণে স্বাধীনতা সূর্য্যরশ্মির প্রবেশ পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় বিবর্ণ, বিশীর্ণ, এবং নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহা হইতে সাময়িক ফুল ফল প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা কোথায়? তাহাতে আবার নানাজাতীয় সুকঠিন চঞ্চুবিশিষ্ট পক্ষীরা আশ্রয় লইয়া চঞ্চ্বাঘাতের মনোবৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা ও পত্রাদি সমুদয় শতধা করিয়া ফেলিয়াছে, অর্থাৎ আমরা পরাধীন জাতি সুতরাং আমাদের মনোবৃত্তি-সমূহ সঙ্কাপিত হইয়া রহিয়াছে। মনের স্ফূর্ত্তি নাই, ইহা সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত। মন যদ্যপি বিস্তৃত হইতে না পারে, তাহা হইলে কালে শরীরও দুর্ব্বল হইয়া আইসে।

দ্বিতীয় কারণ আবশ্যকীয় আহারের অভাব। যাঁহার যে পরিমাণ আহার হইলে শরীর স্বাভাবিকাবস্থা লাভ করিতে পারে, তাহার তাহা প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। সাধারণ লোকে আজকাল এক প্রকার অনাহারেই থাকেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে প্রকার উপার্জ্জনের প্রণালী হইয়াছে এবং তদ্‌সঙ্গে যেরূপ ব্যয়ের প্রবল বায়ু বহিতেছে, তাহাতে সপরিবারের স্বচ্ছন্দে দুই সন্ধ্যা পূর্ণাহার হওয়াই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং শরীরে বলাধান কিরূপে হইবে?

তৃতীয় কারণ—রিপুর প্রাদুর্ভাব। যতই অভাব হইতেছে, ততই দ্বেষ, হিংসা, লোভ প্রভৃতির আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছে। রিপুর পরাক্রমে কাহার সুফল লাভ হয়?

যেমন পীড়া হইলে রোগীর স্বাভাবিক পরিপাক শক্তি বিলুপ্ত হয় বলিয়া আহারের পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তখন তাহার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া কোন কার্য্যই হইতে পারে না, সেই প্রকার দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের জন্যই লঘু আহার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যখন আমাদের সাধারণ ব্যক্তি এই দুর্ব্বল শ্রেণীর অন্তর্গত, তখন তাঁহাদের সেই প্রকার আহার নিরূপিত না হইলে বিপরীত কার্য্য হইয়া যাইবে।

আতপ তণ্ডুলাদি সেই জন্য সাধারণ সাধকদিগের ব্যবস্থা হইতে পারে না। আতপ তণ্ডুলেও বলকারক পদার্থ আছে, তাহা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের দ্বারা জীর্ণ হওয়া সুকঠিন। এইজন্য অনেক সময়ে ইহা দ্বারা উদরাময় জন্মিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকেরা যখন বিধবা হন,তখন তাঁহারা আতপতণ্ডুল পরিপাক করিতে পারেন, কিন্তু সধবাকালীন সন্তানাদি প্রসবও অন্যান্য কারণে শরীরের দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহাতে অশক্ত হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত যে সাধকেরা সংসারে অবস্থিতি করিয়া সাংসারিক ও পারিবারিক কার্য্য কলাপ রক্ষা করিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের সেইজন্য আতপতণ্ডুলাদি ভক্ষণ করা অবিধি। এ অবস্থায় যেমন শক্তি, তেমনি আহার, তেমনি কার্য্য, তেমনি উপাসনা এবং তেমনি বস্তু লাভ হয়। সাধক যখন বাস্তবিক ঈশ্বর লাভের জন্য মনোনিবেশ করেন, তখন তাঁহার সাংসারিক ও পারিবারিক কার্য্যে তাদৃশ অবস্থা থাকে না, বা থাকিতে পারে না; সুতরাং শরীরে কথঞ্চিৎ বলাধান হয়। তখন কিঞ্চিৎ বলকারক আহার ভক্ষণ করিয়াও জীর্ণ করিতে পারেন।

সাধক যে পর্য্যন্ত সিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত কার্য্য থাকে। কার্য্য থাকিলেই বলক্ষয় হয়, সুতরাং আহারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সিদ্ধ হইলে শারীরিক কার্য্যের হ্রাস হয় এবং আহারেও তাদৃশ প্রয়োজন থাকে না। এইজন্য সিদ্ধপুরুষেরা ফল মূল বা গলিত পত্রাদি ভক্ষণ করিয়া অক্লেশে দিনযাপন করিতে পারেন।

যখন নিত্যানন্দদেব ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন তিনি সাধক-প্রবর্ত্তদের বলিয়াছিলেন যে, "মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী স্ত্রীর কোল, বোল হরিবোল," ইহার অর্থ কি? দেশ কাল পাত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহার ভুল নাই। তিনি নিজে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার উপদেশ সাংসারিক ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে।

নিত্যানন্দের এই কথা দ্বারা জীবের মানসিক এবং শারীরিক ভাব বুঝাইতেছে। সাংসারীদিগকে সংসার ছাড়িতে বলিলে, তাঁহারা শমনভবন জ্ঞান করিয়া থাকেন। স্ত্রী পুত্র ঈশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ বোধ না হইলে তাহাদের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে আশঙ্কিত হইবেন কেন? এমন অবস্থায় বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করিতে বলিলে, মনের মস্তকে অশনি নিপতন হইয়া তাহাকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিবে। সুচতুর নিতাইচাঁদ সেইজন্য কৌশল করিয়া মনের প্রকৃতি রক্ষা করিবার জন্য সংসারে অবস্থিতি করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। "মাগুর মাছের ঝোল" উল্লেখ করিয়া লঘু আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনেকে অবগত আছেন যে, নিরামিষ ভক্ষণে উদরাময় হয়, কারণ দুর্ব্বল পাকাশয়ে বলকারক দ্রব্য জীর্ণ হইতে পারে না। এ স্থানে

জিজ্ঞাস্য হইবে যে, উদ্ভিদ পদার্থের মধ্যে এমন কি কোন দ্রব্য নাই, যাহা মৎস্য ব্যতীত ব্যবহৃত হইতে পারে? তাহার অভাব নাই সত্য কিন্তু উদ্ভিদ হইতে লঘুপাক এবং বলকারক দ্রব্য প্রস্তুত হওয়া সুকঠিন, তাহা আয়াসসাধ্য ব্যাপার। সামাণতঃ তণ্ডুলে কি সুন্দররূপে শক্তি হীন করা হইয়াছে। আতপ তণ্ডুলে যে পরিমাণে বীর্য্যবান পদার্থ থাকে, সিদ্ধ তণ্ডুলে তাহার একচতুর্থাংশও নাই। ইহা দীর্ঘকাল রাখিয়া ব্যবহার করিলে তবে উদরে সহ্য হইয়া থাকে। কথিত হইয়াছে যে, দুগ্ধে শতকরা ৪ ভাগ নাইট্রোজেন আছে, ইহাও অনেক স্থলে ব্যবহার করিবার উপায় নাই। যে স্থানে ইহা দ্বারা উদরাময় হয়, সেই স্থলে মৎস্যের ঝোল ব্যবস্থা করিলে তাহা জীর্ণ হইয়া থাকে। এই কারণে অনুমান করা যায় যে, ইহাদের বলকারক শক্তি অধিক নহে।

সাধকদিগের আহারের বিধি নিরূপণ করিতে হইলে দৃষ্ট হয় যে, যাহা ভক্ষণ করিলে মনের বিকার এবং উদরের পীড়া উপস্থিত না হয়, তাহাই ভোজন করা কর্ত্তব্য। মন যদ্যপি বিকৃত হয়, তাহা হইলে সমস্ত স্নায়ুবৃন্দ বিশেষতঃ পাকাশয় প্রদেশস্থ স্নায়ু উগ্রভাবাপন্ন হইয়া উদরাময় উৎপাদন করিবে, এবং ভুক্ত পদার্থ পাকাশয়ে অজীর্ণাবস্থায় থাকিলে তদ্দ্বারা মন চঞ্চল হইয়া আসিবে। মনের স্থৈর্য্যভাব সংরক্ষা করা সাধকের প্রধান উদ্দেশ্য, এ কথাটী স্মরণ রাখিয়া সকলের কার্য্য করা আবশ্যক।

যদ্যপি এই নিয়মে পরিচালিত হওয়া যায়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি যে দেশে যেরূপ আহার দ্বারা দেহ মন স্বভাবে রাখিয়া ঈশ্বরচিন্তায় মনঃসংযম করিতে পারিবেন, তাহাই তাঁহার সম্বন্ধে বিধি।

নিত্যানন্দদেব যে সময়ে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখনকার লোকেরা যে প্রকার স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন, তিনি তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাস্তবিক কথা এই যে, রজস্তমো ভাবে দিন যাপন করিলে যখন ঈশ্বর লাভ একেবারেই হইতে পারে না, তিনি তন্নিমিত্ত রজো গুণের লঘুভাবে থাকিবার বিধি প্রচলিত করিয়াছিলেন। কোন মতে ঈশ্বরের নাম যাহাতে লোকে অবলম্বন করিতে পারে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি জানিতেন যে, একবার নাম রস শরীরে প্রবেশ করিলে নামের গুণে যাহা করিতে হয়, তাহা আপনি হইয়া যাইবে। প্রভু রামকৃষ্ণদেব কহিয়াছিলেন যে, নিত্যানন্দ যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দুইটী ভাব ছিল। বাহিরের ভাব তাঁহার কথায়ই প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু আভ্যন্তরিক

ভাব এই, জীব যখন হরি নাম করিতে করিতে নয়ন ধারায় আর্দ্র হইয়া ভাবাবেশে ভূতলে গড়াগড়ি দিবে,তখনই তাহার জীবন সার্থক হইবে। মাগুর মাছের ঝোল অর্থে চক্ষের জল এবং যুবতী স্ত্রীর কোল অর্থে পৃথিবী বুঝাইয়া থাকে।

রামকৃষ্ণ প্রভু বর্ত্তমান কালের অবস্থা দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট আহারের ব্যবস্থা করেন নাই। কারণ এই বিকৃত সময়ে তিনি যদ্যপি কোন প্রকার বিধি প্রচলিত করিতেন, তাহা হইলে কেহই তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত না। একব্যক্তি কুক্কুট ভক্ষণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে সশঙ্কিতচিত্তযুক্ত দেখিয়া কহিয়াছিলেন, "তুমি উদরাময় রোগে ক্লেশ পাইতেছ, শুনিয়াছি কুক্কুটের ঝোল ভক্ষণ করিলে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।" সেই ব্যক্তি আর নিজ ভাব সম্বরণ করিতে পারিলেন না, অমনি রোদন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্রভু! এত দয়া না হইলে আমরা আপনার সম্মুখে কি আসিতে পারিতাম? আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহা অদ্য ভক্ষণ করিয়াছি।"

১৪১। যেমন ভিজে কাঠ অগ্নির সংযোগে ক্রমে রস হীন হয়, তেমনই যে কেহ ঈশ্বরকে ডাকে, তাহার কামিনী কাঞ্চন রস আপনি শুকাইয়া আইসে। রস শুকাইয়া পরে ঈশ্বর চিন্তা করিবার জন্য যে অভিপ্রায় করে, তাহার তাহা কখনই হইবার নহে, কারণ সময় কোথায়?

১৪২। যেমন ম্যালেরিয়া রোগীর জ্বর পরিপাক পাই-বার পূর্ব্বে কুইনাইন দিয়া রোগের ক্রম নিবারণ করা যায়, তা না করিলে রোগী ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তখন উভয় সঙ্কটে পড়িতে হয়। সেইরূপ হরিনাম রূপ কুইনাইন কামিনীকাঞ্চন রূপ ম্যালেরিয়াগ্রস্থ রোগীর পক্ষে উহা রোগ সত্ত্বেই ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

১৪৩। অমৃতকুণ্ডে যে কোন প্রকারেই হউক, পড়িতে পারিলেই অমর হওয়া যায়।

১৪৪। যেমন লৌহ পরেশমণি স্পর্শে সোনা হইবেই হইবে।

১৪৫। যখন কোথাও আগুণ লাগে, তখন জীবন্ত বড় গাছগুলি পর্য্যন্ত পুড়িয়া যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের শক্তিতে সকলই সম্ভবে।

এই নিমিত্তই প্রভু বর্ত্তমান কালে আহারের ব্যবস্থা করেন নাই। তিনি বলিতেন, ঈশ্বরের নাম লইলে নামের গুণে যাহা হইবার আপনি হইবে। আমরা দেখিয়াছি, যে সকল ব্যক্তি অখাদ্য ভক্ষণ করিত এবং কুস্থানে গতি বিধি করিত, সে সকল ব্যক্তি আপন ইচ্ছায় কু-অভ্যাস-সমূহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

প্রভু কখন এমন কথা কহিতেন না যে, যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই চির-কাল করিবে। তিনি বলিতেন,—

১৪৬। যদ্যপি কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা কখন বাস্তবিক আহার করিতে হয় এবং কখন বিচার করিয়া দেখিতে হয়।

এই উপদেশের দৃষ্টান্তের স্বরূপ আমরা প্রভুর একটী নিজ ঘটনা এই স্থানে প্রদান করিলাম। একদা প্রভু বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল যে, লোকে গোমাংস কিরূপে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ভাবিতে ভাবিতে গোমাংস ভক্ষণ করিবার জন্য তাঁহার অতিশয় স্পৃহা জন্মিল। তিনি নানাবিধ চিন্তার পর গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখিলেন যে, একটী মৃত বাছুর পড়িয়া আছে,তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক মনে মনে আপনাকে কুকুর রূপে পরিণত করিয়া ঐ মৃত বাছুরটী ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে মনে মনে শান্তি আসিল, গোমাংসের দিকে আর মন ধাবিত হইল না। তিনি বলিয়াছেন;—

১৪৭। সকল সাধ কখন কাহার পূর্ণ হইবার উপায় নাই, কিন্তু সাধ থাকিলে ঈশ্বর লাভ হইবারও নহে। এই

জন্য সাধ মিটাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বিচারে উহা মিটাইয়া লইলেও সঙ্কল্প দূর হয়।

১৪৮। যে আহার দ্বারা মন চঞ্চল না হয়, সেই আহারই বিধি।

স্থানের ধর্ম্মানুসারে মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। যেমন, দুর্গন্ধময় স্থানে বাস করিলে মন সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং ফুলবাগানে মনের প্রফুল্লতা জন্মে। যেমন দেবালয়ে বসিয়া থাকিলে মনে ঈশ্বরের ভাব উদয় হয়, সেইরূপ সংসারের ভিতরে কেবল সাংসারিক ভাবই আসিয়া থাকে।

যেমন ভোজ্য পদার্থ দ্বারা দেহের বলাধান হইয়া মনের সমতা রক্ষা করে, বাসস্থান সম্বন্ধেও তদ্রূপ। যে স্থানে বাস করা যায়, সেই স্থানের ধর্ম্মানুসারে দেহের কার্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং দৈহিক কার্য্যবিশেষে মনের অবস্থান্তর সংঘটিত হয়। এইজন্য সাধকদিগের বাসস্থান নির্ণয় করা সাধনের প্রথম কার্য্য।

মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ পরিজন ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া সংসার সংগঠনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিয়া থাকে; এই প্রকার বিবিধ পরিবার একত্রিত হইয়া যখন একস্থানে বাস করে, তখন তাহাকে গ্রাম কিম্বা নগর বলে। পরিবার বেষ্টিত হইয়া নগরে বাস করিলে সাধকদিগের আত্মোন্নতি পক্ষে আনুকূল্য হয় কি না, তাহা এই স্থানে বিবেচিত হইতেছে।

এই প্রস্তাব মীমাংসা করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিবিধ প্রসঙ্গের অবতরণ করা আবশ্যক।

১ম—মনের সহিত দেহের সম্বন্ধ কি?

২য়—দেহের সহিত বাহ্যিক পদার্থাদির সম্বন্ধ নির্ণয়।

৩য়—সংসার এবং লোকালয় দ্বারা দেহ ও মনের কোন প্রকার বিঘ্ন সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না?

৪র্থ—সাধকদিগের বাসস্থান সম্বন্ধে সাধুদিগের অভিপ্রায়।

১ম—মনের সহিত দেহের সম্বন্ধ কি?

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মস্তিষ্কের কার্য্যসমূহের সমষ্টির নাম মন এবং ইহার প্রবর্দ্ধিতাঙ্গ মেরুমজ্জা হইতে স্নায়ুবৃন্দ উত্থিত হইয়া দেহের কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত দেহের সহিত মনের বিশেষ বাধ্যবাধকতা

আছে বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। মন বিকৃত হইলে দেহও বিকৃত হয় এবং দেহের কোন স্থানে অস্বাভাবিক ঘটনা হইলে মনের সমতা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যেমন কোন পারিবারিক কিম্বা বৈষয়িক দুর্ঘটনা হইলে মনে অশান্তি উপস্থিত হয়। তখন আহার বিহার অথবা দৈহিক বেশ ভূষায় একেবারে অনাসক্তি জন্মিয়া থাকে। এস্থানে দৈহিক কার্য্য বিপর্য্যয় করিবার হেতু কে? মনকেই দেখা যাইতেছে। কিন্তু যদ্যপি শরীরের কোন স্থান ব্যাধিগ্রস্থ হয়, তাহা হইলে যে যন্ত্রণা উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহার কারণ কাহাকে কহা যাইবে? এস্থানে দেহই মনবিচ্ছিনের কারণ। অতএব মন এবং দেহ উভয়ে উভয়ের আশ্রিত বলিয়া সাব্যস্থ হইতেছে।

২য়—দেহের সহিত বাহ্যিক পদার্থদিগের সম্বন্ধ নির্ণয়।

মন যদ্যপি দেহের আশ্রিত হয়, তাহা হইলে যে কোন কারণে দৈহিক সমতা বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহা নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

যে পদার্থের যে ধর্ম্ম, সেই পদার্থ অন্য পদার্থকে আপন গুণাশ্রয় প্রদান করিয়া থাকে। দেহ, স্থূল বা জড়পদার্থ। ইহা জড় পদার্থের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, সুতরাং তাহাদের পরস্পর কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

দেহের সহিত বাহ্য জগতের সম্বন্ধ নির্ণয় করা অতি দুরূপ ব্যাপার। কারণ আমাদের চতুর্দ্দিকে যে সকল পদার্থ রহিয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই আপন কার্য্য করিতেছে। জড়পদার্থদিগকে যথা নিয়মে ব্যক্ত করিতে হইলে প্রথমেই বায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ইহা আমাদের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। সুতরাং ইহার সহিত দেহের প্রথম সম্বন্ধ। তদ্‌-পরে উর্দ্ধস্থিত সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রনিচয় এবং নিম্নে পৃথিবী দৃষ্ট হইবে।

. বায়ু বাষ্পীয় পদার্থ। ইহার প্রকৃতাবস্থা কি তাহা বলা যায় না। * পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ইহা দ্বিবিধ বাষ্পদ্বারা সংগঠিত যথা—অক্‌সি-জেন † এবং নাইট্রোজেন ‡। এই বাষ্পদ্বয় ২১ এবং ৭৯ ভাগে অবস্থিতি করে।

---

* জড়শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, পদার্থের উত্তাপে এবং তাহার অভাবে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথা উত্তাপ প্রয়োগে বাষ্প এবং শৈত্যোৎপাদনে তরল ও কঠিনাকারে পরিণত হয়। জলের দৃষ্টান্তে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

† অক্‌সিজেন বাষ্প দ্বারা পৃথিবীর প্রায় সমুদায় পদার্থ দগ্ধীভূত হইয়া থাকে। দাহন কার্য্য করা এই পদার্থের বিশেষ ধর্ম্ম। কাষ্ঠাদি. প্রদীপ, গ্যাস কিম্বা গৃহাদি যখন অগ্নিময় হইয়া থাকে, তখন এই অক্‌সিজেনই তাহার কারণ।

‡ উহা দ্বারা দাহন কার্য্য স্থগিত হইয়া থাকে। নাইট্রোজেন বাষ্প বিষাক্ত নহে।

আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি যে, দেহের কৃষ্ণবর্ণ বা শিরাস্থিত শোণিত (venious blood) পরিশুদ্ধ করিবার জন্য অক্‌সিজেনের প্রয়োজন। এই কার্য্য বক্ষঃগহ্বরে ফুসফুস্ (lungs) মধ্যে সাধিত হইয়া থাকে। শিরাস্থিত শোণিতে অঙ্গারাংশ মিশ্রিত থাকে। যখন বিশুদ্ধ শোণিত শরীরে প্রবাহিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে, তখন নানাস্থান হইতে ক্লেদাদি সমভিব্যাহারে লইয় পুনরায় ফুস্‌ফুসে সমাগত হইয়া বায়ুর অকসিজেনের দ্বারা অঙ্গার বিবর্জ্জিত হয়। অঙ্গার অক্‌সিজেনঘটিত এক প্রকার বাষ্পীয় পদার্থে পরিণত হইয়া প্রশ্বাস বায়ুর সহিত ভূবায়ুতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। ইহাকে কার্ব্বনিক অ্যান্-হাইড্রাড (Carbonic anhydride) বলে। অতএব দেহের সহিত বায়ুর এই কার্য্যকেই বিশেষ সম্বন্ধ বলিতে হইবে।

অনেকে বায়ুস্থিত অক্‌সিজেনকে এই নিমিত্ত প্রাণবায়ু (Vital air) বলিয়া উল্লেখ করেন, কারণ ইহার হ্রাসতা জন্মিলে শিরাস্থিত শোণিত অপরিষ্কৃত থাকা বশতঃ প্রাণীগণ তৎক্ষণাৎ শ্বাস রুদ্ধ হইয়া অচেতন এবং সময়ান্তরে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। যে যে কারণে বায়ু বিকৃত হইয়া থাকে, তাহা অবগত না হইলে সর্ব্ব সময়ে মৃত্যু না হউক, স্বাস্থ্যভঙ্গের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, সুতরাং সাধকদিগের সাধন ভ্রষ্ট হইয়া যায়।

ভূবায়ুতে স্বভাবতঃ কার্ব্বনিক অ্যান্‌হাইড্রাইড ও জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে। এতদ্ব্যতীত যে স্থানে যে প্রকার কার্য্য হয়, সে স্থানে সেই প্রকার দ্রব্য মিশ্রিত থাকিবার সম্ভাবনা। যথা—প্রবল বায়ু বহনকালে ভূবায়ুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকা এবং কাষ্ঠকণা কিম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদি প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। কোথাও বা জীবজন্তু কিম্বা উদ্ভিদাদি বিকৃত জনিত তদুদ্ভূত নানাবিধ বাষ্প মিশ্রিত হয় এবং যে স্থানে কাষ্ঠ কিম্বা কয়লা দগ্ধ করা যায়, তথায় প্রাণীর প্রশ্বাস বায়ুস্থিত কার্ব্বনিক অ্যান্‌হাইড্রাইড ব্যতীত ইহা অতিরিক্ত পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

যেমন উষ্ণ জলে শীতল জল মিশ্রিত না করিলে শরীরে সহ্য হয় না, সেই প্রকার অক্‌সিজেনের প্রাবল্য খর্ব্ব করিবার জন্য নাইট্রোজেন চতুর্থ-পঞ্চমাংশে মিশ্রিত আছে। অক্‌সিজেন এ প্রকারে মিশ্রিত না হইলে আমরা কেহ এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারিতাম না। কারণ পদার্থদিগের সহিত সংযোগ সম্বন্ধে অক্‌সিজেনের এ প্রকার তীক্ষ্ণ শক্তি আছে যে, বায়ুতে একখণ্ড কাগজ যেরূপ দগ্ধ হইয়া যায়, সেই প্রকার ইহাতে লৌহ পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইয়া থাকে

নগরের বিশেষতঃ গৃহের ভূবায়ু সেই জন্য বিশুদ্ধ নহে। ইহাতে আবশ্যকীয় পরিমাণ অক্সিজেনের স্বল্পতা জন্মে এবং তদ্‌স্থানে দূষিত বাষ্প ও মলমুত্রাদি বিকৃত হইয়া নানাপ্রকার আনুবীক্ষণিক কীটাদি উৎপন্ন হইয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণ হইয়া থাকে।

যে সকল অস্বাস্থ্যকর পদার্থ এইরূপে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহাকে কলুষিত করিয়া ফেলে, তন্মধ্যে কার্ব্বনিক অ্যান্‌হাইড্রাইড সর্ব্ব প্রধান বলিয়া বিবেচনা করা যায়। কারণ এই পদার্থ নানা কারণে অতিরিক্ত পরিমাণে প্রত্যহ জন্মিয়া থাকে। প্রাণীদিগের প্রশ্বাসে, আহারীয় পদার্থ প্রস্তুত কালে, বাষ্প সম্বন্ধীয় বিবিধ কার্য্যের জন্য কাষ্ঠ কিম্বা কয়লাদি দাহন হইলে ; রজনীযোগে প্রদীপ ও গ্যাসের আলোকাদি হইতে, সুরাদির উৎসেচনাবস্থায় এবং ধুমপানকালীন ইহা অপরিমিত পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ভূবায়ুতে যদ্যপি সহস্র ভাগে ৪০৪ ভাগ কার্ব্বনিক অ্যান্‌হাইড্রাইড বাষ্প অবস্থিতি করে, তাহা হইলে সে বায়ু দ্বারা বিশেষ বিঘ্ন সংঘটিত হইতে পারে না, কিন্তু ইহা ১০৫ হইতে ২০ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইলে তদ্দ্বারা সুচারুরূপে শোণিত শুদ্ধ না হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণ শোণিত মস্তিষ্কস্তরে প্রবেশ করিয়া শিরঃপীড়া উপস্থিত করিয়া থাকে। কাহার শরীরে এত অধিক পরিমাণে অঙ্গার বাষ্প সহ্য না হইয়া এমন কি ১০৫ হইতে ৩ ভাগ দ্বারা শিরঃপীড়া হইয়াছে। যখন এই বাষ্প ৫০ হইতে ১০০ ভাগে উৎপন্ন হয়, তখন জীবন নাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

কার্ব্বনিক অ্যান্‌হাইড্রাইড বাষ্প বিষাক্ত ধর্ম্মযুক্ত নহে, কিন্তু ইহার আর এক প্রকার বাষ্প আছে, যাহাকে কার্ব্বনিক অক্‌সাইড (Carboinc oxide) কহে, ইহা অতিশয় বিষাক্ত বাষ্প। ময়রাদিগের চুলাতে যে নীলাভাযুক্ত শিখা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই বাষ্প দ্বারা হইয়া থাকে।

যেমন জলমগ্ন হইলে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া জীবন বিনষ্ট হয়, কার্ব্বনিক অ্যান্‌হাইড্রাইড বাষ্প দ্বারাও সেই প্রকারে মৃত্যু হইয়া থাকে। অনেকের বোধ হয় স্মরণ হইতে পারে, কোন কোন সময়ে খুনীরা হত্যার পর কূপ মধ্যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকে। পুলিশ কর্ম্মচারীরা সহসা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া সময়ে সময়ে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত কূপে একটী দীপ নিমজ্জিত করিয়া পরীক্ষা করিবার প্রণালী প্রচলিত আছে। দীপ যদ্যপি নির্ব্বাণ হইয়া না যায়, তাহা হইলে উহা নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু

দীপশিখা নির্ব্বাণ হইয়া যাইলে যে পর্য্যন্ত উহা পুনর্ব্বার রক্ষা না হয়, সে পর্য্যন্ত কূপমধ্যে চুণ নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

পণ্ডিতেরা এক প্রকার স্থির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রশ্বাসে প্রতি ঘণ্টায় ৭ বর্গ ফিট কার্ব্বনিক অ্যান্‌হাইড্রাইড বহির্গত হইয়া থাকে। ২৪ ঘণ্টায় ১৬৮ বর্গফিট হইবে। ইহা যদ্যপি অঙ্গারে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে প্রায় অর্দ্ধসের পরিমিত হয়। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতি এবং তাহা হইতে বালক বালিকাদিগের প্রশ্বাসে ইহার পরিমাণের ন্যূনতা হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই অসীম পরিমাণ কার্ব্বনিক অ্যান্‌হাইড্রাইড পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে বায়ুতে সঞ্চিত হইয়া যাইতেছে, তথাপি কি জন্য প্রাণীগণ অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে?

বিশ্ববিধাতার কি অনির্ব্বনীয় কৌশল, কি অত্যাশ্চর্য্য সুশৃঙ্খলসম্পন্ন কার্য্যপ্রণালী যে, এই কার্ব্বনিক অ্যান্‌হাইড্রাড উদ্ভিদ্‌দিগের জীবন রক্ষা এবং তাহাদের পরিবর্দ্ধনের জন্য তিনি অদ্বিতীয় উপায় করিয়া রাখিয়াছেন! তাহারা সূর্য্যোত্তাপেঐ বাষ্প বিসমাসিত করিয়া অঙ্গার এবং অক্‌সিজেনে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলে। অঙ্গার তাহাদের গঠনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং অক্‌সিজন পুনর্ব্বার ভূবায়ুতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া বায়ুর সমতা রক্ষা করিয়া থাকে *।

অরণ্য বা কানন অপেক্ষা নগর বা জনস্থান বিশেষ উষ্ণ। এস্থানে বায়ু অপেক্ষাকৃত বিকীর্ণ ভাবাপন্ন, সুতরাং উহা কাননের শীতল বায়ু দ্বারা স্থানান্তরিত হইয়া পুনর্ব্বার কাননের বৃক্ষাদি দ্বারা শুদ্ধভাব লাভ করিয়া থাকে। বায়ুর সমাগমসুলভ স্থানই শীঘ্র পরিষ্কৃত হয় কিন্তু নগর মধ্যে উচ্চ অট্টালিকা এবং গৃহের দ্বার বদ্ধ থাকা প্রযুক্ত সর্ব্বত্রে সুচারুরূপে বায়ুর গতি বিধি হওয়া

---

* কথিত হইল যে, উদ্ভিদদিগের দ্বারা কার্ব্বনিক অ্যান্‌হাইড্রাইড বাষ্প সূর্য্যোত্তাপে বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা এই অনুমিতি হইতেছে যে, রজনীযোগে যে সকল স্থানে সূর্য্য অদৃশ্য হয়, সে স্থানের বায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষা হইতে পারে না। ইহা সত্যকথা বটে কিন্তু জগৎপতির নিয়মের ইয়ত্তা কে করিবে? পৃথিবী এককালে সূর্য্যশূন্য হয় না। এক স্থানে রজনী এবং আর এক স্থানে দিবস। যে স্থানে সূর্য্যোদয় হয়, সে স্থান উত্তপ্ত থাকে, সুতরাং তথাকার বায়ু বিকীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বায়ু বিকীর্ণ হইলে ইহার লঘুভার হয়, এই জন্য ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং পার্শ্বস্থিত শীতল বায়ু সেই স্থান অধিকার করিবার জন্য সমাগত হয়। যে বায়ু যে পরিমানে বিকীর্ণ হইবে, সেই স্থানে সেই পরিমাণে শীতল বায়ু উপস্থিত হইবে। বায়ুর এই পরিবর্ত্তনকে বাতাস কহে। যে স্থানে অগ্ন্যুৎপাত হয়, সেস্থানে আনুষঙ্গিক প্রবল বায়ুর উপস্থিত থাকা সকলেরই জ্ঞাত বিষয়। এইরূপে পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই বায়ুর গতিবিধি দ্বারা ইহার সমতা বা পরিশুদ্ধতা সংরক্ষিত হইয়া থাকে।

অসম্ভব, সুতরাং এই স্থানের অধিবাসীদিগের দেহ সর্ব্বদাই রোগের আগার হইয়া থাকে।

সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি এবং পৃথিবীর সহিত আমাদের নানাপ্রকার সম্বন্ধ আছে। বায়ুর সহিত যে সকল সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে, তাহাতে সূর্য্য * একমাত্র আদি এবং প্রধান কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

চন্দ্রের সহিত আমাদের দৈহিক জলীয়াংশের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যদিও পাশ্চত্য জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা তাহা অস্বীকার করেন, কিন্তু আমাদের দেশে ইহাই চিরপ্রচলিত অভিপ্রায়।

অন্যান্য নক্ষত্রের সহিত আমাদের যে কি প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহার নিশ্চয়তা নাই। তবে গ্রহদিগের ফলাফল জন্মপত্রিকা দ্বারা অনেক সময়ে নির্ণয় করা যায়।

পৃথিবীর যে স্থানে যে প্রকার পদার্থের আধিক্যতা জন্মে, সেই স্থানের অধিবাসীরা সেইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহা দেশ কাল পাত্র বর্ণনাকালীন কথিত হইয়াছে।

৩য়। সংসার এবং লোকালয় দ্বারা দেহ ও মনের কোন প্রকার বিঘ্ন সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না?

দ্বিতীয় কারণ প্রদর্শনকালীন যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে কিন্তু তাহা ব্যতীত অন্য কারণও আছে।

সংসার বলিলে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়. কুটুম্ব, প্রতিবাসী ও গার্হস্থ জন্তুদিগকে বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ সংসারের সমষ্টিকে লোকালয় বলে।

সংসারে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা পরস্পরের সহায়তাকাঙ্ক্ষী না হইলে সেস্থানে তাঁহাদের অবস্থিতি করিবার অধিকার থাকে না, এই নিমিত্ত প্রত্যেককে প্রত্যেকের সাহায্যের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হয়। পিতা মাতা সন্তানের সাহায্যার্থ কায়মনোবাক্যে লালন পালন করেন পুত্র কন্যারা পিতা মাতার প্রতিও তদ্রূপ করিতেছে। স্বামী স্ত্রীর জন্য ব্যতিব্যস্ত, স্ত্রীও পতির কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়া দেয় এবং প্রতিবাসীরা প্রতিবাসীর আশ্রয়দাতা; সংসারে মনুষ্যদিগের সচরাচর এই অবস্থা।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মনের সহিত দেহের পূর্ণ সম্বন্ধ আছে।

---

* পূর্ব্ব প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে যে, বলের আদি-কারণ সূর্য্য।

কোন কার্য্যে মনোনিবেশ না হইলে, দেহের দ্বারা তাহা সাধিত হইতে পারে না। সাংসারিক লোককে যখন এত কার্য্য করিতে হইবে, তখন তাহার মনও সেই পরিমাণে তাহাতে লিপ্ত হইয়া যাইবে। আবার দেহ দ্বারা যখন কার্য্য হইয়া থাকে, তখন বলক্ষয় হয়; হইলে সাধারণ দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়, সুতরাং মস্তিষ্কও তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মনের শক্তিহীনতা জন্মায়। এই-রূপে সাংসারিক ব্যক্তিদিগের দেহ এবং মন সর্ব্বদাই দুর্ব্বল হইয়া থাকে। সংসারের অন্যান্য ভাব আমরা ইতিপূর্ব্বে অতি বিশদরূপে উল্লেখ করিয়াছি।

৪র্থ—সাধকদিগের বাসস্থান সম্বন্ধে সাধুদিগের অভিপ্রায়।

যখন যে কোন বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য অভিলাষ জন্মে, তখন তাহা দ্বিবিধ প্রকারে সাধন করা যায়। মনের দ্বারা তাহার সঙ্কল্প এবং দেহের দ্বারা তাহার কার্য্য, অর্থাৎ দেহ মন উভয়ে একত্রিত না হইলে সঙ্কল্পিত কার্য্য পরিসমাপ্ত হইতে পারে না।

কিন্তু সংসারে আমাদের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে দেহ মন এক প্রকার নির্জ্জীব হইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থায় ঈশ্বর চিন্তায় অনন্ত ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া দূরে থাক, তাহাতে প্রবেশ করাও সাধ্যাতীত এবং এককালে স্বতন্ত্র কথা। মন নাই, সঙ্কল্প করিবে কে? দেহ নাই, কার্য্য করিবে কে? যেমন একস্থানে দুই পদার্থ থাকিতে পারে না, তেমনই এক মনে দুই সঙ্কল্প হওয়াও অসম্ভব। সাংসারিক ব্যক্তিদিগের দেহ মন বিক্রীত হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে তাহাদের আর অধিকার নাই; এ অবস্থায় অন্য কার্য্য হইতেই পারে না।

যদ্যপি কেহ ঈশ্বর লাভ করিতে চাহেন, যদ্যপি কাহার মনে অনন্ত চিন্তার জন্য প্রবল বেগের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে উপরের লিখিত কারণগুলি এক-কালে বিনষ্ট করিয়া, দেহ ও মনকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করা কর্ত্তব্য। তখন যাহা সাধন করিবার প্রয়োজন হইবে, তাহাই অতি সত্বরে সমাধা হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য প্রভু কহিয়াছেন যে, "ধ্যান করিবে মনে, কোণে এবং বনে"।

ধ্যান বা ঈশ্বর সাধনের প্রকৃত স্থানই কানন। যে সকল কারণে দেহের স্বাভাবিক কার্য্য-বিশৃঙ্খল সংঘটিত হইতে না পারে, তথায় তাহার সুবিধা আছে। তথাকার বায়ু কলুষিত নহে * ও তথায় সাংসারিক কোলাহলের

* কার্ব্বনিক অ্যানহাইড্রাইড এবং কার্ব্বনিক অক্সাইড বলিয়া, যে দুইটী বায়ু দূষিত করিবার বাষ্প উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা মনুষ্যেরা অচেতনাবস্থা লাভ করে। অনেক সময়ে এই ভাব লইয়া সমাধির সহিত গোলযোগ হইয়া থাকে।

লেশমাত্র শরীরে কিম্বা মনে সংস্পর্শিত হইতে পারে না। এস্থানে স্বল্পায়াসে মনের পূর্ণত্ব সংরক্ষিত হইয়া অনন্ত চিন্তায় কৃতকার্য্য হওয়া যায়। এই নিমিত্ত পুরাকাল হইতে অদ্যাপি যোগীগণ কাননচারী হইয়া থাকেন। কাননের অর্থাৎ বৃক্ষরাজী সমাচ্ছাদিত স্থানের, শারীরিক স্বচ্ছন্দতা প্রদায়িনী শক্তির উৎকর্ষতা সম্বন্ধে বর্ত্তমানকালীন বৈজ্ঞানিকেরা এতদূর উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ইউরোপীয়গণ উদ্যানে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইলে এমন কি দুই চারিটা পুষ্পের গাছ কুটীরের সম্মুখে সংস্থাপনপূর্ব্বক উদ্যানের সাধ মিটাইয়া লন।

কিন্তু যেমন সকল কার্য্যে দেশ, কাল, পাত্রের প্রাবল্য আছে, এ সম্বন্ধেও তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। কারণ, প্রত্যেক সাধকের পক্ষে সংসার পরিত্যাগ করা সর্ব্ব সময়ে সাধ্যাতীত হইয়া থাকে। এইজন্য সাধুরা তাহারও স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যে সকল ব্যক্তি সাধনে সদ্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন, তাঁহাদের যদ্যপি সাংসারিক অর্থাৎ পিতা মাতা কিম্বা স্ত্রী পুত্রাদির সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে সংসারে অবস্থান করাই বিধি। তাঁহারা সাংসারিক কার্য্য নিয়মিতরূপে সমাধা করিয়া, "মনে" ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারিলে তাহাই যথেষ্ট হইবে। পরে যতই তাঁহাদের মানসিক উন্নতি লাভ হইবে, ততই নির্জ্জন স্থান অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। তখন সাধক আপনি "কোণে" অর্থাৎ সাময়িক নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইবেন। অনেকে এই অবস্থায় রজনীযোগে অর্থাৎ যখন গৃহ পরিজনেরা সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়েন, তখন প্রাসাদের উপরিভাগে, অথবা কোন নির্জ্জন গৃহের দ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক ধ্যান করিয়া থাকেন। গৃহীসাধকদিগের নিকট একথা অপ্রকাশ নাই।

যৎকালে এই অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন সাধকের মনে পূর্ণ বৈরাগ্যের উদ্রেক হয়। কারণ, ঈশ্বর চিন্তার অলৌকিক আনন্দ আস্বাদন করিয়া, সংসার পীড়নে তাহা হইতে অবিরত বিচ্ছিন্ন হইতে থাকিলে, সুতরাং সামর্থবিশেষে দূর স্থানে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। এই কারণে সাধকের তৃতীয়াবস্থায় 'বনে' গমন ব্যবস্থা হইয়াছে।

যেমন, চিকিৎসকেরা রোগীর অবস্থাবিশেষে বিধি প্রদান করিয়া থাকেন, তেমনই সাধুরাও সাংসারিক ব্যক্তিদিগের জন্য অবস্থামতে নানাপ্রকার উপায় নির্ণয় করিয়া দেন। সকল স্থানে উপরোক্ত প্রণালী মতে কার্য্য হইতে পারে

না। যে ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া দেহ মন বিনষ্টকারী বিবিধ সাংসারিক কারণ হইতে রক্ষার উপায় স্থির করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে সাধন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে স্থান বিচারের বিশেষ প্রয়োজন নাই কিন্তু এপ্রকার ঘটনা অতি দুরূহ। যদ্যপি ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহা হইলে সকলই সম্ভব কিন্তু তাহা সর্ব্বত্রে সংযোজন হওয়া যারপরনাই কঠিন ব্যাপার। তবে ঈশ্বরের রাজ্যে যাহা আমাদের চক্ষে দুর্ঘট বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা তাঁহার নিকটে নহে। এইজন্য যাঁহারা একমনে, প্রকৃত ইচ্ছায়, কপটতা পরিশূন্য হইয়া ভগবৎ কৃপা-কণা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সে আশা অচিরাৎ পূর্ণ হইয়া থাকে।

সাধক যখন মনস্থির করিয়া আপন ইষ্ট চিন্তা করিতে সামর্থ্য লাভ করেন, অথবা একমনে আপন ইষ্টের পূজার্চ্চনা করিতে কৃতকার্য্য হন, তখন তাঁহার সেই কার্য্যকলাপকে ভক্তি অর্থাৎ সেবা কহা যায়।

১৪৯। ভক্তি পাঁচ প্রকার; ১ম অহৈতুকী, ২য় উচ্ছিত, ৩য় জ্ঞান-ভক্তি, ৪র্থ শুদ্ধ-ভক্তি, ৫ম মধুর বা প্রেম-ভক্তি।

অহৈতুকী বা হেতু শূন্য ভক্তি। যে ভক্ত ভগবান্‌কে, কেন কি কারণে ডাকিয়া থাকেন কিম্বা তাঁহাকে লাভ করিয়াই বা কি ফল হইবে, তাহার কারণ অবগত না হইয়া, মন প্রাণ তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া থাকেন, তাঁহার এই প্রকার ভক্তিকে অহৈতুকী ভক্তি বলে। এই ভক্তিতে কোন ফল কামনা থাকে না। অহৈতুকী ভক্তির প্রধান দৃষ্টান্ত প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ কাহারও নিকট হরিগুণ শ্রবণ করেন নাই, হরিকে লাভ করিলে ভবযন্ত্রণা বিদূরিত হইবে, দুঃখসঙ্কুল সংসারক্ষেত্রে যাওয়া আসা স্থগিত হইবে এবং মহামায়ার কর-কবলিত হইতে হইবে না, অথবা সংসার বক্ষে একচ্ছত্রী রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া পৃথিবীর সুখ সম্ভোগের চূড়ান্ত করা যাইবে, এপ্রকার কোন কামনার জন্য, তাঁহার পরিপাদপদ্ম লাভের আবশ্যকতা হইয়াছিল বলিয়া কোন কথার উল্লেখ নাই। তাঁহার মন হরিগুণ শ্রবণ করিতে চাহিত, তিনি সেই জন্য হরি হরি করিয়া বেড়াইতেন; তাঁহার প্রাণ হরি ভিন্ন কিছুই আপনার বলিয়া বুঝিত না ও তাঁহার ভালবাসা হরির প্রতিই সম্পূর্ণ ভাবে ছিল। পিতার তাড়নায়, মাতার রোদনে, ষণ্ডামার্কের গঞ্জনায়, বন্ধু বান্ধব এবং প্রতিবাসীদিগের হিতোপদেশে প্রহ্লাদের হরির প্রতি ভালবাসার অণুতিলপ্রমাণ খর্ব্ব করিতে

পারে নাই। প্রহ্লাদের মন প্রাণ হরির পাদপদ্মে এপ্রকার সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার আপনার প্রাণের প্রতিও মমতা ছিল না। তিনি তজ্জন্য হিরণ্যকশিপুর উপর্য্যুপরি অত্যাচারগুলি আদর পূর্ব্বক বক্ষঃস্থল পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হ্যারে প্রহ্লাদ! তুই হরিনামটী পরিত্যাগ করিয়া অন্য যে কোন নাম হয়, বল্! তাহাতে আমার অমত নাই," ভক্তরাজ প্রহ্লাদ সবিনয়ে কহিয়াছিলেন, "মহারাজ! আমি কি করিব, আমার ইচ্ছায় আমি হরিনাম করি নাই, হরিকে ডাকিব বলিয়া তাঁহাকে ডাকি নাই, কি জানি হরির জন্য আমার প্রাণ ধাবিত হয়, তাঁহার কথা শুনিতে ও বলিতে আমি আত্মহারা হইয়া পড়ি; কি করিব, আমি হরিনাম ছাড়িব কি? হরি যে আমার ভিতর বাহির পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন।"

অহৈতুকী ভক্তি অতি দুর্ল্লভ। আমরা সামান্য মনুষ্য, এমন মধুর অহৈতুকী ভক্তি কি আমাদের অদৃষ্টে সম্ভবে! আমরা ছার সাংসারিক প্রলোভনে প্রতিনিয়ত বিঘূর্ণিত হইয়া কামিনীর অধরামৃত পান, তাহার গাত্রসংস্পর্শ সুখানুভব এবং কাঞ্চনের চাকচিক্যজ্যোতিঃ দর্শন করিয়া, মনুষ্যজন্মের সার্থকতা লাভ করিব, আমরা সে সুখ লইব কেন? সে সুখের জন্য আমরা ধাবিত হইব কেন? যদ্যপি শ্রীহরির কৃপা প্রার্থনা করা আবশ্যক জ্ঞান করি, তাহা হইলে কোন কামনা ব্যতীত সে ভাব স্থান পাইবে না। কিসে অধিক ধন হইবে, কিসে দশজনের নিকটে সম্মানিত হওয়া যাইবে, কিসে পুত্রাদি লাভ ও সাংসারিক সুখ সমৃদ্ধি হইবে, যদ্যপি ঈশ্বর উপাসনা করিতে হয়, তাহা হইলে এই সকল কামনা চরিতার্থের জন্যই তাঁহার অর্চ্চনা করিতে নিযুক্ত হইব।

আমরা ভাবিয়া দেখি না যে, "কাচের লোভে হীরক খণ্ড পরিত্যাগ করিয়া থাকি। চিটে গুড়ের লোভে মিছরির অপমান করিয়া থাকি।" অথবা হীরক দেখি নাই, ওলা মিছরির আস্বাদন পাই নাই, তাই আমাদের তাহাতে লোভ জন্মাইতে পারে না।

উদ্দীপ্ত ভক্তি। এই ভক্তিতে ভক্তের মনে সাংসারিক ভাব একেবারে থাকিতে পারে না। তিনি আপনার অন্তরের ভাব সর্ব্বত্রে দেখেন, আপনার অন্তরের কথা সর্ব্বত্রে শ্রবণ করেন। যেমন, বেতবন দেখে বৃন্দাবন মনে হওয়া, নদী দর্শন করিয়া যমুনা জ্ঞান করা, তমালবৃক্ষ দেখিয়া

শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করা। এই সকল লক্ষণ, শ্রীমতি বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকায়, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যে এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবে লক্ষিত হইত। শ্রীমতি কৃষ্ণরূপ চিন্তা করিতে করিতে, সম্মুখে তমাল বৃক্ষকে দর্শন করিয়া, তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতেন, "কেন নাথ! এখানে পরের মত দাঁড়ায়ে আছ? চল চল, কুঞ্জে চল, আমি অর্দ্ধ অঞ্চল বিছাইয়া দিব, তুমি উপবেশন করিবে। আমি বুঝিয়াছি, তোমার মনে ভয় হইয়াছে! আমার নিকটে আসিতে তোমার মনে আতঙ্ক হইতেছে! কেন নাথ! ভয় কিসের? প্রবাসে কি কেহ যায় না, তুমি প্রবাসে গিয়েছিলে—তাহাতে ভয় কি?" কখন কৃষ্ণ চিন্তা করিতে করিতে তিনি আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিতেন। এইভাব সখীদেরও হইত। একদা রাসলীলায় শ্রীমতি এবং সমুদয় সখীদিগের এই প্রকার ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। কোন সখী আপনার বেণীর অগ্রভাগ ধরিয়া অপর সখীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, দেখ দেখ আমি কালিয়ের দর্প চূর্ণ করিতেছি, কোন সখী তাঁহার ওড়্ণার প্রান্তভাগ ধারণ পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, দেখ দেখ! আমি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছি! শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে সময়ে এই প্রকার ভক্তির ভাব প্রকাশ পাইত। প্রভু রামকৃষ্ণদেব এই মর্ম্মে একটী গীত বলিতেন ;—

ভাব বুঝিতে নার্লুম রে—(শ্রীগৌরাঙ্গের)
আমরা গোরার সঙ্গে থেকে,
কখন কোন ভাবে থাকেন,
ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায় (কি ভাব রে)
বেতবন দেখে, বলেন বৃন্দাবন।

আমরা এই ভক্তি প্রভু রামকৃষ্ণদেবে দেখিয়াছি। নহবতের সানাইয়ের শব্দ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মশক্তির ভাব উপস্থিত হইত। তিনি কহিতেন, সানাইয়ের পোঁ—এক সুর; ইহাকে ব্রহ্ম এবং ঐ সুর হইতে "এত সাধের কালা আমার" বলিয়া যে গান উঠিয়া থাকে, তাহাকে শক্তি কহা যায়।

আর এক দিন একখানি ষ্টীমার দুই তিন খানি ফ্ল্যাট টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। প্রভু এই ষ্টীমার খানি দেখিয়া অমনি ভক্তিপূর্ণ ভাবে কহিলেন, আহা! অবতারেরা এইরূপ। যেমন ষ্টীমার আপনি চলিয়া যায় এবং এতগুলি বোঝাই নৌকাও সঙ্গে যাইতে পারে।

জ্ঞান-ভক্তি। তত্ত্বজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক যে ভক্তি ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাকে

জ্ঞান-ভক্তি কহে। যেমন, ইনি শ্রীকৃষ্ণ। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তান্ত সমুদায় মানসপটে যেন দৃশ্য হইয়া যায় এবং তখনই ভক্তির আবির্ভাব হয়। অথবা কোন স্থান দিয়া গমন করিবার সময় কেহ বলিয়া দিল, এই স্থানে অমুক ঠাকুর আছেন। ঠাকুর সম্বন্ধে জ্ঞান থাকায় যে ভক্তির কার্য্য হয়, তাহাকে জ্ঞান-ভক্তি কহা যায়।

জড়শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, মহাকারণের কারণে উপনীত হইলে, যেমন জড় জগতে সমুদায় দৃশ্য বা অদৃশ্য পদার্থের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে এক মহাশক্তির জ্ঞান লাভ করা যায় এবং তদবস্থায় প্রত্যেক পদার্থকেই সেই মহাশক্তির অবস্থান্তর বলিয়া উপলব্ধি হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সর্ব্বত্রেই ব্রহ্মের জাজ্বল্য ছবি জ্ঞানচক্ষে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এ প্রকার সাধক কোন পদার্থকেই পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া, এক ব্রহ্মের বিকাশ জ্ঞানে তাহাদের অর্চ্চনা দ্বারা প্রীতি ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

সাধক এই অবস্থায় মানসিক অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে তৃপ্তি লাভ না করিয়া ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুলিত হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার মনে হয় যে, এই অলৌকিক বিশ্ব সংসার যাঁহার দ্বারা কল্পিত হইয়াছে ও যিনি ইহাকে সঞ্চালিত করিয়াছেন, যাঁহার সৃষ্টি কৌশল নির্ণয় করিতে মানব বুদ্ধি পরাজিত হইয়া কোথায় পতিত হইয়া যায়, যাঁহার রাজ্যের এককণা বালুকার মহান্ ভাব ধারণা করিতে সুতীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন মনুষ্যও অসমর্থ হইয়া থাকেন, যাঁহার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও ধ্যানাবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে কোন্ ভাবুকের মনে ব্যাকুলতার সঞ্চার না হইয়া থাকে! নরদেহতত্ত্ব অধ্যয়ন কালে, অস্থি, মাংসপেশী, শিরা, ধমনী ও মস্তিষ্ক প্রভৃতি গঠনাদির সূক্ষ্মতম অংশ লইয়া যখন আনুবীক্ষণিক পরীক্ষা দ্বারা ইহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিতে করিতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যাইতে হয়, যখন জড়পদার্থদিগের সংযোগোৎপাদিত নব নব পদার্থ-নিচয় দ্বারা অবাক্ হইতে হয়, যখন জড়-চেতনদিগের অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা পরম্পরা দর্শন করা যায়, যখন সৌরজগতের অভূতপূর্ব্ব ব্যবস্থা দেখিয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থা লাভ হয়, তখন কি মহিমার্ণব মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে প্রকৃত তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের বাসনা হয় না? যখন উদ্ভিদ জগতের শৈশবাবস্থা হইতে উহাদের পরিণত কাল পর্য্যন্ত বিবিধ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এবং জান্তব জগতের সহিত অসামান্য নৈকট্য সম্বন্ধ এবং অনির্ব্বচনীয়

সামঞ্জস্য ভাব পর্য্যালোচনা করা যায়, তখন কে এমন ব্যক্তি জগতে আছেন, যাঁহার চিত্ত জড়বৎ আকার ধারণ না করে? এমন পাষণ্ড নীরস ব্যক্তি কেহ থাকিতে পারেন না, যিনি ইত্যাকার চিন্তা করিয়া ঈশ্বরের দর্শনের নিমিত্ত লালায়িত এবং সর্ব্বত্রে সেই বিশ্বপতির অস্তিত্ব জ্ঞানে আপনি স্বইচ্ছায় তাঁহার পাদপদ্মে হৃদয় ভেদ করিয়া ভক্তিবারি প্রদান করিতে যত্নবান না হন? এই প্রকার ভক্তিকে সেই জন্য জ্ঞান-ভক্তি কহে।

শুদ্ধ বা নিষ্কাম ভক্তি। ভগবানের অভিপ্রেত কার্য্য ব্যতীত যখন অন্য কার্য্যে আকাঙ্ক্ষা থাকে না, যে কার্য্য করিলে ভগবানের প্রীতিকর হয়, যখন সেই কার্য্য করিতেই মনের একমাত্র সঙ্কল্প জন্মে, তখন তাদৃশ ভক্তিকে শুদ্ধ-ভক্তি কহা যায়। এই ভক্তি বৃন্দাবনের গোপগোপিকাদিগের ছিল। গোপ-শিশুরা যখন কৃষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গোচারণ করিতে যাইতেন, তখন যাহাতে কৃষ্ণের কোনপ্রকার অসুস্থতা বোধ না হইত,সেইরূপ কার্য্য করিতেন। পাছে কোমল পদকমলে কণ্টকাদি বিদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণ ক্লেশানুভব করেন, এই নিমিত্ত রাখালেরা তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া বেড়াইতেন। পাছে প্রখর রবির করে কৃষ্ণচন্দ্রের বদন আরক্তিম হয়, এইজন্য তাঁহাকে বৃক্ষের ছায়াতীত স্থানে যাইতে দিতেন না, যদি একান্ত যাইতেই হইত, তাহা হইলে তাঁহারা বৃক্ষের পল্লবযুক্ত শাখা ভাঙ্গিয়া সূর্য্য-রশ্মি-নিবারণ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি ধারণ করিতেন। পাছে তিক্ত, কষায়, কটু ফল ভক্ষণ করিলে কৃষ্ণের কোন প্রকার অসুস্থতা উপস্থিত হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা অগ্রে আপনারা ফলগুলি আস্বাদন পূর্ব্বক,সুমিষ্ট, সুস্বাদু এবং সুগন্ধাদিযুক্ত ফলগুলি বাছিয়া বাছিয়া কৃষ্ণের বদনে প্রদান করিতেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে জীবন-স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা ভ্রমণে, উপবেশনে, শয়নে, স্বপনে, কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই জানিতেন না।

গোপিকাদিগের কৃষ্ণগত প্রাণ ছিল। তাঁহারা কৃষ্ণ ছাড়া কিছুই জানিতেন না। গোপ বালকেরা পুরুষ স্বভাব বিধায় গোপিকাদিগের ন্যায় ভক্তি করিতে পারিতেন না। কৃষ্ণ গোপালদিগের সহিত প্রান্তরে গমন করিলে যে স্থলে মৃত্তিকায় পদ প্রদান করিতেন, গোপিকারা তথায় আপনাদের সুকোমল কুচযুগ-সম্বলিত বক্ষঃদেশ যেন পাতিয়া রাখিতেন। বাস্তবিক গোপিকাদিগের বক্ষোপরি শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দৃষ্ট হইত, কিন্তু ইহাতেও গোপিকাদিগের তৃপ্তি সাধন হইত না; তাঁহারা মনে মনে এই বলিয়া আক্ষেপ

করিতেন যে, হে বিধাতঃ! তুমি আমাদের কুচদ্বয় এত কঠিন করিয়াছ কেন? না জানি কৃষ্ণের কতই ক্লেশ হইয়াছে!!

তাঁহারা কৃষ্ণের অদর্শন এক তিল প্রমাণ কালও সহ্য করিতে পারিতেন না, কিন্তু কেন যে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে ভালবাসিতেন, কেন যে তাঁহাদের গৃহ ছাড়িয়া কৃষ্ণের কাছে থাকিতে ইচ্ছা হইত, তাহার কোন কারণ তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, যাহাতে শ্রীমতি রাধিকাকে নানা বেশ ভূষায় সজ্জিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে উপবেশন করাইয়া আপনারা যুগলরূপ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক, কেহ চামর, কেহ বা পুষ্পগুচ্ছ এবং কেহ বা তাম্বুলাধার ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতে পারিতেন, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। কৃষ্ণকে লইয়া আপনারা কোন প্রকারে আত্ম-সুখ চরিতার্থ করিবেন, গোপিকাদিগের এরূপ কোন কামনাই দেখা যায় নাই।

মধুর বা প্রেম-ভক্তি। ভগবান্‌কে আত্ম বা সর্ব্বস্বার্পণ করিয়া অনুরক্তা স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসাকে মধুর-ভক্তি কহে। আত্মসমর্পণ করা নানাবিধ ভাবে হইয়া থাকে, কিন্তু মধুর বলিলে সচরাচর স্বামী স্ত্রীর ভাবকেই বুঝাইয়া থাকে। এই মধুর ভাবের উপমা এক শ্রীমতি শ্রীরাধিকা। এই ভক্তিতে নানাবিধ ভাবের তরঙ্গ উঠিয়া থাকে এবং মহাভাবাদি প্রকাশ পায়, অথবা মহাভাব বলিলে শ্রীমতিকেই বুঝাইয়া থাকে, অর্থাৎ অষ্ট প্রকার ভাবের সমষ্টিকে মহাভাব বলে, যথা পুলক (১) হাস্য (২) অশ্রু (৩) কম্প (৪) স্বেদ (৫) বিবর্ণ (৬) উন্মত্ততা (৭) এবং মৃতবৎ হওয়া (৮) ইত্যাদি। ভগবানের উদ্দেশে এই আট প্রকার যুগবৎ লক্ষণ শ্রীরাধিকা ভিন্ন আর কাহার দেহে প্রকাশ পাইতে পারে না। যাঁহাতে ঐ লক্ষণাদি প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে শ্রীমতিই জানিতে হইবে। শ্রীমতির মহাভাব বর্ণনা করিতে পারে এমন কাহার সাধ্য নাই। তিনি জীব শিক্ষার জন্য যাহা লীলা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও সেই রসের রসিক না হইলে বুঝিবার শক্তি কোথায়? আমরা বামন হইয়া চাঁদে হস্ত প্রসারণ করিয়াছি। মধুর-ভক্তি-কিরূপে লিপিবদ্ধ করিব, প্রভু! কি লিখিতে হইবে বলিয়া দিন্।

শ্রীমতি-ভূমণ্ডলে যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বদন ভিন্ন আর কাহার মুখ অগ্রে দেখিবেন না বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সকলে কহিতেন যে, এমন সুরূপা কন্যাটী অন্ধ হইল।

পরে একদিন যশোদা ঠাকুরাণী কৃষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া বৃকভানুরাজ-মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। হ্লাদিনী-শক্তিস্বরূপা শ্রীরাধা অমনি নয়ন উন্মীলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। তখন সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন বটে কিন্তু পরক্ষণেই মহামায়ার মায়ায় আবার তাহা বিস্মৃত হইয়া যাইলেন। এইরূপে শ্রীমতি সর্ব্বপ্রথমে কৃষ্ণকেই দর্শন করিয়াছিলেন, সুতরাং অন্য কাহার দ্বারা কোন প্রকার ভাব মানসপটে অঙ্কিত হইবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিই তথায় বিরাজ করিতে থাকিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যথায় উপস্থিত হন, তথায় আর কাহার অধিকার স্থাপন হইতে পারে না; ফলে শ্রীমতির তাহাই হইয়াছিল।

শ্রীমতির এই ভাব ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন কৃষ্ণই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইলেন। বালিকাবস্থায় ধূলাখেলা হইতে কৈশোর কাল পর্য্যন্ত নানা রঙ্গে কৃষ্ণের সহিত বিহার সুখ সম্ভোগান্তে বিরহাদি নানাবিধ প্রেমের খেলা খেলিয়া লীলা-রঙ্গমঞ্চের যবনিকা নিপতিত করেন।

ভাব। ভক্তির পরিণতাবস্থার নাম ভাব। যেমন ভক্তি দ্বিবিধ, তেমনই ভাবও দ্বিবিধ। যথা, জ্ঞান-ভাব এবং বিজ্ঞান-ভাব। জ্ঞান-ভাবের যেরূপ কার্য্য, বিজ্ঞান-ভাবের কার্য্যও তদ্রূপ, কেবল ভাবের তারতম্য থাকে। যেমন জ্ঞান-ভক্তিতে কোন জড় বস্তু দ্বারা দেবতাদি গঠন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করা হয়, বিজ্ঞান-ভক্তিতে সেই দেবদেবীর স্বরূপ-রূপ সাক্ষাৎ হইলেও তদ্রূপ কার্য্য হইয়া থাকে; এই দ্বিবিধ ভাবের যদিও তারতম্য দেখা যাইতেছে, কিন্তু উহাদের কার্য্য একই প্রকার। সেইরূপ ভাবের মধ্যেও ঘটিয়া থাকে।

১৫০। ভাব পাঁচ প্রকার; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর।

ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভের পূর্ব্বে যে সাধক যে প্রকার ভাব আশ্রয় করেন, তাহাকে জ্ঞান-ভাব কহে; দর্শনের পর সেই ভাবকে বিজ্ঞান বা প্রেম ভাব কহে। প্রভু যে পাঁচটী আদি-ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের পরস্পর সংযোগে অসংখ্যক ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সচরাচর প্রত্যেক ভাবকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা শান্তের—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর; দাস্যের—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর; সখ্যের—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর; ইত্যাদি—

পুত্রের জ্ঞানলাভ হইতে শেষ কাল পর্য্যন্ত তাহার পিতার প্রতি যে ভাবের কার্য্য হয়, তাহাকে শান্ত ভাব বলে। শান্ত-ভাবের পঞ্চভাব কথিত হইয়াছে, ইহা কেবল ভাবের পুষ্টিসাধন মাত্র।

শান্তের-শান্ত। পুত্র যখন তাহার পিতাকে ভয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তখন তাহাকে শান্তের-শান্ত কহে। পুত্রের এই ভাব সর্ব্ব প্রথমে সূত্রপাত হয়, তর্থাৎ যৎকালে পিতা পুত্রকে তাড়না করেন, সেই সময়ে এই ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শান্তের-দাস্য। পুত্র যখন পিতাকে পালনকর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন সে দাস্যের কার্য্য অবাদে সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই অবস্থাকে শান্তের দাস্য বলে।

শান্তের-সখ্য। যখন কোন প্রসঙ্গ লইয়া পিতা পুত্র পরস্পর বাক্যালাপ অথবা কোন বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া পরামর্শ করিয়া থাকে, তখন শান্তের সখ্যভাব কহা যায়।

শান্তের-বাৎসল্য। পিতার বার্দ্ধক্যকালে পুত্র যখন তাঁহাকে প্রতিপালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, তখন সেই ভাবকে শান্তের-বাৎসল্য বলে।

শান্তের-মধুর। পুত্র যখন পিতাকে পরম গুরু এবং ইহ জগতের পথপ্রদর্শক বলিয়া জানিতে পারে; যখন মনে মনে বিচার করিয়া দেখে যে, যাঁহার যত্নে বিদ্যালাভ, যাঁহার স্নেহে শরীর রক্ষিত, যাঁহার আদর্শে জীবন গঠিত হইয়াছে —তিনি কি? ইত্যাকার চিন্তায় যে অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হয়, তাহাকে শান্তের-মধুর কহে। এই অবস্থায় শান্ত ভাবের পূর্ণ পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে।

দাস্যভাব। প্রভুর সহিত ভৃত্যের যে প্রেমোদয় হয়, তাহাকে দাস্যভাব কহে।

দাস্যের-শান্ত। ইহা ভৃত্যের প্রথম ভাব, অর্থাৎ যেমন কোন ভৃত্য নূতন নিযুক্ত হইলে ভয়ের সহিত তাহার প্রভুর আজ্ঞা বহন করিয়া থাকে। ভৃত্যের এই সময়ের অবস্থাকে দাস্যের-শান্ত বলে।

দাস্যের-দাস্য। যখন তাহার প্রভুকে আয়ত্ত করিবার মানসে ব্যগ্রতা এবং মনোযোগের সহিত কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তখন তাহার ভাবকে দাস্যের-দাস্য বলা যায়।

দাস্যের-সখ্য। ভৃত্যের প্রতি প্রভুর বিশ্বাস স্থাপন হইলে তখন ভৃত্যের সহিত সময়ে সময়ে নানা প্রসঙ্গ হইতে পারে এবং সে সময়ে ভৃত্যও বিনা সঙ্কোচে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া প্রভুর কথা খণ্ডন করিয়া থাকে। ইহা দাস্যের-সখ্য বলিয়া উল্লিখিত।

দাস্যের-বাৎসল্য। প্রভুর পীড়াদি হইলে ভৃত্য যখন সেবা-শুশ্রূষা ও পথ্যাদি প্রদান করিয়া থাকে, তখন দাস্যের-বাৎসল্য কহা যায়।

দাস্যের-মধুর। প্রভুর দয়া ও স্নেহ স্মরণ করিয়া পুরাতন ভৃত্যের যে প্রেমের সঞ্চার হয়, তাহাকে দাস্যের-মধুর বলে।

সখ্য। ভ্রাতা ভগ্নি এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গের সহিত যে ভাব স্থাপিত হয়, তাহাকে সখ্য-ভাব কহে।

সখ্যের-শান্ত। ভ্রাতা, ভগ্নি কিম্বা কাহার সহিত বন্ধুত্বের প্রথমাবস্থায় যে ভাবোদয় হয়, তাহাকে সখ্যের-শান্ত বলে।

সখ্যের-দাস্য। সখ্যপ্রেমে বা বন্ধুত্বসূত্রে সেবা বা ভৃত্যের ন্যায় কোন কার্য্য করিলে, সখ্যের-দাস্য কহে।

সখ্যের সখ্য। যখন কোন বিষয় লইয়া পরস্পর পরামর্শ করা যায়, তখন তাহাকে সখ্যের সখ্য বলা যায়।

সখ্যের-বাৎসল্য ও মধুর। ভোজনকালীন সখ্যের বাৎসল্য-ভাব প্রকাশিত হয় এবং যখন প্রাণে-প্রাণে সখ্যভাব সংবদ্ধ হইয়া যায়, তখন তাহাকে সখ্যের-মধুর কহে।

বাৎসল্য। সন্তানাদির প্রতি পিতা মাতা অথবা অন্যান্য গুরুজনের যে ভাব হয়, তাহাকে বাৎসল্য ভাব কহে।

বাৎসল্যের-শান্ত। মনে কেবল সন্তান-ভাব উপস্থিত থাকিলে বাৎসল্যের শান্ত বলে। যেমন, এ আমার পুত্র, অথবা এ আমার শিষ্য, ইত্যাদি। এ সময়ে মনে এক প্রকার প্রশান্ত ভাবের উদ্রেক থাকে।

বাৎসল্যের-দাস্য। সন্তানাদির ভাবে যে সেবা করা যায়, তাহাকে বাৎসল্যের-দাস্য বলে।

বাৎসল্যের-সখ্য। গুরুজনেরা যখন সন্তানের সহিত পরামর্শ করিয়া থাকেন, তখন বাৎসল্যের সখ্যভাব বলিয়া উল্লিখিত।

বাৎসল্যের-বাৎসল্য। যে সময়ে সন্তানকে কোন দ্রব্য ভক্ষণ করান যায়, তখন তাহাকে বাৎসল্যের-বাৎসল্য বলে।

বাৎসল্যের-মধুর। সন্তানকে জগতের সর্ব্ব প্রকার শ্রেষ্ঠরত্ন জ্ঞান করিয়া যে অভূতপূর্ব্ব ভাবাবেশ হয়, তাহাকে বাৎসল্যের-মধুর কহে।

মধুর। দম্পতী-প্রেমকে মধুরভাব কহা যায়।

মধুর শান্ত। স্বামীর প্রতি গুরুভাব আসিলে, অথবা স্ত্রীর প্রতি সহধর্ম্মিণী জ্ঞান হইলে, মধুর-শান্ত বলিয়া কথিত হয়।

মধুর-দাস্য। স্ত্রীর সেবা কিম্বা স্বামীর সেবাকালে মধুর-দাস্য বলে।

মধুর-সখ্য। স্ত্রী এবং স্বামী যখন কোন বিষয়ে পরামর্শ করিয়া থাকে, তখন মধুর-সখ্য ভাবের কার্য্য হয়।

মধুর-বাৎসল্য। অন্যান্য যৌগিকের ন্যায় ইহাতেও আহারকালীন যে ভাব লক্ষিত হয়, তাহাকে মধুর-বাৎসল্য কহা যায়।

মধুর-মধুর। অর্থাৎ বিশুদ্ধ দাম্পত্যের পূর্ণক্রিয়াকে মধুর-মধুর ভাব বলা যায়।

ভক্তেরা ভাবাবেশে যে প্রকার অবস্থা লাভ করিবে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা বৃন্দাবন-লীলায় প্রকটিত করিয়াছিলেন। নন্দযশোদার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে ভাব ছিল, তাহাকে শান্ত এবং দাস্য-ভাব কহা যায়। তাঁহাদের তাড়ন কর্ত্তা বলিয়া কৃষ্ণ কতবার ভয়ের ভাব এবং পিতা মাতা জ্ঞান করিয়া কতই শ্রদ্ধা করিয়াছেন। গো দোহন, গোপাল রক্ষা এবং নন্দের পাদুকা বহনাদি দ্বারা দাস্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। বাৎসল্যভাবের দৃষ্টান্ত নন্দ যশোদা; বসুদেব দেবকীর বাৎসল্য ভাব ছিল, কিন্তু নন্দ যশোদার ন্যায় নহে। যখন শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মথুরায় কংশ নিধনান্তে দেবকীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন দেবকী কৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন, হ্যাঁরে কৃষ্ণ! আমি তোকে এত ডাকিয়াছিলাম, তথাপি মা বলিয়া কি একবার মনে করিতে নাই! কৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, মা! আমি যশোদার বাৎসল্যরূপ ভাব-সাগরে ডুবিয়াছিলাম, তোমার কথা সেইজন্য আমার কর্ণগোচর হয় নাই।

যশোদার বাৎসল্য ভাবের বাস্তবিকই তুলনা নাই। শ্রীকৃষ্ণ যশোদাকে কতবার তাঁহার স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার সম্মুখে কত অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ এবং মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন, এ সকল দর্শন করিয়াও যশোদার বিমল বাৎসল্য ভাবের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই, তিনি যে দিন কৃষ্ণের মুখগহ্বরে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন, সেই দিনই তিনি ভগবানের নিকটে কৃষ্ণের

কল্যাণের নিমিত্ত বার বার কত আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যশোদার বাৎসল্য-ভাবের বিবরণ একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে।• একদা যশোদারাণী গোপালের বনগমনকালীন বলরামকে কহিয়াছিলেন যে, বলাই! এই মাখন আমার গোপালকে দিস্, দেখিস্ যেন ভুলিয়া যাস্‌নে। বলরাম এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, মা! তোমারই ভালবাসা আছে, আমি কি গোপালকে ভালবাসি না? যশোদা এই কথায় অভিমানে পরিপূর্ণা হইয়া কহিলেন, কি? আমার চেয়ে তোর ভালবাসা? তাহা কখনই হইতে পারে না। অতঃপর বলরাম কাহার অধিক ভালবাসা পরীক্ষা করিতে চাহিয়া, উভয়ে নবনী হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক গোপালের নিকট গমন করিলেন, কিন্তু বাৎসল্যের মহিমা অপার, যশোদা নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতেই তাঁহার স্তন্যসুধা বেগে নির্গত হইয়া গোপালের মুখে পতিত হইতে লাগিল। বলরাম সুতরাং লজ্জিত হইয়া রহিলেন। বলরাম অগ্রে বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার সখ্যের বাৎসল্য কখন বাৎসল্যের মধুর ভাবের সহিত সমান হইতে পারে না। বৃন্দাবনের সখ্য ভাবের ক্রীড়া অনুপমেয়। রাখাল বালকেরা ব্রজ-বিহারের বিবিধ বিচিত্র বিস্ময়-জনক কার্য্য অবলোকন করিয়াছিলেন, তথাপি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাদের মনে সখ্যভাবের ভাবান্তর হয় নাই। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পুতুনা বধ ও অকাশুর বকাশুরাদির নিধন হওয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা যেদিন জলপান করিয়া কালিয়ের বিষম বিষে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে দিন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা যে তাঁহাদের জীবন রক্ষা হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা জানিতেন। নিবিড় বনে প্রবল দাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া যেদিন তাঁহারা মৃত্যুগ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন,সে দিনের কথাও কেহ বিস্মৃত হন নাই। শ্রীকৃষ্ণকে কাননে যখন দেবদেবীরা সচন্দন তুলসীপত্র সহযোগে বেদমন্ত্রাদি দ্বারা স্তব স্তুতি করিতেন, তদ্দৃষ্টে কাহার মনে কখন সখ্য-ভাবের স্থলে শান্ত ভাবের উদ্রেক হয় নাই। ভ্রমণকালীন তাঁহারা যে সকল ফল মূল সংগ্রহ করিতেন, অগ্রে আপনারা সে গুলি আস্বাদন করিয়া যে ফল সুস্বাদু এবং মিষ্ট বোধ হইত, সেই গুলি কৃষ্ণের জন্য ধড়ায় রাখিয়া দিতেন এবং তিক্ত কষায় কিম্বা কটুরসযুক্ত ফলগুলি আপনারা ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেন। সখ্য ভাবের কি মহিমা! কৃষ্ণের এতাদৃশ শক্তি-দর্শন করিয়া রাখালদিগের মনে এক দিনও ঈশ্বর জ্ঞানে আপনাদিগের অভ্যস্ত সখ্য-ভাবের বিপর্য্যয় করিয়া শান্ত কিম্বা দাস্যাদি ভাবের পরিচয় দেন নাই। গোপিকা-

দিগের সহিত মধুর-ভাবে কার্য্য হইয়াছিল। সাধারণ গোপিকাদিগের মধুর-সখ্য, গোপিকা-প্রধানা শ্রীমতির মধুর-মধুর ভাব ছিল। এ প্রকার ভাব আর কুত্রাপি দেখা যায় নাই। গোপিকারা আপন গৃহ, পিতা, মাতা বা পতি, পুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক, লোক লজ্জা বাম পদে দলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ; প্রাতঃকাল,প্রাহ্ন,অপরাহ্ন,প্রদোষ কিম্বা রজনী প্রভৃতি কালা-কাল বিচার না করিয়া যখনই শ্রীকৃষ্ণের বংশি নিনাদ সাংকেতিক শব্দ তাঁহাদের শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইত, অমনি তাঁহারা উন্মাদিনীবৎ রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইতেন। তাঁহাদের দেহ, মন, প্রাণ কিছুই নিজের ছিল না,সমুদয় শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকে তাঁহারা দেহের দেহী, মনের মন এবং প্রাণের ঈশ্বর জানিতেন। যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ গোকুল বিহার করিয়াছিলেন, সে সময়ে গোপাঙ্গনারা কৃষ্ণকে লইয়া সর্ব্বদা যেরূপ সম্ভোগ করিতেন,তাহাতে তাঁহাদের নিজের অভিমত ভাবের লেশমাত্র আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহারা যৎকালে গৃহকার্য্য করিতেন, তৎকালেও কৃষ্ণের ভাবে অভিভূত থাকিতেন। অনেক সময়ে এক কার্য্য করিতে গিয়া অপর কার্য্য করিয়া ফেলিতেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই গুরু গঞ্জনা শুনিতে হইত। তাঁহা-দের বাহ্যিক সকল কার্য্যেই ঔদাস্যভাব দেখা যাইত এবং সর্ব্বদাই তাঁহারা অন্যমনা থাকিতেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মনোরঞ্জন করিবার নিমিত্ত নানাবিধ অলঙ্কারাদি বেশভূষা করিতেন,কিন্তু সেই বেশভূষায় প্রায় পারিপাট্য থাকিত না। কখন কখন কাহার এক কর্ণে অলঙ্কার, কখন বা কাহার এক চক্ষে অঞ্জন দেখা যাইত। এই প্রকার তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই বিশৃঙ্খল ঘটিত,তাঁহারা যখন পথে চলিয়া যাইতেন, তখন তাঁহাদের দেখিলে মনে হইত, যেন ছায়া শরীরী গমন করিতেছে।

গোপিকারা যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে না পারিতেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা নিয়ত অস্থির থাকিতেন। শ্রীমতি ঠাকুরাণীর অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইত। তিনি কৃষ্ণ অদর্শনে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রমাদ জ্ঞান করিতেন কিন্তু সর্ব্বদা ইচ্ছাক্রমে তাঁহার দর্শন ঘটিয়া উঠিত না। এই জন্য সখীরা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট কৃষ্ণ কথা কহিতেন। তিনি কৃষ্ণনাম শ্রবণ পূর্ব্বক মৃতপ্রায় দেহে অমৃত লাভ করিতেন। তিনি গৃহে থাকিতে পারিতেন না, কিন্তু কি করিবেন, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে তথায় থাকিতে হইত। শ্রীমতির ভাব সম্বন্ধে প্রভু একটী গীত বলিতেন।

ঘরে যাবই না গো। (পাপ ঘরে) •
যে ঘরে কৃষ্ণ নামটী করা দায়।
যেতে হয় ত তোরাই যা, গিয়ে বল্‌বি ওগো যার রাধা তার সঙ্গে গেল।
(যমুনায় রাই ডুবে মলো)
সখি! যদি কার'র বাড়ী যাই, বলে এলো কলঙ্কিনী রাই।
সখি! আমার যে ননদিনী যেন কাল-ভুজঙ্গিনী।
সখি! যদি পরি নীল বসন, বলে ঐ কৃষ্ণের উদ্দীপন।
সখি! যদি চাই মেঘ পানে বলে কৃষ্ণকে পড়েছে মনে।
সখি! যখন থাকি রন্ধন শালে, কৃষ্ণরূপ মনে হ'লে
আমি কাঁদি সখী ধূঁয়ার ছলে;

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, ভগবান্ এ প্রকার ভাব শিক্ষার ব্যবস্থা কি জন্য প্রকটিত করিয়াছিলেন এবং গোপিকাদিগের বিশেষতঃ শ্রীরাধিকার পতি পরিত্যাগ করায় ব্যভিচার দোষ সংঘটন করাইবার তাঁহার কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা বিচার করা আবশ্যক।

ভাব শিক্ষার স্থান সংসার। এই স্থানে জীবেরা সকল ভাবের কার্য্য করিতে সুবিধা পাইয়া থাকে কিন্তু সেই সাংসারিক ভাব চরম ভাব নহে। যদিও শান্ত ভাব শিক্ষার স্থল পিতা মাতা বা অন্যান্য গুরু জন সত্য কিন্তু সেই ভাব চিরকাল তাঁহাদের প্রতি রক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। পিতা মাতা জড়-পদার্থসম্ভূত, এই আছেন এই নাই। তাঁহারা যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন, সে পর্য্যন্ত ভাবের কার্য্য থাকিতে পারে কিন্তু তাঁহাদের পরলোকে গমন হইলে আর সেই শান্ত ভাবের কার্য্য সেরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুরাদি ভাবে অবিকল এই প্রকার দেখা যায়। কারণ জড় প্রভু নিত্য নহে, জড় সন্তান নিত্য নহে, জড় বন্ধু নিত্য নহে এবং জড় পতিও নিত্য নহে।

জীবগণ সংসারে অবস্থিতি করিয়া যখন ভাবের মাধুর্য্য অর্থাৎ যাহার যে ভাব, তাহার পূর্ণ পুষ্টি কাল পর্য্যন্ত সম্ভোগ করিতে পায়, তখন স্বভাবতঃই স্বস্ব ভাব পরিত্যাগ করিতে অশক্ত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সাংসারিক নরনারীগণ বিয়োগজনিত শোক অনুভব করিয়া থাকে। মাতা পিতার মৃত্যুতে শান্ত ও দাস্য ভাব বিচ্ছিন্ন হয়, সন্তানের লোকান্তরে বাৎসল্য, ভাই ভগ্নিরা গতাসু হইলে সখ্য এবং স্ত্রী কিম্বা স্বামীর পরলোক যাত্রা হইলে মধুর

ভাব এক কালে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই রূপে ভাবের হাট ভাঙ্গিয়া যাইলে সুতরাং ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া নরনারীগণ বিরহ শোকে অভিভূত হইয়া পড়ে। বৃন্দাবন লীলায় সেই জন্য ভাবের অভিনয় এক অদ্ভুত ভাবে সমাধা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ যশোদার প্রতি শান্ত দাস্য ভাব প্রয়োগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া মথুরায় নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন! জীবগণ এতদ্দ্বারা এই শিক্ষা করিবে যে, জড় পদার্থে ভাবের সম্বন্ধ দীর্ঘকাল রাখা কর্ত্তব্য নহে। সাধক মাত্রেই বিবেক বৈরাগ্যের সহায়তায় এই শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। যখন বিবেক উপস্থিত হয়, তখন সাধক দিব্য চক্ষে দেখেন যে, এমন সুন্দর শান্ত ও দাস্য ভাব জড় পদার্থে আবদ্ধ রাখা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়; কারণ পিতা, মাতা, কিম্বা অন্য গুরুজনের প্রতি শান্ত দাস্য ভাব প্রদর্শন করা শান্ত দাস্যের চরম ভাব নহে। সেই প্রকার অন্যান্য ভাবও জানিতে হইবে। এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ রাখালদিগের সহিত সখ্য ভাবে কয়েক দিন ক্রীড়া করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। নন্দ যশোদার বাৎসল্য এবং গোপীদিগের ভাব সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ একদিকে ভাবের অভিনয় দ্বারা তাহার পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন এবং ব্রজধাম পরিত্যাগ কালে সাধারণ ভাবের যে প্রকার পরিণাম হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। অতঃপর এই ব্রজবাসী ব্রজবাসিনীদিগের মনে তাঁহার ঐশ্বরিক ভাব প্রদান করেন। ব্রজের নরনারীগণ অতঃপর শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও তাঁহাদের নিজ নিজ ভাবে আজীবন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কেহই নিজ নিজ ভাব পরিত্যাগ করেন নাই।

শান্ত, দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য প্রভৃতি ভাব যেরূপ কথিত হইল, মধুর ভাব সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। যেমন আপন পিতা মাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরকে পিতা বা মহাশক্তিকে মাতা বলিলে জীবের প্রকৃত ভাবের কার্য্য হয়, জড় পুত্রে বাৎসল্য ভাব সীমাবদ্ধ না করিয়া গোপালের প্রতি তাহা ন্যস্ত হইলে কস্মিন্‌কালে বাৎসল্যের খর্ব্বতা হয় না, রাখাল রাজের প্রতি সখ্যতা সূত্রে গ্রন্থিত হইলে সে ভাব কখন বিলয় প্রাপ্ত হয় না, সেই প্রকার মধুর ভাবে যিনি তাঁহাকে বাঁধিতে পারেন, তিনি সেই ভাবে চিরকাল সম্ভোগ করিয়া যাইতে পারেন।

যদিও শান্তাদি সকল ভাবকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং তাহাদের

নিজ নিজ ধর্ম্ম হিসাবে স্ব স্ব প্রধান কহা যায় কিন্তু সম্ভোগের ভাব বিচার করিয়া দেখিলে মধুর ভাবই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। কারণ শান্তাদি ভাবে যে মধুরতা আছে, তাহা তৎ তৎ ভাবের চরম ভাব মাত্র কিন্তু মধুর ভাবে তাহা অপেক্ষা অধিকতর আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে।

শান্তাদিভাবে ভাবের সঙ্কোচাবস্থা থাকিয়া যায়। পিতা মাতার নিকট সকল কথা বলা যায় না, ভ্রাতা ভগ্নির নিকটেও তদ্রূপ, সখ্যাদিতে তাহা অপেক্ষা অধিক নহে কিন্তু মধুর ভাবে কখনই কোনপ্রকার ভাবের সঙ্কোচাবস্থা হয় না। এই নিমিত্ত প্রভু বলিতেন যে, এই মধুর ভাবে সকল ভাবের কার্য্য হইয়া থাকে। এই বিমল মধুর ভাবের মহিমা যখন স্ত্রীজাতিরা অনুধাবন করিতে পারেন, তখন তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন যে, এমন পতিভাব জড় পতিতে রক্ষা করা অকর্ত্তব্য। কারণ জড় পতি দুইদিন পরে লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তখন সে ভাব কোথায় রক্ষা করা যায়? পতির পতি যিনি, যিনি অক্ষয়, অমর, অজয়, তাঁহার সহিত পতি সম্বন্ধ অবিচ্ছেদে সম্ভোগ হইয়া থাকে। এই শিক্ষার দিবার নিমিত্ত শ্রীমতি জড় পতি পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের অনুগামিনী হইয়াছিলেন। শ্রীমতি যদিও জড় স্বামী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার তাহাতে ব্যভিচার দোষ হয় নাই, তাহার হেতু এই যে, একটী জড় পতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর একটী জড় পতি অবলম্বন করিলে ব্যভিচার দোষ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জড় পতির পরিবর্ত্তে নিত্য পতি যিনি, পতির পতি বিশ্ব-পতি যিনি, তাঁহার অনুগামিনী হওয়াই প্রত্যেক নারীর কর্ত্তব্য। জড় পতির সহিত কেবল জড় ভাবে কার্য্য হইয়া থাকে, কারণ দৈহিক সম্বন্ধ ব্যতীত আত্মার কোন ভাব থাকে না। সাধারণ মধুর ভাবে ইন্দ্রিয়-সুখ-স্পৃহা পরতন্ত্র হইয়াই লোকে কার্য্য করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত এক্ষেত্রে যে ভালবাসা বা অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ জড়সম্বন্ধসম্ভূত বলিয়া দেখা যায়। আত্মার সহিত রমণ কার্য্য সম্পন্ন করা আত্মারাম ব্যতীত অন্য কাহার শক্তিতে তাহা সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। জড়পতি জড় দেহে রমণ করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ আত্মাতে বিহার করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত জড় সম্বন্ধ একেবারেই হইতে পারে না। যদ্যপি তাহা হইত, তবে কিজন্য অন্যান্য গোপিকারা আপনার পতি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? বিশেষতঃ এক শ্রীকৃষ্ণের নিকট এত অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোকের এককালীন জড় ইন্দ্রীয় সুখ চরিতার্থ হওয়া কখন সম্ভবনীয় নহে।

প্রভু কহিতেন যে, গোপিকারা ছার ইন্দ্রিয় সুখের দিকে দৃক্‌পাত করিতেন না, অথবা তাহা তাঁহাদের থাকিতে পারিত না, কারণ শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিবা· মাত্র তাঁহাদের কোটী রমণ সুখ অপেক্ষা আনন্দ আপনি হইয়া যাইত। সাধারণ রমণের বিরাম আছে, সুতরাং তদুৎপন্ন আনন্দও সাময়িক, কিন্তু আত্মারাম যখন আত্মাতে রমণ করিয়া থাকেন, তখন সে সুখের আর অবধি থাকে না। এই রমণের ক্ষয় নাই, যদিও ইহার বিরাম কাল আছে, কিন্তু তাহাতে স্পৃহা শূন্য ভাব থাকে না বলিয়া রমণের রস আরও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রভু বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক নরনারীই প্রকৃতি বা স্ত্রী, ভগবান্ একাকী পুরুষ; যখন কেহ তাঁহাকে লাভ করেন, তাঁহার জ্যোতিঃ ছটা লিঙ্গরূপে দেহের লোম রন্ধ্র রূপ যোনির ভিতর প্রবেশ করিয়া অপার সুখোৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাকে এক প্রকার রমণ কহা যায়; অতএব মধুর ভাব কেবল নারীদিগের নহে, তাহা উভয় শ্রেণীর জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে।

১৫১। ভাব পাকিলে তাহাকেই প্রেম বলে।

যে পঞ্চ ভাবের পঞ্চবিধ যৌগিক ভাব কথিত হইয়াছে, তাহাদের মধুরের অবস্থায় প্রেমের সঞ্চয় হয়, ফলে ভাবের পুষ্টি হইলে তাহাকে প্রেম কহা যায়।

১৫২। প্রেম চারি প্রকার। সমর্থা, সমঞ্জসা, সাধারণী এবং একাঙ্গী।

১৫৩। আপনার সুখ কিম্বা দুঃখের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া প্রভুর সুখকর কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করার নাম সমর্থা প্রেম। এই প্রেম শ্রীমতি রাধিকার ছিল।

১৫৪। যাহাকে ভালবাসি তাহাকে লাভ করিয়া উভয়ের সুখী হওয়াকে সামঞ্জসা প্রেম কহে।

১৫৫। যে পর্য্যন্ত অভিপ্রেত ভালবাসার বস্তু না পাওয়া যায়, সেই পর্য্যন্ত তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য যে অনুরাগ থাকে, তাহাকে সাধারণী প্রেম কহে। সাধারণ গোপিকাদিগের এই প্রেম দেখা যায়।

১৫৬। একজন আর একজনকে ভালবাসে কিন্তু সে

তাহার অনুরাগী নহে, ইহাকে একাঙ্গী প্রেম কহা যায়। যথা, হাঁস পুষ্করিণীকে চাহে, পুষ্করিণী হাঁসকে চাহেনা, অথবা পতঙ্গ প্রদীপকে চাহে কিন্তু প্রদীপ পতঙ্গকে চাহে না।

মহাভাব। ভাবের পূর্ণতা হইলে সাধকের যে অবস্থা লাভ হয়, তাহাকে মহাভাব কহে। মহাভাব উপরোক্ত পঞ্চ ভাব হইতেই হইবার সম্ভাবনা। যখন সাধক ভাবে তন্ময়ত্ব লাভ করেন, তখন বাহ্য জগতে তাঁহার কোন প্রকার মানসিক সংশ্রব থাকে না; তিনি একেবারে ভগবানে লীন হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় অষ্টবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাহা অষ্টসাত্বিক ভাব বলিয়া মহাভাব বর্ণনাকালে কথিত হইয়াছে। মহাভাবে একেবারে বাহ্যচৈতন্য থাকে না, এই নিমিত্ত ইহা সমাধি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

১৫৭। ঈশ্বর লাভের খেই কি? বিশ্বাস—গুরুবাক্যে বিশ্বাস ব্যতীত ঈশ্বর লাভ করা যায় না।

যেমন সুতার গুটীর একটী অন্ত মধ্যে এবং আর একটী অন্ত বাহিরে থাকে। এই বাহিরের অন্তটী ধরিয়া টানিলে সুতা খুলিয়া ফেলা যায়, যেখানে সেখানে টানিলে তাহা হয় না, সেই প্রকার বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বর লাভ করা যায়। বিশ্বাস সকল কার্য্যেরই মূল! যখন আমরা ক, খ শিক্ষা করি, তখন গুরু মহাশয় যে প্রকার ক, খ শিক্ষা দেন, সেই প্রকারে শিক্ষা না করিলে ক, খ শিক্ষা হইতে পারে না। বালক কি তখন বিচার করিবে যে, ত্রিকোণ-বিশিষ্ট আকৃতিবিশেষ একটী আঁকড়ী না দিলে কি 'ক' হয় না? আমি যদি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট আকৃতিকে 'ক, বলি, তাহাতে দোষ কি? গুরু বলিবেন, তুমি চতুষ্কোণ কেন চতুষ্পদবিশিষ্টকে 'ক' কহ, বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিবেন, সেই বালকের আর 'ক' শিক্ষা হইবে না। আমরা সেই প্রকার শাস্ত্র ও মহাজনকথিত কথা অবিশ্বাস করিয়া আপন বুদ্ধিপ্রসূত ভাবে ঈশ্বর লাভ করিতে চাইলে বিভ্রাট ঘটাইয়া থাকি। প্রভু যে ভাব বলিয়াছেন অর্থাৎ যাহার যে ভাব, সেইভাবে তাঁহাকে লাভ করা যায়, এ কথার সহিত বিরুদ্ধ ভাব ঘটিতেছে না। ঈশ্বরে বিশ্বাস, তাঁহাকে ডাকিলে পাওয়া যায়, এইজ্ঞানে যে তাঁহাকে ডাকে, তাহার ভাবের সহিত, কাহার বিরুদ্ধ ভাব হইতে পারে না। সকলেই ঈশ্বর চায়, তাঁহাকে ডাকিলে পাওয়া যায়, ডাকিবার ভাব স্বতন্ত্র প্রকার হইতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন প্রকার ভাবান্তর হইবে না।

১৫৮। যাহার যেমন অনুরাগ বা একাগ্রতা, ঈশ্বর লাভ করিবার পক্ষে তাহার তেমনি সুবিধা বা অসুবিধা হইয়া থাকে।

১৫৯। এক ব্যক্তি কোন স্থানে পাতকুয়া খনন করিতেছিল, আর এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল যে, এস্থানের জল ভাল নহে এবং কিছু নীচের মাটি অত্যন্ত কঠিন প্রস্তরের ন্যায়। এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ব্যক্তি পাতকুয়া খনন বন্ধ করিয়া অন্য স্থানে গমন করিল। তথায় সে ঐরূপ প্রতিবন্ধক পাইল। ক্রমে এস্থান ওস্থান করিয়া তাহার ক্লেশের আর অবধি থাকিল না। সে অতঃপর যারপরনাই বিরক্ত হইয়া মনে মনে স্থির করিল যে, আর আমি কাহার কথায় কর্ণপাত করিব না, আমার নিজের মনে যে স্থানে ইচ্ছা হইবে, সেই স্থানেই পাতকুয়া খনন করিব। এই কথা মনে মনে স্থির করিয়া সে একাগ্রতার সহিত এক স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিল। সে বারেও সে যদিও প্রতিবন্ধক পাইল, কিন্তু তাহার একাগ্রতার খর্ব্ব করিতে পারিল না। তাহার পাতকুয়া খনন হইলে সে জলপান করিয়া আনন্দচিত্তে দিন যাপন করিতে লাগিল।

চঞ্চল চিত্তবিশিষ্টদিগকে সর্ব্বদা এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইতে হয়। তাহারা অদ্য এখানে, কল্য সেখানে, পর দিন আর একস্থানে গমন করায় কোন স্থানের কোন ভাব লাভ করিতে পারে না, ফলে তাহাদের ভ্রমণ করাই সার হইয়া থাকে। যে স্থানেই হউক, একমনে, পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে অবস্থিতি করিলে পরিণামে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। আমরা প্রভুর উপদেশের দ্বারা নানা স্থানে নানা ভাবে বলিয়াছি যে, গুরু বাক্যে বিশ্বাস এবং আপনার অনুরাগ বা একাগ্রতা ব্যতীত ঈশ্বর লাভ হইতে পারে না। আমরা এক্ষণে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছি।

১। প্রভু কহিয়াছেন যে, একব্যক্তি কোন অরণ্য হইতে নিত্য কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিত, এতদ্দ্বারা সে যাহা পাইত, তাহা নিতান্ত অল্প এবং অতি ক্লেশে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন সমাধা হইত। সে এক দিন কাষ্ঠ ছেদন করিতেছিল, এমন সময়ে একজন মহাপুরুষের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। মহাপুরুষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন কাষ্ঠ ছেদন করি-তেছ? সে কহিল, ইহাই আমার উপজীবিকা। মহাপুরুষ অতঃপর কহিলেন, কাষ্ঠ বিক্রয় করা যদ্যপি তোমার উপজীবিকা হয়, তাহা হইলে এই স্থানের অসার কাষ্ঠগুলি দ্বারা তোমার বিশেষ উপার্জ্জন হইবে না, তুমি কিঞ্চিৎ "এগিয়ে যাও।" পর দিন সেই ব্যক্তি অন্য অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, সে স্থানটী চন্দন বৃক্ষের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে! তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। সে চন্দন কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইল। একদিন সে আপনার ভাগ্য প্রসন্ন হইবার কারণ চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় তাহার মনে হইল যে, সেই মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, "এগিয়ে যাও," তিনিএমন কিছু নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই যে, এই পর্য্যন্তই থাকিতে হইবে। এগিয়ে যাইতে বলিয়াছেন, অতএব কল্য দুরবর্ত্তি অরণ্যে যাইতে হইবে। পরদিন সে তাহাই করিল। সেই অরণ্যে নানাবিধ সারবান বৃক্ষ পাইল এবং তৎসমুদয় বিক্রয় করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া পড়িল। পরে সে পুনরায় চিন্তা করিয়া দেখিল যে, আমি অন্য অরণ্যে না যাইব কেন? তিনি এগিয়ে যাইতে বলিয়াছেন, অতএব এখানেও আমার কার্য্যের পরিসমাপ্তি পাইতেছে না। এই বলিয়া অপর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, তথায় নানাবিধ রত্নের খনি রহিয়াছে, সে ক্রমে উহা বিক্রয় করিয়া অপর অরণ্যে প্রবেশ করিল। তথায় হীরকাদি বহুমূল্যের নানাবিধ দ্রব্য প্রাপ্ত হইল। সেইরূপ আমরা এই অসার সংসারক্ষেত্রে অসার দ্রব্যের বেচা কেনা করিতেছি, আমরা যদ্যপি ক্রমে "এগিয়ে" যাই, তাহা হইলে বাস্তবিকই সর্ব্ব সারাৎসর ভগবান্ লাভ করিতে পারি, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

২। কোন স্থানে বিপুল ধনসম্পন্না একটী বারাঙ্গনা বাস করিত। একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় একটী সাধু সূর্য্যোত্তাপে নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া ঐ বারাঙ্গনার উদ্যানস্থিত মনোরম্য সরোবরের তীরে বৃক্ষশাখার নিম্নে শান্তি লাভ করিবার নিমিত্ত আসিয়া উপবেশন করিলেন। বারাঙ্গনা সহসা সাধুকে তথায় উপবেশন করিতে দেখিয়া অপরিমিত আনন্দিত হইল, কারণ তাহার

উদ্যানে সাধু শান্তের আগমন কখনই হয় না ও হইতে পারে না। বারাঙ্গনা অতি যত্নে একখানি রৌপ্য পাত্রে কয়েক খণ্ড স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া আপনি সাধুর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিল এবং ঐ স্বর্ণ মুদ্রাগুলি তাঁহার চরণ প্রান্তে সংস্থাপন করিয়া দিল। সাধু কামিনী-কাঞ্চন দর্শন করিয়া মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ না করিয়া বারাঙ্গনাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মা! তুমি আমার নিকটে কেন? লক্ষণাদি দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহধর্ম্মিনী হইবে,আমি আগন্তুক সন্ন্যাসী,আমার সমক্ষে এরূপ নির্জ্জন স্থানে একাকিনী অধিকক্ষণ অবস্থিতি করা ধর্ম্ম, যুক্তি এবং লোক বিরুদ্ধ কথা,অতএব হয় তুমি প্রস্থান কর, না হয় আমি প্রস্থান করি। বারাঙ্গনা লজ্জিতা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিল, প্রভু! আমি ভাগ্যহীনা, যখন কৃপা করিয়া আমার উদ্যানে আগমন করিয়াছেন, তখন আমি কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে কাঞ্চনখণ্ডগুলি গ্রহণ করিলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। সাধু বারাঙ্গনা প্রমুখাৎ এই সকল কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ বাছা! আমি উদাসীন,কাঞ্চন লইয়া কি করিব? আমি এক্ষণে চলিলাম, এই বলিয়া সাধু গমনোদ্যত হইলেন। বারাঙ্গনা নিতান্ত কাতরোক্তিতে সাধুর চরণ ধারণ করিয়া বলিল,প্রভু! আমি জানি যে, আমি অতি নীচ ঘৃণিত বেশ্যা কিন্তু আপনি সাধু,যদ্যপি আপনার দ্বারা আমার উপায় না হয়, তাহা হইলে আর কাহার শরণাগত হইব! যাহা হয়, একটা উপায় করিয়া যান। সাধু ইতস্ততঃ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেখ! আমি একটা উপায় স্থির করিয়াছি,তুমি এই কাঞ্চনগুলি রঙ্গনাথজীকে প্রদান করিও, তাহাতে তোমার সকল কামনা সিদ্ধ হইবে; এই বলিয়া সাধু প্রস্থান করিলেন। বারাঙ্গনা অনতিবিলম্বে প্রচুর পরিমাণে কাঞ্চন মুদ্রা এবং পূজার অন্যান্য বিবিধ উপকরণাদি আয়োজন করিয়া রঙ্গনাথজীর মন্দিরে সমাগতা হইল। বারাঙ্গনাকে দেখিয়া সকলেই তাহার প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার প্রদত্ত কাঞ্চনাদি রঙ্গনাথজীর পূজকেরা গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন এবং এই সংবাদ মহান্তকে প্রদান করিলেন। মহান্ত বারাঙ্গনার নাম শ্রবণ করিয়া সেই কাঞ্চনাদি তদ্দণ্ডে তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে অনুমতি দিলেন। পূজারীরা যখন সেই সংবাদ বারাঙ্গনার কর্ণগোচর করিলেন, তখন সে আপনার শিরে করাঘাত ও দীর্ঘ নিশ্বাস নিক্ষেপ করিয়া বলিল, হায় রে! আমি এমনি অভাগিনী যে, রঙ্গনাথজীও আমায় পরিত্যাগ করি-

লেন! আমি এই সকল সামগ্রী ঠাকুরের জন্য আনিয়াছি, পুনরায় কি বলিয়া ফিরাইয়া লইব! কখনই তাহা পারিব না; আপনাদিগের যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুণ। পূজারীরা তদনন্তর পরামর্শ করিয়া বারাঙ্গনাকে কহিলেন যে, এই কাঞ্চন মুদ্রাগুলির দ্বারা রঙ্গনাথজীর অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিও, তাহা হইলে বোধ হয় মহান্তজী গ্রহণ করিবেন। বারাঙ্গনা উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্ণকার ডাকাইয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিল। বারাঙ্গনাকে বিদায় দিয়া পূজারীরা ভাবিলেন যে, সে আর এখন আসিতে পারিবে না কিন্তু ভগবানের কি বিচিত্র লীলা, কাহাকে কিরূপে উদ্ধার করেন, তাহা কাহার জ্ঞানগোচর হইতে পারে না; বারাঙ্গনা অতি অল্প দিবসের মধ্যে অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া রঙ্গনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইল। পূজারীরা আর কি করিবেন এবং কিবা বলিবেন ভাবিয়া দিশাহারা হইলেন। বারাঙ্গনা অলঙ্কারের বাক্সটী রঙ্গনাথজীর সম্মুখে খুলিয়া পূজারীদিগকে বলিল, মহাশয়গণ! আপনাদের আজ্ঞাক্রমে আমি এই অলঙ্কার গুলি আনিয়াছি, আপনারা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে পরাইয়া দিন, আমি দেখিয়া সুখী হই। পূজারীরা তখন স্পষ্ট বলিলেন যে, বাছা! আমাদের ভাব গতিকে বুঝিয়াও বুঝিলে না যে,তুমি বেশ্যা,তোমার উপার্জ্জিত অর্থে এই সকল অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়াছে, পাপ সংস্পর্শিত দ্রব্য কি ঠাকুরের সেবায় প্রদান করা যাইতে পারে? তোমায় আমরা অধিক কি বলিব, এ সকল অলঙ্কার তুমি এখনি এস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাও। বারাঙ্গনা পূজারীদিগের এই নিদারুণ বজ্রসম বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া সরোদানে অলঙ্কারের বাক্স গ্রহণ পূর্ব্বক নাট-মন্দিরে গমন করিল এবং তথায় উপবেশন করিয়া রঙ্গনাথজীর প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিল যে, প্রভু! আমি ভাগ্যহীনা, অনাথিনী বেশ্যা, তাহা আমি জানি। আমি জানি যে আপনার দেহ বিনিময়ে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি। ঠাকুর! আমি জানি যে, কুহকজাল বিস্তার পূর্ব্বক কতলোকের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়াছি,কতলোককে পথের ভিখারী করিয়াছি এবং আমার দ্বারা কত লোক অনাথ হইয়া গিয়াছে। জানি প্রভু জানি, আমি বিশ্বাসঘাতিনী, কিন্তু ঠাকুর! বল দেখি, তুমি না পতিতপাবন? তুমি না অনাথশরণ? তুমি না লজ্জা-নিবারণ শ্রীহরি! প্রভু! তোমার চরণে যদ্যপি আমি স্থান না পাই, বল ঠাকুর বল,তবে কোথায় যাইব! আর কাহার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিব'! পতিত পাবন! আমি পতিতা, আমায় পবিত্রা করিয়া তোমার পতিতপাবন নামের

সার্থকতা কর। যাহারা পুণ্যময়, তাহারা আপনার জোরে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে, তাহারা তোমায় পতিতপাবন বলিয়া ডাকে না, তাহারা তোমায় দয়াময় বলে না, তাহারা তোমায় অনাথশরণ বলিয়া আর্ত্তনাদ করে না। তোমার এই সকল নাম চিরকালের। ঠাকুর বল দেখি, এই নূতন নাম কত-দিন ধারণ করিয়াছ? ছিলে পতিতপাবন, হইয়াছ পুণ্যপাবন, ছিলে অনাথ-নাথ, হইয়াছ সনাথনাথ। এ রহস্য সামান্য নহে। ঠাকুর! আমি শুনিয়াছি যে, তুমি সকলের ঈশ্বর! তুমি সকলের মনের মন প্রাণের প্রাণস্বরূপ? তুমি সকলের বুদ্ধি এবং জ্ঞানস্বরূপ; সকলেই জড়, তুমি ঠাকুর এক অদ্বিতীয় চৈতন্য-ময় প্রভু। তোমার শক্তি ব্যতীত বৃক্ষের একটী পাতা নড়ে না, ঠাকুর তুমি যখন যাহাকে যেমন করিয়া রাখ, যখন যাহাকে যে ভাবে পরিচালিত কর, সে তখন সেই ভাবেই পরিচালিত হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। ঠাকুর! এ সকল কথা যদ্যপি সত্য হয়,তাহা হইলে চোরের চৌর্য্যবৃত্তির উত্তেজনার কারণ যিনি, সাধুর সাধু বৃত্তির হেতুও তিনি না হইবেন কেন? সতীর সতীত্ব বৃত্তির নিদান স্বরূপ যিনি, বেশ্যার বেশ্যাভাবোদ্দীপকও তিনি না বলিব কেন? ঠাকুর! অপরের দোষ গুণ কি? জড়ের ভাল মন্দ কি? সে যাহা হউক, আমি পণ্ডিত নহি, আমি শাস্ত্র জানি না,আমার কোন গুণ নাই। আমি চির অপরা-ধিনী, কলঙ্কিনী বারবিলাসিনী, অধিক কি বলিব! বলিবার অধিকারই বা কি আছে? অধিকার এই মাত্র যে, আমি পতিতা তুমি পতিতপাবন, এই সম্বন্ধ এখন আছে। ঠাকুর! যদ্যপি তুমি এই অলঙ্কার গ্রহণ কর, তবে গৃহে ফিরিয়া যাইব, তাহা না হইলে আমি এইস্থানে অনশনে একাসনে দেহ ত্যাগ করিব; এই বলিয়া বারাঙ্গনা অধোবদনে অশ্রুবারি বরিষণ করিতে লাগিল। ক্রমে দিবা অতিবাহিত হইয়া রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। নিশিথ সময়ে রঙ্গনাথজী বারাঙ্গনার অশ্রুবারিতে আর্দ্র হইয়া মহান্তকে স্বপনে কহিলেন, তুমি কি জন্য ঐ বারাঙ্গনার নিগ্রহ করিতেছ? ও বেশ্যা, তাহা আমি জানি। আমি উহাকে আনিয়াছি. সেই জন্য আসিয়াছে। ও যে সকল অলঙ্কারাদি আনিয়াছে,তাহা আমার জন্য, তোমার নিমিত্ত নহে। তুমি উহাকে বেশ্যা বলিয়া ঘৃণা কর কেন? এ অধিকার তোমায় কে দিয়াছে? আমার জন্য অলঙ্কার আনিয়াছে, তুমি তাহা কি জন্য পরিত্যাগ করিলে? তুমি বেশ্যার প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ কর না কর, তোমার ইচ্ছা, আহি গ্রহণ করি না করি, আমার ইচ্ছা; আমার সাম-গ্রীতে তোমার অধিকার নাই। তুমি আমার মহান্ত হইয়াছ বলিয়া অভি-

মান হইয়াছে? তুমি কি জান না যে, ঐ বারাঙ্গনা আমার পরম ভক্ত। উহার রোদনে, উহার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় কাতর হইয়াছি, আমি আজ একবারও নিদ্রা যাইতে পারি নাই, তুমি এখনি উহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস। আর দেখ পূজারীরা পুরুষ জাতি, তাহারা আমার বেশ ভূষা করিতে ভাল পারে না, জানেও না। বারাঙ্গনারা বেশভূষা-পরায়ণা, তাহারা স্বভাবতঃ ও বিষয়ে বিশেষ পটু; অতএব ও নিজ হস্তে অলঙ্কারাদি দ্বারা আমায় সুসজ্জিত করিয়া দিবে; মহান্তের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যাইল, তিনি সসব্যস্তে পূজারীদিগকে ডাকাইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত আদ্যন্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। পূজারীরা তখন বারাঙ্গনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রঙ্গনাথজীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। মহান্ত বারাঙ্গনাকে দেখিয়া কৃতঞ্জলিপুটে কহিলেন, মা! ক্ষমা করুন, আপনি সৌভাগ্যবতী, প্রভুর পরম ভক্ত, আমায় কৃপা করুণ,আমি আপনার নিকটে অপরাধী হইয়াছি, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিবিশিষ্ট জীববিশেষ, ভগবানের ব্যাপার কিরূপে বুঝিতে পারিব! সামান্য জ্ঞানপ্রসূত ভাল মন্দ দুইটী কথা, বালক কালাবধি শুনিয়া আসিতেছি, তন্নিমিত্ত এক প্রকার ধারণা হইয়া গিয়াছে। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমি তোমায় বারাঙ্গিনী জ্ঞানে ঘৃণা করিয়াছিলাম। এখন বুঝিয়াছি যে, আমার ন্যায় মহান্ত সন্ন্যাসী অপেক্ষা তোমার ন্যায় বেশ্যা কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। যাহার জন্য ভগবান্ কাতর হন,সে কি সামান্য জীব! মাতঃ!এই তোমার ঠাকুর, যাহা ইচ্ছা তাহাই তুমি কর। প্রভুর ইচ্ছায় তুমি নিজ হস্তে বেশ ভূষা সমাধা করিয়া দাও। এই কথায় বারঙ্গনার প্রাণে যে কত আনন্দ উদয় হইল, তাহা বর্ণনা করা মনুষ্য শক্তির সাধ্যাতীত। সে তখন দুইটী চক্ষু মুছিয়া, অঞ্চলাগ্রভাগ কটিদেশে বন্ধন পূর্ব্বক প্রথমে নূপুর পরাইয়া ক্রমে রঙ্গনাথজীর ঊর্দ্ধাঙ্গ সমুদয় অলঙ্কার দ্বারা বিমণ্ডিত করিল। অতঃপর মুকুট পরাইতে অবশিষ্ট রহিল। প্রেমচতুরা বারাঙ্গনা তখন কহিল, ঠাকুর! আমার খর্ব্বাকৃতি, তোমার মস্তক স্পর্শ করিতে ক্লেশ হইতেছে; তুমি কিঞ্চিৎ মস্তকাবনত কর, আমি চূড়া পরাইয়া দিই। প্রেমের ভগবান্, অমনি তিনি তাহাই করিলেন। বারাঙ্গনার আনন্দের ইয়ত্তা থাকিল না, সে তখন চূড়া পরাইয়া মনোসাধ পূর্ণ করিয়া লইল।

৩। কোন ভক্তের একটী গোপাল মূর্ত্তি ছিল। ভক্ত এই গোপালের সেবাদি করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিতেন। একদিন পূজা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল যে, গোপালের আহারের জন্য প্রত্যহ কত ভোজ্য সামগ্রী প্রদান

করিয়া থাকি, কিন্তু গোপাল তাহা স্পর্শও করেন না কেন? এই ভাবিয়া তিনি সবিনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে গোপালকে কহিলেন, দেখ ঠাকুর! তুমি আমার প্রদত্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণ কর। গোপাল সে কথা শুনিলেন না। ভক্ত গোপালের উপর ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, ভাল, যেমন তুমি কিছুই ভক্ষণ করিলে না, আমিও তেমনি তোমাকে প্রতিফল দিতেছি; এই বলিয়া তখনই একটী কৃষ্ণমূর্ত্তি আনিয়া উপস্থিত করিলেন। গোপালের পার্শ্বে কৃষ্ণমূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক ধুপ দ্বারা আরতি করিবার সময় গোপালের নাসিকা বাম হস্তে টিপিয়া ধরিলেন। গোপাল অমনি বলিয়া উঠিলেন, ওরে! আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইল, শীঘ্র ছাড়িয়া দে। ভক্ত কহিলেন, আমি কখন ছাড়িব না, এতক্ষণে তোমার জ্ঞান হইল? গোপাল বলিলেন,আমার অপরাধ কি? তোর কি ইতি-পূর্ব্বে এমন বিশ্বাস ছিল যে, মাটির গোপাল আহার করে? বলিতে হয় একটা কথা বলিয়াছিলি কিন্তু এখন তোর বিশ্বাস কতদূর! মাটির গোপাল এভাব আর নাই, তাহা থাকিলে নাসিকা সঞ্চাপিত করিবি কেন? এই নিমিত্তই প্রভু সর্ব্বদা বলিতেন যে, ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে ভাবের ঘরে চুরি থাকিবে না।

৪। কোন পল্লীগ্রামে একটী দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ নিঃস্ব হইলেও তাঁহার ভিতরে ব্রহ্মতেজ ছিল। তিনি একজন নৈষ্ঠিক ভক্ত বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ব্রাহ্মণের সর্ব্বমঙ্গলা নাম্নি একটী কন্যা সন্তান ছিল। কন্যাটী অতিশয় সুরূপা এবং সুলক্ষণা বলিয়া তদ্‌পল্লীস্থ জমিদার তাঁহাকে পুত্রবধূ করিয়া লইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষোপজীবী ছিলেন। একদা চণ্ডী-পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মনে সাধ হইল যে, মা! আমি ভিক্ষুক বলিয়া কি আমার প্রতি দয়া হইবে না? যাহারা ধনী, তাহারাই কি মা তোর পুত্র, আমি দীন হীন বলিয়া কি তোর পুত্র নই মা! ধনীরাই কি মা তোকে পূজা করিবে, আর নির্ধনীরা তোকে পাবে না? এই বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিৎয়কাল এইরূপে ক্রন্দন করিয়া তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন যে, অদ্যাবধি যাহা ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করিব, তাহার অর্দ্ধেক মাতার পূজার নিমিত্ত রাখিয়া দিব; এই সঙ্কল্পটী তখনই ব্রাহ্মণীকে জানাইয়া রাখিলেন। সম্বৎসর প্রায় অতীত হইয়া আসিল। ব্রাহ্মণ তহবিল খুলিয়া দ্বাদশটী মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না! তিনি সেই মুহূর্ত্তে কুমারের নিকট গমন করিয়া নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। কুমার ব্রাহ্মণের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিল, মহাশয়! আপনি কি

বাতুল হইয়াছেন? দুর্গোৎসব করিবেন, এমন কি আপনার সঙ্গতি আছে? ব্রাহ্মণ অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, বাপু! মনে বড় সাধ হইয়াছে যে, মাতার পদে গঙ্গাজল বিল্বদল প্রদান করিব, তাহাতে সঙ্গতি অপেক্ষা করে না? আমি নিজে দরিদ্র, তিনি দরিদ্রের মাতা, তাঁহার কখন তাহাতে অভিমান হইতে পারে না। বাপু! আমাকে যেমন হয়, একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া দাও, তোমার কল্যাণ হইবে। আমার আর একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। এই অর্দ্ধ মুদ্রাটী প্রতিমার মূল্য স্বরূপ গ্রহণ কর। এই মূল্যে যেরূপ প্রতিমা হইবার সম্ভব, তুমি তাহাই করিবে, তাহাতে আমার কোন আপত্তি থাকিবে না। ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া কুমারের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যাইল। সে তখন প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবার ভার গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধমুদ্রাটী প্রত্যর্পণ করিতে চাহিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহা কোন মতে স্বীকার করিলেন না।

ক্রমে পূজার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। ব্রাহ্মণও আপন অবস্থামত সমুদয় আয়োজন করিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণী কন্যাটীকে আনিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, সে জমিদারের বধূ, তাহাদের বাটীতে পূজা, আমি কেমন করিয়া এপ্রকার প্রস্তাব করিব? ব্রাহ্মণী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

পঞ্চমীর দিন ব্রাহ্মণ প্রতিমা আনয়ন করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণী আসিয়া কহিলেন যে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আমি অদ্য অস্পর্শীয়া হইয়াছি, কি করিয়া ঠাকুরের কার্য্য করিব? ব্রাহ্মণ এই কথা অশনি পতনাপেক্ষা অধিক-তর কঠিন বলিয়া জ্ঞান করিলেন। তিনি চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। তিনি একাকী কি করিবেন, কোন্‌দিক্ রক্ষা করিবেন, ভাবিয়া আর কূল-কিনারা পাইলেন না; তখন ব্রাহ্মণী পুনরায় কহিলেন যে, আর আমাদের ত্রিকুলে কেহ নাই, যাহাকে আনিয়া কার্য্য সমাধা করাইয়া লইব। তুমি আমার কথা শুন, সর্ব্বমঙ্গলাকে আনিবার জন্য চেষ্টা কর; এই বিপদের কথা শ্রবণ করিলে অবশ্যই তাহাকে পাঠাইয়া দিবে। ব্রাহ্মণ তখন বিবেকশক্তিবিমূঢ়-প্রায় হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণীর কথা সুপরামর্শ জ্ঞান পূর্ব্বক সর্ব্ব-মঙ্গলাকে আনয়ন করিতে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বমঙ্গলার শ্বশুরকে অনুরোধ করায় তিনি কহিলেন যে, বাটীতে পূজা, আমার একটী বধূ, আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে পাঠাইতে পারি? এ অনুরোধ আমায় করিবেন না, বরং আপনার সাহায্যার্থ

আমি কয়েকজন ব্রাহ্মণ দিতেছি, তাহারা আপনার সমুদয় কার্য্য সমাধা করিয়া দিয়া আসিবে। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ লইয়া কি করিবেন ভাবিয়া অন্তঃপুরে কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে যাইয়া সর্ব্বমঙ্গলাকে লইয়া যাইবার কথা বলিলেন। তিনিও কর্ত্তার ন্যায় আপত্তি করিলেন, সুতরাং সর্ব্বমঙ্গলার আসা হইল না। ব্রাহ্মণ সর্ব্বশেষে কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা বলিলেন। কন্যা পিতার সমূহ বিপদের কথা শ্রবণ করিয়াও শ্বশুর শাশুড়ীর অমতে কিরূপেই বা আপনি পিত্রালয়ে গমন করিবেন, তাহা চিন্তা করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ অগত্যা কন্যাকে ক্রন্দন সম্বরণ করিতে অনুরোধ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পথে আসিতে আসিতে শ্রবণ করিলেন যে, পশ্চাৎ হইতে সর্ব্বমঙ্গলা বাবা বাবা বলিয়া ডাকিতেছে। ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন যে, বাস্তবিক সর্ব্বমঙ্গলা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ দাঁড়াইলেন, ক্রমে সর্ব্বমঙ্গলা নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল, বাবা! আমি আসিয়াছি। ব্রাহ্মণের হৃদয়কন্দর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, নয়নে আনন্দাশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি ভাব সম্বরণ পূর্ব্বক কহিলেন, বাছা! কাহাকে না বলিয়া আসিলে শেষে পাছে কোন বিভ্রাট ঘটে? সর্ব্বমঙ্গলা হাসিয়া কহিল, বাবা! সেজন্য তোমার চিন্তা কি?

সর্ব্বমঙ্গলাকে বাটীতে আনিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী পরমানন্দে সর্ব্বমঙ্গলার দুই দিন পূজা সমাধা করিলেন। নবমীর দিন প্রাতঃকালে সর্ব্বমঙ্গলা কহিল, বাবা! পূজায় না ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়? ব্রাহ্মণ কহিলেন, নিয়ম বটে কিন্তু বাছা! আমি কোথায় কি পাইব যে, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া কৃতার্থ হইব? মহামায়ীর যদ্যপি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আগামী বর্ষে দেখা যাইবে। সর্ব্বমঙ্গলা এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, বাবা! আমি তবে পাড়ার ব্রাহ্মণদিগকে মহাপ্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া আসি। ব্রাহ্মণের উপর্য্যুপরি নিষেধ সত্ত্বেও সর্ব্বমঙ্গলা তাহা না শুনিয়া গ্রামের যাবতীয় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণদিগকে মধ্যাহ্ন কালে প্রসাদ ভক্ষণের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। পাড়ার লোকেরা বিশেষতঃ ভোজনপ্রিয় ব্যক্তিরা সর্ব্বমঙ্গলাকে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল যে, অদ্য ভোজনের বিশেষ আড়ম্বর হইবে, তাহার ভুল নাই! যাহা হউক, বেলা দুই প্রহরের সময় পিপীলিকার শ্রেণীর ন্যায় ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণাদি, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা, বালক এবং শিশুরা আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ লোকের জনতা দেখিয়া আতঙ্কে

শিহরিয়া উঠিলেন এবং সর্ব্বমঙ্গলাকে নানাবিধ তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সর্ব্বমঙ্গলা ঈষৎ হাস্যাননে কহিল, বাবা ! তোমার চিন্তা কি ? আমি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে প্রসাদ ভোজন করাইব, তাহাতে তোমার চিন্তিত হইবার হেতু নাই। তুমি ব্রহ্মময়ীর সম্মুখে বসিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে তাঁহার চরণযুগল দর্শন করগে। বাবা ! তোমার বাটীতে স্বয়ং ভগবতী বিরাজ করিতেছেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবদিগের অন্ন বিধান করিয়া থাকেন, তাঁহার সমক্ষে কি এই কয়েকটী ব্রাহ্মণাদির পরিতৃপ্তি সাধন হইবে না ? বাবা ! দেখ দেখি, তুমি দরিদ্র বলিয়া কি মাতা তোমার মনোসাধ অসম্পূর্ণ রাখিলেন ? যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ভগবতীর পূজা করে, সে স্থানে সেই ব্যক্তির যে পরিমাণে আনন্দ লাভ না হয়, তাহা অপেক্ষা তোমার কি আনন্দ হয় নাই ? আহা ! দেখ দেখি তোমার প্রেমে মাকে এই তালপত্রের কুটীরে আসিতে হইয়াছে। তাঁহার স্থানাস্থানের অভিমান নাই। তাঁহার স্থান হৃদয়ে, বাহিরের শোভা কিম্বা অশোভায় কোন প্রকার ক্ষতি বৃদ্ধি হইতে পারে না। অতএব তুমি স্থির হও, আমি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া দিতেছি। সর্ব্বমঙ্গলা অতঃপর বাহিরে আগমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে বিনীত ভাবে কহিল, দেখুন, আমার পিতা দীন হীন দরিদ্র, ভগবতীর পূজা করিবার তাঁহার নিতান্ত বাসনা ছিল, সর্ব্বমঙ্গলা অভয়া সে সাধ পূর্ণ করিয়াছেন। সর্ব্বমঙ্গলার শুভাগমনে এই পল্লী পবিত্র হইয়াছে, আপনারাও পবিত্র হইয়াছেন, যেহেতু আমার পিতা ভক্তিতে, অর্থে নহে, মাতার পূজা করিয়াছেন। আপনারা দয়া করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান, যেন কার্য্যের ফেরে ভক্তির ত্রুটি না হয়। তিনি আপনাদের চাতুর্ব্বিধান্নে ভোজন করাইতে পারেন এমন কি শক্তি আছে, আপনারা বলিবেন আমি তাঁহার কন্যা, ধনীর পুত্রবধূ, তাহাতে আমার পিতার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে ? আপনাদের মহাপ্রসাদের নিমন্ত্রণ আছে, অতএব মহাপ্রসাদ ধারণ করুন, এই বলিয়া সর্ব্বমঙ্গলা প্রসাদ পাত্র বাহির করিলেন। প্রসাদ বাহির করিবামাত্র তাহার সৌরভে দিক্ আমোদিত হইয়া উঠিল। প্রসাদের যে এমন সুগন্ধ হয়, তাহা ভোজন-সিদ্ধ অতি প্রাচীন ব্যক্তিরাও কখন আঘ্রাণ করেন নাই। যদিও কেহ কেহ সর্ব্বমঙ্গলার শুষ্ক কথায় বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও এই প্রসাদের সুগন্ধে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বমঙ্গলা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদ প্রদান করিয়া বাস্তবিক সকলের এরূপ পরিতোষ সাধন করিলেন যে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা হৃদয়

খুলিয়া ব্রাহ্মণের শুভ কামনা করিয়া বিদায় হইলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ এতাবৎ-কাল ভয়ে কাষ্ঠবৎ হইয়া একমনে দীন দয়াময়ীর পাদপদ্মে মন প্রাণ সংলগ্ন করিয়া স্তব করিতেছিলেন, যখন সর্ব্বমঙ্গলা নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তিনি নয়নোন্মীলিত করিয়া কহিলেন, বাছা! ব্রাহ্মণেরা কি আমায় অভিশাপ দিয়া গেল? সর্ব্বমঙ্গলা পুনরায় মৃদুহাস্যে বলিল, বাবা! এখনও তোমার ভ্রম যাইতেছে না। যখন সম্মুখে মাতা উপস্থিত রহিয়াছেন, তখন কি কোন বিষয়ে বিশৃঙ্খল ঘটিতে পারে? ঐ দেখ এখনও এত মহাপ্রসাদ রহিয়াছে যে, এই পল্লীর সমুদয় লোক পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে। ব্রাহ্মণের তখন আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া কহিলেন, দেখ সর্ব্বমঙ্গলা জমীদারের পুত্রবধূ হইয়া অনেক কথা শিখিয়াছে, তুমি শুনিয়াছ কি? কেমন ন্যায়সঙ্গত কথা বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের বাক্য রোধ করিয়া দিল। আহা! মা আমার, তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘকাল জীবিত থাক।

পরদিন বিজয়া, ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালের বিধি-ব্যবস্থা-বিহিত কার্য্যকলাপ সমাধান-পূর্ব্বক ভগবতীকে দধি কড়মা নিবেদন করিয়া দিলেন। তিনি তদনন্তর চাহিয়া দেখিলেন যে, সর্ব্বমঙ্গলা তাহা ভক্ষণ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণীকে ডাকাইয়া কহিলেন, দেখ দেখ তোমার কন্যার বিবেচনা দেখ? কোথায় আমি ভগবতীকে নিবেদন করিয়া দিলাম, না তোমার কন্যা তাহা উচ্ছিষ্ট করিয়া দিল! কি সর্ব্বনাশই হইল। আরে! তোর্ কি এখনও বাচালতা গেল না? দেবতা জ্ঞান নাই, ব্রাহ্মণ জ্ঞান নাই, তোর্ উপায় কি হইবে? হায় হায়! কবে কোন্ দিন তুই কি করিবি, তাহা বলিতে পারি নাই। গত কল্য ব্রহ্মশাপ হইতে ভগবতীর কৃপায় রক্ষা পাইয়াছি, আবার এ কি? ভগবতীর ভোগে হস্ত প্রসারণ? ছি ছি, একি রীতি, স্ত্রীলোকের এপ্রকার স্বভাব হওয়া কখন উচিত নহে। ব্রাহ্মণের তিরস্কারে সর্ব্বমঙ্গলার নয়নে অশ্রু ধারা বহিয়া পতিত হইল, কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। ব্রাহ্মণকে স্থির হইতে কহিয়া ব্রাহ্মণী পুনরায় দধি কড়মার আয়োজন করিয়া দিলেন, সে বারেও সর্ব্বমঙ্গলা উচ্ছিষ্ট করিয়া দিল। ব্রাহ্মণীর কথায় ব্রাহ্মণ শান্ত হইয়া তৃতীয়বার দধি কড়মা ভগবতীকে প্রদান করিলেন, সর্ব্বমঙ্গলা সেবারেও তাহা উচ্ছিষ্ট করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ রোষ্-সম্বরণ করিতে না পারিয়া সর্ব্বমঙ্গলাকে তথা হইতে দূর হইয়া যাইতে বলি-

লেন। সর্ব্বমঙ্গলা অমনি অধোবদনে অশ্রু বরিষণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণীর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিল, মা! আমি চলিলাম, বাবা দূর হইয়া যাইতে বলিয়াছেন। দেখ মা! আমি আজ তিন দিন কিছুই খাই নাই, বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল এবং এখনি আমায় যাইতে হইবে, সেই জন্য আমি দধি কড়মা খাইয়াছিলাম, বাবা তাহাতে বিরক্ত হইলেন। এই বলিয়া সর্ব্বমঙ্গলা চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণী দধি কড়মার জন্য পুনরায় আয়োজন করিতেছিলেন, তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, তথায় সর্ব্বমঙ্গলা নাই। তিনি উচ্চস্বরে কত ডাকিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া সেই কথা তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে জানাইলেন। ব্রাহ্মণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি তদবস্থায় সর্ব্বমঙ্গলার শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন এবং সর্ব্বমঙ্গলাকে অনেক মিষ্ট কথা কহিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বমঙ্গলা এই প্রকার সান্ত্বনা-বাক্যের কোন ভাব বুঝিতে না পারিয়া কহিল, বাবা! অমন করিয়া আমায় বলিতেছ কেন? আমি তোমার কাছে কখন যাইলাম, কখনই বা দধি কড়মা উচ্ছিষ্ট করিলাম এবং কখনই বা আমায় দূর হইয়া যাইতে বলিলে, সে সকল কথা আমি কিছুই জানি নাই। আমি এখানে যেমন ছিলাম, তেমনই রহিয়াছি। ব্রাহ্মণ কন্যার মুখ-নিঃসৃত বাক্যগুলি যেন স্বপনের ন্যায় শ্রবণ করিলেন! তাঁহার তখন সকল কথার তাৎপর্য্য বোধ হইল। তিনি তখন বক্ষে করাঘাত করিয়া ভূমিতে পতিত হইয়া কিয়ৎকাল হতচেতন হইয়া রহিলেন, পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া আপনি ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন, হায় হায়! আমি কি করিলাম? হায় হায়! পরম পদার্থ গৃহে পাইয়া চিনিতে পারিলাম না। হায় মা! কেন এমন করিয়া বঞ্চনা করিলে? সকল কথায় যদিও আভাস দিয়াছিলে, কিন্তু আমরা মায়া-বদ্ধ জীব কেমন করিয়া মহামায়ার মায়া ভেদ করিয়া যাইব? মা! যদিই এত দয়া করিয়া দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে পিতা সম্বোধন-পূর্ব্বক কৈলাশ-ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ণ-কুটিরে বাস করিলে, তবে কেন মা আমার ভবঘোর বিদুরিত করিয়া তোমার নিত্য ভাব দেখাইয়া কৃতার্থ না করিলে? হায় হায়! আমি এখন সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু তাহাতে আর কি ফল হইবে? মা গো! তোমার অপরাধ কি? আমার যেমন কর্ম্ম, আমার যেমন সঙ্কল্প, তুমি তেমনি পূর্ণ করিয়াছ। কিন্তু আমার এখন বড় ক্ষোভ হইতেছে যে, তুমি কন্যারূপে স্বয়ং আগমন করিয়া কেন মায়া-বস্ত্র বাঁধিয়া দিলে? আমি তোমায় জানিতে পারিলে

প্রাণটা ভরিয়া যে দধি, কড়মা খাওয়াইতাম। আহা! সামান্য দ্রব্যের জন্য তোমায় কটু বাক্য বলিলাম? মাগো! কোথায় তুমি? আর একবার পিতা বলিয়া নিকটে আইস, তোমায় ভাল করিয়া দেখিয়া মানব-জন্ম সার্থক করি। কোথায় মা সর্ব্বমঙ্গলে! একবার দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া কর, মা আমি তোমাকে দধি কড়মা খাওয়াইয়া সান্ত্বনা লাভ করি। মাগো! তিন দিন আহার কর নাই বলিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে। পৃথিবীতে অবতীর্ণ কালে তোমার সঙ্গের সঙ্গিনী এবং ভক্তদিগের জন্য, পাছে পিতার অপযশ হয়, এই নিমিত্ত ভাবিতে হয়। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার জন্যে অধিক ভাবিতে হইয়াছে। আমার অল্প আয়োজন আপনি ভক্ষণ করিলে পাছে তাহাদের অনাটন হয়, এই ভয়ে মা অনাহারে ছিলেন এবং আমরাও ভোজন করিতে বলি নাই। হায় হায়! করিলাম কি, প্রত্যক্ষ ছাড়িয়া প্রতিমা লইয়া ব্যতিব্যস্ত রহিলাম। ব্রাহ্মণ এইরূপে রোদন করিতে করিতে স্বগৃহে আগমন করিলেন।

৫। কোন ব্যক্তি ঈশ্বর লাভ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন। তিনি গৃহপরিত্যাগ করিয়া দেশ বিদেশ, বন উপবন, পাহাড় পর্ব্বত, নানা স্থান ভ্রমণ করিলেন কিন্তু কোথাও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না। তিনি তখন মনে মনে বিচার করিলেন যে, সর্ব্বব্যাপী ভগবান্, অন্তর্য্যামী তিনি, আমার কথা কি তাঁহার কর্ণগোচর হইতেছে না? অবশ্যই হইতেছে, তবে আমার মনোরথ পূর্ণ করিতেছেন না কেন? অবশ্যই কোন কারণ আছে। সে যাহা হউক, বোধ হয় এ জন্মে দেখা হইবে না। অতএব এ দেহ বিনাশ করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া তিনি প্রয়াগ তীর্থে আগমন করিলেন এবং তথায় নদী-কূলে একখানি বিস্তীর্ণ প্রস্তর খণ্ডের সহিত আপনার গলদেশ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, উহা জলে ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, অমুক মন্দিরে আইস, তোমার সাধ মিটিবে। তিনি এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক গলদেশের রজ্জু বিচ্ছিন্ন করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে মন্দিরে আসিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন এবং দেখিলেন যে জ্যোতির্ম্ময়ী ভগবতী তন্মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র আনন্দময়ী মাতা বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বাবা আমার ক্রোড়ে আইস। ভক্ত অমনি মাতার ক্রোড়ে শয়নপূর্ব্বক ব্রহ্মময়ী মাতার স্তন পান করিয়া লইলেন।

৬। একদা, কোন দুশ্চরিত্রা তাহার উপপতির সহিত লীলাচলে গমন করিয়াছিল। পথিমধ্যেও তাহারা কুৎসিৎ ভাব পরিত্যাগ করিতে না পারায় সমুদয় যাত্রী তাহাদের উপর মর্ম্মান্তিক বিরক্ত হইল; যাত্রীরা তদবধি যে স্থানে থাকিত, সে স্থানে তাহাদের দুই জনকে থাকিত দিত না এবং সকল পাণ্ডাকে এমন ভাবে আয়ত্ত করিয়াছিল যে, কেহই তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিত না; সুতরাং সেই বিকৃত দম্পতির ক্লেশের একশেষ হইয়াছিল। প্রায় বৃক্ষের নিম্নেই তাহাদিগকে রাত্রিযাপন করিতে হইত; এইরূপে তাহারা জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। তথায় কোন পাণ্ডা তাহাদের গৃহে স্থান না দেওয়ায় তাহাদের অগত্যা দোকানে ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। মনুষ্য-স্বভাব যতই বিকৃত হউক, পরীক্ষায় পতিত হইলে তাহাদের আর এক অবস্থা লাভ হয়। এই স্ত্রী পুরুষদ্বয় উপর্য্যুপরি নিগৃহীত ও অপদস্থ হইয়া মনে মনে আপনাদিগের নীচাবস্থা বুঝিতে পারিল এবং অতি সাবধানে জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিত, কিন্তু তাহাতেও তাহারা নিস্তার পাইল না। যখন তাহারা মন্দিরে প্রবেশ করিত, অন্যান্য যাত্রীরা পাছে তাহাদের গাত্রে গাত্র সংস্পর্শ হয়, এই আশঙ্কায় অতি ঘৃণিত ভাবভঙ্গীতে কহিত,"সরিয়া যা, তোদের আবার ধর্ম্ম কর্ম্ম কি ?" এইরূপ তিরস্কার এবং অবজ্ঞাসূচক বাক্য মনুষ্য হৃদয় কতদুর সহ্য করিতে সক্ষম হইতে পারে ? তাহারা বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া আর জগন্নাথদর্শন করিতে যাইত না। স্ত্রীলোকটার বাস্তবিক আত্মধিক্কার আসিল এবং উপপতিকে কহিল যে, দেখ তুমি আমার সর্ব্বনাশের মূলাধার। ছিলাম ভাল, তুমি আমাকে কত প্রলোভন দেখাইয়া কত ছলনা করিয়া, ভালবাসার মূর্ত্তিমান হইয়া আমার কুল শীল নষ্ট করিয়াছ। তখন আমি ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতাম না, তোমার দীনতা, আমার জন্য তোমার জীবনের অকিঞ্চিৎকর ভাব দেখিয়া যৌবন গর্ব্ব শতাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ ছিল না; যাহা কিছু ছিল, তাহা তোমার বাক্য কৌশলে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তখন বুঝিয়াছিলাম যে, সংসারে স্বামী সহবাস সুখ সম্ভোগ করিতে না পারিলে জীবনই বৃথা, একথা তুমিও আমায় বার বার বলিয়াছিলে। ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই মিথ্যা, মনের ভ্রম, ইহা বিশেষ করিয়া আমায় শিক্ষা দিয়াছিলে, কিন্তু বল দেখি, এখন কি হইল ? আমারা সাধারণের চক্ষে কুক্কুর শৃগাল অপেক্ষাও অধম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছি। আমাদের এমন দুরবস্থা ঘটিয়াছে যে, বিষ্ঠার যে স্থান আছে, তাহা

আমাদের নাই। বাস্তবিক কথাও বটে। আমরা যখন কামমদে উন্মত্ত হইয়া অগ্র পশ্চাৎ কর্ম্মাকর্ম্ম জ্ঞান দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কাম বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কলঙ্ক-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, তখন এই প্রকার দুর্গতি হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী, তাহার কিছুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।' আমি এ সকল কথা তোমায় বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমায় তখন কি কুহকেই ফেলিয়াছিলে যে, তাহাতে সমুদয় বিস্মৃত হইয়াছিলাম। হায় হায়! পাপের ফল হাতে হাতেই ফলিল! যাহা হউক, আর আমাদের এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু কোথায়ই বা যাইব! দেশে আর যাইব না, আমরা চল সমুদ্রের গর্ভে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করি, এই বলিয়া তাহারা উভয়ে সমুদ্র-তীরে অনতিবিলম্বে যাইয়া উপস্থিত হইল। প্রাণের মমতা সহজে পরিত্যাগ করা অতিশয় কঠিন, বিপদগ্রস্ত হইলে অনেকের সাময়িক বৈরাগ্য ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা যারপরনাই ক্ষণিক মাত্র। এই স্ত্রীপুরুষেরা সমুদ্র তটে আগমন করিয়া জলধির অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন পূর্ব্বক বিমোহিত হইয়া যাইল। তাহারা সমুদ্রের তরঙ্গনিচয় দর্শন করিতে করিতে, কিয়ৎ কাল পূর্ব্ব ভাব বিস্মৃত হওয়ায় কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিল। এইরূপে তাহাদের মনের কিয়ৎপরিমাণে স্থৈর্য্য সম্পন্ন হওয়ায় তাহারা পুনরায় আপনাদের অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিল। দয়াময় পতিতপাবন ভগবানের অপার মহিমা, তাহা কে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবে? তিনি কি কৌশলে যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহা তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তির জ্ঞাতব্য বিষয় নহে। তিনি কাহাকে কখন কি অবস্থায় রাখিয়া দেন, কাহাকে কখন ধার্ম্মিক করেন এবং কাহাকে কখন বর্ব্বর চূড়ামণির শ্রেণীভুক্ত করেন, তাহা তাঁহার ইচ্ছাধীন মাত্র। এইস্ত্রীপুরুষটী জীবন ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে সমুদ্রের সহায়তা লাভ করিতে আসিয়া কি অপূর্ব্ব ভাব লাভ করিল, তাহা স্মরণ করিলেও পাষাণবৎ হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। তাহাদের মনে হইল যে, কর্ম্মেই ভাল মন্দের নিদান। যে যেমন কর্ম্ম করে, তাহার ফলও সে সেইরূপ লাভ করিয়া থাকে। এই অগণন নরনারী জগন্নাথদেব দর্শন করিতে আসিয়াছে, তাহাদের অভিপ্রায় তাঁহাকে দর্শন করা, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, আমরাও জগবন্ধু দর্শন করিতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া আমাদের মনে অসদভিপ্রায় ছিল এবং তাহা কার্য্যেও সমাধা করিয়াছি। গৃহে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া আমরা উভয়ে আনন্দ করিতে পারিতাম না, বিদেশে সেই আনন্দ উপভোগ করা লীলাচলে আসিবার

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং ঠাকুর দেখা আনুষঙ্গিক ভাব ব্যতীত কিছুই নহে। ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। ভগবান্ ন্যায়বান, সে কথার কিছুই সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, যদ্যপি কার্য্যের অনুরূপ ফল্ হয়, তাহা হইলে আমাদের ভয় কি? আমরা যাহা করিয়াছি, তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন তাহা না করিলে আমাদের আর কোন বিভ্রাট ঘটিবে না। এক্ষণে অন্য চিন্তা না করিয়া আইস, আমরা জগন্নাথদেবকে চিন্তা করি, জগন্নাথ চিন্তা করিলে জগন্নাথই লাভ হইবে। তাহারা তদনন্তর সমুদ্র জলে স্নান করিয়া, আর্দ্র বস্ত্রে বামন মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিল। অনাথশরণ নারায়ণ অবিলম্বে তাহাদের হৃদয়ে অপার আনন্দ প্রেরণ করিলেন। তাহারা আপনাকে আপনি ভুলিয়া গেল। তখন তাহাদের জ্ঞান হইতে লাগিল যেন, চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য এবং জয়ধ্বনিতে শ্রবণ-বিবর পরিপূর্ণ হইতেছে ও সম্মুখে জগন্নাথদেবের রথ, তিনি তাহাতে বিরাজিত রহিয়াছেন এবং তাহারা রথের রজ্জু ধারণ-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে। ইতি মধ্যে তাহাদের ভাবাবসান হইয়া গেল। তখন তাহারা পরস্পর নিজ নিজ স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিল এবং উভয়ে এক সময়ে এক প্রকার স্বপ্ন দেখিল বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অতঃপর তাহারা উভয়ে পরামর্শ করিল যে, আমাদের ভাগ্যে কখন জগন্নাথ দর্শন এবং তাঁহার রথের রজ্জু ধারণ করা অদৃষ্টে ঘটিবে না, অতএব এই বালুকা ক্ষেত্রে রথ এবং জগন্নাথদেব অঙ্কিত করিয়া মনের সাধ পূর্ণ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। জগন্নাথ কি আমাদের কৃপা করিবেন না? আমরা না হয় পাপ কার্য্যের অভিপ্রায়ে আসিয়াছি, কিন্তু ভগবানের প্রতাপ কোথায় যাইবে? প্রভু উপদেশ দিতেন যে, "অমৃত কুণ্ডে জানিয়াই হউক কিম্বা না জানিয়াই হউক, যে পড়িয়া যায়, সেই অমর হইয়া থাকে।" ইহাদের মনে সেই ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে,প্রভু! তুমিত জগন্নাথ! আমরা কি জগৎ ছাড়া যে, আমাদের কৃপা কণা বিতরণ করিতে পারিবে না? ঠাকুর! তুমি যে দয়ার সাগর! তোমার সীমাবদ্ধ সমুদ্রের জলে স্নান করিয়াছি, কৈ তাহার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইয়াছে? আমাদের মত কোটি কোটি নরনারী এ সমুদ্রে স্নান করিলেও তখন কোন তারতম্য লক্ষিত হয় না, তুমি নিজে অসীম সমুদ্রবিশেষ। তখন তোমার দয়ার সাগরে এক বিন্দু স্থান কি আমরা পাইব না? অবশ্যই পাইব। এই বলিয়া তাহারা বালুকার উপরে রথ ও জগন্নাথ অঙ্কিত করিয়া এবং রজ্জু ধারণ পূর্ব্বক উভয়ে তাহা আকর্ষণ করিতে

লাগিল। ওদিকে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। জগন্নাথদেবকে রথে সংস্থাপন পূর্ব্বক সকলে মিলিয়া টানাটানি করিয়া যখন কোন মতে এক তিল প্রমাণ স্থান অগ্রসর হইতে পারিল না, তখন এক পাণ্ডার কিশোর সন্তানকে বন্ধন করিল। এই বালককে বন্ধন করিবামাত্র তাহাতে জগন্নাথদেবের ভাবাবেশ হইল এবং ভাবাবেশে সে কহিল যে, "দেখ তোমরা আমার পরম ভক্তদিগের অপমান করিয়া পুরীর বাহির করিয়া দিয়াছ; তাহাদের জন্য আমি নিতান্ত কাতর আছি। আজ কয়েক দিন তাহারা অনাহারে সমুদ্র তীরে পড়িয়া রহিয়াছে, আমি কেমন করিয়া আহার করিব, এই জন্য আজ করেক দিন ভোগ নষ্ট হইতেছে। ভাল মন্দের বিচার কর্ত্তা আমি, যাহাকে যাহা করিতে হয়, তাহা আমি করিব, তোমারা নিজে কি জন্য আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর? যদ্যপি তোমরা কল্যাণ কামনা কর, তবে এই মুহূর্ত্তে তাহাদের এই স্থানে লইয়া আইস।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে তৎক্ষণাৎ সমুদ্র-তীরে উপস্থিত হইয়া সেই স্ত্রীপুরুষকে বালুকার রথ টানিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল এবং তাহাদের চরণ ধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "আপনারা আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।" আমরা না জানিয়া কত কি বলিয়াছি, কত দুর্ব্বাক্য-বাণ বরিষণ করিয়াছি, তৎসমুদয় দয়া করিয়া ক্ষমা করুন; বিশেষতঃ প্রভু রথোপরি দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন, আপনারা না যাইলে তাঁহার রথ চলিবে না, অতএব আর বিলম্ব করিবেন না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐ স্ত্রীপুরুষের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হইল। তাহারা যাহা ইতিপূর্ব্বে দর্শন করিয়াছিল, তাহাই প্রত্যক্ষ করিল। তাহারা অচিরাৎ জগন্নাথদেবের সম্মুখে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সজলনয়নে কহিতে লাগিল, হে প্রভু! হে দীন নাথ! আপনাকে আমরা আর কি বলিয়া স্তুতি করিব! আপনি ত স্তুতির ঠাকুর নন। আপনাকে যে কেহ যে নামেই সম্বোধন করুক, কিন্তু আমি আপনার লজ্জানিবারণ মধুসূদন নামটীকে বড় বলি। ঠাকুর! আমরা লোক লজ্জায় লোকালয় হইতে বিতাড়িত হইয়া সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় লইতে গিয়াছিলাম, আপনি সেই লজ্জা বিমোচন করিয়া যে অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা আমরা কি বলিব? ঠাকুর! আমরা বুঝিয়াছি যে, আপনার কৃপাই মূলাধার, তাহা না হইলে আমরা কি কখন আপনার সন্নিহিত হইতে পারিতাম? রাজার সমক্ষে রাজাজ্ঞা ব্যতীত কখনই কেহ দণ্ডায়মান হইতে পারে না। এই বলিয়া সকলের সহিত মিলিত হইয়া রথ টানিয়া লইয়া গেল।

৮। কোন ব্যক্তির ঈশ্বর দর্শন করিবার জন্য মনে মনে বড় বাসনা জন্মিয়াছিল। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন যে, বিবেক বৈরাগ্য না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। তিনি তন্নিমিত্ত ঘর বাড়ী, স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। বনে গমন করিয়া অধিক দিন বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহার মন প্রাণ ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার নিমিত্ত এরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল যে, তিনি কখন এক স্থানে এক দিন স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার মনে হইত যে, কোথায় যাইলে তাঁহাকে দেখিতে পাইব, তাঁহার বচনামৃত শ্রবণ করিতে পাইব, তাঁহার চরণ বন্দনাদি করিয়া মানব-জীবন সফল করিব; কিন্তু সে আশা কোন মতে ফলবতী হয় নাই। যদিও তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ না পাইয়া উপর্য্যুপরি হতাশ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে তাঁহাকে জ্ঞানপন্থীরা কহিতেন যে, ঈশ্বর নিরাকার, তাঁহাকে দেখা যায় না। সময়ে সময়ে নিরীশ্বরবাদীরা বলিতেন যে, ঈশ্বর বলিয়া এমন কেহ নাই, যাঁহাকে দেখিতে পাইবে। সময়ে সময়ে যোগীরা কহিতেন যে, যোগাবলম্বন না করিয়া কেবল বাতুলের ন্যায় "ভগবান্ তোমায় দেখিব" এরূপ ভাবে ভ্রমণ করিলে কোন ফলই হইবে না; যদ্যপি নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে চিত্ত নিরোধ করিতে শিক্ষা কর। এরূপে যে সম্প্রদায়ের সাধকদের সহিত সাক্ষাৎ হইত, তাঁহারা নিজ নিজ ভাবের কথা কহিয়া অনুরাগী ভক্তের মনের চঞ্চলতা বাড়াইয়া দিতেন। ভক্তের মনে আর ধৈর্য্য রহিল না। তিনি ভাবিলেন যে, ঠাকুর! বড় আশায় আসিয়াছিলাম, সংসারে তোমাকেই পরম সুন্দর জ্ঞান করিয়া, জগৎকে কাক বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়াছি কিন্তু তথাপি তোমার দয়া হইল না! আমি শুনিয়াছি যে, তোমার ইচ্ছা না হইলে কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না, অতএব আমার সংসার ত্যাগ করা, বনে বনে ভ্রমণ করা, তোমায় দেখিবার নিমিত্ত প্রাণে আশার সঞ্চার হওয়া কি তোমার ইচ্ছায় হয় নাই? সে যাহা হউক, তুমি আমায় এত ক্লেশ দিয়া যদ্যপি দেখা না দাও, তাহা হইলে আমি আর কি করিব? আমি এই বুঝিলাম যে, তুমি অতিশয় নিষ্ঠুর, অতিশয় স্বার্থপর, নির্ম্মম এবং ক্রূর। লোকে তোমাকে কি গুণে যে দয়াময় বলে, তাহা আমি অদ্যাপি বুঝিতে পারিলাম না। তোমার কার্য্য-কলাপ আমার স্মরণ হইতেছে। তুমি বাস্তবিক স্বেচ্ছাময় মহাপুরুষ। যখন রাম

রূপ ধারণ কর. তখন তুমি বিনা অপরাধে মা জানকীকে বনবাস দিয়াছিলে, তুমি কৃষ্ণাবতারে গোপ গোপিকাদিগের মন প্রাণ হরণ-পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে মথুরায় যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলে। আহা! সেই গোপ গোপিকাদিগের কথা স্মরণ হইলে অতি কঠিন হৃদয়ও করুণায় আর্দ্র হয়, কিন্তু ঠাকুর! তুমি তাহা গণনায় স্থান দাও নাই। তুমি অনুগতদিগকে ক্লেশ দিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিতে বড় ভালবাস। যে দিন অক্রুরের রথে তোমাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া গোপিকারা কাতরোক্তিতে বলিয়াছিল যে, প্রভু! প্রাণনাথ! আমাদের কোথায় রাখিয়া যাইতেছ? তুমি কি জান না যে, ত্রিলোকে আমাদের আর স্থান নাই। কংশ মহারাজের সহিত বিদ্রোহ বাধাইয়া দিয়াছ, বৃন্দাবন তাঁহার অধিকার। তিনি যখন শুনিবেন যে, আমরা কৃষ্ণপ্রিয়া, তিনি সেই মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে দুর্দ্দশাপন্না করিবেন। তখন কোথায় যাইব? পাতালের অধীশ্বর বাসুকি, তথায় আমাদের স্থান হইবে না, কারণ কালীয়ের সর্ব্বনাশ কর্ত্তা তুমি; স্বর্গরাজ্যেও আমাদের স্থান হইবে না, কারণ ইন্দ্রের পূজাও তুমি বন্ধ করিয়াছ! তথাপি তুমি ফিরিয়া দেখ নাই। অতঃপর যখন তোমার হৃদয় কিছুতেই কোমল হইল না, তখন তাহারা বলিয়াছিল যে, কৃষ্ণ যদি একান্তই যাইবে, যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করা তোমার অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমরা বামদিকে শবাকার ধারণ করি, তোমার যাত্রায় শুভ ফল হইবে। তথাপি তোমার হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র উদ্রেক হয় নাই! যখন গোপাঙ্গনাদিগের সহিত এই প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলে, তখন আমার দুঃখে তোমার প্রসন্নতা লাভ করিব কিরূপে? আমি বুঝিলাম, তুমি দুর্ব্বলের কেহ নও, কংশ তোমার সহিত শত্রুতাচরণ করিয়াছিল, তাহার নিমিত্ত তোমায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, হিরণ্যকশিপু তোমার নাম শ্রবণ করিতেও ঘৃণা করিত, তাহাকে তুমি ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলে, রাবণের জন্য তোমার রামরূপ ধারণ; অতএব আমি অদ্যাবধি তোমার আর উপাসনা করিব না। তোমায় যদ্যপি কখন দেখিতে পাই, তাহা হইলে তুমি যেমন ঠাকুর, আমি তোমার সেইরূপ পূজা করিব। এই বলিয়া তিনি একটী বাঁশ সংগ্রহ করিয়া স্কন্ধে ধারণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন পথিমধ্যে তিনি আর ব্যক্তিকে একটী বাঁশ লইয়া যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই! তুমি এই বাঁশ বহন করিয়া বেড়াইতেছ কেন? তিনি কহিলেন,

কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না, অবশ্যই হেতু আছে। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলাম, আমার কিছুরই অভাব ছিল না। শাস্ত্রে শুনিলাম যে, সংসারের সুখাপেক্ষা ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিলে আনন্দের অবধি থাকে না। আমার কেমন মতিভ্রম হইল, সেই কথায় আমি ভগবানের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইবার মানসে সমুদয় বৈভব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইলাম। বনে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিলাম, তথায় হতাশ হইয়া তীর্থাদি পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু তাঁহার দেখা কোন স্থানেই পাইলাম না। তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে কোন স্থান বাকী রাখি নাই। তখন আমার মনে হইল যে, কে বলে তিনি সর্ব্বব্যাপী? কে বলে তিনি অন্তর্য্যামী? সমুদয় মিথ্যা কথা! শুনিয়াছি, ভগবান্ নিজে শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তিনি মিথ্যা কাল্পনিক কথাগুলি যেমন লিখিয়া আমার ক্লেশোৎপাদন করিয়াছেন, যদি কখন তাঁহাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাঁহার গুহ্যদেশে এই আ-ছোলা বাঁশ প্রবিষ্ট করিয়া দিব। এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক প্রথম ব্যক্তি কহিলেন, আমিও এই নিমিত্ত বাঁশ লইয়া বেড়াইতেছি; আইস উভয়ে একত্রে মিলিত হইয়া তাঁহাকে অনুসন্ধান করি। অনুরাগীর ভগবান্, এই সাধকদ্বয়ের একাগ্রতা দেখিয়া আর তিনি স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ পূর্ব্বক তিনি উঁহাদের সমক্ষে সমাগত হইয়া কহিলেন, বাপু! তোমরা উভয়ে বাঁশ লইয়া বেড়াইতেছ কেন? তাঁহারা নিজ নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন। ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া অতি কাতর ভাবে কহিলেন, তোমরা যাহা শাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছ, তাহা কিছুই মিথ্যা নহে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, এ পর্য্যন্ত কি ভগবানের নিমিত্ত তোমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল? আনন্দ লাভের লালসায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এই কামনায় তোমাদের মন প্রাণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, সে কামনা তোমাদের পূর্ণ হইয়াছে কি না একবার গত জীবন চিন্তা করিয়া দেখ। সংসারে অবস্থিতি কালে প্রতি মুহূর্ত্তে সুখ এবং দুঃখ সম্ভোগ করিয়াছ, অবিচ্ছেদ সুখ সংসারে নাই, তাহা এক্ষণে তোমাদের স্মরণ হইতেছে, কিন্তু বল দেখি, এই বাঁশ ধারণ করিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাদের মনে অবিচ্ছিন্ন আনন্দ বিরাজিত ছিল কি না? সত্য করিয়া বল, ভগবানের দর্শনের জন্য তোমরা যে যে স্থান ভ্রমণ করিয়াছ, তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়া প্রকৃতির শোভা দর্শন পূর্ব্বক আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছ। এক্ষণে আমি দেখি-

তেছি যে, ঈশ্বর দর্শনের জন্য তোমাদের স্পৃহা জন্মিয়াছে, আর এখন অন্য কোন কামনাতে মনের আকাঙ্ক্ষা নাই কিন্তু তোমাদের বাঁশের ভয়ে ভগবান্ সাহস করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, তোমরা যদ্যপি অভয় দান কর, তোমরা যদ্যপি বাঁশ দুইটী ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে তিনি নির্ভয়ে আসিতে পারেন। ব্রাহ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অশ্রু নিবারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বাঁশ দুইটী দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, ঠাকুর! আপনি যেই হউন, আপনাকে আমরা প্রণাম করি। আমাদের প্রকৃত অবস্থাই বলিয়া দিয়াছেন। আমরা আনন্দের জন্যই লালায়িত হইয়া এতদিন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, ভগবান্কে দেখা যায়, একথা কখন মনে হইত এবং কখন তাহাতে অবিশ্বাস জন্মিত। ঠাকুর! আপনাকে দেখিয়া আমাদের প্রাণ কেমন করিতেছে! আমাদের বলিয়া দিতে পারেন, কোথায় যাইলে সেই ভুবনমোহনরূপ দেখিতে পাইব? ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া অমনি শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করিলেন।

ঈশ্বর লাভের পাত্র কে?

১৬০। যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমনই লাভ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে তাঁহাকে চায়, সেই তাঁহাকে পায়, যে তাঁহাকে না চাহিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য কামনা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়।

পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রামকৃষ্ণদেবের এই কথার জাজ্বল্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি যে প্রকার কামনায় ফিরিতেছে, সে ব্যক্তির সে অভিপ্রায় কি সিদ্ধ হইতেছে না? যে পণ্ডিত হইবার জন্য চেষ্টা করে, সে পণ্ডিত হয়, যে চোর হইবার জন্য ইচ্ছা করে, সে পাহাড়ে-চোর হইতে পারে। যে সতী হইতে চাহে, সে সতী হয় এবং যে বেশ্যা হইতে ইচ্ছা করে, সে বেশ্যা হইয়া যায়। যে নাস্তিক হইবে বলিয়া আপনাকে প্রস্তুত করে, সে নাস্তিকচূড়ামণি হয়; যে ঈশ্বর দর্শনাভিলাষী হয়, তাহার মনোসাধ সেই

রূপেই পূর্ণ হইয়া থাকে। কখন কখন মনের সাধ মিটে না, ইচ্ছা থাকিলেও তাহা পূর্ণ হয় না, তাহার কারণ স্বতন্ত্র প্রকার। মনুষ্য যদ্যপি গরু হইতে চাহে, তবে তাহার সে সাধ পূর্ণরূপে কেমন করিয়া সফল হইবে ? এই প্রকার অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখন কখন সম্পূর্ণ হয় না বটে, কিন্তু অবস্থান্তরে বোধ হয় তাহা হইবার সম্ভাবনা।

রামকৃষ্ণদেবের আজ্ঞাক্রমে বুঝা যাইতেছে যে, আশ্রমবিশেষে ঈশ্বর লাভ হয় এবং আশ্রমবিশেষে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা নহে। তিনি বলিয়াছেন যে, মন লইয়া কথা—ভাব লইয়া ব্যবস্থা। গৃহীই হউক, আর গৃহত্যাগী উদাসীনই হউক, তাহাদের শারীরিক অবস্থান্তর লইয়া ঈশ্বরের কার্য্য হইবে না ; সংসারেই থাকুক আর অরণ্যেই থাকুক, মন যদি ঈশ্বরে থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর লাভই হইবে। মনে ঈশ্বর ভাব না থাকিলে দেহের গতিতে ঈশ্বর পাওয়া যাইবে না। কারণ,

১৬১। যে ঈশ্বরের প্রতি মন প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক দিন যাপন করে, তাহার মনে অন্য কোন ভাব না আসায়, তাহা দ্বারা অন্য কোন প্রকার কার্য্য হইতে পারে না। সে যাহা করে, যাহা বলে, ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নহে ; এই নিমিত্ত তাহারই ঈশ্বর লাভ হয়। যে ব্যক্তি অন্য বিষয়ে মন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, তাহার সেই পরিমাণে ঐশ্বরিক ভাব বিচ্যুত হইয়া যায়, সুতরাং সে তত পশ্চাৎ হইয়া পড়ে।

১৬২। সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর লাভ করা অতি সুকঠিন, কারণ চতুর্দ্দিকে প্রলোভন আছে। সকল প্রলোভন হইতে মনকে রক্ষা করিয়া ঈশ্বর লাভ করা বড়ই দুরূহ।

১৬৩। মনুষ্যেরা কামিনী-কাঞ্চন রসে অভিষিক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই রস না মরিলে তাঁহাকে লাভ করা যায় না।

সাধারণ ব্যক্তিদিগের প্রতি এই নিয়ম। গৃহী বা উদাসীন হউক, যাহার কামিনী-কাঞ্চন রসে মন সংস্পর্শ করিবে, তাহারই সর্ব্বনাশ। ইতিপূর্ব্বে এই সম্বন্ধে নানাবিধ দৃষ্টান্ত প্রদান করা গিয়াছে। যাহারা ঈশ্বর-পাদপদ্মে মন

স্থির রাখিতে পারিবে, তাহাদের কি সংসার, কি কানন, উভয়বিধ স্থানই সমান।

১৬৪। কামিনী-কাঞ্চন রসযুক্ত মন কাঁচা সুপারির ন্যায়। সুপারি যতদিন কাঁচা থাকে, ততদিন খোসার সহিত জড়িত থাকে, কিন্তু রস মরিয়া গেলে সুপারি এবং খোসা পৃথক হইয়া পড়ে। তখন উহা নাড়া দিলে ঢক্ ঢক্ করিতে থাকে।

এ স্থানে সুপারি মনের সহিত এবং দেহ খোসার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। দেহ সম্বন্ধে কামিনী-কাঞ্চন পরম্পরা সূত্রে উহাদের সহিত মনের সম্বন্ধ স্থাপন হয়। মনকে যদ্যপি দেহ হইতে স্বতন্ত্র করা যায়, তাহা হইলে কামিনী-কাঞ্চনও স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে; কিন্তু এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া যারপরনাই কঠিন ব্যাপার। উদাসীনেরা যখন সংসার ছাড়িয়াও হয় কামিনী না হয় কাঞ্চনের আসক্তি হইতে পরিত্রাণ পাইয়াও পায় না, তখন তাহাতে ডুবিয়া থাকিলে কস্মিনকালে যে তাহা হইতে মন বিচ্ছিন্ন হইবে, তাহার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই কিন্তু প্রভু কহিয়াছেন যে, সংসারে থাকিয়া যে তাঁহাকে ডাকে, ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করেন। ভগবানের কৃপা ব্যতীত এ প্রকার ব্যক্তির উপায় নাই। তিনি বলিতেন—

১৬৫। সিদ্ধ চারি প্রকার। ১ম নিত্য-সিদ্ধ, ২য় সাধন সিদ্ধ, ৩য় স্বপ্ন-সিদ্ধ, ৪র্থ কৃপা বা হঠাৎ-সিদ্ধ।

অবতারাদি নিত্যসিদ্ধ। তাঁহারা সাধন না করিয়া সিদ্ধ। বিবেক বৈরাগ্যাদি নিয়মপালন দ্বারা যে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করে, তাহাকে সাধন-সিদ্ধ বলে। এস্থানে সাধকের শক্তির প্রতি নির্ভর করিতেছে। স্বপ্ন সিদ্ধিতে সাধকের কিঞ্চিৎ বিবেক বৈরাগ্য এবং কিঞ্চিৎ ঈশ্বরের কৃপা মিশ্রিত থাকে। হঠাৎ সিদ্ধে সাধক কোন কার্য্য না করিয়া তাঁহার কৃপায় একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া কামিনী-কাঞ্চন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়, এ স্থানে "স্বতন্ত্র" অর্থে সন্ন্যাসী নহে। কৃপাসিদ্ধ ব্যক্তিরা সংসারে থাকিয়া সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য সাংসারিক ব্যক্তির ন্যায় সমাধা করিয়াও ঈশ্বরের বিমল বদনকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। কর্ম্মীরা এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের নিতান্ত শত্রু। কারণ,তাহারা কামিনী

কাঞ্চন সুখ পরিত্যাগ করিয়াও ঈশ্বরের সহিত সহবাস সুখ লাভ করিতে পারে না, কিন্তু গৃহীরা তাঁহার কৃপায় একদিকে ভগবৎ রস, আর একদিকে কামিনীকাঞ্চন-রস আস্বাদন করিতে কৃতকার্য্য হয়। এ কথা কর্ম্মীরা না বুঝিতে পারে, না বৈরীভাব পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয় ? এক ব্যক্তি মস্তকের ঘর্ম্ম ভূমিতে ফেলিয়া যে অর্থ আনয়ন করে, তাহাতে উদর পূর্ণ হয় না ; কিন্তু আর একজন বড় মানুষের জামাই হইয়া পর দিন হইতে সুখের পারাবার লাভ করে, তাহার অবস্থা দেখিয়া শ্রমজীবীদিগের বক্ষঃশূল না জন্মিবে কেন ?

সন্ন্যাসী হইলেই যে কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি যাইবে, তাহা নহে, ইচ্ছা করিয়া না জঞ্জাল বাড়াইলে তাঁহাদের সে ভাবনা থাকিতে পারে না। তাঁহাদের সহিত গৃহীদের তুলনা করা উচিত নহে, অথবা সন্ন্যাসাশ্রমেই ঈশ্বর লাভ হয় এবং গৃহস্থাশ্রমে তাহা হয় না, এ কথা বলা নিতান্ত অসঙ্গত। গৃহীরা গৃহ ছাড়িয়া যাইবে কোথায় ? এবং তাহাতেই বা ফল কি ? গৃহীরা যেমন, তাহাদের ঠাকুরও সেইরূপ হইয়া থাকেন। অদ্যাবধি ভগবান্ যতবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি ততবারই গৃহী হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীর গৃহে কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই। গৃহীদিগের জন্যই ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ঈশ্বর, সন্ন্যাসীদিগের জন্য তাহা নহে। এই নিমিত্ত সন্ন্যাসীদিগের গৃহস্থের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করা বা উপদেশ দেওয়া অনধিকার চর্চ্চা এবং গৃহী হইয়া সন্ন্যাসব্রত শিক্ষা দিতে চেষ্টা পাওয়া যারপরনাই উপহাসের কথা। প্রভু কহিয়াছেন—

১৬৬। "আম্‌লী কর্‌কে করে ধ্যান্।
গৃহী হোকে বতায়্ জ্ঞান ॥
যোগী হোকে কুটে ভগ্
এ তিন আদ্‌মী কলিকা ঠক ॥

অর্থাৎ গাঁজা কিম্বা সুরাদি সেবন পূর্ব্বক ধ্যান করাকে ধ্যান বলে না, ঘোর সংসারীর মুখে বৈরাগ্য কথা, সন্ন্যাসী হইয়া স্ত্রী বিহার, এই ত্রিবিধ ব্যক্তি কলিকালে জুয়াচোর-বিশেষ।

গৃহীরা নিজে ভোগী, তাঁহাদের ঈশ্বরও তদ্রূপ, সন্ন্যাসীরা ত্যাগী, ঈশ্বরও নিরাকার—উপাধিশূন্য। ঈশ্বরোপাসনায় গৃহীদের যদিও কামিনী-কাঞ্চন

দ্বারা কোন দোষ হয় না কিন্তু তাহাতে লিপ্ত থাকা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। নির্লিপ্ত অর্থে সন্ন্যাসী হওয়া নহে। তিনি কহিয়াছেন—

১৬৭। সংসার আমার নহে জ্ঞান করিবে; এই সংসার ঈশ্বরের, আমি তাঁহার দাস, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে আসিয়াছি।

১৬৮। স্ত্রীকে আনন্দরূপিণী জ্ঞান করিবে। সর্ব্বদা রমণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ধৈর্য্যরেতা হইতে চেষ্টা করিবে। সর্ব্বদা রমন করিলে শুক্রক্ষয় জনিত মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়। দ্বাদশ বৎসর ধৈর্য্যরেতা হইতে পারিলে "মেধা" নামক একটী নাড়ী জন্মে। এই মেধানাড়ী জন্মিলে তাহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়।

১৬৯। স্ত্রীর অনুরোধে ঋতু রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যদ্যপি স্ত্রীর তাহাতে রুচি না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে লিপ্ত হইবে না।

১৭০। বিষয় চিন্তা মনে স্থান দিবে না। যখন যাহা করিতে হইবে, তাহা করিয়া যাইবে।

১৭১। পাতকোয়ার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিলে যেমন সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হয়, সংসারকেও তদ্রূপ জ্ঞান করিবে।

১৭২। যদ্যপি গৃহে কালসর্প থাকে, সেই গৃহে বাস করিতে হইলে যেমন মন সর্ব্বদা ভয়যুক্ত থাকে, সংসার সেই প্রকার জানিবে।

এইরূপ অবস্থায় যদ্যপি সাংসারিক লোক সংসারে অবস্থিতি করেন এবং হরিপাদপদ্মে রতি মতি থাকে, তাহা হইলে সেই ভাগ্যবান ঈশ্বর লাভ করিয়া থাকেন।

১৭৩। কাঁঠাল ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে, যেমন হস্তে তৈল মাখাইলে উহাতে আর কাঁঠালের আঠা লাগিতে পারে না, তেমনি এই সংসাররূপ কাঁঠাল জ্ঞানরূপ তৈল লাভ করিয়া সম্ভোগ করিলে আর কামিনী-কাঞ্চন আঠা উহার মনে সংলগ্ন হইতে পারিবে না।

১৭৪। সর্প অতি বিষাক্ত, তাহাকে ধরিতে যাইলে তখনি দংশন করিয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি ধূলা পড়া শিখিয়াছে, সে ব্যক্তি সাপ ধরা কি, সাতটা সাপ গলায় জড়াইয়া খেলা করিতে পারে।

সাংসারিক লোকেরা সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে পারে না বলিয়া যাঁহারা সংস্কারাবৃত হইয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভুল এবং যাঁহারা সংসার না ত্যাগ করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই বলিয়া প্রতিঘোষণা করেন, তাহাও তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভুল। কর্ম্মের সহিত অবশ্যই ফলের সম্বন্ধ আছে, অতএব ভগবান্‌কে যিনি লাভ করিব বলিয়া মনে ধারণা করেন, তিনি সেই কর্ম্মের ফলে ভগবান্‌কে লাভ করিয়া থাকেন। ইহাতে সন্দেহের বিষয় কি আছে? কোন আশ্রম-বিশেষে ভগবানের লাভ পক্ষে সহায়তা করে এবং কোন আশ্রম-বিশেষে তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা বলিয়া যে এই কথাটী চিরসিদ্ধান্ত কথা, তাহার অর্থ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ সংসারে লিপ্ত হইয়া নির্লিপ্ততার ভাব দেখাইবার নিমিত্ত পুনরায় সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। তিনি ছোট হরিদাসকে সন্ন্যাসীর কঠোর নিয়ম পালন করিতে কহিয়াছিলেন, রূপ-সনাতনদিগকে উজিরী পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন, কিন্তু অদ্বৈত ও শ্রীবাসাদিকে সংসারের বহির্ভূত করেন নাই। প্রভু রামকৃষ্ণদেব কি করিয়াছিলেন? তিনি কি প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন, তাহাও একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া সামান্য দিন লেখা পড়া করেন। পরে কিছুকাল কাজকর্ম্ম করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর তাঁহার ভাবান্তর হয়, সেই নিমিত্তই হউক, কিম্বা জীব শিক্ষার্থেই হউক, তাঁহার স্ত্রীর সহিত মায়িক সম্বন্ধ রাখিতে পারেন নাই, অথবা রাখেন নাই। তিনি সাধনকালে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন কিন্তু

কখন সন্ন্যাসীর বেশে থাকিতেন না এবং সাধারণ গৃহীদিগের ন্যায় পরিচ্ছদও পরিধান করিতেন না। এই নিমিত্ত কেহ সহসা তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। তিনি গদীর উপর শয়ন করিতেন, আত্মীয়েরা নিকটে থাকিত এবং স্ত্রীকেও সময়ে সময়ে কাছে রাখিতেন। তিনি কাহার নিকট কিছুই গ্রহণ করিতেন না, কেহ কিছু প্রদান করিতে যাইলে তিনি আপত্তি করিতেন, জোর করিয়া দিয়া আসিলে তাহা অপরকে প্রদান করিতেন। তিনি রাসমণির ঠাকুর-বাটীতে থাকিতেন, তথাপি তিনি কহিতেন, আমি কাহার কিছুই গ্রহণ করি নাই। ইহার অর্থ কি? রাসমণির ত গ্রহণ করিতেন, তবে কেন এমন অন্যায় কথা তাঁহার মুখে বাহির হইত? ইহার কারণ আছে। তিনি অন্যায় কিছুই বলেন নাই। বর্ত্তমান সময়ানুযায়ী তিনি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসীর ভাব তাঁহার অন্তরের কথা ছিল। গৈরিক বসন পরিধান করা পূর্ব্বকালের সন্ন্যাসীদিগের পরিচ্ছদ ছিল, একালে তাহা স্বেচ্ছাধীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গৃহী হইয়া সন্ন্যাসীর ভাব অবলম্বন করাই বোধ হয় তাঁহার ভাব ছিল। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া এই বুঝা যায় যে, প্রথমে লেখা পড়া শিখিবে কিন্তু অর্থকরী বিদ্যার জন্য বিশেষ লালায়িত হইবে না। এইজন্য তিনি পঠদ্দশাতেই বলিয়াছিলেন, "যে বিদ্যায় কেবল চাল কলা লাভ হয়, তাহা আমি শিখিব না।" পরে কিয়দ্দিন ধনোপার্জ্জন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহাও বিশেষ প্রয়োজন, এবং যখন নিজে কর্ম্ম করিতে অশক্ত হইয়াছিলেন, মথুর বাবু তখন তাঁহার মাসিক বেতনটী মাসহারার (পেন্‌সন) হিসাবে দিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি এই নিমিত্ত কহিতেন, "আমি কাহার কিছুই গ্রহণ করি নাই"। রামকৃষ্ণদেব যদ্যপি মন্দিরে কর্ম্ম না করিতেন, তাহা হইলে রাসমণির গ্রহণ করা সম্পূর্ণ দানের হিসাব হইত। পেন্‌সান, দান নহে; একথা সকলেই বুঝিতে পারেন। তাঁহার স্ত্রী ছিল, তিনি যে ভাবে তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন, তাহা জীবের পক্ষে সাধ্যাতীত। তিনি সেই জন্য বলিতেন, "আমি যতদূর বলি, তোমরা কি তাহা করিতে পারিবে, তবে ষোল টাং বলিলে, যদি এক টাং করিতেও পার, ত যথেষ্ট হইবে।" এইজন্য বলি যে, সংসারে থাকিয়াই হউক কিম্বা সংসারের বাহিরেই হউক, বৈরাগ্যের দ্বারা কামিনী-কাঞ্চন হইতে মনকে ঈশ্বরে সংলগ্ন পূর্ব্বক যে থাকিতে পারিবে, সেই ঈশ্বর লাভ করিবে।

একদা একটী ভক্ত ভক্তিভাবে বিহ্বল হইয়া গমন করিতেছিলেন।

তাঁহার তখন দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। পথিমধ্যে ধোপারা কাপড় কাচিয়া শুকাইতে দিয়াছিল, ভক্ত ঐ বস্ত্রগুলির উপর দিয়াই চলিয়া যাইতেছিলেন। ধোপারা বার বার নিষেধ করিয়া কহিতে লাগিল কিন্তু তাহাদের কথা ভক্তের কর্ণগোচর হইলেও ভাবের আবেশে তিনি উচিতমত কার্য্য করিতে পারিলেন না। ধোপারা তদ্দৃষ্টে লগুড় হস্তে দ্রুতপদে আগমন পূর্ব্বক ভক্তের পৃষ্ঠে উত্তম মধ্যম ব্যবস্থা করিল। ধোপা কর্তৃক ভক্ত সংস্পর্শিত হইবামাত্র তাঁহার ভাবের বিরাম হইয়া যাইল এবং তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ধৌত বস্ত্রগুলি তাঁহার দ্বারা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ধোপারা নিগ্রহ করিয়াছে। তিনি মনে করিলেন যে, সকলই নারায়ণের ইচ্ছা! ধোপাদের সহিত কোন কথা না কহিয়া তিনি হরিগুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

ভক্ত নারায়ণের প্রতি নির্ভর করিবামাত্র, সে কথা তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তিনি তৎকালে ভোজন করিতে উপবেশন করিয়াছিলেন। ভক্তের নিগ্রহ সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি তৎক্ষণাৎ ভোজন পাত্র ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। লক্ষ্মী তদ্দৃষ্টে অতিশয় কাতর ভাবে নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর! ভোজনের ব্যাঘাত হইল কেন? নারায়ণ দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে নারায়ণ ফিরিয়া আসিলেন। লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর! ভোজন না করিয়া কোথায় গিয়াছিলেন, আবার এই অল্প সময় মধ্যেই বা কোথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন? নারায়ণ ঈষৎ হাস্যাননে কহিলেন যে, আমার একটী ভক্তকে ধোপারা প্রহার করিয়াছিল, ভক্ত তাহাদের কোন কথা না বলিয়া আমার উপর বিচারের ভার অর্পণ করে, সুতরাং আমাকে ধোপাদিগের দণ্ড দিবার জন্য যাইতে হইয়াছিল, কিন্তু ভক্তটী কিয়দ্দূর গমন করিয়া মনে মনে স্থির করিল যে, নারায়ণের হস্তে বিচারের ভার না দিয়া আমি উহাদের দুই কথা বলিয়া যাই। সে আপনার বিচার আপনি করিতে চাহিল, সে স্থলে আমি যাইয়া কি করিব! এই ভক্তের এখন ধোপার স্বভাব হইয়াছে।

১৭৫। সীতারাম ভজন কর্‌লিজো, ভুখে অন্ন, পিয়াসে পানি, ন্যাংটায় বস্ত্র দিজো।

ক্ষুধাতুর ব্যক্তিকে আহার, পিপাসান্বিত ব্যক্তিদিগকে বারি এবং বস্ত্রহীন

ব্যক্তিদিগকে বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া যে ভগবানের নাম ভজনা করে, সেই ভগবান্‌কে লাভ করিয়া থাকে।

১৭৬। যাহার ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, তাহারই অনায়াসে ঈশ্বর লাভ হইয়া থাকে; অর্থাৎ সরল বিশ্বাসেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

১৭৭। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবের তিনের দয়া হ'ল। একের দয়া না হ'তে জীব ছারে খারে গেল।

একের অর্থ মনকে বুঝাইয়া থাকে। যে যতই বলুক আর যতই চেষ্টা করুক, আপনি তাহা গ্রহণ না করিলে, অন্যের দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না।

সাধারণ উপদেশ।

—:*:—

সন্ন্যাসীর প্রতি।

১৭৮। যাহা একবার পরিত্যাগ করিয়াছ, আর তাহাতে আকৃষ্ট হইও না; একবার থুথু ফেলিয়া তাহা পুনরায় ভক্ষণ করিও না।

একবার সংসার ছাড়িয়া ফিরিয়া ঘুরিয়া, তাহাতে আবার প্রবেশ না করাই তাঁহার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য। কালের কুটিল গতিতে সত্যকে অসত্য দেখায়, অসত্যকে সত্য বোধ করায়। সন্ন্যাসীরা গৈরিক পরিলেই মনে অভিমান করেন যে, তাঁহাদের সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহা নহে। সন্ন্যাস একটা আশ্রমবিশেষ, তথায় অতি সাবধানে থাকিতে হয়। যাহাতে মনে কোন মতে কামিনী-কাঞ্চনের ভাব না আসিতে পারে, এইজন্য তাঁহাদের লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে হয়। সন্ন্যাসী হইয়া, যদ্যপি লোকালয়ে গৃহীদিগকে কৃতার্থ করিবার মানসে ঘুরিয়া বেড়ান হয়, তাহা হইলে যাহার অন্ন ভক্ষণ করা হইবে, তাহাদের হইয়া দুটা কথা কহিতে বাধ্য করিবে; এইজন্য সন্ন্যাস এত কঠিন কিন্তু যাঁহাদের সন্ন্যাসভাব স্বভাব সিদ্ধ, তাঁহাদের গৃহ ভাল

লাগে না, স্ত্রী ভাল লাগে না, তাহাদের তিনি সেই ভাব বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত কহিতেন।

১৭৯। গৃহীদিগের সংসর্গে থাকা উচিত নহে, গৃহীদিগের অন্ন ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ।

১৮০। যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দধি মন্থন করিলে মাখন উঠিয়া থাকে, কিন্তু রৌদ্র উঠিলে মাখন গলিয়া যায়, আর মাখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না; সেইপ্রকার কামিনী-কাঞ্চন-রূপ দধি হইতে মনকে পৃথক করিয়া সচ্চিদানন্দরূপ স্বচ্ছ জলে রাখিয়া দিলে সুন্দররূপে ভাসিতে থাকে। শুকদেবই তাহা করিয়াছিলেন, কেহ বা মাখন তুলিয়া ঘোলের সহিত রাখিয়া দেয়। জ্ঞানীদিগের সংসারে থাকা তদ্রূপ; মুনি ঋষিরাই তাহার দৃষ্টান্ত।

১৮১। যাহারা বাল-সন্ন্যাসী, তাহারা নিদাগী খৈয়ের ন্যায়।

১৮২। যেমন কোন ফল পক্ষীর উচ্ছিষ্ট হইলে আর তাহা ঠাকুরকে নিবেদন করা চলে না, সেই প্রকার কামিনী-কাঞ্চনের ভাব মনোমধ্যে একবার প্রতিবিম্ব পড়িলেও তাহাকে দাগী বলিতে হইবে। তাহা দ্বারা অন্য কার্য্য হইতে পারে বটে কিন্তু বিশুদ্ধ-সন্ন্যাস-ভাব হইবার নহে।

কোন ব্যক্তির বৈরাগ্যভাব হওয়ায় তিনি সংসার ছাড়িয়া বনবাসী হইবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী স্বামীর ভাব দেখিয়া, তিনিও সন্ন্যাসিনী হইতে প্রস্তুত হইলেন। এই দম্পতি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন তাঁহারা কোন স্থানে কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ হইয়া পড়েন। সন্ন্যাসী পথিমধ্যে কতকগুলি হীরক খণ্ড পতিত দেখিয়া মনে করিলেন যে, আমার স্ত্রী যদি দেখিতে পায়, তাহা হইলে হয় ত তাহার লোভ জন্মিবে; এই বলিয়া ধূলি দ্বারা তাহা আবৃত করিয়া

রাখিলেন। সন্ন্যাসিনী দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার স্বামী ধূলি লইয়া কি করিতেছেন, তিনি নিকটে আসিয়া কহিলেন, হ্যাঁগা তুমি কি করিতেছিলে? সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, পরে সন্ন্যাসিনী বামপদে ধূলারাশি সরাইয়া হীরক খণ্ড দেখিতে পাইয়া কহিলেন, আজও যদি হীরকে মৃত্তিকায় প্রভেদ জ্ঞান না যাইয়া থাকে, তবে অরণ্যে আসিয়াছ কেন?

গৃহীদিগের প্রতি।

১৮৩। যেমন মাছি কখন ক্ষত স্থানে বসে এবং কখন ঠাকুরের নৈবেদ্যতেও বসে; সংসারী জীব তদ্রূপ কখন হরি কথায় মনোনিবেশ করে, আবার কখন কামিনী-কাঞ্চনের রস পান করে। মৌমাছির স্বভাব তাহা নহে, তাহারা ফুলেই বসে, মধুও তাহারাই খায়। পরমহংসাশ্রমী ব্যক্তিরা মৌমাছির ন্যায়, তাঁহারা হরিপাদপদ্মেই সর্ব্বদা বসিয়া মকরন্দ পানে বিভোর হইয়া থাকেন।

১৮৪। কোন স্থানে মৎস্য ধরিবার জন্য ঘূনি পাতিয়া রাখিলে মৎস্যেরা তাহার মধ্যে সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু আর বাহির হইতে পারে না। যে নির্ব্বোধ মৎস্য, সে ঘূনির ভিতরে কিঞ্চিৎ জল পাইয়া তাহাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, পরে যখন ঘূনির স্বামী আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া লয়, তখন তাহার প্রাণ সংহার হইয়া থাকে। ঘূনির ভিতরে পড়িলে প্রায় রক্ষা নাই, কিন্তু যদ্যপি কোন মৎস্য পলাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে পলাইবার ছিদ্র অনুসন্ধান করিলে কোথাও না কোথাও তাহা মিলিতে পারে। কারণ ঘূনির ফাঁক গুলি সর্ব্বত্র সমান হয় না; কোন স্থানে বেশী কম থাকে; সংসার তদ্রূপ। একবার সংসার-ঘূনিতে পড়িলে আর জীবের রক্ষা থাকে না। তাহাদের সে অবস্থা হইতে কখনও বাহিরে আসা সম্ভব নহে, তবে বিশেষ চেষ্টা করিলে

একটী দুইটী ব্যক্তি পলাইতে পারে কিন্তু ভগবানের কৃপা হইলে ঘূনি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; তখন সকল মাছ গুলি বাঁচিয়া যায়। সেইরূপ যখন কোন অবতার আসিয়া উপস্থিত হন, তখনই সকল জীবের কল্যাণ হইয়া থাকে। তাহারা ভাঙ্গা ঘূনির ন্যায় কখন ভিতরেও যায়, আবার বাহিরেও আসিতে পারে।

১৮৫। জীব গুটীপোকার ন্যায়। সংসার—গুটী, জীব—পোকা বিশেষ; জীব মনে করিলে গুটী কাটিতে পারে। আবার মনে না করিলে তাহার ভিতর বসিয়াও থাকিতে পারে। যদ্যপি অগ্রে গুটীর মুখ না কাটিয়া রাখে, তাহা হইলে কোন্ সময়ে গুটী ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইবে, তাহা কে জানে? তখন আর তাহার কল্যাণ থাকে না। জীব, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া যদ্যপি সংসার গুটীতে বসিয়া থাকে, তাহা হইলে ইচ্ছামত তাহাতে থাকিতেও পারে এবং ইচ্ছামত পলাইতেও পারে।

১৮৬। সংসারে থাকিতে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। কারণ সংসার শব সাধনার মড়াবিশেষ। শব সাধনায় মড়ার উপরে বসিতে হয়, সাধন কালে মড়া মধ্যে মধ্যে হাঁ করে, সেই সময়ে তাহার মুখে চাউল, ছোলা ভাজা এবং মদ না দিলে সে দড়াদড়ি ছিঁড়িয়া সাধন ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। সেই প্রকার সংসারে যখন স্ত্রী আসিয়া বলিবে, "চাল নাই, ডাল নাই, নূন তেল নাই," তখন তুমি চুপ্ করিয়া আর ধ্যান করিতে পারিবে না। তুমি যেখানে পাও, তাহা আনিয়া দিতেই হইবে, না আনিয়া দিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। যদ্যপি সংসারে

থাকিয়াই কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে অগ্রে চাল ডালের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

রামকৃষ্ণদেবের ভাব এই জন্যই এত সুন্দর। সংসারে সংসারীর ধর্ম্ম পালন কর এবং বৈরাগী হইলে আর সংসারের সংশ্রব রাখিও না। এদিক ওদিক দুই দিক কি একস্থানে হয়? একদা তাঁহার কয়েকটী গৃহী ভক্ত গৈরিক বসন, গৈরিক উত্তরীয়, একতারা, বাঘছাল ইত্যাদি সন্ন্যাসীর আসবাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া সে সমুদয় দ্রব্যগুলি বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন।

১৮৭। হে গৃহী, অতিশয় সাবধান! কামিনী-কাঞ্চনকে বিশ্বাস করিও না। তাহারা অতি গুপ্তভাবে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়া লয়।

১৮৮। জীব যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন তাহাদের মন নিক্তির কাঁটার ন্যায় একস্থানে থাকে। নিক্তির যেমন দুইটী পাল্লা আছে, তেমনি জীবের দুই দিকে দুইটী অবিদ্যা এবং বিদ্যারূপা পাল্লা আছে। সংসারের খেলা প্রায় সকলই অবিদ্যার; সুতরাং ক্রমে ক্রমে অবিদ্যাপাল্লা ভারি হইয়া মন কাঁটা সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, মনকে পূর্ব্বাবস্থায় আনিতে হইলে হয় অবিদ্যার গুরুত্বকে ফেলিয়া দিতে হইবে, না হয় বিদ্যার দিক্ বৃদ্ধি করিয়া মনের পূর্ব্বভাব স্থাপন করিতে হইবে।

১৮৯। প্রকৃতির দুই কন্যা, বিদ্যা এবং অবিদ্যা। বিদ্যার পুত্র বিবেক এবং বৈরাগ্য। অবিদ্যার ছয় পুত্র, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য। সংসার আমাদের অবিদ্যার কার্য্যেই পরিপূর্ণ, বিদ্যা শিক্ষা অর্থের নিমিত্তই, সুতরাং তাহা কামের কার্য্য। স্ত্রীলাভ করা তাহাও কামের কার্য্য, অভিমানাদি অন্যান্য রিপুর কার্য্যবিশেষ। তাহাতে বিবেক

বৈরাগ্যের লেশমাত্রও থাকে না। সুতরাং, এমন মনের দ্বারা আর কি হইতে পারে? এইজন্য সাংসারিক লোকেরা ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়াও কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। অবিদ্যার ভার না কমাইলে কি হইবে? বিদ্যার কার্য্যেও অবিদ্যা আসিয়া সহায়তা করে। যেমন ধর্ম্মার্থে অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাতে অভিমান আসিলেই যে টুকু বিদ্যার দিকে গুরুত্ব হইয়াছিল, তাহা বিপরীত দিকের সহিত সমভার হওয়ায় কোন ফল হয় না। ভিতরকার এই ব্যাপার অবগত হইয়া যে ব্যক্তি সাবধানে কার্য্য করেন, সেই সুচতুর ব্যক্তি; তিনিই এই সংসারে জিতিয়া যান।

১৯০। মন প্রথমে পূর্ণ থাকে, তাহার পর বিদ্যা শিক্ষায় দুই আনা, স্ত্রীতে আট আনা, পুত্র কন্যায় চারি আনা এবং বিষয়ে দুই আনা; কালে কাহারও আর নিজ মন থাকে না ও সকলে পরের মনেই কাজ করিয়া থাকে।

এইরূপে প্রত্যেকের মন খরচ হইয়া যায়। তাহার মনের স্থানে স্ত্রীর মন আসিয়া অধিকার করে এবং বিদ্যা ও পুত্র কন্যাদির ভাব দ্বারা ইহার পূর্ণ মন হয়। যদিও এই ব্যক্তির পূর্ণ মন বলা হইল, কিন্তু সে যাহা কিছু করে, তাহা তাহার নহে। কখন কখন স্ত্রীর ষোল আনা মন পুরুষের ষোল আনা মনকে বিচ্যুত করিয়া থাকে। এস্থানে সে পুরুষকে পুরুষ না বলিয়া স্ত্রী বলাই কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে দেখা যায়, অনেকে স্ত্রীর আজ্ঞা ব্যতীত একটী কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। স্বামী যদ্যপি একটী টাকা কাহাকে দিবে বলিয়া স্থির করে, তাহা স্ত্রীর অনভিমত হইলে আর তাহা দিবার শক্তি থাকে না। যাহার বাড়ীতে স্ত্রীই কর্ত্তা, সেখানে পুরুষের মন স্ত্রীই হরণ করিয়া লইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি ঈশ্বর লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাকে প্রত্যেকের নিকট হইতে আপন মন পুনর্ব্বার আনয়ন করিয়া পূর্ণ মন করিতে হইবে এবং তদনন্তর তাহা দ্বারা তাহার কার্য্য হইতে পারিবে।

১৯১। স্ত্রীকে সর্ব্বদা ভয় করিবে, কারণ সে তোমার সর্ব্বনাশ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়; অতএব তুমি সদাসর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে।

যেমন আমাদের শিক্ষা, স্ত্রীগণও সেই প্রকার শিক্ষা পাইয়া থাকে। সংসার করাই উভয়ের মত। পিতামাতা অর্থোপার্জ্জনক্ষম পাত্র দেখিয়া জামাতা স্থির করেন এবং জামাতার পিতামাতা পুত্রবধূর রূপলাবণ্য এবং কি পরিমাণে অর্থ গৃহে আসিবে, তাহারই প্রতি একমাত্র লক্ষ্য রাখেন! এমন বিবাহের ফল আর কি হইবে? অতএব যে বিবাহে কামিনী-কাঞ্চনই মুখ্য ভাব তাহার ফলও যে কেবল কামিনী-কাঞ্চন, কন্যাজামাতা তাহাই জানে। অতএব দোষ সংসারেরই।

১৯২। যে স্ত্রী বিদ্যা অংশে জন্মে, তাহার স্বভাব স্বতন্ত্র। তাহারা কখন স্বামীর উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে চাহে না; এমন দম্পতীর ধর্ম্মোপার্জ্জন পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। অবিদ্যা-স্ত্রী যাহার অদৃষ্টে ঘটে, তাহার দুঃখের অবধি থাকে না।

বিদ্যা-স্ত্রীর স্বভাব ধীর, ধর্ম্মে মতিগতি থাকে। কাম ও লোভাদি নাই বলিলেই হয়, অর্থাৎ তাহার বশীভূত নহে। অবিদ্যা-স্ত্রী কটুভাষিণী, স্বামীকে ক্রতদাসবৎ করিয়া রাখে, তিরস্কার করিতে গেলে রাস্তায় গিয়া দাঁড়ায়, তাহার বাড়াবাড়ী হইলে বেশ্যা হইয়াও যায়। সর্ব্বদা কলহপটু, লোভী ইত্যাদি।

আজকাল অর্থলোভে আর পাত্রীর জন্ম পত্রিকা দেখিয়া বিবাহ না দেওয়ায় অনেক স্থলে এই প্রকার বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। অবিদ্যার কার্য্য যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই অমঙ্গল হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

১৯৩। সংসারে থাকিয়া অভ্যাস যোগের দ্বারা ঈশ্বর লাভ করা যাইতে পারে।

১৯৪। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহও একটী সংস্কার-বিশেষ।

১৯৫। সংসারে থাকিলে বিবাহ করাই সাংসারিক নিয়ম, তাহা লঙ্ঘন করা যায় না।

১৯৬। সকল কার্য্যেরই সময় আছে। একদিনেই বিবাহ, এবং পুত্রোৎপাদন করা ও সেই পুত্রের অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ উপবীত, বিবাহ এবং তাহার সন্তানের মুখাবলোকন করা যায় না।

১৯৭। বিবাহের সময়ে বিবাহ হওয়াই উচিত। আজ-কাল অসময়ে বিবাহ হইতেছে বলিয়া, তাহাদের সেই প্রকার হাড়হাবাতে, পেট গ্যাঁড় গেড়ে লক্ষ্মী-ছাড়া ছেলেও জন্মিতেছে।

আমাদের শাস্ত্রমতে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ণভেদে অষ্টবিধ বিবাহের ব্যবস্থা আছে। যথা;—

সবিশেষ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা বর কন্যার আচ্ছাদন ও পূজন পুরঃসর বিদ্যা ও সদাচার সম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে যে কন্যাদান, তাদৃশ দানসম্পাদ্য বিবাহকে ব্রাহ্ম-বিবাহ বলা যায়। ১

অতি বিস্তৃত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞারম্ভ কালে, সেই যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিতকে সালঙ্কৃত কন্যার যে দান, উক্ত দানসম্পাদ্য বিবাহকে দৈব-বিবাহ বলা যায়। ২

এক গাভী ও এক বৃষ, ইহাকে গো মিথুন বলা যায়, ধর্ম্মার্থে (অর্থাৎ যাগাদির সিদ্ধির জন্য, কন্যা বিক্রয় মূল্যরূপে নহে) এইরূপ এক বা দুই গো মিথুন, বরপক্ষ হইতে লইয়া ঐ বরকে যে কন্যা দান, উক্ত দানসম্পাদ্য বিবাহকে আর্য্য-বিবাহ বলা যায়। ৩

তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণ কর, বর ও কন্যাকে এই কথা বলিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক ঐ বরকে যে কন্যা দান, উক্ত দানসম্পাদ্য বিবাহকে প্রাজাপত্যবিবাহ বলা যায়। ৪

কন্যার পিত্রাদিকে এবং কন্যাকে শক্ত্যনুসারে শুল্ক দিয়া, বরের স্বেচ্ছানুসারে যে কন্যা গ্রহণ, তাদৃশ কন্যা গ্রহণ সম্পাদ্য বিবাহকে আসুর-বিবাহ বলা যায়। ৫

কন্যা এবং বর উভয়ের পরস্পর অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ বলা যায়। এই বিবাহ কামবশতঃ মৈথুনেচ্ছায় ঘটিয়া থাকে। ৬

বলাৎকারে কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করার নাম রাক্ষস-বিবাহ। ৭

নিদ্রায় অভিভূত বা মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা অনবধানযুক্ত স্ত্রীতে নির্জ্জন প্রদেশে গমন করার নাম পৈশাচ-বিবাহ। ৮

এই অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য, প্রাজাপত্য, আসুর ও গান্ধর্ব্ব; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ-বিবাহ ধর্ম্মজনক বলিয়া কথিত হয়; কিন্তু মনু মহাশয় বর্ণবিশেষের এই প্রকার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া তৎপরে প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ, এই পঞ্চবিধ বিবাহের মধ্যে প্রাজাপত্য, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এই তিন প্রকার বিবাহ সকল বর্ণের উপযোগী এবং পৈশাচ ও আসুর বিবাহ সকলেরই অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রকারদিগের মতে সন্তানোৎপাদন করাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত যে যে বিবাহে যে প্রকার সন্তানলাভের প্রত্যাশা থাকে এবং তদ্দ্বারা যেরূপ পারিবারিক মঙ্গল সাধনের সম্ভাবনা, তাহাও তাঁহারা খুলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। "ব্রাহ্ম-বিবাহের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান যদি সুকৃতিশালী হয়েন, তাহা হইলে ঐ পুত্র পিত্রাদি দশ পূর্ব্বপুরুষ ও পুত্রাদি দশ পরপুরুষ এবং আপনি, এই এক বিংশতি পুরুষকে পাপ হইতে মুক্ত করেন।"

"দৈববিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত সদনুষ্ঠানযুক্ত সন্তান পিত্রাদি সপ্ত পূর্ব্বপুরুষ ও পুত্রাদি সপ্ত অপর পুরুষ এবং আপনি এই পঞ্চদশ পুরুষকে পাপ হইতে মুক্ত করেন। আর্য্য-বিবাহে সাধুসন্তান পূর্ব্ব তিন পুরুষ ও পর তিন পুরুষ এবং আপনি, এই সপ্ত পুরুষকে পাপ হইতে রক্ষা করেন। প্রাজাপত্য বিবাহে, সৎকর্ম্মশালী সন্তান পিত্রাদি ষট্ পূর্ব্বপুরুষ ও পুত্রাদি ষট্ পর পুরুষ এবং আপনি, এই ত্রয়োদশ পুরুষকে পাপ হইতে মুক্ত করেন। এই চারি বিবাহোৎপন্ন সন্তান সুরূপ, দয়াদি গুণযুক্ত, প্রচুর ধনশালী, যশস্বী, ধর্ম্মশীল ও শতবৎসর জীবিত থাকিতে পারে কিন্তু আসুর, গান্ধর্ব্ব, পৈশাচ ও রাক্ষসাদি চারি নিকৃষ্ট বিবাহে, ক্রূরকর্ম্মা, মিথ্যাবাদী, বেদ ও যাগাদিদ্বেষী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।"

বিবাহোপযোগী কন্যার লক্ষণ সম্বন্ধে সমুদায় শাস্ত্রকারেরা একই প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সদ্বংশীয়া অদুষ্টরোগ-বংশসম্ভবা, শুল্ক দ্বারা অদূষিতা, সবর্ণা, অসমান প্রবরা, অসপিণ্ডা, অল্পবয়স্কা, শুভলক্ষণা, বিনীতবেশা, মনোহারিণী কন্যা, বেদাধ্যয়নান্তে গুরু কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বিবাহ করিবে। পাত্র সম্বন্ধে যদিও বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া লেখা হয় নাই কিন্তু বেদাধ্যয়নান্তে গুরু কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বিবাহের কথা উল্লেখ থাকায় এবং কন্যাদান কালে কন্যাকর্ত্তার পাত্র বিচারে লক্ষণে যে কুল এবং আচারে উৎকৃষ্ট, সুরূপ, গুণবান, সজাতীয় বরকে সম্প্রদান করিবার উপদেশ আছে, তাহাতে পাত্রের অবস্থাও অনায়াসে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। ফলে সুপাত্র এবং সুপাত্রীর সংযোগই বিবাহের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে সুসন্তান লাভেরই সম্ভাবনা। এই সন্তান দ্বারা কুল রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা এবং জাতি রক্ষা হইয়া থাকে।

যে দিন হইতে হিন্দুস্থান পরাধীন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে, সেই দিন হইতে ক্রমে ক্রমে সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক যাবতীয় কার্য্য কলাপ নানা দোষে দূষিত হইয়া আসিতেছে। দূষিত কার্য্যে সুতরাং বিশুদ্ধ ফললাভের সম্ভাবনা কোথায় থাকিবে? যেমন ধর্ম্মভাব বিকৃত, যেমন জাতিভেদ বিকৃত, তেমনই জাতিবিশেষের সামাজিক রীতি নীতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং যাইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশে যে বিবাহ দ্বারা সুসন্তান লাভ হইত, সে বিবাহের পরিবর্ত্তে, যাহাকে নিকৃষ্ট বিবাহ বলিয়া শাস্ত্রকারেরা বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই সম্যক্‌রূপে প্রচলিত হইতেছে এবং পণ্ডিত মহাশয়েরা নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া আর্য্য-শাস্ত্র বাক্য অবাধে লঙ্ঘন করিয়া হিন্দুস্থানে নির্ব্বিঘ্নে প্রশংসার সহিত সময়াতিবাহিত করিয়া যাইতেছেন।

আমাদের বর্ত্তমান বিবাহের সহিত হিন্দুশাস্ত্রের অধুনা কোন সংশ্রব নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ বিবাহের উদ্দেশ্যই যাহা, তাহা পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে কেবলমাত্র তাহারই আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

হিন্দু বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য, কন্যা দান। এই নিমিত্ত, শাস্ত্র-বাক্য আছে যে, দান বা উপভোগ দ্বারা সম্বন্ধ রহিত কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে; কিন্তু কি উপায়ে দান সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা তখনকার কন্যাপক্ষীয়েরা বিশেষ

রূপে লক্ষ করিতেন। একক্ষণে দান করিতে হয়, এই মাত্র জানা আছে এবং প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইতেছে; কিন্তু কাহাকে দান করা হইল এবং সে দান শাস্ত্রমতে সিদ্ধ কি না, তাহা কেহ কি এপর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখিয়াছেন? এই নিমিত্তই বালকের বাল্যবিবাহের এত আড়ম্বর হইয়াছে। আদালতে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কেহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কোন প্রকার বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হয়, তাহা বিধিমতে সমুদয় অগ্রাহ্য হইয়া যায়। এইরূপে কত লোক অর্থ কর্জ্জ দিয়া পরিণামে তাহাকে তাহাতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। সামান্য বিষয়াদিতে যাহাদের অধিকার না জন্মে, অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহাদের তাহা আইনের হিসাবে গ্রহণ বলিয়া গ্রাহ্য হয় না, এমন বালকদিগের পাণিগ্রহণ কি বলিয়া বিধিমত হইবে এবং তাহার সন্তানেরাই বা কিরূপে বিষয়াদির হিন্দুশাস্ত্র-সঙ্গত উত্তরাধিকারী হইবে? অতএব অপ্রাপ্ত বয়স্ক যুবকের পাণিগ্রহণ হিন্দুশাস্ত্র কিম্বা বর্ত্তমান সামাজিক বিধির বিরুদ্ধ হইতেছে।

দ্বিতীয় দোষ এই যে, হিন্দুদিগের যে অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে চারি প্রকার বিবাহ উত্তম এবং চারি প্রকার নিকৃষ্ট বলিয়া কথিত আছে, তাহার পরিবর্ত্তে নূতন প্রকার বিধি প্রচলিত হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা আসুর-বিবাহ বলিয়া যাহাকে বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বিবাহ আর এক আকারে পরিণত হইয়াছে। আসুর-বিবাহে কন্যা, শুল্ক দিয়া অর্থাৎ ক্রয় করিয়া বিবাহ করা হইত, কিন্তু বর্ত্তমান কালে বরপক্ষে শুল্ক দিয়া, কন্যার বিবাহ দেওয়া হইতেছে; সুতরাং এ বিবাহ অশাস্ত্রীয়।

তৃতীয় দোষ এই ঘটিয়াছে যে, সবর্ণা, স্বজাতীয়া, সুলক্ষণা, অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার পরিবর্ত্তে অর্থ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রায় কুল ত্যাগ, বর্ণ ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে এবং গুণবান ধর্ম্মশীল ৩৬, ৩০, এবং ন্যূন সংখ্যায় ২৪ বৎসরের পাত্রে কন্যা দান না হওয়ায় অপর দোষও সংঘটিত হইতেছে।

হিন্দুশাস্ত্র বিগর্হিত কার্য্য দ্বারা যে অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা এক্ষণে দেখা কর্ত্তব্য।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের বিবাহ, দ্বাদশ কিম্বা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার সহিত শত করা প্রায় ৮০ জনের হইয়া থাকে। যে সময়ে বালকের বিবাহ হয়, তখন তাহার বয়ঃক্রম ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ষোড়শ কিম্বা সপ্তদশ হইবে।

তাহার মস্তিষ্ক * তখনও পূর্ণবিস্তৃত হয় নাই। বিশেষতঃ পঠদ্দশায় মস্তিষ্কের অতিরিক্ত কার্য্য বর্ত্তমান থাকায় এবং বিবাহ জনিত অসময়ে অপরিপক্ক শুক্র অপরিমিত পরিমাণে বহির্গত হইয়া, অচিরাৎ সকল প্রকার কার্য্যের বহির্ভূত করিয়া ফেলে। সুতরাং দৃষ্টিহীনতা, মস্তক ঘূর্ণন, মধুমেহ (Diabetes) এবং অজীর্ণ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া শরীরটী ব্যাধির-মন্দির-বিশেষ হইয়া উঠে।

সকলেই আপনাপন শরীর বিচার করিতে সমর্থ। তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, আমাদের এই কথার অভ্যন্তরে সত্য আছে কি না? এবং যাঁহাদের চিন্তা করিবার মস্তিষ্ক আছে, তাঁহারা বুঝিয়া লউন যে, মস্তিষ্ক যে পর্য্যন্ত পূর্ণরূপে আপনার শক্তিলাভ না করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে অন্য কারণে বীর্য্যহীন হইতে দেওয়া নিতান্ত অদূরদর্শিতার কার্য্য, তাহার কোন ভুল নাই।

এই তরুণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদিগের সহিত পুষ্পিতোন্মুখী বালিকার বিবাহে, কাহার কল্যাণ হইতে পারে না।

১ম। কন্যার পিতা, অবিধি পূর্ব্বক অপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া দানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন না। বিশেষতঃ আসুর বিবাহের ন্যায় বিবাহ হওয়ায় সে গর্ভস্থ সন্তানের শ্রাদ্ধাদি তর্পণ প্রভৃতি কোন কার্য্যের অধিকার থাকিতে পারে না এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার অবস্থাতিরিক্ত শুল্ক প্রদান করিতে হয় বলিয়াও দুঃখের অবধি প্রকাশ করিয়া বলা যায় না।

২য়। পাত্রের পিতার পুত্র বিক্রয়ের পণ লাভ হয় বটে; কিন্তু তাহা বেশ্যার ধনোপার্জ্জনের ন্যায় নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী; কারণ পুত্রের শুল্কও গ্রহণ করা হইতেছে, কিন্তু তথাপি কাহার দুঃখেরও অবসান হইতেছে না।

---

* ইংরাজী শরীরতত্ত্ববিদ্‌দিগের অভিপ্রায়ে বালকের মস্তিষ্ক ৩ বৎসর হইতে ৭ম কিম্বা ৮ম বৎসরে প্রায় পূর্ণায়তন লাভ করিয়া থাকে। ২০ বৎসরে একপ্রকার গুরুত্ব বৃদ্ধি হওয়ায় কার্য্যক্ষম হইতে পারে; কিন্তু ইহার পূর্ণবৃদ্ধি কাল ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তখন ইহার গুরুত্ব একসের সাত ছটাক হইতে একসের দশ ছটাক পর্য্যন্ত দেখা যায়। কোন কোন স্থলে এই পরিমাণের ন্যূন ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হিসাবের মধ্যে পরিগণিত নহে। আমাদের দেশে আপাততঃ শবদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সাধারণ হিসাবে মস্তিষ্কের গুরুত্ব একসের তিন ছটাক হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ মাত্রা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

৩য়। পাত্রের পিতা, পুত্রের শুল্ক গ্রহণ করিয়া, অকালে উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ দ্বারা যে প্রকার সাময়িক স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া থাকে, পুত্রের পরিণাম হিসাব করিয়া দেখিলে, লাভের কথা দূরে যাক, ক্ষতির পরিমাণ করা যায় না।

৪র্থ। এই বিবাহের দ্বারা যে বংশবিস্তার হয়, তাহা দ্বারা ধর্ম্মলোপ হইয়া থাকে।

৫ম। বাল্য-বিবাহ-জনিত অকালে মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হওয়ায় স্বাধীন মনোবৃত্তি সকল বিকশিত হইতে পারে না; সুতরাং মনুষ্যদিগের কোন কার্য্যে অধিকার জন্মে না। ফলে পুত্রলাভ করিয়া পুত্রের দ্বারা যে সকল কার্য্য আকাঙ্ক্ষা করা যায়, তাহার কিছুই সুবিধা হয় না। পাত্রের দুঃখ পূর্ণ কলায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন নব-শাখা-পল্লবিত তরুর প্রত্যহ একটী করিয়া মূলোচ্ছেদ করিতে থাকিলে, অচিরাৎ বৃক্ষটী নীরস হইয়া আইসে, ইহাদেরও তদ্রূপ অবস্থা উপস্থিত হয়। এক্ষণে যে বয়সে পুত্রের বিবাহ হইতেছে, কথিত হইয়াছে যে, তখন মস্তিষ্ক পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ তখন বিদ্যা শিক্ষার সময় বলিয়া তাহার এক-পক্ষীয় দৌর্ব্বল্য নিতান্ত অনিবার্য্য। বিদ্যা শিক্ষা হেতু মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্যের সময় বীর্য্য-হীন হইতে থাকিলে, মস্তিষ্কও একেবারেই দুর্ব্বল হইয়া আইসে এবং তদ্ব্যতীত সাধারণ স্নায়ুমণ্ডলীতেও দৌর্ব্বল্য ভাব উপস্থিত হইয়া যায়। কথিত হইয়াছে, মনের স্থান মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইলে মনও দুর্ব্বল হয়। বিবাহের পূর্ব্বে যে মন—যাহা যে পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারে, বিবাহের পরে এক্ষণে তাহার সে শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে, সুতরাং যাহার যে অবস্থায় বিবাহ হয়, প্রায় তাহাকে সেই অবস্থায় থাকিয়া যাইতে হয়। কোন কোন স্থানে যদিও অবস্থান্তর হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার অপর কারণ থাকিবেই থাকিবে।

অনেকে দেখিতে পাইতেছেন যে, যে বালক পরীক্ষাদিতে রীতিমত উত্তীর্ণ হইয়া আসিতেছে কিন্তু যখনই তাহার বিবাহ হইয়াছে, তখনি তাহার উন্নতির পথে অশনিপাত হইয়া গিয়াছে; কেন না তাহার যখন ভোগ বিলাসের প্রতি মন ধাবিত হয়। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বয়সের বালিকার সহবাসে কোন্ বালক পশুভাব প্রদমিত করিয়া রাখিতে পারে? ক্রমে বালকের তাহাই ধ্যান, তাহাই জ্ঞান, বন্ধুবান্ধবের নিকট তাহারই জল্পনা ব্যতীত অন্য কোন কথা আর স্থান পায় না।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইয়া যাইলে ক্রমে সাধারণ স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ প্রকাশপাইতে থাকে অর্থাৎ নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া যায়। শরীরে সর্ব্বদা ব্যাধি থাকিলে তাহার দ্বারা কোন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং বিদ্যা হয় না এবং অর্থোপার্জ্জনের ক্লেশেরও পরিসীমা থাকে না।

এদিকে বিবাহের ছয় মাস, কোথাও একবৎসর উর্দ্ধসংখ্যায় দুই বৎসরের মধ্যে বালক, সন্তানের পিতা হইয়া উঠিল; অধিকাংশ স্থলে প্রথমে কন্যাই ভূমিষ্ঠ হয়। সন্তান জন্মিতে আরম্ভ হইলে সম্বৎসর অতিক্রম না হইতে হইতেই দ্বিতীয় সন্তান জন্মে, তৎপরে ঐ হিসাবে কয়েক বৎসরের মধ্যে একটী সংসার সৃষ্টি করিয়া তুলে। যে বালকের ১৭ কিম্বা ১৮ বৎসরের সময় বিবাহ হইয়াছিল, তাহার বয়স এক্ষণে ২৪।২৫ হইবে। এ সময়ে তাহার অর্থানুকূলের কোন সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু তাহাকে একটী পরিবার ভরণ-পোষণ করিবার ভার গ্রহণ করিতে হয়। একে তরুণ বালক বিদ্যা শিক্ষায় দুর্ব্বল, তাহার উপর বিবাহজনিত দুর্ব্বল এবং তাহার উপর পরিবারের গুরুভার বিধায় একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া পড়ে।

সচরাচর দেখা যাইতেছে যে, বালকেরা রীতিমত পাঠ করিলে পর প্রায় ১৫।১৬ বৎসরে এণ্ট্রান্স, ১৭।১৮ বৎসরে ফার্ষ্ট আর্টস্, ১৯।২০তে বিএ, ২০।২১ তে বি এল, ২১।২২তে এম এ, ২২।২৩তে ষ্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। অথবা যাহারা চিকিৎসা কিম্বা ইঞ্জিনিয়ারিং পথে গমন করে, তাহারাও প্রায় ২২।২৩ বৎসর বয়সের ন্যূনে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে না; অর্থাৎ যে কোন উপজীবিকাই অবলম্বন করা হয়, ২২।২৩ বৎসর বয়সের নিম্নে কখন বিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। যদ্যপি ১৭ কিম্বা ১৮ বৎসরে বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাহার পর এণ্ট্রান্স, না হয় এলএ পর্য্যন্ত আসিয়া বিদ্যায় "এলে" দিতে হয়। যদিই কেহ মেডিকেল কিম্বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করে, অধিকাংশ স্থলে তাহাকেও প্রায় ভগ্ন-মন হইয়া যাইতে হয়। ইহাদের মধ্যে শতকরা ১০জন ব্যতীত কদাপি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে দেখা যায়।

মোট কথা হইতেছে যে, মানসিক শক্তি এবং কায়িক শক্তি প্রত্যেক মনুষ্যেরই প্রাপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যে কোন কারণেই হউক, অকালে হীন-বীর্য্য হইতে থাকিলে তাহার দ্বারা যে কোন কার্য্যই সুচারুরূপে চলিতে পারে না, তাহা এক পরমাণু মনুষ্য-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

কন্যার দুর্গতির অবধি নাই। যে জাতির অনন্যগতি স্বামী, যাহাদের ইহকাল পরকাল একমাত্র স্বামী, যাহাদের এক স্বামী ব্যতীত দ্বিতীয় পুরুষ গমন নিষিদ্ধ, তাহাদের জন্য স্বামী স্থির করা কতদূর গুরুতর ভাবিলে দশদিক্ অন্ধকার বোধ হয়। যাঁহারা কন্যার পাত্র স্থির করিয়া থাকেন, তাঁহাদের যে কি দায়িত্ব আছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে কন্যাদান করিবার সুপাত্র কে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

একথা সকলেই জানেন, কিন্তু এমনি অবস্থা ঘটিয়া আসিতেছে যে, তাহা অতিক্রম করিয়া কেহ শাস্ত্রমত কার্য্য করিতে পারিতেছে না এবং অনেক স্থলে আপনাদের ইচ্ছাক্রমে শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান কালের বিবাহ, হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও যে সাধারণের চক্ষে তাহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া কি জন্য পরিগণিত হইতেছে না, তাহার হেতু নির্ণয় করিবার নিমিত্ত অধিক দূর গমন করিতে হইবে না। আমরা জাতি বিভাগ স্থলে বর্ত্তমান হিন্দুজাতি বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি যে, ইহা বিশুদ্ধ মৌলিক (elementary) হিন্দুজাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, হিন্দু, যবন এবং ম্লেচ্ছ, এই তিন ভাবের মিশ্রণ (যৌগিক নহে) জাতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এপ্রকার অবস্থায় কাহারও বিশুদ্ধ দৃষ্টি থাকিতে পারে না। সুতরাং সর্ব্ববিষয়ে তিনটী ভাব ন্যূনাধিক্যরূপে কার্য্য করিতে থাকে। তাই যখনই হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোন কথা উত্থাপিত হয়, তখনই দশ দিক্ দিয়া তাহার অযথা এবং অশাস্ত্রীয়তা খণ্ডন হইয়া যায়। যেমন একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উপর দশ ঝুড়ি মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিলে তাহার দাহিকা শক্তির কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, হিন্দু-যবন-ম্লেচ্ছ বা আধুনিক হিন্দুদিগের দ্বারা প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রের তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে; কিন্তু ইহাতে কাহাকেও বিশেষ অপরাধী করা যায় না। কারণ যাহার যে প্রকার সংস্কার, যে প্রকার ধারণা, সে কোনও মতে তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের স্বীয়ভাব বিকৃত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং শুদ্ধভাব সহসা জ্ঞানগোচর হইতেছে না।

হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য, তাহার উপায় এবং ফল, সংক্ষেপে এক প্রকার আমরা বলিয়াছি, অর্থাৎ উদ্দেশ্য সুসন্তান, উপায় সুপাত্র ও পাত্রী, এবং ফল জাতি, ধর্ম্ম ও বংশ রক্ষা; কিন্তু বর্ত্তমান বিবাহে সে সমুদয় ভাব বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—উদ্দেশ্য, প্রায় সর্ব্বত্রে পাত্রের

অভিভাবকের কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন করা, কোন কোন স্থলে কাষ্ঠপুত্তলিকা কিম্বা কুক্কুর বিড়ালের বিবাহের ন্যায় সাময়িক নয়নানন্দকর ক্রীড়াস্বরূপ জ্ঞান করা, অথবা কখন পাত্রপক্ষের পশুভাব বা ইন্দ্রিয় চরিতার্থের নিমিত্ত বিবাহ হইয়া থাকে। উপায়ও উদ্দেশ্যের অনুরূপ অর্থাৎ যে স্থানে পাত্রের পিতার অর্থ কামনাই একমাত্র বিবাহের উদ্দেশ্য, তথায় পাত্রীর বয়ঃক্রম, গণ, বর্ণ কিম্বা দৈহিক লক্ষণাদি দেখিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কন্যা, পাত্রের যোগ্যা হউক বা নাই হউক, চতুর্দ্দশ বৎসরের কন্যা এবং অষ্টাদশ বৎসরের বালক হইলেও তাহাতে বিবাহের প্রতিবন্ধক হয় না। যথায় পাত্র নিজ অভিমত পাত্রী স্থির করিয়া লয়, তথায় তাহার উদ্দেশ্য আশু স্ত্রী-সহবাস। তাহার ফল বংশলোপ, জাতি ও ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ এবং পিণ্ড তর্পণের অধিকারী হইতে বঞ্চিত হওয়া, তাহাই শাস্ত্রের কথা, কিন্তু একথা অনেকে বিশ্বাস করেন না। মরিয়া যাইলে পিণ্ড দেওয়া দূরে থাক, জীবিতাবস্থায় পিতা মাতাকে বোধ হয় আজ কাল শতকরা ২৫ জন ব্যতীত কেহই পিণ্ড দিতে চাহে না; অনেক স্থলে কিঞ্চিৎ অর্থের দ্বারা পিণ্ডের কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিতা মাতা হইতে পৃথক হইয়া তাঁহাদিগকে মাসিক দাতব্য প্রদান করা হইয়া থাকে। পুত্রের দ্বারা যে ফল কামনা করা হিন্দু-ধর্ম্মের অভিপ্রায়, তাহার বিকৃতির লক্ষণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতীয়মান হইতেছে।

আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা প্রায় অবিকল এই প্রকার, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা নহে। এইজন্য হিন্দু বলিলে যে হিন্দু বুঝায়, তাহা আমরা নহি। তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন সংশ্রব নাই বলিলেও এক প্রকার বলা যাইতে পারে। অনেকে এই হিন্দু বিবাহ লইয়া নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া বেড়ান। অনেকে এই হিন্দু আচারে চলিয়া হিন্দু নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ভাল বাসেন। আমরা এই প্রস্তাব লইয়া অনেকের সহিত আলাপ করিয়া উল্লিখিত অবস্থার জাজ্বল্য প্রমাণ পাইয়াছি। তাঁহারা যে সকল কারণ উল্লেখ করেন, তদ্বিষয়গুলি প্রথমে পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

১। হিন্দুশাস্ত্রে বিবাহের উদ্দেশ্য ও উপায় এবং ফল, যাহা কথিত হইয়াছে, কতকগুলি ব্যক্তি তাহা বিশ্বাস করেন না। এই কলিকাতার কোন সদ্বংশীয় সভ্য ব্যক্তি অকপটে বলিলেন, "মনুতে কি ন্যূন সংখ্যায় ২৪ বৎসর পাত্রের বিবাহ কাল লেখা আছে? আমি তাহা বিশ্বাস করি না।" তিনি এই বলিয়া এক খণ্ড মনুসংহিতা আনয়ন করাইলেন। ইহাতেই সেই ব্যক্তির

জ্ঞানের পরিচয় যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যখন পাত্রের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে মনুর নাম দিয়া প্রকাশ্যভাবে বলা হইতেছে, তখন তদ্বিষয়ে সন্দেহ দূর করিতে কি অনুপল কাল-বিলম্ব হইতে পারে? সে জন্য কি কেহ তর্ক করিয়া আপনাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিতে চাহে? কিন্তু আমাদের দেশের এ প্রকার শোচনীয়াবস্থাও ঘটিয়া গিয়াছে।

শাস্ত্র না দেখিয়া, শাস্ত্রের কথা না শুনিয়া যাঁহারা নিজের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের উপায় আর কি হইবে? এই প্রকার স্বেচ্ছাচারী হিন্দুদিগকে অগত্যা মিশ্রিত হিন্দুজাতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করাই কর্ত্তব্য।

২। কেহ কেহ শাস্ত্রের কথা স্বীকার করেন বটে, এবং বর্ত্তমান কালে যে বিবাহ চলিতেছে, তাহাও শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায়ানুযায়ী, এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পড়েন। যে কারণে একথা মীমাংসা করিয়া দেন, তাহা শ্রবণ করিলে, আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহাই আমরা করিয়া যাইতেছি। আমরা কাহার কোন কথা শ্রবণ করিব না।

আমরা যাহা বলিতেছি, তাঁহারা যদ্যপি একবার তদ্বিষয় মনোযোগ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত আমাদের কোনস্থানে অনৈক্য হইতেছে কি না অনায়াসে বুঝিতে পারেন; কিন্তু কেমন অবস্থান্তর ঘটিয়াছে যে, কিছুতেই তাহা করিতে চাহেন না। মনে মনে এই আশঙ্কা যে, পাছে কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হয়। এ প্রকার আশঙ্কা প্রশংসার বটে, কারণ যবনের অত্যাচারে হিন্দু-সমাজ প্রথম সঙ্কুচিত হয়। সেই সঙ্কুচিতাবস্থা অদ্যাপিও রহিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কারকগণ যে বিভীষিকা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে কেহ কাহাকে সহসা বিশ্বাস করিতে চাহেন না এবং আমাদের মতে নিজের বিশ্বাস অতিক্রম করিয়া কাহার কথায় পথ পরিত্যাগ করা উচিতও নহে; কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস করিলে চলিবে না। তাই এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে পূর্ব্বপুরুষদিগের কার্য্য পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। যে মতে বর্ত্তমান বিবাহ চলিতেছে, তাহা কি পূর্ব্ব পুরুষদিগের অভিমত? পুস্তকাদির সাহায্যে অথবা জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে অনায়াসে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।

হিন্দু-বিবাহ যাহা, তাহা আমরা বলিয়াছি। পরে, বল্লাল সেন তাৎকালিক

অবস্থা দেখিয়া, নয়প্রকার গুণালঙ্কৃত ব্যক্তিদিগকে কৌলিন্য শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সমাজ-সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যের দ্বারা নূতন বিধির নব অবতারণা দেখা যায় না। হিন্দুশাস্ত্র ও মনুর বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহাকে চলিতে হইয়াছিল। কুলিন অর্থাৎ নানাগুণালঙ্কৃত ব্যক্তি যখন দার-পরিগ্রহ করিবেন, তখন তাঁহার সমান পরিচয়ের অর্থাৎ তিনি যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশানুক্রমে তিনি যত পুরুষ নিম্ন হইবেন, যে কুলিন কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, তিনিও তাঁহার বংশানুক্রমে অবিকল তত পুরুষ নিম্ন হইবেন। যেমন পাত্রের বিংশতি-পরিচয় হইলে পাত্রীরও পরিচয় বিংশতি হইবে, ইত্যাদি। বল্লালের এই ব্যবস্থা প্রাচীন হিন্দু-শাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুযায়ী কি না, তাহা সংহিতাগ্রন্থ অবলোকন করিলে তৎক্ষণাৎ সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া যায়। বর্ত্তমান কালে সেইরূপ নয় প্রকার গুণযুক্ত কুলিন আছে? অবশ্য স্বীকার করি বটে যে, এখন কুলিনদিগের পরিচয়াদির হিসাব উঠিয়া যায় নাই; কিন্তু তাহা কেবল নামে আছে এই মাত্র। ফলে, তাহাতে কোন কার্য্যই হইতেছে না। যাহা হউক, এ কথা সকলেই নতশিরে স্বীকার করিবেন যে, পূর্ব্বের ভাব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া কেবল বাহ্যিক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে; তাহাও দুর্ভাগ্যক্রমে আসুর-বিবাহের অন্তর্গত হইয়া, বিবাহের সমুদয় ফলই নষ্ট করিয়া দিতেছে।

৩। কেহ বলেন যে, বালকের বিবাহ না দিলে তাহাদের চরিত্র রক্ষা হয় না। এই মত পোষকতা করিবার নিমিত্ত, তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালা দেশ উষ্ণ প্রধান, এই নিমিত্ত বালকেরা ইন্দ্রিয়াদি দমন করিয়া রাখিতে পারে না, বিবাহ না দিলে দুর্নীতি শিক্ষা করে; বিশেষতঃ জনপদাদি স্থানে প্রলোভনের আশঙ্কা অধিক থাকায় অচিরাৎ কুচরিত্র-বিশিষ্ট হইয়া পড়ে।

এই কথা বলিয়া যাঁহারা বালকের বাল্য-বিবাহ পোষকতা করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা ভ্রমান্ধ ব্যক্তি কুত্রাপি দেখা যায় না। কারণ দেশের উষ্ণতা যদ্যপি ইন্দ্রিয়প্রাবল্যের হেতু নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বালক এবং বালিকা উভয়ের মধ্যেই সেই লক্ষণ দেখা যাইবে; কিন্তু যে বালিকা বাল্য-বিবাহে শৃঙ্খলিত হইয়া, বাল্যকালেই বৈধব্যদশায় পতিত হয়, সে কিরূপে বিধবার আচার ব্যবহার প্রতিপালন করিয়া, আপন চরিত্র রক্ষা করিতে পারে? সে স্থলে কি দেশের জল বায়ু কার্য্য করিতে পারে না?

তাহাদের মনে কি কখন পশুভাবের উদ্দীপন হয় না? তাহারা কি কখন প্রলোভনের করগ্রস্ত হয় না? তাহারা ইন্দ্রিয় সংযম ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেছে; অতএব দেশের উষ্ণতাকে কারণ বলিয়া কোন মতে একপক্ষীয় মীমাংসা করা যাইতে পারে না। বারবিলাসিনী-দিগের দ্বারা বালকের চরিত্র নষ্ট হয় বলিয়া যে আপত্তি করা হইয়া থাকে, তাহার মূলেও কোন সত্য আছে বলিয়া দেখা যায় না। বালকের চরিত্র-দোষ কোথা হইতে উৎপত্তি হয়, তাহা কেহ এপর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। বারাঙ্গনার দ্বারা বালকের চরিত্রবিকৃত হইবার পূর্ব্বে, পিতা মাতার দ্বারাই তাহার পূর্ব্বকারণ উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে পিতা মাতার যেরূপ স্বভাব ও চরিত্র, সন্তানদিগেরও প্রায় সেই প্রকার স্বভাব ও চরিত্র হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে আমরা যেমন ধর্ম্ম এবং নীতি বিজ্ঞানানভিজ্ঞ হইয়া কেবল শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়াছি, তেমনি আমাদের সন্তানেরাও জন্মিতেছে, সুতরাং কারণ আমরাই; দেশের উষ্ণতা কিম্বা বারাঙ্গনারা নহে। দেশের প্রত্যেক জনপদে যাইয়া প্রত্যেক গৃহের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দেখা হউক, কোন্ গৃহে কোন্ ব্যক্তি সন্তানকে ধর্ম্ম এবং নীতিবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন? বর্ত্তমান হিন্দু-চরিত্র কি প্রকার হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বতন হিন্দুর সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে কি ভাল হয় না?

প্রথমতঃ বালকের চরিত্র পিতা মাতার দোষেই কলুষিত, পরে তাহাদের চরিত্র গঠন কিম্বা তাহা রক্ষা করিবার জন্য কোন উপায়ই নাই, বরং তাহার বিপরীত কার্য্য হইবার নিমিত্ত আপনারাই নানাবিধ সুবিধা প্রদান করিয়া থাকি। আমাদের স্বভাব মিথ্যা কহা, পরগ্লানি প্রচার ও পরদ্রব্য হরণ করা, তাহারাও তাহাই শিক্ষা করে। আমরা বাটীতে আসিয়া সুরাপান ও মাদক দ্রব্যের ধূম পান করি, সন্তানেরা তাহা শিক্ষা না করিয়া কি করিবে? আমরা সায়ংকালে বারাঙ্গনার ক্রোড়ে যাইয়া বিশ্রাম লাভ করি, বালক তাহা বাটীতে বসিয়াই শিক্ষা করে। আমরা সময়ে সময়ে আপন বাটীতেই বারাঙ্গনা আনিয়া বালকের মনে সেই ভাবের বীজ বপন করিয়া দিই। আমরা হিন্দু সন্তান হইয়া নিয়মিতরূপে ম্লেচ্ছাহার ভক্ষণ পূর্ব্বক সন্তানদিগকে তাহার প্রসাদ দিয়া হিন্দুচরিত্র বিনষ্ট করিবার কি আমরাই কারণ হইলাম না? এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কারণও আছে। এখনকার মতে যে ঈশ্বর না মানেন এবং স্ত্রীকে বেশ্যা সাজাইতে পারেন, তাহাকেই প্রকৃত সভ্য কহে। যে

ব্যক্তি যত দূর সভ্য হইয়াছেন, তাহার সন্তানও তত্দূর পর্য্যন্ত হিন্দু-চরিত্র হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতা এবং অন্যান্য কারণে সন্তানাদি প্রতিপালন করা, প্রায় দাসদাসীর দ্বারা সমাধা হইয়াই থাকে। এই শ্রেণীর নরনারীরা নিতান্ত অসভ্য ও নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত। তাহাদের দ্বারা বালক বালিকারা কুৎসিত কথা, কুৎসিত ভাবের উপাখ্যান এবং অনেক সময়ে কু-অভ্যাসাদি শিক্ষা করিয়া থাকে। সামান্য বা মধ্যবিদ্ গৃহস্থ সন্তানেরা বিদ্যালয়ে যাইয়া ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান কর্ত্তৃক দুর্নীতি শিক্ষা করিয়া থাকে।

বালকেরা ইত্যাকার নানা কারণে পূর্ব্ব হইতে বিকৃত হইয়া যায়। কোন স্থলে বারাঙ্গনারা কেবল উত্তেজক কারণ-স্বরূপ। তাহা না হইলে এই কলিকাতা সহরে সকলেরই বাল্য-বিবাহ হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু তথাপি লক্ষ লক্ষ বারাঙ্গনারা কাহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে? ১৭ বৎসরের ঊর্দ্ধে প্রায় সকলকেই সস্ত্রীক দেখা যায়; কিন্তু তাহারাই বেশ্যা-লয় আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। এই যে সে দিন একজন হিন্দু যুবা লক্ষ লক্ষ টাকায় একটী বেশ্যার চরণ পূজা করিল, সেকি সস্ত্রীক নহে? না তাহার বাল্য-বিবাহ হয় নাই? ঐ যে বিংশতি বৎসরের একটী যুবা বারাঙ্গনা বেষ্টিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, উহার কি স্ত্রী নাই? কিন্তু গৃহস্থের বাটী অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, এখনও শত শত বালক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, যাহারা স্ত্রী সহবাস কাহাকে বলে তাহা জানে না; তথাপি তাহারা বারাঙ্গনার দিকে দৃষ্টিপাত করে না। কত কুমার বৈরাগী রহিয়াছেন, যাঁহাদের বিমল চরিত্রে বারাঙ্গনা কর্ত্তৃক বিন্দুমাত্র কালিমা কখনও সংস্পর্শিত হইতে পারে নাই। তাঁহাদের চক্ষের উপরে বারাঙ্গনারা নৃত্য করিতেছে, তথাপি কোন মতে মনাকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। ইহার হেতু কি? ধর্ম্ম এবং নীতিবিজ্ঞান। ইহাই চরিত্র গঠনের, চরিত্র রক্ষণের অদ্বিতীয় উপায়। সেই উপায় বিহীন হইয়া আমরা পথের কাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছি।

অতএব দেশের উষ্ণতা কিম্বা বারাঙ্গনারাই যে চরিত্র নষ্ট করিবার সাধারণ কারণ, তাহা নহে। ধর্ম্ম এবং নীতি শিক্ষার অভাবই ইহার আদি কারণ জানিতে হইবে।

৪। কেহ কেহ বলেন যে, এখনকার পরমায়ু অতি অল্প, বাল্যবিবাহ না দিলে সংসার করিবে কবে? এই কথাটী শ্রবণ করিলে আমাদের একটী রহস্যের কথা স্মরণ হয়। ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত দেশে দেখা যায় যে, জ্বর

আসিবার পূর্ব্বে বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিয়া সম্বাদ প্রেরণ করে, তখন সেই ব্যক্তিরা তাড়াতাড়ি করিয়া যে কোন প্রকারে হউক কিছু আহার করিয়া ফেলে। হয়ত অর্দ্ধেক ভোজন না হইতেই তাহাকে রৌদ্রে বস্ত্রাবৃত হইয়া পতিত হইতে হয়। তখন সেই ভুক্তদ্রব্যগুলি হয় আপনি উদ্গীরণ হইয়া যায়, কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক বমন না করিলে যন্ত্রণার হ্রাস হয় না; যদ্যপি কেহ তাহা না করে, তাহা হইলে রোগের যাতনা চতুর্গুণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই ব্যক্তিরা তাহা জানিয়া, ভুক্তভোগী হইয়া তথাপি জ্বরের পূর্ব্বাহ্নে ভোজন না করিয়া থাকিতে পারে না। বার বার নিষেধ করা হইলেও কিছুতেই সে কথা শুনিবে না। উপরোক্ত মতে বাল্য-বিবাহ পোষকতা করাও তদ্রূপ। পরমায়ু অল্প, সেইজন্য শারীরিক পরিবর্দ্ধন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্ব হইতেই, তাহাকে এরূপ ভাবে ব্যয় করিতে হইবে, যাহাতে মৃত্যুর দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে পারে। এমনই মূর্খতার দিন পড়িয়াছে যে, শীঘ্র মরিতে হইবে বলিয়া, যাহাতে তাহার আনুকূল্য হয়, তাহাই করিতে হইবে। একে ত আহারাভাবে, শয্যা-ভাবে, বিবিধ বিচিত্র রোগের আক্রমণে প্রায় সকলে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে শারীরিক এবং মানসিক পুষ্টিলাভ করিতে সময় না দিয়া, যাহাতে হীনবীর্য্য হইবার উপায় হয়, তদ্বিষয়ে সহায়তা করিতে হইবে। ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আমাদের বর্ত্তমান বিবাহ দ্বারা যে কি অনিষ্ট সাধন হইতেছে, তাহা ভাবিতে গেলে বক্ষঃদেশ শুষ্ক হইয়া উঠে, তখন মানসক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালী জাতি একেই ত জন্তুবিশেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পরে যে কি হইবে, তাহা বলা যায় না। এই বিবাহে তিন কুল নষ্ট হইয়া থাকে।

বালকের অকাল অর্থাৎ বাল্যবিবাহে প্রথম অনিষ্ট পাত্রের। তাহার প্রায় ইহকাল পরকাল বিনষ্ট হইয়া যায়। শরীর ব্যাধির মন্দির হইলে মন আর কিরূপে স্বচ্ছন্দ থাকিবে? যে জন্য বিবাহ, তাহাতে বিফল মনোরথ হইয়া, পুরুষত্ব বৃদ্ধির জন্য চিকিৎসকের নিকট সর্ব্বদা মনের আক্ষেপ প্রকাশ এবং সংবাদপত্রের "পুরুষত্ব হানির" ঔষধ দেখিলেই তাহা ক্রয় করিয়া সেবন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। আমরা এ প্রকার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। অপরিপক্ক যৌবনের প্রারম্ভে দিকবিদিক বোধ থাকে না, সুতরাং "যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে, বয়সে কাঙ্গালী" হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে হয়।

পাত্রের দ্বিতীয় অনিষ্ট এই যে, সে যখন আপনি অপরের মুখাপেক্ষী, তখন তাহার সন্তান সন্ততি জন্মিলে, তাহাদের দুঃখ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া থাকিতে হয়।

তৃতীয় অনিষ্ট, স্ত্রীর মনোবাসনা পূর্ণ করিতে অপারক হইলে, তাহার বিরাগভাজন হওয়া এবং আপনাকে কাপুরুষ জ্ঞান করা।

চতুর্থ অনিষ্ট—বিষয় কার্য্যের দুরবস্থা হেতু, উদরান্ন সংস্থানে উপর্য্যুপরি হতাশ হইয়া বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হওয়া।

পঞ্চম অনিষ্ট—অর্থাভাবে অপাত্রে কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে আজীবন দুঃখার্ণবে নিক্ষেপ করা।

ষষ্ঠানিষ্ট—ধর্ম্মে বঞ্চিত হইয়া পশুত্ব লাভ করা।

পাত্রীর প্রথম অনিষ্ট—বিবাহের প্রথম শিক্ষা পশুবৃত্তির উত্তেজনা।

দ্বিতীয় অনিষ্ট—স্বামীর ইন্দ্রিয় সুখ সম্বর্দ্ধনার্থ সর্ব্বদা বেশ ভূষান্বিত থাকার নিমিত্ত সাংসারিক কার্য্যে অনাস্থা বিধায় পরিণামে ক্লেশ পাওয়া।

তৃতীয় অনিষ্ট—সন্তানদিগকে অভিমত অলঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত করিতে না পারায় মনোবেদনা।

চতুর্থ অনিষ্ট—অনবরত প্রসব হওয়ায় স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হেতু রুগ্নাবস্থায় পতিত হওয়া।

পঞ্চম অনিষ্ট—পিত্রালয়ের সাহায্য স্থগিত হইলে,শ্বশুর শ্বাশুড়ীর তিরস্কার-ভাজন হওয়া।

ষষ্ঠানিষ্ট—উদরান্নের অনাটন।

সপ্তমানিষ্ট—কটুভাষিণী হওয়া।

অষ্টমানিষ্ট—ধর্ম্মকর্ম্ম বিবর্জ্জিত হওয়া।

সন্তানের প্রথম অনিষ্ট—সর্ব্বদা পীড়িত হওয়া।

দ্বিতীয়ানিষ্ট—স্পৃহা চরিতার্থ না হওয়া।

তৃতীয়ানিষ্ট—উপযুক্ত বিদ্যাদি উপার্জ্জন করিতে না পাওয়া।

চতুর্থানিষ্ট—বাল্যবিবাহ বশতঃ অকালে সংসার-পাষাণ কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে পেশিত হওয়া।

এক্ষণে কে বলিতে চাহেন যে, বালকের বাল্যবিবাহ দেশের মঙ্গলদায়ক? কে বলিতে চাহেন যে, বাল্যবিবাহে বাস্তবিক বিবাহের অর্থ সমাধা হইতেছে?

কে বলিতে চাহেন যে, বাল্যবিবাহের দ্বারা পিতা মাতার উদর পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় নহে। বাল্যবিবাহে তিন কুল বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করিতে কে চাহেন? তাঁহারা মূর্খ, যাঁহারা বলেন যে, বাল্যবিবাহে চরিত্র রক্ষা হয়। তাঁহারা বাতুল, যাঁহারা বাল্যবিবাহ দিয়া বারনারী-পরায়ণ পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন! তাঁহাদের জানা কর্ত্তব্য যে, পিতার চরিত্র দ্বারা সন্তানের চরিত্র উৎপন্ন হয়, গঠিত হয় এবং সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই পিতার যখন বাল্যকালে পশুবৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছিল, তখন তাহার সন্তানের সেই সময়ে এবং সেইরূপে তাহা উত্তেজিত না হইবার হেতু নাই। যেমন পিতা মাতার শরীরে যে কোন ভাবের রোগ থাকিলে সন্তানেরও প্রায় তদ্রূপ রোগ উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ মানসিক বিকার কিম্বা উন্নতি ক্রমে, সন্তানের মনের ভাবও পরিচালিত হইতে দেখা যায়। অতএব এ প্রকার পিতা মাতার ঔরসজাত সন্তানদিগের নিকট পশুভাবের পরিচয় ব্যতীত আর কি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? মনের মধ্যে যখন নিয়ত পশুভাব নৃত্য করিতেছে, তখন যে মুহূর্ত্তে তাহার প্রতিবন্ধক জন্মিবে, সেই মুহূর্ত্তেই স্ত্রী ব্যতীত অপর স্ত্রী গমনের আশক্তি বৃদ্ধি হইয়া যাইবে। এই নিমিত্ত কৃতবিদ্যদিগের পর্য্যন্ত কুচরিত্রের কাহিনী কাহার অজ্ঞাত নাই।

দ্বিতীয় কথা। বালকের বাল্য-বিবাহ-বিরোধীদিগের ভুল এই যে, তাঁহারা বালিকা-বিবাহের কাল বৃদ্ধি করিবার জন্য যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা বর্ত্তমান দেশের অবস্থানুসারে আপনিই হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা কি দেখিতেছেন না যে, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় জাহ্নবীর সলিলে নিহিতা হইয়া গিয়াছেন? অষ্টম বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ হওয়া দূরে থাক, দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ এবং কোথাও বা তাহারও অতিরিক্ত বয়ঃস্থা অবিবাহিতা কন্যা রহিয়াছে! আজকাল সকলেই বয়ঃস্থা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে লালায়িত; সে সংস্কার, সে স্পৃহা, কি কাহার কথায় নিবৃত্ত হইতে পারে? যাহা তাঁহারা আন্দোলন করিতেছেন, তাহা হইয়া গিয়াছে কিন্তু আন্দোলন কি—প্রাণপণে এই চেষ্টা করিতে হইবে, কর্ম্মক্ষম অথবা ধনাঢ্য-যুবক ব্যতীত, কেহ পাণিগ্রহণ করিতে না পারে, কিন্তু এ কথা স্বার্থপর পিতা মাতারা এক্ষণে বুঝিবে না। ক্রমাগত আন্দোলন করিয়া বালকদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়া এবং আপনারা দুই এক জন উন্নতিশীল—বাস্তবিক দেশহিতৈষী ব্যক্তিরা স্বার্থসূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রীয় বিধান বর্ত্তমান অবস্থাসঙ্গত পূর্ব্বক, কার্য্যে পরিণত

করিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ না দেখাইলে কোন ফলই ফলিবে না। হায়! হায়! দেশের কৃতবিদ্যানেরা কি কাপুরুষ! তাঁহারা একদিন এক কথার পোষকতা করেন, আবার পরদিন কি বলিয়া তাহারই প্রতিবাদ করিয়া স্বীয় হীনচেতার পরিচয় দিয়া থাকেন? তাহরে হেতু কেবল ধর্ম্মের অভাব।

বর্ত্তমান দেশ কাল পাত্রের হিসাবে, আমাদের যুবকদিগের ২৫ বৎসরের নিম্নে বিবাহ হওয়াই অকর্ত্তব্য। ২৫ বৎসরের উর্দ্ধে বিবাহের কাল উল্লেখ করিবার হেতু এই যে, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর ব্যবস্থানুসারে ন্যূন সংখ্যায় ২৩ বৎসরের নিম্নে কোন বালক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম নহে। বিদ্যালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্ততঃ এক বৎসর বিশ্রামের প্রয়োজন। তদনন্তর জীবিকা নির্ব্বাহের পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিন বৎসর কাল অতিবাহিত না হইলে, তাহাতে দক্ষতা লাভ হয় না। এই সময়েই বিবাহ হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। যদ্যপি ২৭ বৎসরের পাত্র, দ্বাদশ কিম্বা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করে,তাহা হইলে বাস্তবিক সুখের ইয়ত্তা থাকে না। শারীরিক স্বচ্ছন্দতা রক্ষিত হয়, অর্থের আনুকূল্য প্রযুক্ত বলকারক আহারের অভাব হয় না এবং বীর্য্যবান পিতার ঔরসে সুসন্তান জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এরূপ বিবাহে পিতামাতার, যদিও পুত্র বিক্রয়ের পণ লাভ না হউক, কিন্তু পুত্র ক্ষমবান হইলে তাঁহাদের কোটী কোটী গুণে লাভ হইবে, তাহার সংশয় নাই। এরূপ বিবাহে পাত্র সর্ব্ব বিষয়ে আনন্দিত, স্ত্রী সর্ব্ব বিষয়ে আনন্দিতা এবং তদুৎপন্ন সন্তানেরাও সর্ব্ব বিষয়ে আনন্দিত থাকে। এই নিমিত্ত মনু মহাশয়, ন্যূন কল্পে ২৪ বৎসরের পাত্রের সহিত ৮ম বর্ষীয়া বালিকার পরিণয় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, ২৪ বৎসরের যুবা ৮ম বর্ষীয়া বালিকার প্রতি গমন করিতে পারে না; বিশেষতঃ জ্ঞানোপার্জ্জনের পর বিবাহ করিলে, হৃদয়ে এ পশু ভাবের কখনও স্থান হয় না। তাহার যখন দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইবে, তখন পাত্রের বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতি হইবে; ফলে আমাদের প্রস্তাব অবিকল মনু মহাশয়ের মতের অনুযায়ী হইতেছে। ইহা অশাস্ত্রীয় এবং বর্ত্তমান অবস্থার বিরুদ্ধ হইতেছে না।

এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত একটী সভা আবশ্যক, তাহাতে হিন্দু মাত্রেই সভ্য হইয়া আপনাপন মতামত প্রকাশ করিয়া দেশের কল্যাণার্থ কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই সভার দ্বারা হিন্দুদিগের সমাজ এবং

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রত্যেক বিষয়গুলি হিন্দুশাস্ত্রের সাহায্যে, বর্ত্তমান দেশ, কাল এবং পাত্র সঙ্গত করিয়া, পুনরায় স্থির হওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেক হিন্দুসন্তান একথাটী ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখুন। আমাদের অতি শোচনীয়াবস্থা উপস্থিত হইয়াছে! সকলেই বুঝিতেছেন যে, আজকাল সংসার করা কি দুর্ব্বিসহ ক্লেশের কারণ হইয়াছে। আইন পাশ করিয়াই হউক কিম্বা চিকিৎসক হইয়াই হউক, হাহাকার নাই, এমন স্থানই নাই। আইন পাশ করিতে যে অর্থ এবং সামর্থ্য ব্যয় হয়, তাঁহারা কি সে টাকা জীবনে উপার্জ্জন করিতে পারেন? তবে দুই দশ জনের কথা কদাচ গণনার বিষয় নহে।

যদ্যপি আমরা আপনারাই সময় থাকিতে ব্যবস্থা না করি, তবে পরিণামে আমাদের যে কি হইবে, তাহা বলা যায় না। যত কিছু অনর্থপাত হইতেছে, তাহার আদি কারণ বিবাহ। তন্নিমিত্ত বিবাহ বিষয়ে প্রথমে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান বিবাহের পরিণাম আমরা এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু বালকের বাল্যবিবাহ স্থগিত না হইলে যত দারিদ্রতা বাড়িবে, ততই হাহাকার উঠিবে, ততই বিবাহের ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু এক্ষণে যে প্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে একটী কন্যার বিবাহ হওয়া দুঃসাধ্য, যদিও সর্ব্বস্ব নিঃশেষিত হইয়া তাহাতে অব্যাহতি লাভ করা যায়, তাহার পরের কন্যার বিবাহ দেওয়া যারপরনাই বিভ্রাট হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে কিছুদিন চলিলে বালিকা-হত্যা আরম্ভ হইবে। বর্ত্তমানে তাহা হইতেছে কি না, এক্ষণে তাহাই বা কে বলিতে পারে? এই পাপ প্রবাহিত হইলে তখন সেই মহাপাতকে যে কি হইবে, তাহা কি কেহ স্থির করিতেছেন? সুতরাং সে পাপে জাতির দফা একেবারে "গয়াগঙ্গাহরি" হইয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় এ কথা বুঝিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। এমন আশঙ্কার স্থানে একটা আইন যে হইবে না, তাহা অধিক চিন্তার বিষয় নহে। আমরা চীৎকার করিলে কি হইবে, গভর্ণমেণ্ট তাহা শুনিবেন না। সতী দাহকালেও আইন হইয়া তাহা স্থগিত হইয়াছিল, এ কথা অযথার্থ নহে। বাঙ্গালী জাতিও আইন ভিন্ন সহজে কোন কার্য্য করিতে চাহে না, তাহাও সত্য কথা। তাই বলিতেছি, এই বেলা দিন থাকিতে থাকিতে আপোসে একটা বন্দোবস্ত করিলে কি ভাল হয় না? কিন্তু তাহা অতি সন্দেহের কথা। এ জাতি যে আর তেমন নাই। তাহা না হইলে ভ্রাতৃবিদ্রোহ বাধাইয়া, যবন ম্লেচ্ছের উদর পূর্ণ করিবে সেও ভাল, তথাপি ভাই-

ভেয়ে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া আপনাপনি মিটাইবে না। সে যাহা হউক, আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, যদ্যপি কেহ সহৃদয় ব্যক্তি থাকেন, তাঁহারা এই মহান্ কার্য্যে স্কন্ধদেশ প্রদান করুন। আমার প্রস্তাবই যে অভ্রান্ত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি না। যাহাতে সর্ব্বসঙ্গত হয়, সকলে একত্রিত হইয়া তাহার কারণ বহির্গত করিবার জন্য চিন্তা করুন। কেবল কথার বিবাদ করিয়া কবিত্ব এবং তর্ক বুদ্ধির পরিচয় দিলে জাতির কোন মঙ্গল হইবে না; জাতি যায়! অন্নাভাবে—শারীরিক স্বচ্ছন্দাভাব, মানসিক বলাভাব এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্মাভাব। এই অভাব মোচনের সদুপায় স্থির করিতে হইবে। এক রাজা তাঁহার রাজ্য মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করেন যে, প্রত্যেক প্রজা এক পোয়া করিয়া দুগ্ধ দিয়া একটী নবখোদিত পুষ্করিণী একরাত্রি মধ্যে পূর্ণ করিয়া দিবে। সকলেই মনে মনে ভাবিল যে, আমাদের একপোয়াতে কি আর ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে এবং রাজা কিরূপেই বা জানিতে পারিবেন। এইরূপ সকল প্রজাই ভাবিয়া কেহ দুগ্ধ দিল না, সুতরাং পরদিন প্রাতঃকালে রাজদূত যাইয়া দেখিল যে, পুষ্করিণী যেমন শুষ্ক তেমনই আছে। এক্ষণে আমাদের জাতিও তেমনই হইয়াছে। সকলেই মনে করেন যে, আমি আর কি করিব! এবিষয় চিন্তা করিবার অনেকেই আছেন; কিন্তু অদৃষ্টক্রমে পরিশেষে শূন্য পুষ্করিণীই থাকিয়া যায়। আমাদের কথায় আছে, "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।"

আমরা বাল্যবিবাহ হইতে যে কয়েকটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহা ১২৯৪ সালে লিখিত হইয়াছিল। সেই সময়ে আমরা দেশের প্রায় বড়লোক যাঁহারা, তাঁহাদের দ্বারে অনবরত গমনাগমন করিয়া কাহাকেও আমাদের কথায় মনোনিবেশ করাইতে পারি নাই। সমাজের অবস্থা দেখিয়া আমরা নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম, যে, বিবাহ সম্বন্ধে অচিরাৎ একটা আইন পাশ হইবেই। গভর্ণমেণ্ট কৌশল করিয়া যদিও আইনটী বর্ত্তমানে অন্যদিক দিয়া স্থির করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা বর্ত্তমান কালানুযায়ীই হইবে। সে যাহা হউক, এই বিবাহের আইন প্রচলিত হওয়ায় দেশের মঙ্গল সাধন হইয়াছে, তাহার ভুল নাই। মঙ্গল শব্দটী প্রয়োগ করিবার হেতু এই যে, ইহাতেও যদ্যপি আমাদের দেশের নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে সমাজ-সংস্করণ ও শাস্ত্রাদি চর্চ্চা করিবার জন্য লোকের মনে উত্তেজনা শক্তি উপস্থিত হইবে। শাস্ত্র কোথায়? স্বেচ্ছাচারী মত সর্ব্বত্রেই চলিতেছে। চারি বৎসর অতীত হইল, আমরা এই

নিমিত্তই একটী সভা স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সর্ব্বস্থানের পণ্ডিতেরা এই সভায় কার্য্য করিবেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া যাহা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, তাহাই শাস্ত্রবাক্য বলিয়া সকলকে শিরোধার্য্য করিতে হইবে। যে হিন্দু তাহা অশ্রদ্ধা করিবেন, তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা যাইবে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সভা হইতে প্রতিপালিত হইবেন। যদ্যপি সেইরূপ সভা স্থাপন করা যাইত, তাহা হইলে অদ্য আমাদের একটা একতায় বল জন্মিত। একি সামান্য আক্ষেপের বিষয় যে, হিন্দু-সমাজ, হিন্দুধর্ম্ম, অহিন্দু ম্লেচ্ছ এবং শূদ্রাদির অভিমতে কার্য্য হইতে লাগিল! হিন্দু সন্তানের কি ইহাতেও মোহতিমির বিদূরিত হইবে না?

আমি করজোড়ে আমাদের স্বজাতীয় মহোদয়দিগকে অনুনয় করিতেছি যে, তাঁহারা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। দ্বেষভাবে হিন্দুস্থানের অদ্য এতদূর দুর্গতি হইয়াছে, স্বার্থপরতার জন্য হিন্দুদিগের স্বাধীনতা গিয়াছে এবং এক্ষণেও ভ্রাতৃবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া কত পরিবার উৎসন্নে যাইতেছে। কিঞ্চিৎ অর্থের অনুরোধে অকালে আপন সর্ব্বনাশকে আহ্বান করিয়া আনিয়া কি কেহ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছেন? তবে কেন এই বিভ্রাট ঘটাইতেছেন? আমি স্বীকার করি, পিতা মাতা যখন বালক বালিকার বিবাহ দেন, তখন তাঁহাদের নয়নের অতিশয় আনন্দবর্দ্ধন হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ইহা বিড়ালের কিম্বা কুকুরের বিবাহ নহে, অথবা কাষ্ঠের পুত্তলিকারও বিবাহ নহে। এই বিবাহের পরিণামটা বিচার করিয়া দেখিলে, আমার প্রস্তাব কোন মতে অযথার্থ বলিয়া বোধ হইবে না।

বিবাহ-বিধি পরিবর্ত্তন করাই হউক, কিম্বা সামাজিক অন্য কোন নিয়মেই নূতন বিধি প্রচলিত করা হউক, পরিবারের মধ্যে বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব প্রবিষ্ট না হইলে কোন প্রকারে বিশেষরূপ মঙ্গল হইবে না; কিন্তু উপরোক্ত বিবাহের পরিবর্ত্তনে যুবকদিগের নিজ নিজ কর্ত্তব্য বোধ থাকায়, বিপদের আশঙ্কা হইতে যে পরিমুক্তি লাভ হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না; কিন্তু আমরা হীনবীর্য্য পিতার ঔরসে জন্মাইয়া মস্তিষ্কহীন হইয়া এবং আমাদের সমাজ দীর্ঘসূত্রতায় ও স্বার্থপরতা সূত্রে গ্রথিত হইয়া কিম্ভূতকিমাকার হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা কখন সুবিচার সম্ভবে না। যাঁহারা তাহা নহেন, যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বীর্য্যবান, যাঁহাদের ধমনীতে ধর্ম্মবারি প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহারা সচেষ্টিত

হউন। তাঁহারা এই স্বজাতির বিপদের কর্ণধার স্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান হউন, তবে দৃষ্টান্ত দ্বারা ক্রমে ক্রমে সকলের মনে নূতন ভাব প্রেরিত হইবে।

যদ্যপি তাঁহারাও অদৃষ্টক্রমে আমাদের নৈরাশ করেন, তাহা হইলে তরুণ বালকদিগকে সবিনয়ে অনুরোধ করি, তাঁহারা নিজে বদ্ধপরিকর হউন। কেশব বাবু "ব্যাণ্ড অব্ হোপ" দ্বারা যেমন অনেক সুরাপায়ী পিতার ঔরসজাত সন্তানের মনোবৃত্তি সংশোধিত করিতে পারিয়াছিলেন, সেইরূপ সকলে ভগবানের শ্রীচরণে মন একান্ত সমর্পণ পূর্ব্বক আত্মোন্নতি করিতে চেষ্টা করুন, ভগবানের বল থাকিলে পিতা মাতার অবাধ্য হইলে কোন অনিষ্ট হইবে না। তদনন্তর পিতা মাতার নিকটেও অবাধ্য দোষে দোষী হইতে হইবে না। পিতা মাতার আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া যদ্যপি অধর্ম্ম কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ পাপ হইবে। হিন্দুশাস্ত্রে এ প্রকার অবাধ্য হইবার দৃষ্টান্ত আছে।

১৯৮। বিবাহ হইলেই যে দিন রাত্রি স্ত্রী লইয়া থাকিতে হইবে, তাহা নহে। পশুদিগের যে সকল নিয়ম আছে, এক্ষণে মনুষ্যদিগেরও তাহা নাই। কুকুরেরা কার্ত্তিক মাসে সহবাস করে, কিন্তু মানুষের প্রত্যহই কার্ত্তিক মাস।

১৯৯। স্ত্রীর ঋতুকালীন সহবাসের সময়; তদ্ভিন্ন তাহাকে স্পর্শ করা কর্ত্তব্য নহে।

২০০। পরদার গমনের অপেক্ষা পাপ আর নাই।

২০১। যোনি ও লিঙ্গের মিলনকে রমণ বলে কিন্তু রমণ বিবিধ প্রকার আছে। রঙ্গরসের কথা কহা, চক্ষে চক্ষে ভাব বিনিময়, পরস্পর হস্তমর্দ্দন, পরস্পর আলিঙ্গন, চুম্বন, ইত্যাদি।

২০২। যে প্রকৃত-রমণ যতই অল্প করিবে, তাহার সেই পরিমাণ মঙ্গল হইয়া থাকে। রেত নির্গমণ হইয়া যাইলে, ভক্তি এবং ভাব সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়।

২০৩। স্ত্রীকে ইচ্ছা করিয়া কেহ পরিত্যাগ করিবেন না। যদ্যপি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও হইয়া থাকে।

২০৪। কথায় বলে, গরু, জরু, ধান,
তিন রাখ্‌বে আপন্‌ বিদ্যমান।

সাংসারিক লোকদিগের এই প্রকার কথাই বটে, কিন্তু ইহার ভাব স্বতন্ত্র প্রকার। ঈশ্বরের দিকে যাহার মন ধাবিত হয়, তাহার পক্ষে কোন কথাই ঘটে না।

২০৫। সংসারের আকর্ষণ অতিশয় তীব্র, যেমন অম্লগ্রস্ত রোগী আচার তেঁতুল দেখিলেই তাহার জিহ্বায় জল সরিয়া থাকে, তেমনি কাহার কামিনী কাঞ্চনের প্রয়োজন না থাকিলেও তাহাদের দ্বারা মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর লাভের নিমিত্ত যাহার মন ছুটিবে, সে সর্ব্বাগ্রেই কামিনী-কাঞ্চনের সম্বন্ধ অল্পই রাখিবে।

২০৬। ঈশ্বরের কৃপায় সকলই সম্ভবে।

২০৭। জীব তিন প্রকার; ১ম মুক্ত, ২য় মুমুক্ষু এবং ৩য় বদ্ধ। এতদ্ভিন্ন নিত্য জীবও আছে। নিত্য জীবেরা আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকে।

২০৮। মুক্ত হ'ব কবে, "আমি" যা'ব যবে।

পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্যদিগকে বিশমাসিত করিয়া ফেলিলে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা বদ্ধ, মুমুক্ষু এবং মুক্ত।

যে সকল নরনারী আত্মজ্ঞানান্ধ এবং রিপুদিগের বশীভূত হইয়া নিয়ত পরিচালিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের বদ্ধজীব কহে।

বদ্ধজীবেরা দৈহিক কার্য্যকেই পৃথিবীর একমাত্র কার্য্য এবং তাহা সুচারুরূপে সাধন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আপন পর জ্ঞান সমধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং স্বার্থপরতার পূর্ণকার্য্য পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাঁহাদের নিকট অর্থই সর্ব্বস্ব

রত্ন। জ্ঞান অর্থ, ধ্যান অর্থ এবং অর্থের কথাই তাঁহারা প্রচার করিয়া থাকেন। এই জীবমণ্ডলীতে দানশক্তি নিষ্ক্রিয়াবস্থায় অবস্থিতি করে। দয়ার বাস উঠাইয়া সে দেশ হইতে দূরে বহিষ্কৃত করা হয়, অতএব ক্ষমার ছায়া পতিত হইবার কোন উপায়ই থাকিতে পারে না। তাঁহাদের মুখে কেবল আমি এবং আমার, এই শব্দ দুইটীর একাধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমি অমুক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র, আমি স্বহস্তে উপার্জ্জন করিয়া এই বাড়ী, উদ্যান প্রভৃতি সমুদয় বিষয় সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছি। আমার স্ত্রী রূপে, গুণে এবং স্বামী-ভক্তিতে জগতের অদ্বিতীয়া; আমার কন্যার ন্যায় সুশীলা, সুরূপা ও লাবণ্য-সম্পন্না আর কে আছে? আমার পুত্র, আমার পুত্র বলিবারই যোগ্য বটে। আমার ন্যায় ধনী কে? আমার ন্যায় পণ্ডিত কে? আমার ন্যায় ধী-সম্পন্ন আর কে আছে? আমি মনুষ্য বলিয়া আর কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। আমি মনে করিলে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারি!

সাধু, দেবতা, ঈশ্বর, কাহারই প্রতি শ্রদ্ধা থাকে না, কিন্তু তাঁহারা যে সাধু দ্বারা তাম্র ও সুবর্ণ হইবার প্রলোভন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহার প্রতিই তাঁহাদের শ্রদ্ধা জন্মায়; আর যে দেবতার্চ্চনা করিলে যশঃ, ধন ও পুত্র সন্তান লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাঁহারই পূজা তাঁহাদের দ্বারা হইলেও হইতে পারে। যে ধর্ম্ম কর্ম্মে পারলৌকিক সুখ্যাতি, ধন ও পুত্রাদি এবং নরপতি তুল্য মর্য্যাদাসম্পন্ন অবস্থা লাভ হইতে পারে, তাঁহারা তাহা একদিন অনুষ্ঠান করিলেও করিতে পারেন। এই শ্রেণীর মনুষ্যেরা সুখের সময় যেমন স্ফীত হন, শোক দুঃখেও তেমনই বিষাদিত ও উন্মাদের প্রায় আকৃতি ধারণ করিয়া থাকেন। পরকাল আছে বলিয়া তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান থাকে না। স্বর্গ নরক বিশ্বাস করেন না। ঈশ্বর আছেন কি না তাহা ভ্রমেও তাঁহাদের মনোমধ্যে উদয় হয় না। যদ্যপি ঘটনাক্রমে কোন ব্যক্তি দ্বারা ধর্ম্ম কথা শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে বিরক্তির পরিসীমা থাকে না। যদ্যপি কোন বন্ধুর বাটীতে পুরাণ কিম্বা হরিকীর্ত্তনাদির নিমন্ত্রণ হয়, তাহা হইলে ভোজনের সময় অনুমান করিয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন। যদ্যপি তাঁহার আত্মীয় স্বজন কেহ ধর্ম্ম কার্য্যে অর্থব্যয় করেন, তাহাতে তাঁহারা মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হন এবং সুযোগ মতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য নানাবিধ উপদেশ দিয়াও থাকেন, কিন্তু সংসারের গঠন স্বতন্ত্র; সুখ বা শান্তি এমন গুপ্তভাবে রক্ষিত হইয়াছে

যে, বিশেষ সুচতুর ভিন্ন অন্যের তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হইবার কোন উপায় নাই। বদ্ধজীবেরা যখন আমি এবং আমার জ্ঞানে সংসারক্ষেত্রে উপর্য্যুপরি আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের প্রাণে ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়া থাকে। যখন তাহারা দর্পের সহিত কোন কার্য্যে উপর্য্যুপরি প্রবৃত্ত হইয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য লাভ করিতে না পারে, যখন বিদ্যার গরিমা অন্য কর্ত্তৃক প্রদমিত হইয়া যায়, যখন অতি যত্নের অর্থ রোগে কিম্বা মোকদ্দমায় অথবা বাণিজ্যের ছলনায় বিনষ্ট হইয়া যায়, যখন প্রাণসর্ব্বস্ব সহধর্ম্মিণী কালশয্যায় শয়ন করে, যখন সংসারক্ষেত্রের শোভানকারী সন্তানরত্ন একটী একটী করিয়া খসিয়া পড়ে, যখন আপনার দেহ বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়, তখন বদ্ধজীবের মনে হয় যে, আমি এবং আমার কি? যে আমি এক সময়ে যাহা মনে করিয়াছি, তাহাই অবাধে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছি, যে আমি ক্ষণমধ্যে কত হীনবীর্য্য ব্যক্তি-দিগের ভদ্রাসন পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছি, যে আমি সতীত্বাভিমানিনী স্ত্রীদিগের সতীত্ব-গর্ব্ব মুহূর্ত্তের মধ্যে খর্ব্ব করিয়াছি, যে আমি বুদ্ধির কৌশলে অর্থ রাশি উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, যে আমি অশেষ গুণযুক্ত পুত্রকন্যা উৎপাদন করিয়াছিলাম, যে আমি বীর্য্য শৌর্য্যশালী ছিলাম, সেই আমি এখন কেন সেইরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছি না? কেন ধন রক্ষায় অপরাক হইলাম? কেন পুত্রের প্রাণ রক্ষায় অসমর্থ হইতেছি? কেন বাক্য স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না? কেন বন্ধুহীন হইলাম? কেন দীন দরিদ্রাবস্থায় পতিত হইলাম? কোথায় আমার বিষয় বৈভব, কোথায় আত্মীয় স্বজন একে একে অদৃশ্য হইল?

বদ্ধজীবেরা এইরূপে যখন আমি এবং আমার কি বিচার করিতে থাকে, তখন ক্রমে ক্রমে তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতে থাকে। তাহারা তখন প্রত্যক্ষ করে যে, আমি—আমার কথা যারপরনাই ভ্রমের ব্যাপার। তবে আমি এবং আমার কে? এই বিচার মানসক্ষেত্রে উত্থিত হইলেই বদ্ধজীবেরা মহাবিভ্রাটে নিপতিত হইয়া থাকে। অমুকের পুত্র আমি এই কথাটি সত্য, না অমুক-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহাই আমি? অমুকের পিতা আমি, না অমুক পণ্ডিত ও ধনী আমি? আমিই আমি, না আর কেহ আমি? যদ্যপি অমুকের পুত্র আমি হইতাম, তাহা হইলে পিতা পুত্রের বিচ্ছেদ হইল কেন?

যদ্যপি কুলই আমি হই, তাহা হইলে আর সে মর্য্যাদা নাই কেন? যদ্যপি ধনী আমি হইতাম, তাহা হইলে সে ধন কোথায় গেল? যদ্যপি আমিই আমি হইতাম, তাহা হইলে কেন শ্বাস রোগে এক প্রকার নির্ব্বাক্ হইয়াছি,

পক্ষাঘাতে চলৎ-শক্তি-বিহীন হইয়াছি, এবং দর্শন শক্তির অভাবে অন্ধ হইয়া বসিয়া আছি? যে আমি পূর্ব্বে ছিলাম, এখন কি সেই আমি আছি? না অন্য আমি হইয়াছি? মনে হয় সেই আমিই রহিয়াছি, তবে এমন দুর্দ্দশাপন্ন হইলাম কেন? কেন আমি চলিতে পারিতেছি না? কেন আমি দেখিতে পাইতেছি না? কেন আমি গলাবাজী করিয়া শ্রোতৃবর্গের মোহ জন্মাইতে পারিতেছি না? তবে আমি কে? যে আমি পূর্ব্বে ছিলাম, সে আমি কি আর নাই? অথবা ইহার অভ্যন্তরে কোন গূঢ় রহস্য আছে?

যাহা আমার বলিয়া ধারণা ছিল, এখন আমি সত্ত্বে সে সকল কোথায় গেল? এখন আমার স্ত্রী নাই, আমার পুত্র নাই, আমার ধন ঐশ্বর্য্য নাই, এমন কি আমার দেহ এখন যেন আমার নহে। তবে আমারই বা কি? বদ্ধজীবের এই অবস্থা উপস্থিত হইলে, তিনি মুমুক্ষু শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। তখন 'আমি এবং আমার' এই প্রশ্ন মীমাংসা করিবার জন্য মনপ্রাণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। পৃথিবী এমনই স্থান যে, সে স্থানে যখন যাহার মনে যাহা জানিবার বা বুঝিবার জন্য ব্যাকুলতা জন্মায়, তখনই তাহা সিদ্ধান্ত হইবার উপায় উপস্থিত হইয়া যায় অর্থাৎ গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে।

আমাদের দশটী দিক্ আছে। এই দশদিকে যতক্ষণ যে কেহ আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে বদ্ধ বলা যায়। তখন কোন দিক হইতে তাহার পলাইবার শক্তি থাকে না। গুরুর কৃপায় এই দশটী বন্ধন,—যথা ১ দেহাভিমান, ২ জাত্যাভিমান, ৩ বিদ্যাভিমান, ৪ মর্য্যাদাভিমান, ৫ ধনাভিমান, ৬ পিতা মাতার প্রতি আসক্তি, ৭ স্ত্রী অনুরক্ততা, ৮ সন্তান বিমুগ্ধতা, ৯ সামাজিক ভয় এবং ১০ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাভিমান একে একে খণ্ডিত হইয়া বদ্ধজীব পরিমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার জ্ঞানচক্ষে দৃষ্ট হয় যে, আমি বলিয়া বাস্তবিক কেহই নাই। আমি শব্দ একটী উপাধি মাত্র। শরীরের মধ্যে আমি কোথায়? মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলে কুত্রাপি আমি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদিও জীবিতাবস্থায় আমিত্বের ভ্রম ঘটিয়া থাকে, কিন্তু নিদ্রাকালে সে আমিত্বের বলবিক্রম অনায়াসে উপলব্ধি করায়। জাগ্রতাবস্থায় কেহ কোন প্রকার মর্য্যাদা ভঙ্গের কথা বলিলে, আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি অথবা করিয়া থাকি; কিন্তু নিদ্রাকালে মুখগহ্বরে কেহ মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া যাইলেও তাহা জানিবার শক্তি থাকে না। অথবা দস্যুতে

সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া লইলে, তাহা আমার কর্ণগোচর হইতে পারে না। তখন কে মাতা পিতা, কেই বা দারা সুত, কেই বা ভ্রাতা ভগ্নী, কেই বা কুটুম্ব, কেই বা শত্রু, কেই বা মিত্র, ইহার কিছুই বোধ থাকে না। তখন রত্নাদিও যাহা, আর মৃত্তিকা খণ্ডও তাহা। জীবিতাবস্থায় প্রত্যেক দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ন্যূন সংখ্যায় তাহার এক তৃতীয়াংশ কাল "আমি"র আমিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই আমির কত গৌরব! মৃত্যুর পর ত কথাই নাই। আমার বলিয়া যাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক আবদ্ধ হওয়া যায়, তাঁহারা আমার কি না তৎসম্বন্ধেও এইরূপে দিব্যজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। কোন আত্মীয় ব্যক্তি মরিয়া গেল। যত্নের দেহ, যাহা আমার জ্ঞানে এতদিন ক্ষীর-সর-নবনী ও বহুবিধ জীব-হিংসা করিয়া পুষ্টিসাধন করা হইল, যাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের নিমিত্ত নানা ছাঁদের বস্ত্র ও বিবিধ প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য সুশোভিত করা হইল, পিতা মাতা যাহাকে নয়নের মণি, বৃদ্ধকালের অবলম্বন-স্বরূপ বলিয়া পলক প্রমাণ কাল চক্ষের অন্তরাল হইলে প্রলয় জ্ঞান করিতেন, স্ত্রী যাহার নিমিত্ত নিমেষার্দ্ধ অদর্শনে ব্যাকুলিত হইতেন, পুত্র কন্যা যাহাকে দেখিতে না পাইলে বিষাদিত হইত, এখন সেই ব্যক্তির দেহের পরিণাম কি ভয়ানক! পিতা মাতা এক-চক্ষে বারিবর্ষণ করিতেছেন, অপর চক্ষে আপনার এবং অন্যান্য কন্যা পুত্রের মঙ্গলের জন্য সতর্ক হইতেছেন। কন্যা পুত্রেরাও তাহাদের স্ব স্ব বিরহানল অর্থের দ্বারা নির্ব্বাণ করিতে আরম্ভ করিল। দেহ, হয় পূর্ণাগ্নিতে আহুতি-স্বরূপ প্রদত্ত হইল, না হয় পৃথিবীর উদরে অনন্ত শয্যা রচনা করিয়া তথায় অনন্তকালের জন্য রক্ষিত হইল। ক্ষণপূর্ব্বে যাহাকে এত বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাকে কেন পরিত্যাগ করা হইল? মনে আর একটী প্রশ্ন উঠিল। সম্বন্ধ কাহার সহিত? আবদ্ধ করা হইয়াছিল কাহাকে? শরীর না আত্মা? যদ্যপি শরীর হয়, তাহা হইলে সে শরীর পরিত্যক্ত হইল কেন? যদ্যপি তাহা অস্বীকার করিয়া আত্মাকে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে সে কথা নিতান্ত উপহাসের বিষয় হইবে। আত্মার সহিত কাহার চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয় না। দেহের দ্বারাই আত্মার উপলব্ধি বা অনুমান করিয়া লইতে হয়। আনুমানিক বস্তুতে প্রাকৃতজ্ঞান করা মায়া বা ভ্রমের কার্য্য, সুতরাং আমি এবং আমার সম্বন্ধ সমুদয়ই অনুমানের রহস্য।

যখন মুমুক্ষু জীব এই রহস্য ভেদ করিতে পারেন, তখনই তিনি সম্মুখে মুক্তির প্রশস্ত পথ অবলোকন করিয়া থাকেন। আপনাকে জড় ও চেতন

পদার্থের একটী যৌগিক বলিয়া ধারণা হয়, কিন্তু কেন জন্মিলাম ? কে জন্ম দিল ? কোথায় ছিলাম ? কি ছিলাম ? কি হইব ? কোথায় যাইব ? তাহার কোন নিদর্শন পাইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আমি কি এবং কে ? আমার কি এবং কে ? তাহা আর বলা যায় না। যখন যে স্থানে অবস্থিতি করি, তখন তাহাদের সহিত সাময়িক সম্বন্ধ স্থাপন হয়। সেই সাময়িক সম্বন্ধে যাহা কিছু সাময়িক ভাব আইসে, তাহাতেই নির্ভর করিয়া থাকা মুক্ত জীবের কার্য্য।

মুক্ত জীব আপনার সহিত পৃথিবীর সমুদয় পদার্থের সাদৃশ্য এবং সমলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া সকলকেই আপনার জ্ঞান করিয়া থাকেন। দেহ জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত হয়। মনুষ্য মাত্রেই এক জাতীয় পদার্থ গত এবং দেহীও তদ্রূপ, সুতরাং আমিও যাহা, সমুদয় মনুষ্যগণও তাহা। এমন অবস্থায় সকলেই আপনার হইয়া যায়। এই নিমিত্ত আত্মপর জ্ঞান আর থাকে না। এমন ব্যক্তিই সংসারে সাধু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। মুক্ত জীবদিগের এই প্রকার অবস্থা উপস্থিত হইলে তাঁহারা 'আমি এবং আমার' এ কথা উচ্চারণ করিতে অপারক হইয়া থাকেন। কারণ দেহের উপাদান কারণ জড় পদার্থ, তাহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃজিত এবং অধিকরণ কারণ আত্মাও পরমাত্মাপ্রসূত; জড় পদার্থ এবং আত্মা যদ্যপি পরমেশ্বর বস্তুই হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার সম্পত্তিতে আমার বলিয়া আত্মসম্বন্ধ স্থাপন করা যারপরনাই অজ্ঞানের কর্ম্ম। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "যে পর্য্যন্ত আমি এবং আমার জ্ঞান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে অজ্ঞান বলে এবং হে ঈশ্বর! তুমি এবং এই ব্রহ্মাণ্ড তোমার, ইহাকেই জ্ঞান কহে।" প্রকৃত মুক্ত পুরুষেরাই এই কথা বলিবার অধিকারী।

২০৯। অভিমান বা আমি কিছুতেই যাইতে চাহে না। যাহা যাইবার নহে,—যত চেষ্টাই হউক, যত জপতপই করা হউক, এক সূত্রে না একসূত্রে তাহা গ্রথিত হইয়া থাকিবেই থাকিবে।

২১০। যেমন কেহ স্বপনে দেখিল যে, কোন ব্যক্তি তাহাকে কাটিতে আসিতেছে, সে ঘুমের ঘোরে গোঁ গোঁ

করিতে করিতে জাগিয়া উঠিল। তখন সে দেখিল যে, গৃহের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, বাস্তবিক তাহাকে কেহ মারিতে আইসে নাই, স্বপ্ন দেখিয়াছে; এপ্রকার স্থির করিয়াও কিয়ৎকাল তাহার বুক টিপ্ টিপ্ করিতে থাকে। অভিমানও তদ্রূপ যাইয়াও যাইতে চাহে না।

২১১। ছাগলটা কাটিয়া ফেলিলে, তাহার ধড়, মুণ্ড হইতে পৃথক করা হইলেও কিয়ৎকাল নড়িতে থাকে। সেইরূপ অভিমানের জড় মরিয়াও মরে না।

২১২। যেমন পেঁয়াজ কিম্বা রসুন ছাঁচিয়া কোন পাত্রে রাখিলে, পাত্রটী শতবার ধৌত করিয়া ফেলিলেও তাহার গন্ধ যায় না; সেই প্রকার অভিমান, জ্ঞান-বারি দ্বারা বিশেষ ধৌত করিলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে শূন্য করা যায় না।

২১৩। আমি দুই প্রকার। কাঁচা আমি এবং পাকা আমি। আমি অমুকের পুত্র, আমি অমুকের পৌত্র, আমার পিতা পিতামহ অমুকের বিবাহ দিয়াছেন, অমুকের পৈতা দিয়াছেন, অমুককে দশ বিঘা জমি দিয়াছেন, আমি কি না করিতে পারি? ইহাকে কাঁচা; এবং আমি কেহ নহি, আমি কিছুই নহি, আমি কি? জাতি আমি, কুল আমি, না আমিই আমি? যখন সে দেখে যে, আমি কথাটাই অহঙ্কার-সূচক, আমি যাইয়াও যায় না; তখন মনে ভাবে যে, পাজী আমি যদি একান্তই যাবি না, তবে ঈশ্বরের "দাস-আমি" হইয়াই থাক্; এই আমিকে পাকা আমি কহে।

আমি কি কিছুই নহি, একথা মীমাংসা করা যাউক। আমি কেহ নহি, তাহার প্রমাণ কি? আমারা যতক্ষণ জাগিয়া থাকি, ততক্ষণ বলিয়া থাকি

যে, ইহা আমি কিম্বা আমার। নিদ্রাগত হইলে সে কথা বলিবার আর অধিকার থাকে না। তখন আমি এবং আমার বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই দৃষ্টান্তে আমি ও আমার কতদূর সত্য, তাহা দৃষ্ট হইয়াছে। অন্য দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, আমি বলিয়া এমন কোন পদার্থই নাই। একদা কোন সাধু তাহার শিষ্যকে এই জ্ঞান প্রদান করিবার জন্য তাহাকে কোন উদ্যানে রাখিয়া আসিলেন। কিছু দিন পরে সাধু তথায় যাইয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বাপু কেমন আছ? শিষ্য কহিল, আছি ভাল কিন্তু কিছু অভাব ঘটিতেছে। সাধু শ্যামা-নাম্নি একটী স্ত্রীলোককে আনিয়া তাহাকে প্রদান করিলেন। কিছুদিন পরে সাধু পুনরায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ? শিষ্য কহিলেন, কিছু অভাব বোধ হইতেছে। সাধু মদ্য মাংসাদি ভক্ষণ করিতে বলিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে সাধু শিষ্যের নিকট আসিয়া কহিলেন, কেমন বাপু! এবার তুমি কেমন আছ? শিষ্য কহিল, আর আমার কোন অভাবই নাই। তখন সাধু শ্যামাকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া শ্যামার হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি এ কি? শিষ্য কহিল, শ্যামার হাত। কর্ণ নাসিকা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শিষ্য তাহাতেও শ্যামার কান, শ্যামার নাক কহিল। এইরূপে যে স্থানটীর নাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, শিষ্য সেই স্থানটী শ্যামার বলিয়া উত্তর প্রদান করিল। কিয়ৎকাল পরে শিষ্যের মনে সহসা তর্ক উঠিল। হাত, পা, মুখ শ্যামার বলিতেছি, তবে শ্যামা কে? সাধু কহিলেন, আমি জানি না। শিষ্য নিতান্ত উতলা হইয়া উঠিল, "শ্যামা কে, শ্যামা কে" বলিয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তখন সাধু কহিলেন, শ্যামাকে যদি জানিতে একান্তই ইচ্ছা হয়, তবে এখন তোমাকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিই, এই বলিয়া মন্ত্র প্রদান করিলেন।

২১৪। আমি বা অহংভাব এত অনিষ্টদায়ক যে, তাহা যে পর্য্যন্ত না যাইবে, সে পর্য্যন্ত কোনমতেই নিস্তার নাই। "আমি"র কত দুর্গতি তাহা একটী দৃষ্টান্তেই দেখিতে পাইবে। বাছুরগুলো ভূমিষ্ট হইয়া হাম্‌হা অর্থাৎ হাম্ হায়, আমি আমি ইত্যাকার বলিতে থাকে। তাহার এই অহংকারের

নিমিত্ত কত দুর্গতিই হয় দেখ! ষাঁড়গুলোকে চাষ করিতে হয়, কখন বা তাহাদের দাগ দিয়া ছাড়িয়া দেয়, এবং কোনটাকেও বা গাড়ি টানিতে হয়। গাভিগুলোকে দড়ি দিয়া বেঁধে রাখে, কাটিয়া খাইয়া ফেলিলে বিষ্ঠা হইয়া যায়। তাহাতেও ত তাহার অভিমানের যথেষ্ট শাস্তি হয় না। মরিয়া গেলে তাহার চামড়ায় ঢোল হয়, তখন তাহাকে পিটিতে থাকে, সে স্থানেও অহঙ্কার শেষ হয় না। পরে অন্ত্র-গুলি লইয়া তাঁত প্রস্তুত হয়, সেই তাঁতে যখন ধুনুরীরা তুলা ধুনিতে থাকে, তখন "তুঁহু তুঁহু" "আমি নই, আমি নই" "তুমি তুমি" শব্দ বাহির হয়। সেই প্রকার সহজে "আমি" ত্যাগ করিতে কেহ চাহে না, অস্ত্রে আঘাত করিলে তবে তুমি বলে। ঈশ্বরের কাছে কি কেহ সহজে যাইতে চাহে? যখন বিষয় নাশ, পুত্র-বিয়োগ ঘটে, তখনই তাহার আমিত্ব যাইয়া তুমিত্ব আসিলেও আসিতে পারে।

২১৫। কোন ব্যক্তির একজন কর্ম্মচারী ছিল। তাহাকে যে কেহ জিজ্ঞাসা করিত, মহাশয় এ বাগানটী কাহার, সে বলিত আমাদের। এ বৈটকখানাটী কাহার? তখন সে আমা-দের বলিয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইত। একদিন সেই কর্ম্মচারী একটী মাছ ধরিয়া খাইয়াছিল, বাবু তাহা জানিতে পারিয়া এক-কাপড়ে তাহাকে দূর করিয়া দিল। তখন তাহার একটী আঁবকাটের সিন্দুক ছিল, তাহাও লইয়া যাইতে পারিল না। অভিমানেতে এতদূর অধোগামী হইতে হয়।

২১৬। যেমন, হাঁড়িতে চাল, ডাল, আলু কিম্বা অন্য কোন দ্রব্য একত্রিত করিয়া রাখিলেও ইচ্ছাক্রমে প্রত্যেক দ্রব্যকেই বাহির করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে উত্তাপ

প্রদান করিলে আর কাহাকেও স্পর্শ করা যায় না। অহঙ্কারের দ্বারা জীবদিগকে তেমনি সর্ব্বদা উগ্র করিয়া রাখে। জীবের দেহটী হাঁড়িবিশেষ; কুল, মান, জাতি, বিদ্যা, ধন ইত্যাদি চাল, ডালের স্বরূপ; অহঙ্কার উত্তাপের ন্যায়।

২১৭। ফোঁস করিও, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু কাহাকেও দংশন করিও না।

কোন স্থানে একটী সর্প থাকিত। তাহার নিকট দিয়া কাহার গমনাগমন করিবার সাধ্য ছিল না। যে যাইত, তাহাকে দংশন করিত। একদা একজন মহাত্মা সেই পথে গমন করিতেছিলেন, তাঁহাকে দংশন করিবার মানসে সর্প ধাবিত হইল কিন্তু সাধুপ্রভাবের নিকট তাহার হিংসা বৃত্তি পরাজিত হইয়া যাইল। সাধু কহিলেন, কি রে, আমায় দংশন করিবি? সর্প লজ্জিত হইয়া কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। অতঃপর সাধু কহিলেন যে, শোন্, অদ্যাবধি আর কাহাকেও দংশন করিস্‌নে! সর্প যে আজ্ঞা বলিয়া আপন বিবরে প্রস্থান করিল, সাধুও স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। পরদিন হইতে সর্পের নিগ্রহ আরম্ভ হইল। সে কাহাকেও কিছু বলে না, সুতরাং যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাকে লইয়া তাহাই করিতে লাগিল। কেহ ইট মারিত, কেহ লেজ ধরিয়া টানাটানি করিত, এইরূপে তাহার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়া আসিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই মহাত্মা তথায় পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সর্পের হীনাবস্থা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, ঠাকুর! আপনি যে অবধি কাহাকেও দংশন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই অবধিই আমার নানাবিধ দুর্গতি হইতেছে। সাধু হাসিয়া কহিলেন, আরে পাগল! আমি তো'কে দংশন করিতে নিষেধ করিয়াছি বটে, কিন্তু ফোঁস করিতে নিবারণ করি নাই। যে কেহ তো'র নিকটে আসিবে, তুই তখনি ফোঁস করিবি, তাহা হইলে কেহ আর অত্যাচার করিতে পারিবে না। সেই প্রকারঃ—

২১৮। সংসারে থাকিতে হইলে ফোঁস্ চাই। নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তিদিগের সমাজে কল্যান নাই। কাহারও সর্ব্বনাশ

করা উচিত নহে, কিন্তু কাহারও কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হওয়াও কর্ত্তব্য নহে।

২১৯। ভৃত্যকে সর্ব্বদা শাসনে রাখিবে। যে ভৃত্য মনিবের সহিত সমান উত্তর প্রত্যুত্তর করে, তাহাকে বাটীতে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যেমন গৃহের ভিতর কালসর্প বাস করিলে সেস্থান আর বাসোপযোগী হয় না, সেইরূপ মুখরা ভৃত্যকেও জানিতে হইবে।

২২০। ভ্রষ্টা-স্ত্রী লইয়া বিশুদ্ধ শোণিতবিশিষ্ট ব্যক্তি কখন সহবাস করিতে পারে না। স্ত্রী ভ্রষ্টা হইলে তাহাকে গৃহে কালসর্প জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিবে।

২২১। যেমন, কামারদের "নাই"-এর উপর কত হাতুড়ির আঘাত পড়ে, তথাপি তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তন হয় না; তেমনি সকলের সহ্য গুণ থাকা চাই। যে যাহাই বলুক, যে যাহাই করুক, সমুদায় সহ্য করিয়া লইবে।

২২২। যেমন, স্প্রীংএর গদির উপর যতক্ষণ বসিয়া থাকা যায়, ততক্ষণই সঙ্কুচিত থাকে, কিন্তু উহা পরিত্যাগ করিবার পরক্ষণেই আপন আকার ধারণ করে; মনও তদ্রূপ। ইহা সতত স্ফীত হইয়া থাকিতেই চাহে। যখন ইহার উপর শ্রীহরি আসিয়া উপবেশন করেন, তখনই স্ব-ভাব চ্যুত হইয়া সঙ্কুচিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

মনুষ্যেরা যে পর্য্যন্ত মনের পরামর্শে মনের আদেশে প্রতিনিয়ত পরিচালিত হইতে থাকে, যে পর্য্যন্ত মনের মীমাংসা মনের যুক্তি দ্বারা মতামত স্থির করিয়া লয়, যে পর্য্যন্ত মনের আবেগে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান করে, সে পর্য্যন্ত প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিক রাজ্যের একটী বর্ণও তাহাতে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। এই নিমিত্ত আমাদের শাস্ত্রেতেও ঈশ্বর মনের অতীত বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

মনের কার্য্য সীমাবদ্ধ। যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়াদির গোচর, মন তাহা হইতে অধিক দূরে গমন করিতে অপারক হইয়া থাকে, অর্থাৎ জড় ও জড়-চেতন পদার্থ এবং তৎসম্বন্ধীয় ভাব ব্যতীত, অপর ভাব প্রাপ্ত বা চৈতন্যলাভ হইবার উপায় এবং তাহা ধারণা করিবার শক্তি জড়রাজ্যে সর্ব্ব প্রথমে কুত্রাপি লাভ করা যায় না। কারণ, জড় ও জড়-চেতন পদার্থে জড় ও জড়-চেতন ভাবই উদ্দীপন করিয়া দেয়। যেমন, কাষ্ঠের দ্বারা কাষ্ঠ ব্যতীত অন্য কোন ভাব আসিতে পারে না; অথবা তাহাকে যে ভাবে পরিণত করা হইবে, যথা—নৌকা, দরজা, জানালা, কিম্বা বাক্স,তখনই সেই জড়-ভাবই অবিচলিত-রূপে বিরাজিত থাকিবে; অথবা মনুষ্য দ্বারা মনুষ্যেরই নানাজাতীয় ভাব জ্ঞাত হওয়া যায়।

বাহ্যিক জড় পদার্থ ও জড়ভাব ব্যতীত আভ্যন্তরিক বা মানসিক ভাবও আছে। যথা—দয়া, ক্ষমা, প্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি; যাহাদিগকে জড়ভাব বলিয়াও উল্লেখ করিতে পারা যায়, কিন্তু আমরা তাহাদিগকে জড় চেতন ভাবের মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকি। কারণ দয়া, ক্ষমা, প্রীতি, প্রভৃতি যাবতীয় ভাব জড়-চেতন পদার্থেই আবদ্ধ রহিয়াছে। যখন দয়ার কার্য্য হয়, তখন তাহা জড়-চেতন পদার্থে হইয়া থাকে। যেমন দরিদ্রের দুঃখ বিমোচন করিলে দয়ার কার্য্য কহা যায়; অথবা কাহার কোন অপরাধের প্রতিশোধ না লইয়া ক্ষমার কার্য্য করা হয়, কিম্বা গুরুজনের প্রতি সম্মান দ্বারা প্রীতি ও ভক্তির পরিচয় দেওয়া হয়। এই নিমিত্ত এ সকল ভাবকেও আমরা জড়-চেতন সম্বন্ধীয় বা মনুষ্যদিগের পার্থিব ভাব বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকি।

যতক্ষণ মন এইরূপ প্রকার পার্থিব ভাবে অবস্থিতি করিয়া ঈশ্বর বিষয়ক মীমাংসা করিতে থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার স্বরূপতত্ত্ব কোনমতে উপলব্ধি হইবে না, বরং মনকে ক্রমশঃ উদ্ধত বা স্ফীত করিয়া তুলিবে। ফলে, এ অবস্থায় অহঙ্কার অর্থাৎ পাণ্ডিত্যাভিমান আসিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে একেবারে অচলবৎ প্রাচীর হইয়া উঠে। যদ্যপি কাহার তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রত্যাশা হয়, যদ্যপি কাহার ঈশ্বর লাভ করিবার ইচ্ছা জন্মে, তাহা হইলে মানসিক সিংহাসনে শ্রীহরিকে উপবেশন করাইতে হইবে। তিনি তথায় অধিষ্ঠান হইলে, তাঁহার গুরুত্বে স্ফীতমন একেবারে আকুঞ্চিত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। তখন মনের কার্য্য দ্বারা চলিতে হইবে না। ঈশ্বর যাহা

করাইবেন, তাহাই সে করিতে বাধ্য হইবে। তিনি যেরূপে রাখিবেন, সেইরূপে সে থাকিতে বাধ্য হইবে।

এক্ষণে বুঝা যাইবে যে, মনের কর্ত্তৃত্ব মনের প্রতি না রাখিয়া ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করিবার হেতু কি? ঈশ্বর বিহীন মন আপনাকেই সকল কার্য্যের নিদান জানিয়া অহং মিশ্রিত পার্থিব ভাবে প্রতিফলিত করিয়া থাকে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ঈশ্বর তাহার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে সকল কার্য্য ও সকল ভাব চৈতন্য-ভাব বিমিশ্রিত হইয়া যায়। তখন সেই ব্যক্তির প্রীতি ও ভক্তিকে আর জড়-চেতন ভাব বলা যায় না; কারণ তাহা জড়-চেতন মনুষ্যে প্রয়োগ না হইয়া শুদ্ধ চৈতন্য প্রভুতে অর্পিত হইতেছে। তন্নিমিত্তই প্রভু বলিতেন যে, "মনের অগোচর ঈশ্বর, এ কথা সত্য, কারণ, সে মন যে পর্য্যন্ত বিষয়াত্মক অর্থাৎ জড় ও জড়-পদার্থে অভিভূত থাকে, সে পর্য্যন্ত সে মনে ঐশ্বরিক ভাব প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। যেমন পুষ্করিণীর জলে কর্দ্দমমিশ্রিত থাকিলে, সূর্য্য কিম্বা চন্দ্রের মূর্ত্তি দেখা যায় না, কিন্তু কর্দ্দম অধঃপতন হইয়া পড়িলে তখন সূর্য্য ও চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়; মন হইতে জড় ও জড়-চেতন ভাব-রূপ কর্দ্দম একেবারে পরিষ্কৃত না হইলে চৈতন্য দর্শন হয় না।" সেই জন্যই ঈশ্বর, মনোরাজ্যের ঈশ্বর না হইলে, তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার আর কোন উপায়ই নাই।

২২৩। নাপিতের ন্যায় জমা খরচ বোধই অনেকের হইয়া থাকে, দুই একজন প্রকৃত জমা খরচ বুঝিয়া থাকে।

আমরা জমা খরচ শব্দ দুইটী অতি শৈশবাবস্থা হইতেই শিক্ষা করিয়া থাকি; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জমা খরচ যাহাকে বলে, তাহা আমরা জানি না, আমাদের প্রভু কহিয়াছেন, "একদা জনৈক নাপিত, কোন নির্জ্জন স্থান দিয়া গমন করিতেছিল। এমন সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে কে বলিল, 'ওহে বাপু! সাত ঘড়া টাকা লইবে?' নাপিত আশ্চর্য্য হইয়া দশদিক্ চাহিয়া দেখিল কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না, তখন কে আবার বলিল যে, সাত ঘড়া টাকা লইবে? নাপিত কিঞ্চিৎ ভীত হইল বটে, কিন্তু সাত ঘড়া টাকার কথা শ্রবণ পথে প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া তুলিল এবং অপর্য্যাপ্ত টাকা, সাত ঘড়া—দুই এক ঘড়া নহে,—অমনি দিতে চাহিতেছে, ইহাতে লোভের উদ্রেক হইয়া উঠিল। নাপিত তখন ভয়, আশ্চর্য্য এবং

লোভের পরতন্ত্র হইয়া বলিল, হ্যাঁ আমি লইব। এই কথা বলিবামাত্র উত্তর আসিল, যাও! তোমার ঘরে টাকা রাখিয়া আসিলাম।

নাপিত যে কতদূর আনন্দিত হইল, তাহা বর্ণনা করাপেক্ষা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সে তখন দিক্ বিদিক্ দৃষ্টি না করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে কুটীরে আসিয়া দেখিল যে, সাতটী ঘড়া রহিয়াছে। নাপিত প্রথমে তাহার ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার দৃষ্টিবৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে বলিয়া সাব্যস্থ করিল এবং মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্বন্ধেও সন্দেহ করিল, কিন্তু এই কুচিন্তা আর অধিকক্ষণ থাকিল না। সে ঘড়াগুলি স্পর্শ করিল এবং আবরণ মোচন করিয়া টাকা দেখিতে পাইল ও হস্তে লইয়া আশা নিবৃত্ত করিল।

সাতটী ঘড়ার মধ্যে একটী ব্যতীত সকলগুলিই পরিপূর্ণ ছিল। এই অপূর্ণ ঘড়াটী পূর্ণ করিতে তাহার মনে স্পৃহা জন্মিল। নাপিতের নিকট যাহা কিছু অর্থ ছিল, তৎসমুদায় তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াও তথাপি ঘড়াটী পূর্ণ করিতে পারিল না।

নাপিত রাজসরকারে ভৃত্য ছিল। সে একদিন রাজার নিকট দুঃখের কাহিনী জ্ঞাপন করায়, তাহার নির্দ্দিষ্ট বেতনের দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু বেতন পাইবামাত্র সমুদায় টাকাগুলি ঐ ঘড়ায় নিক্ষেপ করিয়া ভিক্ষা করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিল। রাজা, নাপিতের হীনাবস্থা দেখিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁরে, তোর এ প্রকার দুরবস্থা ঘটিবার হেতু কি? পূর্ব্বে যে অর্থের দ্বারা দিন নির্ব্বাহ হইত, এক্ষণে তাহার দ্বিগুণেও কি সঙ্কুলান হয় না? ইহার মধ্যে কোন কথা আছে তাহার সংশয় নাই। নাপিত নানাবিধ কাল্পনিক কথা দ্বারা রাজার মনে অন্য ভাবের উত্তেজনা করিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু তাহা বিশ্বাস না করিয়া বলিলেন, তুই কি সাত ঘড়া টাকা আনিয়াছিস্? নাপিতের মুখ ম্লান হইয়া গেল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, না মহারাজ! একথা আপনাকে কে বলিয়া দিল? রাজা তখন হাস্যে বলিলেন, ওরে নির্ব্বোধ! আমি সকল কথাই জানি। ঐ টাকা খরচের নহে, উহা জমার টাকা। সেই যক্ষ ঐ টাকা আমার নিকট পাঠাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; কিন্তু আমি তাহাকে 'জমা না খরচের' এই কথা জিজ্ঞাসা করায় সে 'জমার' কথা বলিয়াছিল। জমার টাকা লইয়া কি করিব? তাহা আমার খরচের জন্য নহে। তবে সে টাকা লইয়া কেন যক্ষের কার্য্য করিয়া যাইব। নাপিত এই কথা শুনিয়া যক্ষের স্থানে আসিয়া টাকাগুলি ফিরাইয়া লইবার জন্য বলিয়া

আসিল এবং গৃহে আসিয়া দেখিল যে, সে টাকা চলিয়া গিয়াছে। তখন নাপিত বুঝিল যে, কি কুক্ষণেই সাতঘড়া টাকা আনয়ন করা হইয়াছিল। এ টাকায় কোন ফল হইল না, বরং যাহা কিছু পূর্ব্বসঞ্চিত ছিল, তাহাতেও বঞ্চিত হইতে হইল।"

এই দৃষ্টান্তের বিবিধ তাৎপর্য্য আছে। ১ম, সাংসারিক হিসাবে, যাহাদিগকে কৃপণ বলিয়া উল্লেখ করা যায়, তাহারা বাস্তবিক নির্দ্দোষী। তাহারা সদ্ব্যয়াদি না করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহা উপরোক্ত যক্ষের অর্থ রক্ষা করার ন্যায়, তাহার সন্দেহ নাই। যক্ষ যেমন জমার টাকাকে নানাবিধ উপায়ে বৃদ্ধি করিয়া রাখে, তাহার খরচ করিবার অধিকার থাকে না, অথবা সেই অর্থ নাপিতের নিকটে রক্ষাকরণকালীন তাহাকে যেমন কেবল বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইয়াছিল, কিন্তু খরচ করিতে পারে নাই; কৃপণেরা অবিকল সেই কার্য্যই করিয়া যায়। তাহারা যদ্যপি চক্ষু খুলিয়া দেখে যে, যে টাকা মস্তকের ঘর্ম্ম ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া সঞ্চয় করা হইতেছে, তাহা খরচের নহে, অন্য লোকের জমামাত্র; তাহা হইলে অনর্থক ভূতগত পরিশ্রম করিয়া মরিতে হয় না। জমাখরচের জ্ঞান লাভ করিয়া যদ্যপি কেহ অর্থ ব্যবহার করে, তাহা হইলে সেই সুচতুর ব্যক্তি কোনকালেও ক্লেশ পায় না।

জমার টাকা যেমন খরচ করা যায় না, অথবা তাহা ব্যয় করিলে তজ্জন্য দায়ী হইতে হয়, তেমনি খরচের টাকা জমা করা যায় না এবং জমা করিলে তাহার জন্য পরিতাপ করিতে হয়। যেমন কেহ দরিদ্রশালায় সহস্র মুদ্রা প্রদান করিল। যাহার প্রতি উক্ত টাকা ব্যয় করিবার ভার দেওয়া হয়, সে যদ্যপি তাহা না করিয়া নিজে জমা করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহাকে পরিণামে তহবিল ভঙ্গের অপরাধে রাজদণ্ড পাইতে হয় এবং দরিদ্রদিগের দুঃখের জন্য অপরিমিত পাপ আসিয়া তাহাকে নিরয় কুণ্ডে লইয়া যায়। এই নিমিত্ত প্রত্যেকের জমা খরচ বোধ থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বিশেষতঃ সাংসারিক নিয়মে ইহার দ্বারা আর একটী সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে। যাহার যে পরিমাণে মাসিক আয়, তদপেক্ষা অধিক ব্যয় হইতেছে কি না, তদ্বিষয়ে যদ্যপি বিশেষ করিয়া মনোযোগ রাখে, তাহা হইলে তাহাকে কখনই ঋণগ্রস্ত হইতে হয় না। ইহাও মনুষ্যদিগের আর একটী কল্যাণের হেতু হইয়া থাকে।

২য়। পারমার্থিক হিসাবের জমাখরচ এই যে, আমরা যখন পৃথিবীতে প্রেরিত হই, তখন আমাদের জীবন খাতায় দুইটী জমা এবং একটী খরচের

বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একটী বিষয় জমা করিয়া, উহাকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করণ পূর্ব্বক তাহা হইতেই খরচ করিয়া যাইতে হইবে। আর একটী বিষয় যত্নপূর্ব্বক যাহাতে জমার স্থানে সন্নিবিষ্ট না হয়, এরূপ এক প্রকার সাবধানে হিসাব রাখিতে হইবে, কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকি। প্রকৃত জমার বিষয় ভুলিয়া তাহাকে জীবন খাতার জমা না করিয়া অপর জমার হিসাব হইতে জমা বাড়াইয়া দিয়া, পরিশেষে নাপিতের ন্যায় আপন জমার হিসাব হইতে খরচের টাকা আদায় দিয়া শেষে মুর্খতার পরিচয় দিয়া যাইতে হয়।

আমাদের নিজ জমা ধর্ম্ম, বাজে জমা পাপ এবং খরচ পরমায়ু। পৃথিবীতে পাপ বলিয়া যাহা পরিগণিত, তাহা যত্নপূর্ব্বক গৃহে আনিয়া জমা করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ পাপ জমা হইলে ধর্ম্ম কমিয়া আইসে; পাপ জমার জন্য পরমায়ু খরচ হইয়া যাইল সুতরাং দুঃখের অবধি থাকে না।

জমাখরচ বোধ হওয়া অতি সুকঠিন ব্যাপার। ইহাতে সহসা ভুল জন্মিয়া যায়। সময়ক্রমে ধর্ম্ম জমা করিতে যাইয়া পাপ জমা হইয়া পড়ে। পৃথিবীতে দেখা যায় যে, ধনোপার্জ্জন করিয়া সেই ধনের নানাবিধ ব্যবহারের দ্বারা সুখ শান্তি লাভ করা যায়; কিন্তু ধনরাশির উপরে শয়ন করিয়া থাকিলে সেরূপ সুখের উদ্ভাবন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সেই প্রকার পুণ্য উপার্জ্জন করিয়া অর্জ্জিত পুণ্য ব্যয় করিয়া মনুষ্যেরা দৈনিক আনন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকে। যে দিন হইতে পাপ জমা গৃহে আনিয়া উপস্থিত করে, সেই দিন হইতেই সেই পরিমাণে পুণ্য-কর্ম্ম স্থগিত হইয়া যায়, সেই পরিমাণে তাহার সুখেরও কারণ হইয়া থাকে।

যক্ষ যেমন সাত ঘড়া টাকার লোভ দেখাইয়া নাপিতের খরচের টাকা হরণ করিয়া লইয়াছিল, সেইরূপে অবিদ্যা-পাপিনী নরনারীর সমক্ষে কামিনী-কাঞ্চনের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদের মোহ জন্মাইয়া দেয়। সেই মোহ বশতঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া তাহারা অবৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ক্রমে আপন উপার্জ্জিত পুণ্যধন ব্যয়িত হইয়া যায় এবং 'পরিশেষে পুণ্যস্পৃহা পর্য্যন্ত তথায় আর স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না।

অবিদ্যা যক্ষিণীর কার্য্য অতি কুটিল। তাহাকে নিজ কার্য্য সিদ্ধি করিবার জন্য সর্ব্বদা নানাপ্রকার সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হয়; এমন কি পুণ্য কার্য্যেও সুবিধা পাইলে তাহার দ্বারাও স্বীয় অভীষ্ট সম্পূর্ণ করিয়া লইয়া থাকে।

কোন ধনসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মশীল ব্যক্তি চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধান্নে দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইতেছিলেন। যদিও দরিদ্রদিগকে তৃপ্তি সাধন করা কর্ম্মকর্ত্তার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। তিনি মনে মনে আপনাকে শক্তিবান পুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এই নিমিত্ত সাধারণ লোকের ন্যায় কেবল দরিদ্রকে বাছিয়া না লইয়া যে কেহ যেরূপ আসিয়া ভিক্ষার্থ সমাগত হইতেছিল, তাহাদের কাহাকেই বিমুখ করেন নাই। সেই বাটীর সম্মুখ দিয়া জনৈক কসাই একটী গাভী হনন করিবার নিমিত্ত লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু গাভী তাহার সংহারকর্ত্তাকে চিনিতে পারিয়া পলায়ন করিবার মানসে প্রাণপণে চেষ্টা করায় কসাই কিঞ্চিৎ শ্রান্তযুক্ত হইয়া পড়িল এবং গাভী লইয়া এক পদ অগ্রসর হওয়া পক্ষেও তাহার বিশেষ প্রতিবন্ধক ঘটিয়া গেল। কসাই নিকটস্থ একটী বৃক্ষে ঐ গাভীটীকে বন্ধন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিবার জন্য বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিল; এমন সময়ে ঐ গৃহস্থের বাটীতে ভোজনের সংবাদ পাইল। সে তৎক্ষণাৎ তথায় গমনপূর্ব্বক চতুর্ব্বিধান্নে উদর পূর্ণ করিয়া গাভীটীকে লইয়া যাইবার সামর্থ্য লাভ করিল। কসাই কর্ত্তৃক ঐ গাভীর যখন মৃত্যু সংঘটিত হয়, তখন গাভীবধের পাপ চারি আনা রকম কসাইকে এবং বারো আনা রকম দানশীল গৃহস্থকে আক্রমণ করিল। গৃহস্থের এত দানের ফল একটী কসাই দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গেল।

যদিও দান করা পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু এ স্থানে ঐ ব্যক্তির দানের উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া অর্থের মত্ততায় পরিচালিত হওয়ার পরিণামে অবিদ্যা যক্ষিণীর করকবলিত হইতে হইয়াছিল। এই নিমিত্ত অতি সাবধানে জমাখরচের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত। যদ্যপি ইহাতে সামান্য রূপেও অমনোযোগিতা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বিপদের ইয়ত্তা থাকে না।

আমরা যদ্যপি জমাখরচ না বুঝিয়া কার্য্য করি, অথবা দৈনিক তাহার বাকী কাটিয়া না দেখি যে, কি বা জমা এবং কিরূপেই বা পরমায়ু ব্যয় করা হইতেছে, অথবা যদ্যপি নাপিতের ন্যায় মূর্খতাবশতঃ আমরা বাজে জমার বস্তু পাপকে গৃহে আনিয়া আপন পুণ্যজমা অপচয় করি, তাহা হইলে রাজার পরামর্শের ন্যায় গুরুকরণ ভিন্ন অন্য উপায়ে ঐ পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। নাপিতের ভাগ্যের ন্যায় অনেকস্থলে গুরু আপনি আসিয়া ভ্রম বিদূরিত করিয়া দেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইলে অপর জমার

টাকা অজ্ঞতাবশতঃ গৃহে আনিয়া স্বোপার্জ্জিত ধন পর্য্যন্ত তাহার সহিত বিসর্জ্জন দিতে হয় না। অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞানের এই লাভ ও ক্ষতি।

প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনের জমাখরচ বোধ থাকা কর্ত্তব্য। মনুষ্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক কি হিসাবে কত জমা এবং কত খরচ করা হইল, প্রত্যহ তাহার বাকী কাটিয়া দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। একদিন হিসাব দাখিল করিতে হইবে, তাহার ভুল নাই। তখন জমাখরচের ত্রুটি হইলে তজ্জন্য দায়ী হইতে হইবে। সে সময়ে মনে হইবে যে, কেন অগ্রে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া যায় নাই। অতএব সময় থাকিতে যাহাতে আপনার জমাখরচের প্রতি সুচারুরূপে দৃষ্টি রাখিয়া দিন যাপন করিয়া যাইতে পারা যায়, তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া সকলেরই মঙ্গলের কারণ স্বরূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই জমাখরচের সাহায্যে আমরা আর একটী বিষয়ের সুন্দর উপদেশ পাইয়া থাকি। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, সংসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না। যতই শাস্ত্রপাঠ করা হউক, যতই জপ ধ্যান করা যাউক, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইবার নহে। এই সকল ব্যক্তিদিগকে তাহাদের জীবনের জমাখরচ দেখিতে অনুরোধ করি। বিষয় লাভ করিবার জন্য বিদ্যা শিক্ষা হইতে অর্থোপার্জ্জন করা পর্য্যন্ত, যে প্রকার মানসিক ও কায়িক ব্যয় করা হইয়া থাকে, ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য কি সেই হিসাবে কার্য্য করা হয়? কখনই নহে। এইজন্য বলি, যেমন ব্যবসায়ীরা সন্ধ্যার সময় দৈনিক জমাখরচের বাকী কাটিয়া খাতা মিলায় এবং আয় ব্যয় দ্বারা ব্যবসার উন্নতি ও অবনতি স্থির করিতে পারে, সেইরূপ প্রত্যহ কার্য্যাদি হইতে শয়নকালে আমাদের আপনাপন জীবন খাতায় ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম জমা খরচের হিসাব দেখা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ সমস্ত দিনে কি করা হইল। কতগুলি মিথ্যাকথা খাতায়, কতগুলি পরগ্লানি খাতায়, কতগুলি পরানিষ্টপাত খাতায়, কতগুলি পরদ্রব্যহরণ খাতায়, কতগুলি বিশ্বাসঘাতকতা খাতায়, কতগুলি পরদারগমন ও গমনেচ্ছা খাতায়, কতগুলি ধনাভিমান খাতায়, কতগুলি বিদ্যাভিমান খাতায়, কতগুলি মর্য্যাদাভিমান খাতায় এবং কতগুলি ধর্ম্মাভিমান খাতায় জমা হইয়াছে ও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও ঐশ্বরিক জ্ঞানোপার্জ্জন খাতায়ই বা কি জমা হইয়াছে; পরমায়ু খরচের সহিত বাকী কাটিতে হইবে। পরমায়ু প্রত্যহ ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। ধর্ম্ম জমা হইলে ধর্ম্মই খরচ হইয়া থাকে কিন্তু পাপ জমা করিলে জীবন খাতায় ব্যতিক্রম ঘটিয়া যায়। গৃহে ধন থাকিলে সেই ধন ব্যয় করিয়া যেমন আহারীয় দ্রব্যের সংস্থান করা যায় কিন্তু ধন নাশ হইয়া

যাইলে তাহাকে উপবাস করিয়া থাকিতে হয়। উভয় স্থলেই দিন কাটিয়া যায়, কিন্তু এক স্থানে সুখে এবং আর এক স্থানে মহাকষ্টে; এই মাত্র প্রভেদ দেখা যাইতেছে।

মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সুখ শান্তি লাভ করা। যাহাতে অসুখ ও অশান্তি উপস্থিত না হয়, যাহাতে আপন জমায় ভুল না হয়, এরূপ সতর্কতার সহিত জমা স্থির করিয়া লইতে হইবে। ধর্ম্মই জমা করা আমাদের উদ্দেশ্য, তাহাই এই সংসার স্থলে প্রয়োজন। তাহাই আমাদের স্বাস্থ্যের কারণ, তাহাই আমাদের নিদান স্বরূপ।

যে স্থানে যে কেহ এই জমা বিস্মৃত হইয়া পাপ জমার প্রশ্রয় দিয়াছে, তাহাকেই পরিতাপযুক্ত হইতে হইয়াছে; তাহাকেই বিপদাপন্নাবস্থায় পতিত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া যাইতে হইয়াছে; অতএব জমা খরচ জ্ঞান লাভ করিয়া, তবে জীবন-খাতায় অঙ্কপাত করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য।

যখন কোন ব্যবসায়ী জমাখরচ না মিলাইয়া বিপন্নাবস্থায় পতিত হয়, যখন সে দেখে যে, তাহার মূলধন খরচ হইয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াছে, তখন তাহার আর ব্যবসা চলিতে পারে না। এ অবস্থায় তাহার পরিত্রাণের একটী উপায় আছে। তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি থাকে, তাহা রাজার নিকটে প্রদান পূর্ব্বক ঋণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে আশ্রয় দেন। সেই দিন হইতেই ঋণ মুক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম জগতেও সেই প্রকার নিয়ম আছে। যদ্যপি কেহ ভগবানের প্রতি আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, তবে তাহার সকল বিপদই কাটিয়া যায়।

২২৪। যেমন, ছেলেরা যখন খুঁটি ধরিয়া ঘুরিতে থাকে, তখন তাহারা বয়স্যদিগের সহিত নানা প্রকার কথাবার্ত্তা ও নানাবিধ রঙ্গ-রহস্য করিয়া থাকে কিন্তু কখনও খুঁটি ছাড়িয়া দেয় না, তাহারা জানে যে ছাড়িলেই পড়িয়া যাইবে; তেমনই সাংসারিক জীবেরা হরি-পাদপদ্মে দৃঢ় মতি রাখিয়া সংসারে কোলাহল করিয়া বেড়াইলেও তাহাদের কোন বিঘ্ন হইবে না।

২২৫। লুকোচুরী খেলিবার সময় যে বুড়িকে স্পর্শ

করিতে পারে, সে আর চোর হয় না। সংসারে যে কেহ হরিপাদপদ্মে শরণাগত না হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইবে, তাহাকে বার বার গর্ভযাতনায় পড়িতে হইবে।

২২৬। জন্মিলেই মৃত্যু এবং মৃত্যু হইলেই জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

২২৭। যেমন ধান পুঁতিলেই গাছ হয়, তদুৎপন্ন ধানে আবার গাছ হয়, তাহার ধানেতে পুনরায় গাছ হয়, অর্থাৎ অনন্তকাল পর্য্যন্ত সেই ধান পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু যে ধান গুলি অগ্নির উত্তাপে জলের সহিত সিদ্ধ করা যায়, তদ্দারা আর ধানের অঙ্কুরও হইতে পারে না। তেমনই যে জীব তত্ত্ববিচাররূপ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভক্তিবারি সহযোগে সিদ্ধ হইতে পারিবে, তাহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।

২২৮। হে জীব! দেখিও, যেন ধোপাভাঁড়ারী হইও না। ধোপারা সকলের ময়লা কাপড় পরিষ্কার করিয়া আপনার ঘর পরিপূর্ণ করে কিন্তু পরদিন আর তাহা থাকে না। পণ্ডিত হওয়াও তদ্রূপ। লোকের মনের ময়লা পরিষ্কার করিয়াই দিন কাটাইয়া যায় কিন্তু নিজের কিছুই উপকার হয় না, বরং অভিমান সঞ্চারিত হইয়া ক্রমে আরও অধোগামী করিয়া ফেলে।

২২৯। যেমন, হাড়্গিলা ও শকুনি ঊর্দ্ধে অনেক দূর উঠিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তথায় যাইয়া তাহার নিম্নস্থ গো-ভাগাড়ের প্রতিই দৃষ্টি থাকে, আমাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরাও তেমনি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে শিক্ষা করিয়া কেবল "কামিনী-কাঞ্চন, কামিনী-কাঞ্চন" করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

২৩০। যেমন, ভাগাড়ে গরু মরিয়া যাইলে, পালে পালে শকুনি আসিয়া টানাটানি করে, তেমনই কোন দাতা কিছু দান করিতে চাহিলে পণ্ডিতেরা তাহাকে বিরক্ত করিয়া থাকে।

২৩১। পণ্ডিতদিগের এরূপ দু শা হইবার হেতুই ভগবান্। শাস্ত্রপাঠের দ্বারা যদ্যপি তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারা আর কাহাকেও উপদেশ দিতে যাইবে না, আর কেহ গ্রহ-ফাঁড়া কাটাইতে স্বীকার করিবে না। ভগবান্ এই নিমিত্ত তাহাদের দুই চারিটা প্যাঁচ কসিয়া রাখেন।

একদা প্রভু কহিয়াছিলেন,—কোন রাজাকে একপণ্ডিত যাইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমার নিকটে শ্রীমদ্ভাগবৎ শ্রবণ করুন। রাজা উত্তর করিলেন, আপনি অগ্রে বুঝিতে চেষ্টা করুন, তাহার পর আমায় বুঝাইবেন।" ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমদ্ভাগবৎ খানি আদ্যন্ত উত্তম রূপে পাঠ করিয়া আপনাপনি হাসিতে লাগিলেন যে, রাজা কি নির্ব্বোধ, ঘোর বিষয়ী এবং মূর্খ, তাহা না হইলে গুরুর নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার অমন কথা বলায় অর্ব্বাচিনতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। রাজাজ্ঞায় পুনরায় পাঠ করিলাম, তাহাতে লাভ কি হইল? গুরুর মুখে যাহা শিখিয়াছি, তাহাতে কি ভ্রম জন্মিতে পারে? তিনি তদনন্তর পুনরায় রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা পণ্ডিতকে দেখিবামাত্র কহিলেন, মহাশয়! এখনও আপনার ভাল করিয়া পাঠ করা হয় নাই। পণ্ডিত ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া রাজসমীপে কিছু বলিতে না পারিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, রাজা কিজন্য আমায় উপর্য্যুপরি একথা বলিতেছেন; অবশ্যই ইহার ভিতরে কোন অর্থ আছে। তিনি চিন্তা করিতে করিতে প্রথমেই বুঝিলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবৎকে "পারমহংস-সংহিতা" কহে। অতএব এ গ্রন্থ গৃহীদিগের পাঠ্যই নহে, দ্বিতীয়তঃ এ গ্রন্থের বক্তা শুকদেব, যিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, সর্ব্বত্যাগী, পরমহংস; এবং শ্রোতা পরীক্ষিৎ, যিনি সপ্তাহকাল

জীবনের সীমাজ্ঞাত হইয়া পূতনীরের তটে প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। ছি! ছি! কি করিয়াছিলাম, কিঞ্চিৎ অর্থের লোভে আমি এমন পবিত্র গ্রন্থ লইয়া বিষয়ীর নিকট গমন করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব রস পান করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে বিভোর হইয়া রাজার কথা বিস্মৃত হইয়া যাইলেন। অতঃপর রাজা ব্রাহ্মণের আর গতিবিধি না হওয়ায় দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণ তখন বিনীতভাবে বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাজা আমার গুরুর কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে আর আমি কি শিক্ষা দিব? রাজাকে কহিবে যে, শ্রীমদ্ভাগবৎ যে কি, তাহাই আমি অদ্যাপি একবর্ণও বুঝিতে পারি নাই।

২৩২। সকল জলই এক প্রকার, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদের ব্যবহার সমান নহে। কোন জলে ঠাকুর পূজা হয়, কোন জল পান করা চলে, কোন জলে স্নানাদি হইবার সম্ভাবনা এবং কোন জলে হস্ত পদ ধৌত করাও নিষিদ্ধ। সেইরূপ সকল ধর্ম্ম এক প্রকার হইলেও ইহার মধ্যে উপরোক্ত জলের ন্যায় তারতম্য আছে।

প্রভু জলের যে দৃষ্টান্তটী দিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমে তাহাই বিচার করা হউক। জল এক পদার্থ—সর্ব্বত্রেই এক পদার্থ, রসায়ন শাস্ত্র তাহা আমাদের শিক্ষা দিয়াছে, কিন্তু যে স্থানে ইহা যখন অবস্থিত করে, সেই স্থানের ধর্ম্মানুযায়ী ইহারও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বৃষ্টির জল পৃথিবীর জল অপেক্ষা অতিশয় পরিষ্কার, নির্ম্মল ও দোষশূন্য। এই জল যখন ভূমণ্ডলে পতিত হয়, তখন তাহার ধর্ম্ম বিচার করিয়া দেখিলে, বিশুদ্ধ বৃষ্টির জলের সহিত কোন অংশে সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। বৃষ্টির জল যদ্যপি সাগরের জলে নিপতিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সাগরের জল কহা যায়, গঙ্গার সহিত মিশ্রিত হইলে গঙ্গাজল, কূপে কূপজল এবং দুর্গন্ধযুক্ত খাল নালায় খাল ও নালার জল বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। এ স্থানে, স্থানবিশেষে এক বিশুদ্ধ বৃষ্টির জলের ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা হইয়া যাইল। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, যদিও বৃষ্টির জল এক অদ্বিতীয় ভাবে, সাগর, নদী ও কূপাদিতে মিশ্রিত রহিয়াছে, তথাপি কার্য্যক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বৃষ্টির জলের ন্যায় কাহার ব্যবহার হইতে পারে না।

এক্ষণে এই উপমার সহিত ধর্ম্ম মিলাইয়া দেখা যাইতেছে। বৃষ্টির জলের ন্যায় ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়, তাহার সংশয় নাই। তিনি যখন যেমন আধারে প্রবিষ্ট হন্, তখন সেই আধারগত ধর্ম্মই লাভ করিয়া থাকেন। প্রভু বলিতেন,- "সাপ হ'য়ে খাই আমি, রোজা হ'য়ে ঝাড়ি, হাকিম হ'য়ে হুকুম দিই, পেয়াদ হ'য়ে মারি।" অর্থাৎ সাপের আধারে ব্রহ্ম জীবহিংসা করেন, রোজার আধারে সর্প দংষ্ট্রজীবের কল্যাণ সাধন করেন, হাকিমের আধারে প্রবেশ করিয়া ন্যায়ান্যায়ের বিচার করেন এবং পেয়াদার আধারে প্রহারকর্ত্তার কার্য্য করেন। তিনি আরও বলিতেন, "পঞ্চ ভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।" অর্থাৎ স্বয়ং রাম ও কৃষ্ণ অবতারাদিতে সময়ে সময়ে সামান্য মনুষ্যদিগের ন্যায় স্বভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের হাসা, কাঁদা, যে ভাবেই হউক কিন্তু দেখিতে মনুষ্যদিগের ন্যায় ছিল। এই নিমিত্ত ধর্ম্মও আধার বা পাত্রবিশেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। "যেমন ছাদের জল যেরূপ নল দিয়া পতিত হয়, তাহাকে তদাকৃতিযুক্ত দেখায়।"

আমাদের এপ্রদেশে যত প্রকার ধর্ম্ম দেখা যায়, উহা দ্বারা স্বতন্ত্র আধারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; ফলে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া সাধারণ ভাষায় পরিগণিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র প্রকার এবং কার্য্যও সুতরাং স্বতন্ত্র প্রকার। আমাদের কথিত উপমায় বৃষ্টির জল ধর্ম্মস্বরূপ এবং স্থান উদ্দেশ্য-স্বরূপ। যে স্থানে যত বিচিত্র প্রকার পদার্থ সঞ্চিত থাকে, তথাকার জল যেমন কলুষিত হয়, সেই প্রকার যে আধার বা সম্প্রদায়ের যত বহুবিধ উদ্দেশ্য থাকে, ধর্ম্মজলও সেই পরিমাণে বিকৃত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রে নিষ্কাম ধর্ম্মের এত গৌরব! এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, "সকল প্রকার কামনাবিশিষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি একান্ত অনুগত হও।"

বর্ত্তমান ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উদ্দেশ্যের এত বাড়াবাড়ি পড়িয়া গিয়াছে যে, ধর্ম্মজল আর তাহারা ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। যেমন এক সের জলে দশ সের চিনি দ্রবী-ভূত করা যায় না, সে স্থানে জল বিলুপ্ত হইয়া কেবল চিনিই দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায়ে সেইরূপ কেবল উদ্দেশ্যই শোভা পাইতেছে।

ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, ধর্ম্মের কার্য্যও ধর্ম্ম, কিন্তু সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের উদ্দেশ্য স্বার্থ চরিতার্থে পর্য্যবসিত হওয়ায় তাহারই কার্য্য হইয়া যাইতেছে।

ইংরাজী-বিদ্যা শিক্ষা ও খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের স্বার্থপরতাপূর্ণ একপক্ষীয় ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা হিন্দু উদ্দেশ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার পক্ষে বিশেষ আনুকূল্য হইয়াছে।

ইতি পূর্ব্বেই হিন্দু-উদ্দেশ্য সাংসারিক উন্নতি লাভ পক্ষে ধাবিত হইয়াছিল। কি ধর্ম্ম করিলে পুত্রলাভ হয়, কি ধর্ম্মে ধন প্রাপ্তির সুবিধা জন্মে, এইরূপ ধর্ম্মেরই বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ধর্ম্মসাধন বলিয়া যাহা ছিল, তাহাতেও উদ্দেশ্যের নিতান্ত প্রাবল্য দেখা যাইত। বৈরাগীদিগের সখীভাব, তান্ত্রিকদিগের ভৈরবীচক্র এবং জ্ঞানপন্থীদিগের ঈশ্বরত্ব অভিমানে বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে দূষিত করিয়া রাখিয়াছিল। বর্ত্তমান ইংরাজী উদ্দেশ্যগুলি তাহার সহিত সংযোগ হইয়া হিন্দুধর্ম্মটীকে বিশিষ্টরূপে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে। বেদের অর্থ বিকৃত হইয়াছে, পুরাণের ভাব আধ্যাত্মিকতায় পরিণত হইয়াছে, যোগসাধন ভৌতিক শক্তির অন্তর্গত হইয়াছে, মুনি ঋষির কথা উড়িয়া গিয়া ম্লেচ্ছদিগের বাক্য বেদবাক্য হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল ধর্ম্মোপদেশে সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্মর্ষিদিগের মতামত গ্রাহ্য হইত, এক্ষণে তথায় ম্লেচ্ছ মহোদয়দিগের নাম শোভা পাইতেছে। ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট ধর্ম্ম বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে; সুতরাং বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মে বহুবিধ আবর্জ্জনা সন্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ধর্ম্মসম্প্রদায়ই চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অবোধ হিন্দু সন্তানেরা ধর্ম্মপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য, যে সম্প্রদায়টী নিকটে দেখিতে পাইতেছে, তখনই তাহা হইতে ধর্ম্মবারি পান করিয়া পিপাসা নিবারণ করিতেছে সত্য, কিন্তু সে জলে যে ক্লেদাদি দ্রবীভূত আছে, তাহা শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবিধ বিষয়ব্যাধির উত্তেজনা করিয়া কত প্রলাপই দেখাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

বিশুদ্ধ জল যেমন, জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, বিশুদ্ধ ধর্ম্মও তদ্রূপ; তাহাতে ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম, যে ধর্ম্মই হউক, তাহা এক। স্থানভেদে স্বতন্ত্র দেখাইলেও প্রকৃতিগত প্রভেদ হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের উদ্দেশ্যও এক এবং কার্য্যও এক। এমন ধর্ম্ম যাহা, তাহাতে ভেদাভেদ নাই, দ্বেষাদ্বেষী নাই, ভাল মন্দ কোন কথাই নাই।

যদিও কথিত হইল যে, হিন্দুধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে কলুষিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রভুর জলের তুলনায় অতি সুন্দর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করা গিয়াছে। জলের ধর্ম্ম—পদার্থ দ্রবীভূত করা; কিন্তু যদ্যপি সেই জলে উত্তাপ প্রয়োগ করা যায়,

তাহা হইলে সে জল তৎক্ষণাৎ দ্রবীভূত আবর্জ্জনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাষ্পাকারে পুনরায় বিশুদ্ধ জলীয়রূপ ধারণ করে। অবতারদিগের দ্বারা এই কার্য্যটী সমাধা হইয়া থাকে। তাঁহারা জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেন, সেই জ্ঞানাগ্নির উত্তাপে বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব বিষয়াদি বিবিধ সাংসারিক উদ্দেশ্য হইতে বিযুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অপ্রতুল নাই এবং এই জন্যই অদ্যাপি হিন্দুধর্ম্ম সংরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে।

পরিশেষে হিন্দুনরনারীগণকে বক্তব্য এই যে, হিন্দু সন্তানেরা বিজাতীয় উদ্দেশ্য হিন্দুধর্ম্মে প্রবিষ্ট করাইয়া যে সকল অভিনব ধর্ম্মের গৌরব প্রতিঘোষিত করিতেছেন, তাহা বাস্তবিক বিশুদ্ধ নহে। হিন্দুধর্ম্ম সত্য, যে ধর্ম্ম মুনি ঋষি কথিত, যে ধর্ম্ম অবতারদিগের হৃদয়ের সামগ্রী, তাহা কখন মিথ্যা নহে। হিন্দু যে কোন শ্রেণীভুক্ত হউন, ব্রাহ্মণ হইতে মুচি মেথর পর্য্যন্ত সকলেরই পক্ষে সেই সনাতন হিন্দুধর্ম্মই একমাত্র পরিত্রাণের উপায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

২৩৩। যেমন ক্ষতস্থানের মামড়ী ধরিয়া টানিলে রক্ত পড়ে এবং রোগ বৃদ্ধি পায়, তেমনি ইচ্ছা করিয়া জাতি ত্যাগ করিলে নানাবিধ উপসর্গ জন্মিয়া থাকে।

২৩৪। যেমন আঁব পাকিলে আপনিই পড়িয়া যায়, তেমনি জ্ঞান পাকিলে জাত্যাভিমান আপনিই দূর হইয়া যায়। ইচ্ছা করিয়া জাতি ত্যাগ করায় অভিমানের কার্য্যই হইয়া থাকে।

জাতি বিভাগ হওয়া স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। ইহা মনুষ্য কর্ত্তৃক কখন সম্পাদিত হয় না। যেমন আমরা এক্ষণে জানিয়াছি যে, জড় জগতে ৭০ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আদিম জাতি (Elements) বা রূঢ় পদার্থ বাস করিতেছে। ইহারা পরস্পর আদান প্রদান দ্বারা নানাপ্রকার স্বতন্ত্র জাতিতে (compounds) বা যৌগিক পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে। এই আদিম জাতিরা যখন একাকী বাস করে, তখন তাহাদের দেখিবামাত্র অনায়াসে চিনিতে পারা যায়, কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক প্রকাশ পাইলেও স্বজাতির ধর্ম্ম বিলুপ্তের কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহারা যখন অন্য জাতির সহিত সহবাস করে, তখন

তাহাদের স্বজাতির আর কোন লক্ষণ থাকিতে পারে না, এক অভিনব জাতির সৃষ্টি করিয়া দেয়। যেমন রৌপ্য। ইহাকে পিটিয়া গোলাকার করাই হউক, কিম্বা টানিয়া তারই করা হউক,অথবা নানা প্রকার তৈজসপাত্র ও অলঙ্কারাদিতে পরিণত করাই হউক, রূপার ধর্ম্ম কদাপি ভ্রষ্ট হয় না, কিন্তু যখন রূপাকে গন্ধকের সহবাস করিতে দেওয়া যায়, তখন রূপা এবং গন্ধক উভয়ে উভয়ের আকৃতি এবং প্রকৃতি হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়া থাকে। তখন রূপার চাকচিক্যশালী শুভ্রবর্ণ এবং গন্ধকের হরিদ্রাভাযুক্ত রূপলাবণ্য কোথায় অন্তর্হিত হইয়া এক কৃষ্ণবর্ণ কিম্ভূত কিমাকার ভাবে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। তখন তাহা হইতে আর তৈজসপাত্র প্রস্তুত করা যায় না,আর তাহাতে অলঙ্কার গঠিত হইতে পারে না,অথবা গন্ধকের স্বভাবসিদ্ধ যথা বারুদ দেশলাই ইত্যাদি কোন কার্য্যে প্রয়োগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

মনুষ্য সমাজেও অবিকল ঐ নিয়ম চলিতেছে। ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে আমরা দেখাইয়াছি যে, মনুষ্যেরা জড় এবং চেতন পদার্থের যৌগিক মাত্র। জড় জগতের নানাজাতীয় পদার্থেরা একত্রিত হইয়া উপরোক্ত গন্ধক এবং রৌপ্যের ন্যায় মনুষ্য এবং পৃথিবীর বিবিধ পদার্থ উৎপাদন করিয়াছে। এই সকল গঠিত পদার্থের গঠন-কর্ত্তাদিগের সহিত কোন সংস্রব রক্ষা করে নাই। তেমনই পদার্থ পরিচালনী যে শক্তি আছে, তাহা জাতিবিশেষে স্বাভাবিক ধর্ম্মের বিপর্য্যয় করিয়া থাকে। যেমন কাষ্ঠের সহিত উত্তাপশক্তি মিলিত হইলে তাহাকে দগ্ধ করিয়া অগ্নির সৃষ্টি করে ও ধাতুবিশেষে যথা বিসমাথ (Bismuth) এবং য়্যান্টিমনি (antimony) একত্রে সংস্থাপিত হইয়া তন্মধ্যে উত্তাপ প্রবেশ করাইলে তড়িতের জন্ম হয়। মনুষ্যেরাও তদ্রূপ। কথিত হইল, মনুষ্যেরা নানা জাতীয় পদার্থ হইতে গঠিত হইয়াছে, সুতরাং তাহারা জাতীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট। জড় জগতের শক্তির ন্যায় চৈতন্য জগতেও একপ্রকার শক্তি আছে, যাহা গুণ শব্দে অভিহিত। জড় জগতে যেমন এক শক্তি অবস্থাভেদে উত্তাপ (heat) তড়িৎ (electricity) চুম্বক (magnetism) ও রসায়ন শক্তি (chemism) বলিয়া কথিত হয়, তেমনই চৈতন্য রাজ্যে একগুণ সত্ব, রজঃ এবং তমঃ নাম ধারণ করিয়াছে ; কিন্তু স্থূল রাজ্যে যেমন রসায়ণ শক্তির কার্য্যকালে অথবা তড়িতের বিকাশ হইলে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় উল্লিখিত হয়, তেমনই এক গুণ সচরাচর সত্ব, রজঃ এবং তমঃ বলিয়া ত্রিবিধ শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন কোন জড় পদার্থ শক্তির সহবাসে

অনন্ত প্রকার অবস্থায় অনন্ত প্রকার আকার ধারণ করিয়া অনন্ত প্রকার ধর্ম্মের পরিচয় দিতেছে, তেমনই এক গুণ চৈতন্য পদার্থের সহিত অনন্তপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। মনুষ্যেরা যে জড় পদার্থ হইতে দেহ লাভ করিয়া থাকে, তাহা মনুষ্যসমাজে অদ্বিতীয় অর্থাৎ দেহের উপাদান কারণ সম্বন্ধে কোন দেশে বা কোন জাতিতে কিম্বা কোন অবস্থায় কিছুমাত্র প্রভেদ হইতে পারে না। শোণিত কাহার স্বতন্ত্র নহে, অস্থি কাহার স্বতন্ত্র নহে এবং মাংসপেশীও কাহার স্বতন্ত্র নহে। সেই প্রকার চৈতন্য পদার্থ ও গুণ কাহার পৃথক হইবার নহে। কিন্তু পৃথিবীর কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি কুটিল মহিমা! যে এই এক জাতীয় পদার্থ সর্ব্বত্র স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াও কাহার সহিত কাহার ঐক্যতা রক্ষা করে নাই; অর্থাৎ মনুষ্যেরা এক জাতীয় পদার্থের দ্বারা সংগঠিত হইয়া কেন পৃথক্ পৃথক্ স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণয় করা কাহারও শক্তিতে সংকুলান হয় নাই।

গুণভেদে স্বভাবের সৃষ্টি হয়। এই স্বভাব যাহার সহিত যতদূর মিলিয়া থাকে, তাহাদের ততদূর এক জাতীয় বলিয়া পরিগণিত করা যায়। যেমন গোলাকার পদার্থ, পদার্থ যাহাই হউক—কিন্তু গোলাকার বলিয়া তাহাদের একজাতীয় কহা যায়। ত্রিকোণ কিম্বা চতুষ্কোণ বিশিষ্ট পদার্থও ঐরূপে পরিগণিত করা যায়। অথবা যে দেশে যে জাতি, কিম্বা যে পদাভিষিক্ত মনুষ্য হউক, মনুষ্য বলিলে তাহাদের এক জাতিই বুঝাইবে। অথবা যে পদার্থ দ্বারা বিদ্যুৎ কিম্বা উত্তাপ অনায়াসে পরিচালিত হইতে পারে, তাহাদের এক জাতীয় ধাতু বলে। মূর্খ মাত্রেই এক জাতি, যে যে বিষয়ে মূর্খ, তাহারাও এক জাতি; পণ্ডিতেরা এক জাতি, সাহিত্যের পণ্ডিত এক জাতি, গণিতের পণ্ডিত এক জাতি; বিজ্ঞানশাস্ত্রের পণ্ডিত এক জাতি; চিকিৎসকেরা এক জাতি; উকীলেরা এক জাতি; চোরেরা এক জাতি; সাধুরাও এক জাতি; ইত্যাদি।

উদ্ভিদরাজ্য নিরীক্ষণ করিলেও জাতিভেদের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। স্থূল কলেবরের উপাদান কারণ কাহারও স্বতন্ত্র নহে। যে এক জাতীয় পদার্থ অঙ্গার আম্র বৃক্ষে, সেই এক জাতীয় পদার্থ অঙ্গার পদ্মের মৃণালে, সেই অঙ্গার গোলাপ ফুলে, সেই অঙ্গার পুরীষে; কিন্তু গুণভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

জান্তব রাজ্যেও ঐ প্রকার জাতি বিভাগ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

যেমন রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতি ক্রমে ৭০টী এক জাতি পদার্থ হইতে পরস্পর সম্মিলন দ্বারা অনন্ত প্রকার নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে, আল্‌কাতরা এক জাতি, তাহার সহিত অন্যান্য জাতির সংযোগে সুন্দর লোহিত জাতি মেজেণ্টা জন্মিয়াছে; পরে এই মেজেণ্টা এক্ষণে অশেষ প্রকার স্বতন্ত্র জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, যথা গোলাপি, হরিদ্রা, সোণালী, বেগুণী, মেজেণ্টা ইত্যাদি। সেইরূপ যে দিকে যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই নূতন নূতন জাতির সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে।

মনুষ্যসমাজের সূত্রপাত হইতে যে কি প্রকারে জাতি সকল পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদান করা একেবারেই অসাধ্য। হিন্দুশাস্ত্রমতে দেখা যায়, প্রথমে ব্রহ্মা হইতে চারি প্রকার স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল, যথা মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র। এই চারি প্রকার জাতিদিগের মধ্যে, গুণ ভেদই প্রধান কারণ। ব্রাহ্মণের গুণ ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া, ক্ষত্রিয়ের রাজকার্য্য, বৈশ্যের বাণিজ্য ব্যবসা এবং ইহাদের সেবা করা শূদ্রের কার্য্য ছিল।

স্পষ্টই দেখা যায় যে, এই সকল জাতিদিগের পরস্পর সংসর্গে নানাবিধ নূতন নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কেবল সংসর্গই জাতি বিভাগের একমাত্র কারণ কিন্তু গুণ ভেদের জন্য যে জাত্যন্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহাকে প্রকৃতপক্ষে জাতি না বলাই উত্তম। কারণ, ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত হিন্দুজাতির অন্তর্গত। ব্রাহ্মণ শূদ্রে যে উপাধির প্রভেদ আছে, তাহাই গুণ দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। ফলে, গুণের দ্বারা যে পার্থক্য ভাব উপস্থিত করে, তাহাকে তজ্জন্য জাতি না বলিয়া আমরা উপাধি শব্দ প্রয়োগ করিলাম।

গুণ ভেদের কারণে যে উপাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা বর্ত্তমান কালে নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ হইবে। যে সকল হিন্দু এবং মুসলমান জাতি ছিল, তাহারা পাশ্চাত্য বিদ্যায় গুণান্বিত হইয়া পূর্ব্ব উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক অভিনব উপাধির অন্তর্গত হইয়া যাইতেছে। তাহা ইংরাজ, হিন্দু কিম্বা মুসলমান নহে। সুতরাং নূতন উপাধিবিশিষ্ট হিন্দু কিম্বা মুসলমান জাতিকে জাতি না বলায় কোন দোষ ঘটিবে না।

এই গুণভেদের জন্য আবার আর এক উপাধি উৎপন্ন হইতেছে। তাঁহারাও পূর্ব্বোল্লিখিত নূতন উপাধির ন্যায় অদ্যাপি বিশেষ জাতিতে অভিহিত

হন নাই। তাঁহারা খৃষ্টান, মগ, চীণ, যবন প্রভৃতি কোন জাতির অন্তর্গত নহেন।

অতএব জাতি বিভাগ যে একটী স্বাভাবিক কার্য্য, তাহার সংশয় নাই। জাতি বিভাগ যদ্যপি স্বাভাবিক নিয়মাধীন হয়, তাহা হইলে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবার প্রসঙ্গ করা নিতান্ত উপহাসের বিষয় হইবে। কিন্তু কি জানি ভগবানের কি ইচ্ছা যে, আজকাল এই মতের অনেক লোকই দেখা যাইতেছে। তাঁহারা দেশোন্নতি লইয়া যখনই ব্যতিব্যস্ত হন, তখনই জাতি-বিভাগ বিলুপ্ত না করিতে পারিলে ভারতের কল্যাণ হইবে না বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া থাকেন। ফলে, তাঁহারা জাতিলোপ করিয়া নূতন একটী জাতি সংগঠিত করিতে যাইয়া কেবল উপাধি বাড়াইয়া বসেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ব্রাহ্মদিগকে গ্রহণ করিলাম। তাঁহারা হিন্দুদিগের সামাজিক এবং ধর্ম্মবিষয়ে সহানুভূতি করিতে অশক্ত এবং তাঁহাদের সহিত কোন কার্য্যে মিলিত হইতে পারেন না। পূজাদি উৎসবে যাইলে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, শ্রাদ্ধাদিতেও পৌত্তলিকতা, ফলে হিন্দুদিগের প্রায় সকল উৎসবাদি দেবদেবী ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না বলিয়া তাঁহাদের সংযোগ দান করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপে জাতিলোপ করিতে যাইয়া আপনারাই অপর উপাধি সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন কিন্তু নূতন জাতির গঠন হয় নাই।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, জড় জগতে নূতন জাতি উৎপন্ন করিতে হইলে এক পদার্থ অপর পদার্থের সহিত রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ করিয়া থাকে; কিন্তু যখন তাহারা কেবল পরস্পর মিলিতাবস্থায় থাকে, তখন তাহারা মিশ্রণ বলিয়া কথিত হয়।

আদান প্রদান দ্বারা সমাজ গঠন করিলে নূতন জাতির সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু উপরোক্ত পদার্থ মিশ্রণের ন্যায় হিন্দুরা ম্লেচ্ছ স্বভাবের সহিত আপনাকে সংযুক্ত করিয়া হিন্দু-ম্লেচ্ছ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই ভাবেরই কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন যে, তাঁহারা হিন্দু। হিন্দুর সহিত সামাজিক সকল কার্য্যই করিবেন। পিতা মাতার স্বর্গারোহণ হইলে শ্রাদ্ধাদিও করিবেন, বাটীতে নিয়মিত দেবসেবা হইবে; কিন্তু হিন্দুজাতির নিষিদ্ধ আহার বিহার অর্থাৎ গো, শূকর ভক্ষণ এবং যবন ও ম্লেচ্ছ গমন করায় কোন আপত্তি হইবে না। হিন্দুরা তাহা পারেন না ও করেন না এবং ম্লেচ্ছেরা দেবসেবা বাহ্যিক হইলেও

কখন করিবেন না। তখন ইহাদের মিশ্রণ জাতি ব্যতীত কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি বলিতে পারা যায় না।

আর এক মিশ্রণ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা হিন্দু বটে। হিন্দুদিগের সামাজিক সকল নিয়ম ইচ্ছায় হউক, আর কার্য্যে বাধ্য হইয়াই হউক, প্রতিপালন করিয়া থাকেন, কিন্তু হিন্দু জাতির যে দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব আছে, তাহা তাঁহারা করেন না। সকল দেবদেবীকে আধ্যাত্মিক অর্থে মনুষ্যে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের সর্ব্বস্ব রত্ন ধর্ম্মশাস্ত্র, তাহাও কবির কল্পনাপ্রসূত বলিয়া নীতিশাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত করেন। তাঁহারা স্বজাতি অর্থাৎ সমধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত অপরের সহিত আহার করেন না, অপরের প্রসাদ এমন কি পিতা মাতার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করেন না, কিন্তু স্বধর্ম্মাবলম্বী হইলে সে যে জাতিই হউক, ব্রাহ্মণ কিম্বা চণ্ডালাধম হউক, ধোপা কিম্বা নাপিতই হউক, তাহার অধরামৃত মিশ্রিত পদার্থ অমৃত তুল্য ভক্ষণ করিবেন। হিন্দুরা তাহা করেন না, সুতরাং এই শ্রেণীকে নূতন মিশ্রণ জাতি বলা যাইতে পারে। মনুষ্যসমাজ লইয়া এইরূপে যদ্যপি বিশ্লিষ্ট করা যায়, তাহা হইলে জাতি বিভাগের আর সীমা থাকিবে না।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, জাতি বিভাগ হয় হউক, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা কাহার সাধ্য নহে, কিন্তু যিনি যে জাতিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি তাহারই পরিচয় দিন, তাহাতে ক্ষতি নাই। যদ্যপি এক জাতি হইয়া গুপ্তভাবে অপর জাতির সহিত সর্ব্বদা সহবাস করেন,তাহা হইলে কোন জাতিরই স্বভাব রক্ষা হইবে না। যেমন, মুসলমান হইয়া হিন্দুর বেশে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিলে তাহার সম্বন্ধীয় ব্যক্তিরা হিন্দু যবনের মিশ্রণ জাতি হইবেন। তেমনই গুপ্ত ভাবের ভিতর বাহির ভাবাবলম্বীদিগের দ্বারা (যে জাতিই হউক) স্বজাতির বিলক্ষণ অনিষ্টের হেতু হইয়া থাকে।

যখন ম্লেচ্ছেরা হিন্দুস্থানে প্রথমে রাজছত্র স্থাপিত করেন, তখনকার হিন্দু এবং এই ১৮৯১ সালের হিন্দুদিগের সহিত তুলনা করিলে কি এক জাতি বলিয়া প্রত্যক্ষ হইবে? (আমরা এস্থানে উন্নতি অবনতির কথা বলিতেছি না) যে হিন্দুর ধর্ম্মই একমাত্র সম্বল ছিল, হিন্দুকে দেখিলেই ধর্ম্মের রূপ বলিয়া জানা যাইত, সে হিন্দু এখন নাই। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম মান্য না করাই এখনকার হিন্দুর লক্ষণ হইয়াছে। যে হিন্দুর পিতা ও মাতার ইহলোকে ব্রহ্মশক্তির রূপ বলিয়া ধারণা ছিল এবং তদনুরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, সে হিন্দু এখন

কোথায়? অধুনা পিতা মাতাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিলে পুরুষার্থ এবং স্বাধীন চেতার আদর্শ দেখান হয়। যে স্ত্রীলোকেরা বাল্যাবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের আশ্রয় ব্যতীত জানিতেন না, সেই হিন্দু রমণী এখন স্বাধীন ভাব ধারণ করিয়াছেন। স্বামীকে ইন্দ্রিয় সুখের হেতু জ্ঞান করিয়া যখনই তাহাতে পূর্ণ মনোরথ না হইতে পারেন, তখনই অপরের দ্বারা সে সাধ মিটাইয়া লয়েন। যে নারীগণ চন্দ্রানন ব্যতীত দেখিতেন না, তাহারা এক্ষণে প্রভাকরের সমক্ষে প্রভান্বিত হইতেছেন। এ রমণীদিগের কি তখনকার মহিলাদের সহিত কোন সাদৃশ্য আছে? যে হিন্দুজাতি, বৃথা জীবহিংসা করিতেন না, অদ্যকার হিন্দুরা তাহার চূড়ান্ত করিতেছেন। সুতরাং তাহাদের একজাতি কিরূপে বলা যাইবে? যদ্যপি তাহাই হয়, যদ্যপি বর্ত্তমান হিন্দুদিগের প্রকৃত হিন্দু-ভাব বিলুপ্ত হইয়া যবন ও ম্লেচ্ছাদি নানা ভাবের মিশ্রণাবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের একটী কার্য্য করিতে হইবে। আর পূর্ব্বের নিয়মে এই প্রকার মিশ্রণ জাতিকে বিরুদ্ধ হিন্দুনামে অভিহিত করিতে পারা যায় না এবং নানা কারণে, যাহা পশ্চাতে বলিব, তাহাতে হিন্দু বলিয়া হিন্দু সমাজে পরিগণিত হইতে দেওয়া উচিত নহে।

জড়জগতে রূঢ় পদার্থদিগের ন্যায় হিন্দুজাতি ভাবজগতের একটী রূঢ় ভাব। সুতরাং, তাহা মনুষ্যের দ্বারা যৌগিক ভাবে পরিণত করা ব্যতীত কস্মিন্ কালে বিকৃত অথবা একেবারে বিলুপ্ত করার কোনমতে সম্ভাবনা নাই। ভাষানভিজ্ঞেরা যেমন পুস্তকের মর্য্যাদা বুঝিতে অশক্ত হইয়া কতই নিন্দা, কতই হতাদর করেন, সেইরূপ ভাবানভিজ্ঞেরা ভাবের বিরুদ্ধে বাক্যব্যয় করিয়া থাকেন। সেইজন্য যে সকল ব্যক্তিরা মিশ্রণ ভাবে পরিণত হইয়াছেন, তাহাদের যে ভাবটী প্রবল হয়, তখন বাহিরে তাহারই অধিক কার্য্য হইয়া থাকে। যেমন সোরা এবং গন্ধক ও কয়লা মিশ্রিত করিলে এক প্রকার বর্ণের উৎপত্তি হয়; কিন্তু যাহার পরিমাণ অধিক হইবে, তাহারই আধিক্যতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অথবা যেমন লবণের সহযোগে অম্ল পদার্থের অম্লত্ব দূর হয়, কিন্তু ইহার আধিক্য হইলে লাবণিক স্বাদ প্রবল ভাবে অবস্থিতি করে; কিম্বা তাহার স্বল্পতা ঘটিলে অম্লতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। জাতি ভাবের মিশ্রণ সংঘটিত হইলেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। হিন্দুজাতির মধ্যে পূর্ব্বে যাবনিক ভাব কিয়ৎপরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহা

সর্ব্বস্থানে সমান ভাবে কার্য্যকারী হইতে পারে নাই, ম্লেচ্ছাধিকারের পর এই হিন্দুজাতি কেমন স্বল্পে স্বল্পে ম্লেচ্ছ ভাবে পরিণত হইয়া আসিতেছেন, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে ভাবের আশ্চর্য্য মহিমা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইবে।

হিন্দুদিগের মতে দুই কারণে স্বভাব বিচ্যুত হইয়া থাকে। প্রথম, সংস্রব এবং দ্বিতীয়, প্রকৃত-কার্য্য। সংস্রবে কেবল মানসিক ভাবান্তর হয়, এবং কার্য্যে মানসিক এবং শারীরিক উভয় লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন কোন লম্পটকে দেখিলে লাম্পট্য অতি ভয়ানক পাপ মনে হইয়াই হউক, অথবা তাহা সুখের প্রশস্ত পথ জ্ঞানেই হউক, মানবের ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে। এই ভাব যে পর্য্যন্ত থাকে বা যখনই তাহা উদিত হয়, তখনই তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু যে ব্যক্তি লাম্পট্যভাব কার্য্যে পরিণত করেন, তাহার মন একেবারে পরিবর্ত্তিত এবং সে শরীরে দূষিত রস প্রবেশ করাইয়া নানাবিধ ব্যাধির সূত্রপাত করিয়া রাখে। যেমন চুম্বকের সংস্রবে লৌহে চুম্বকের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, অগ্নির সংস্রবে কোন পদার্থ অগ্নিময় না হউক, তথাপি উত্তপ্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনই সংস্রব এবং প্রকৃত কার্য্য দ্বারা স্বভাব বিনষ্ট হয়। এই নিমিত্ত হিন্দুরা অন্য কোন বিজাতীয় আহার ভক্ষণ, কিম্বা কোন বিজাতীয় দেশে গমন অথবা বিজাতীয় ব্যক্তির সহিত সহবাস করিতেন না। সুতরাং তখন প্রকৃত হিন্দুজাতি দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু বর্ত্তমানকালে সংস্রব দোষের কথাই নাই, বাস্তবিক বিজাতীয় কার্য্যই হইতেছে। সহরের প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, ম্লেচ্ছ আহার, ম্লেচ্ছ ঢংএ আপন স্বভাব সংগঠন পূর্ব্বক বাস করিতেছেন। তাঁহাদের পক্ষে হিন্দুজাতি অতি ঘৃণিত, হিন্দুর সকল বিষয়ই কুসংস্কারাবৃত, সকল কার্য্যই অসভ্যতায় পরিপূর্ণ। হিন্দু রীতিনীতি যারপরনাই কলুষিত। ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ভাবে গঠিত। কোন হিন্দু গ্রন্থকর্ত্তা হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার বর্ণনা করিতে গিয়া বিবাহ উল্লেখ পূর্ব্বক লিখিয়াছিলেন, যে বিবাহের সময় লেখাপড়া হয়। লিখিবার পূর্ব্বে প্রজাপতি পতঙ্গের আবির্ভাব (invocation of butterfly) করান হইয়া থাকে। পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়ের পরলোক প্রাপ্ত হইলে উপরোক্ত গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, ভূতের ভয় নিবারণের নিমিত্ত লৌহ ব্যবহার করিবার নিয়ম আছে। এই প্রকার নানা প্রকার হিন্দুদিগের কুসংস্কারের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ প্রকার যে

সকল হিন্দু জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের কি বিশুদ্ধ হিন্দু বলা যাইবে, না তাঁহারা হিন্দু যবনাদি বিবিধ জাতির এক প্রকার মিশ্রণ জাতি হইয়া গিয়াছেন?

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, দেশে কি কেহ হিন্দু নাই? কেহ কি নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন না? তাহাই বা কিরূপে বলা যাইবে। যাঁহারা প্রকাশ্য ম্লেচ্ছাবস্থায় রহিয়াছেন, যাঁহাদের বাটীতে মুসলমান পাচক বেতন ভোগ করিতেছে, তাঁহারা হিন্দুকুলচূড়ামণী, হিন্দুসমাজ তাঁহাদের হস্তে, হিন্দুর রীতি নীতি আচার ব্যবহারের হর্ত্তাকর্ত্তা তাঁহারই; সুতরাং হিন্দুয়ানী আর থাকিবে কিরূপে? কুক্কুট ভক্ষণ এক্ষণে মৎস্যের ন্যায় নির্ব্বিরোধে আহার হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুসন্তান গো মাংস ভক্ষণ করিয়া হিন্দুসমাজে স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়াইতেছেন, তথাপি হিন্দু সমাজ যেন বধির হইয়া বসিয়া আছেন!

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। গঙ্গা—হুগলী নদী, দেবদেবীর উপাসনাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া উপহাস করা; নারায়ণ পূজা ঘোর অজ্ঞানের কার্য্য, গুরু ভক্তি করিলে হীনবুদ্ধি মনুষ্য-পূজার পরিচয় দেওয়া হয়, ইত্যাদি হিন্দুভাবের বিপরীত কথা শ্রবণ করিলে এ প্রকার জাতিকে হিন্দুজাতি কে বলিতে পারেন?

হিন্দুজাতি যে আর প্রকৃতিস্থ নাই, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা, যাঁহারা হিন্দু সমাজের জীবন, হিন্দুভাব বিকৃত করিয়া অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, সুতরাং এ সমাজের মঙ্গল কোথায়?

বর্ত্তমান হিন্দুজাতি বিসমাসিত করিয়া দেখিলে অধিকাংশ স্থলে ম্লেচ্ছভাবই অধিকার করিয়াছে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ম্লেচ্ছ জাতির সহিত হিন্দু ও ম্লেচ্ছ-জাতির স্বাভাবিক যে কি পর্য্যন্ত প্রভেদ আছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

পরীক্ষার নিমিত্ত একটী বিশুদ্ধ ম্লেচ্ছ এবং একটী বিশুদ্ধ হিন্দু পরিগৃহিত হউক। সর্ব্ব প্রথমে কি দেখা যাইবে? বর্ণের প্রভেদ, শারীরিক গঠনের প্রভেদ, পরিচ্ছদের প্রভেদ, দৈহিক শক্তির প্রভেদ, আহারের প্রভেদ, কার্য্যের প্রভেদ, বুদ্ধির প্রভেদ, বিদ্যার প্রভেদ, অধ্যবসায়ের প্রভেদ, সামাজিক রীতি-নীতির প্রভেদ এবং ধর্ম্মের প্রভেদ। হিন্দু যতই রূপবান হউক, কিন্তু ম্লেচ্ছের ন্যায় শ্বেতাঙ্গ হইতে পারে না। কারণ রূপাদি হওয়া নক্ষত্রের অবস্থার কথা। তাহা সেই জন্য ঈশ্বরাধীন কর্ম্ম, মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে হইবার নহে। আজকাল

অনেকে যদিও ম্লেচ্ছ হইয়াছেন, কিন্তু স্বভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে কে সক্ষম হইবেন? কতই সাবান ঘর্ষণ করিলেন, এবং চর্ম্মোপরিস্থিত সূক্ষ্মাংশগুলি ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল, তথাপি শ্বেতাঙ্গ হইল না। কেহ বা স্ত্রী গর্ভবতী হইবামাত্র, ম্লেচ্ছদেশে তাঁহাকে প্রসব করাইবার নিমিত্ত পাঠাইতেছেন। তথাপি সে সন্তান ম্লেচ্ছের ন্যায় বর্ণ লাভ করিতে পারিতেছে না। অতএব এ স্থানে ইচ্ছা ক্রমে এক জাতি হইতে অপর জাতি হওয়া গেল না। গঠন সম্বন্ধেও তদ্রূপ। যে হিন্দু সন্তানেরা ম্লেচ্ছ হইয়াছেন, তাঁহারা কি শারীরিক উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছেন, না পারিবার কোন সম্ভাবনা আছে? ব্যায়াম কিম্বা ক্রীড়া দ্বারা কোন হিন্দু-ম্লেচ্ছ বিশুদ্ধ ম্লেচ্ছের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছেন? কখনই না। তাহা হইবার নহে।

পরিচ্ছদ অস্বাভাবিক কার্য্য, সুতরাং তাহা সুচারুরূপে অনুকরণ করা যাইতে পারে এবং কার্য্যেও তাহা সুচারুরূপে পরিণত করা হইয়াছে।

আহার, তাহা অস্বাভাবিক বিধায় পরিচ্ছদের ন্যায় অনায়াসে অবলম্বন করা যায় এবং ফলে তাহা হইয়া গিয়াছে।

দৈহিক শক্তি স্বাভাবিক কথা। তাহাতেই সকলে পরাভূত হইয়াছেন। উহা মনুষ্যের আয়ত্তাধীন নহে।

কার্য্যে প্রভেদ। ম্লেচ্ছেরা স্বাধীন কার্য্যে বিশেষ দক্ষ, কিন্তু হিন্দুদিগের বর্ত্তমান পরাধীন অবস্থা হেতু, তাহাদের মানসিক-ভাব এরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, স্বাধীন কার্য্যের কোন ভাব আসিবার উপায় নাই। এই নিমিত্ত হিন্দুরা ম্লেচ্ছ হইয়াও পরাধীন ব্যবসায় দীক্ষিত হইয়া আসিতেছেন। সরকারী ভৃত্য হওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহাতে বিফল হইলে আইন ব্যবসা শিখিয়া একমাত্র স্বাধীন কার্য্যের পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাকে আমরা স্বাধীন কার্য্য বলিতে পারি না। কারণ স্বাভাবিক চিন্তাই উন্নতির একমাত্র উপায়। ম্লেচ্ছেরা এই আইন ব্যবসায় পৃথিবী-ব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। আইনে বারুদ প্রস্তুত হয় না, কামান পরিচালিত হয় না, ব্যোমযান বাষ্পযান প্রস্তুত হয় না। সুতরাং তাহা স্বাধীন কার্য্য বলিয়া কেমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে? অতএব হিন্দু ম্লেচ্ছের কার্য্যে প্রভেদ রহিল।

বুদ্ধির প্রভেদ এই যে, যে জাতি ব্যবসা করিতে আসিয়া একাধিপত্য স্থাপন করিয়া ফেলিলেন, যাঁহারা এই বিশাল ভারতবর্ষের অগণন প্রাণীর বস্ত্র, আহার, পাঠোপযোগী পুস্তকাদি, গৃহ নির্ম্মাণের সামগ্রী সকল, ঔষধ প্রভৃতি

দৈনিক ব্যবহারের যাবতীয় পদার্থ আপন হস্তে রাখিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা যদ্যপি অন্য বস্ত্র না দেন, সমগ্র ভারতবর্ষ উলঙ্গ হইবে, যদ্যপি ঔষধ না পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে হাহাকার উঠিবে, যদ্যপি তথা হইতে পুস্তকাদি না আইসে,তবে আমরা মূর্খ হইব ; এমন অবস্থায় কোন্ জাতি বুদ্ধিমান হইলেন ? হিন্দুর সে বুদ্ধি হয় নাই।

বিদ্যার পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। বিদ্যাবলে ছয় মাসের পথ একদিনে গমন, সহস্র যোজন ব্যবধানের সংবাদ এক মূহূর্ত্তে প্রাপ্ত হওয়া, পক্ষীর গতি খর্ব্ব করিয়া ব্যোমমার্গে বিচরণ করা, নিমিষের মধ্যে চূর্ণ করা মূর্খের কর্ম্ম নহে। কোন্ হিন্দু-ম্লেচ্ছ এমন বিদ্যায় ম্লেচ্ছের সমকক্ষ ?

অধ্যবসায়। কোথায় ম্লেচ্ছাধিকার, আর কোথায় হিন্দুস্থান ! যে মহা মহা অতলস্পর্শ জল অতিক্রম করিতে কত ব্যক্তির প্রাণ সংহার হইয়াছে ও অদ্যাপি হইতেছে, তথাপি সে জাতির অধ্যবসায় অবিচলিত ভাবে রহিয়াছে।

ম্লেচ্ছদিগের সামাজিক রীতিনীতির সহিত হিন্দুদিগের একেবারেই সম্পর্ক নাই, কিন্তু পুরাতন হিন্দুশাস্ত্রে যে প্রকার রীতিনীতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত অনেক পরিমাণে সাদৃশ্য আছে। যথা,—বিদ্যাভ্যাস, বিবাহ, শরীর পালন, ইত্যাদি নানা বিষয়ে ঐক্যতা দৃষ্ট হয়।

আহার, বিহার ও পরিচ্ছদাদি তাহাদের দেশের অবস্থানুসারে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। হীমপ্রধান দেশ বলিয়া শরীরের সমুদায় অংশ আবৃত করা প্রয়োজনবশতঃ যে পরিচ্ছদের ব্যবহার হইয়াছে, তাহা অভ্যাসের নিমিত্ত উষ্ণপ্রধান দেশেও ব্যবহার করিতে হয়। আহারেও সেই উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু হিন্দুরা উষ্ণদেশে বাস করিয়া কিজন্য ঐ প্রকার পরিচ্ছদের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন, তাহার অন্য কারণ কিছুই নাই, কেবল অনুকরণ করার পরিচয় মাত্র। ঈশ্বর লাভ করা উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বভাবের গঠনানুসারে সাধন-প্রণালী হিন্দু হইতে পার্থক্য হইয়াছে ; কারণ ধর্ম্মের বর্ণ-মালা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মন স্থির করাই সাধনের প্রথম উদ্দেশ্য। শারীরিক অবস্থাক্রমে মন পরিচালিত হয়। যেমন, নিক্তির কাঁটা, উভয় পক্ষীয় তুলা পাত্রের লঘু গুরুর হিসাবে স্বস্থানচ্যুত হইয়া থাকে। সেইপ্রকার উষ্ণতা ও শীতলতা প্রযুক্ত শারীরিক স্নায়ুবৃন্দের কার্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটনায়, মন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে ; শরীরের স্বচ্ছন্দতা স্থাপন করা মন স্থিরের প্রথম সোপান।

কথিত হইয়াছে যে, শীত প্রধান দেশে ম্লেচ্ছদিগের বাসস্থান, তন্নিমিত্ত তাহাদের পেণ্টুলেন ব্যবহার করিতে হয়। পেণ্টুলেন পরিধান পূর্ব্বক হিন্দুদিগের ন্যায় আসনে উপবেশন করা যারপরনাই দুরূহ ব্যাপার। অগত্যা চেয়ারে অর্থাৎ উচ্চাসনে লম্বিতপদে উপবেশন করিতে হয়। প্রাতঃস্নান করা শীতল দেশে নিষিদ্ধ, কিন্তু উষ্ণ-প্রধান-দেশে তাহাতে শারীরিক উত্তাপের লাঘবতা হইয়া মনের স্থৈর্য্য ভাব লাভ হইবার পক্ষে বিশেষ আনুকূল্য হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত হিন্দুদিগের ভাবের সহিত কোন মতে মিলিতে পারে না। তাহা স্বাভাবিক নিয়মাধীন; কিন্তু ম্লেচ্ছ-হিন্দুরা অস্বাভাবিক ভাবকে আরও স্বাভাবিক করিতে যাইয়া বিকৃতাবস্থায় পতিত হইয়াছেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, বর্ত্তমান হিন্দু ম্লেচ্ছেরা কি করিতেছেন? তাঁহারা কি ম্লেচ্ছদের সমুদয় গুণ লাভ করিতে পারিয়াছেন? তাঁহারা কি স্বাধীন চিন্তাশীল হইতে পারিয়াছেন? তাঁহারা কি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকের শ্রেণীভূত হইয়াছেন? তাঁহারা কি স্মারবীয় শক্তি লাভ করিতে পারিয়াছেন? তাঁহারা কি অধ্যবসায়ী হইয়া স্বাধীন জাতিদিগের ন্যায় আপনাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের উপায় করিতে পারিয়াছেন? আমরা দেখিতেছি যে, তাহার কিছুই হয় নাই। সেদিকে কাহার দৃষ্টিপাত নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পরাধীন জাতির সে শক্তিই থাকিতে পারে না। তাই তাঁহারা দাস্যবৃত্তি শিক্ষার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং কিঞ্চিৎ উচ্চ রকমের দাস্যবৃত্তি শিখিতেছেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এইগুণে আপনাদের কেমন করিয়া তাঁহারা ম্লেচ্ছের পরিচ্ছদ ও আহার বিহার দ্বারা সেই বর্ত্তমান উন্নত জাতিদিগের সমকক্ষ মনে করেন? যেমন অভিনেতারা নানাজাতির সাজ সাজিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের প্রকৃতি লাভ করিতে পারেন না। সেই প্রকার হিন্দু-ম্লেচ্ছেরা ম্লেচ্ছদিগের অনুকরণ সুলভ পরিচ্ছদ ও আহার অবলম্বন পূর্ব্বক এক প্রকার নূতন অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক, যেমন অভিনেতারা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র অভিনয় করিয়া আপনাদের স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষেও তাহাই হইতেছে ও হইবে। তাহার কারণ এই যে, দেশ কাল ও পাত্র বিশেষে মনুষ্যের স্বভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে; অর্থাৎ যেমন দেশে যেমন মাতা পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে, তাহার আকৃতি প্রকৃতি প্রায়ই তদনুরূপ হইয়া থাকে। কাকের শাবক ময়ুর হইতে পারে না, সিংহের শাবকও মেষ হইবার নহে। কেহ কি

বলিতে পারেন যে, দুর্ব্বলের বলিষ্ঠ সন্তান হইয়াছে, অথবা যক্ষ্মা রোগীর সন্তান যক্ষ্মা রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে? কেহ কি দেখিয়াছেন যে, যাঁহার সন্তান তাঁহার লক্ষণ না পাইয়া আর এক জনের ভাব পাইয়াছে? হিন্দু-গৃহে ম্লেচ্ছ অথবা কাফ্রির ন্যায় কোন সন্তান এপর্য্যন্ত জন্মিয়াছে, কিম্বা কাফ্রি এবং ম্লেচ্ছের দ্বারা হিন্দুর লক্ষণাক্রান্ত সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে? তাহা কখনই হয় না, হইবারও নহে। তাহা স্বভাব-বিরুদ্ধ কার্য্য। তাই বলিতেছি, হিন্দু-ম্লেচ্ছেরা কি করিতেছেন?

তাঁহাদের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, যেমন লৌহকে কোন প্রকারে পারদ কিম্বা রৌপ্য করা যায় না, যেমন জলকে মৃত্তিকায় পরিণত করিবার কাহার সাধ্য নাই, সেইপ্রকার একজাতি কখনই আর এক জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইতে একেবারেই পারে না। তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী কথা, কিন্তু লৌহকে অন্যান্য পদার্থ যোগে যেমন তাহার ধর্ম্মের আকৃতি এবং প্রকৃতির বিপর্য্যয় করা যায়; যথা, গন্ধকাম্ল (Sulphuric acid) সহযোগে হিরাকস প্রস্তুত হয়, তখন তাহাতে লৌহের কিম্বা গন্ধকাম্লের কোন লক্ষণ থাকে না, সেই প্রকার যৌগিক জাতিদিগের মধ্যে যোগোৎপাদক জাতির কোন ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। হিরাকসে বাস্তবিক লৌহও আছে এবং গন্ধকাম্লও আছে, কিন্তু সে লৌহে কি অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে, না গন্ধকাম্লে তাহার নিজ ধর্ম্মের আর কোন কার্য্য হইয়া থাকে?

পূর্ব্বে আমরা মিশ্রণ এবং যৌগিক জাতির উল্লেখ করিয়া এই বর্ত্তমান ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হিন্দুদিগের মিশ্রণ জাতির অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন যে, এই শব্দটা প্রয়োগ করিবার আমাদের উদ্দেশ্য কি?

রসায়ণ শাস্ত্রের মতে যখন একজাতি পদার্থ অপর জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে, তাহাকে মিশ্রণ-পদার্থ কহে। কারণ, তাহা হইতে সহজেই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে এবং মিশ্রিত পদার্থেরা অস্বাভাবিক-নিয়মে একত্রিত হইয়া থাকে। যেমন,কাঁসা, পিতল, বারুদ ইত্যাদি। কিন্তু যখন একজাতীয় পদার্থদিগের সহিত স্বাভাবিক সংযোগ স্থাপন হয়, তখন তাহার লক্ষণ আর পূর্ব্বের পদার্থের কোন লক্ষণের সাদৃশ্য থাকে না। যেমন বারুদে অগ্নিস্পর্শ করিলে আর কি কেহ তাহাকে বারুদ বলিতে পারিবেন? তখন কয়লা, সোরা এবং গন্ধকের কোন চিহ্নই প্রাপ্ত

হওয়া যাইবে না; কিন্তু এক প্রকার শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট পদার্থ অবশিষ্ট থাকিবে; তাহা কয়লা,গন্ধক প্রভৃতির সহিত একেবারে বিভিন্ন প্রকার ভাবাপন্ন, তাহার সন্দেহ নাই। সেইরূপ এক জাতির সহিত অপর জাতির সংস্রব দ্বারা গুণাবলম্বন করিলে মিশ্রণভাব লাভ করা যায়, কিন্তু নূতন জাতি লাভ করা যায় না। নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইলে স্বাভাবিক নিয়মে যাইতে হইবে; অর্থাৎ যে জাতির ধর্ম্ম যে জাতিতে আনয়ন করিতে হইবে, সেই জাতির সহিত সংযোগ হওয়া আবশ্যক। পরস্পর বিবাহাদি দ্বারা যে সন্তান জন্মিবে, তাহারা দুই জাতির মধ্যবর্ত্তী জাতি হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জাতি—মনুষ্য কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইতে পারে না। এক্ষণে আমাদের হিন্দু-ম্লেচ্ছ-মিশ্রণ জাতিরা কি বলিতে চাহেন? তাঁহারা হিন্দুজাতিকে ঘৃণাই করুন, আর বিদ্রূপই করুন, তাঁহারা স্বীয় ইচ্ছায় জাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহা চিন্তা করিয়া বুঝিয়া লউন। ইচ্ছা করিলে যখন সং সাজা ব্যতীত ম্লেচ্ছ হওয়া যায় না, তখন সে আশা করা বৃথা হইতেছে। যদ্যপি একথা বলেন যে, তাঁহারা নূতন জাতি সৃষ্টি করিবেন, তাহা হইলে তাহা স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু যে প্রকারে বর্ত্তমান সময় চলিতেছে, তাহাতে কেহই পূর্ণ মনোরথ হইতে পারিবেন না। তাঁহারা যে পর্য্যন্ত আপনাদের কন্যা ম্লেচ্ছ করে সমর্পণ করিতে না পারিবেন এবং আপনারা ম্লেচ্ছের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত নূতন যৌগিক-জাতি কখনই উৎপন্ন হইবে না।

আমরা হিন্দুদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি এক্ষণে বুঝিলেন যে, হিন্দু-জাতি একটী জাতিবিশেষ? তাহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ পৃথিবী বক্ষে বিরাজ করিতেছে। কত যুগান্তর দেখিল, কত রাজ্য বিপ্লব দেখিল, কখন স্বাধীন কখন বা পরাধীন হইল, তথাপি অপ্রতিহতপ্রভাবে সে জাতি দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিলে কখন তাহাতে ময়ূরত্ব সম্ভবে না। বিস্তর পুণ্যফলে বিশুদ্ধ জাতিতে জন্ম হইয়া থাকে, ভ্রমক্রমে তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত মূর্খতার কর্ম্ম।

জাতিমর্য্যাদা সর্ব্বস্থানেই আছে। অমুকের পুত্র, অমুক জাতিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি বলিতে কাহারও সঙ্কোচভাব আসিবে না, কিন্তু একজন বেশ্যার পুত্র, তাহার পরিচয় দিবার সময় যদিও উচ্চজাতি এবং কুলের আশ্রয় লইয়া সাধারণের নিকট বাঁচিয়া যায়, কিন্তু মনে মনে জানে যে, কি

ক্লেশে তাহার দিন যাপন হইয়া থাকে। একজন উচ্চপদস্থিত কর্ম্মচারী যদ্যপি নীচ জাতি কিম্বা হীন কুলোদ্ভব হয়, তাহা হইলে তাহার পরিচয় দেওয়া অতিশয় বিড়ম্বনা হইয়া থাকে। যাঁহারা ম্লেচ্ছ হইয়াছেন,তাঁহারাও কি বুঝেন না যে, কয়জন সুজাত ইংরাজের সহিত তাঁহারা আহার করিতে পাইয়া থাকেন? তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন যে, যাঁহারা যে জাতিতে জন্মিয়া যে মাতৃ-শোণিত পান করিয়া লালিত পালিত হইয়াছেন, আত্ম-সুখের জন্য যাঁহারা কৃতজ্ঞতা সূত্র স্বচ্ছন্দে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন, তাঁহারা আর একদিন যে, সে কুলেও কালি দিয়া যাইতে পারিবেন, তাহাও তিলার্দ্ধ সন্দেহের বিষয় নহে। যেমন, ভ্রষ্টা-স্ত্রী কাহারও নহে। যখন যেমন সময় উপস্থিত হয়, তখন সে তেমনই পরিচালিত হইয়া থাকে। জাতিত্যাগীরাও তদ্রূপ স্বভাবের লোক। এই নিমিত্তই বোধ হয় যে, যে সকল ইংরাজদিগের কুল মর্য্যাদা আছে, তাঁহারা হিন্দু-ম্লেচ্ছদিগের সহিত বিশেষরূপে মিলিত হইতে চাহেন না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি কাহার জ্ঞান-দৃষ্টি হইতেছে না?

ইংরাজি লেখাপড়া শিখিলে যে জাতি ত্যাগ করিতে হইবে কিম্বা পিতা মাতাকে দূর করিয়া দিতে হইবে, তাহার অর্থ কি? ইংরাজেরা আজ দুই দিন আসিয়া বলিয়া দিল যে, হিন্দুদের ধর্ম্মকর্ম্ম নাই, অমনই যে তাহাই দেববাক্য বলিয়া ধারণা করিয়া লইতে হইবে, তাহার হেতু কি? জীবিকা নির্ব্বাহ এবং বিজ্ঞানাদি-শাস্ত্র শিক্ষার সুবিধার জন্য বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা; এ কথা বিস্মরণ হইয়া যাইলে কি হইবে? আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি যে,এই হিন্দু-ম্লেচ্ছেরা বড়ই পণ্ডিত, বড়ই বিজ্ঞানী এবং বড়ই বুদ্ধিমান! তাঁহারা কি এ কথা বুঝিতে পারেন যে, যে জাতি যে জাতির উপর একাধিপত্য স্থাপন করেন, সেই জাতিকে বিকৃত করিতে পারিলেই তাঁহাদের মনোরথ সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ হইয়া থাকে।

এই নিমিত্ত ইংরাজেরা আমাদের সর্ব্ববিষয়ে বিকৃত করিয়া দিতেছেন। আমরাও এমনই বালকবৎ অজ্ঞান যে, মাকাল ফল দেখিয়া আম্র পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তাঁহারা ধর্ম্ম বিকৃত করিয়া দিতেছেন, তাঁহারা সামাজিক রীতি নীতি বিকৃত করিয়া দিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের কথাই আমাদের শিরোধার্য্য হইতেছে। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া এ দোষ স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়া লইতেছি; তখন তাহা আমাদেরই মূর্খতার ফল বলিতে হইবে।

সে যাহা হউক, যখন ভগবান্ আমাদের এই অবস্থায় পতিত করিয়াছেন,

তখন তাহাতেই নতশিরে তাঁহার আশীর্ব্বাদ বিবেচনায় আনন্দ প্রকাশ করাই উচিত কিন্তু তাই বলিয়া স্বজাতি, স্ব-কুল, স্ব-স্বভাব, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব কেন? তাই সবিনয়ে আমাদের হিন্দু-ম্লেচ্ছ ভ্রাতাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, আর হিন্দুসমাজে এবং হিন্দুধর্ম্মে ম্লেচ্ছ-ভাব সন্নিবিষ্ট না করিয়া যাহাতে আপনাদের আর্য্য গৌরব বিস্তৃত হয়, যাহাতে পিতামহ কুলের সম্মান রক্ষা হয়, যাহাতে হিন্দুস্থানের হিন্দু-সন্তান বলিয়া দশদিকে প্রতিঘোষিত হইতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এ কি পরিতাপ! এ আশা যে পুনরায় ফলবতী হইবে, তাহা অতিশয় সুদূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতেছে। যেমন, সুস্থ দেহে বিষ প্রয়োগ করিলে বিষের বিক্রমে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের হিন্দুসম্বন্ধে তেমনি অবস্থা ঘটিয়াছে। যদিও সে বিষ বিনাশের উপায় আছে,কিন্তু প্রয়োগকর্ত্তার অভাব হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, শিশির মধ্যে ঔষধ থাকিলে কখন রোগ আরোগ্য হইতে পারে না, তাই মনে মনে আশঙ্কা হইতেছে; সে যাহা হউক, আমাদের আবেদন এই যে, স্বজাতি ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একবার পরিণাম পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করা হইবে।

যাঁহারা এখন হিন্দু আছেন, তাঁহাদের নিকট বক্তব্য এই যে, তাঁহারা এই বেলা সতর্ক হউন। আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে। আর রক্ষা নাই, হিন্দুজাতির মিশ্রণাবস্থা বিধায় প্রকৃত হিন্দুভাব বিলুপ্তপ্রায় হইয়া হিন্দুর গৌরব অস্তমিত হইতে চলিল। এখনও বদ্ধপরিকর হইয়া যদ্যপি চেষ্টিত হওয়া যায়, তাহা হইলেও কিয়ৎপরিমাণে কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা; অতএব এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি?

জাতিরক্ষা করিতে হইলে হিন্দুদিগের রীতি নীতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্র, বর্ত্তমান অবস্থানুযায়ী প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ পরিবর্ত্তন করিবার বিশেষ হেতু আছে।

পুরাকালে হিন্দুরা স্বাধীন ছিলেন, মাতৃভাষায় তাঁহাদের সকল কার্য্যই নির্ব্বাহ হইত, সুতরাং তখন তাহাই শিক্ষার বিষয় ছিল, এক্ষণে তাহা চলিবে না। ইংরাজ রাজ্যাধিকারে বাস করিতে হইলে তাঁহাদের ভাষা শিক্ষা করা অনিবার্য্য। এই ভাষা শিক্ষা করিবার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য আছে; আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জীবিকা নির্ব্বাহ এবং জড় বিজ্ঞান পাঠ করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

যাহাতে বিশুদ্ধ *হিন্দুভাব, হিন্দুমাত্রেই অবলম্বন এবং প্রতিপালন করিতে বাধ্য হন, তাহা সমাজ-শাসন দ্বারা সম্পাদিত করিতে হইবে। এই নিমিত্ত বাঙ্গালা দেশে যেমন নবদ্বীপ এবং ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানবিশেষের অধ্যাপক-মণ্ডলীদ্বারা এই কার্য্য চলিতেছিল, সেই প্রকার বিশেষ ব্যবস্থার সহিত তাহা সংগঠিত হওয়া উচিত।

সাম্প্রদায়িক কিম্বা গোঁড়ামী ভাব চলিবে না; সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক প্রত্যেক বিষয়ের হেতু নির্ণয় পূর্ব্বক, কার্য্যের ব্যবস্থা দেওয়া হইবে। কেবল অমুকের মতে এই কার্য্য করিতে হইবে, এ প্রকার কথার কোন অর্থ থাকিবে না।

নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থ সরল ভাষায় মুদ্রিত হইয়া প্রত্যেক গৃহে এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইবে।

শরীর-রক্ষা এবং যাহাতে সন্তানাদি বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে দৃঢ় সংকল্প করিতে হইবে এবং তৎকার্য্যে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের দেশের লোকদিগের যে প্রকার শারীরিক অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা পৃথিবীর সকল জাতি হইতে অধঃপতিত হইয়া গিয়াছেন। হিন্দুদিগের অন্যান্য উপাধিধারী হইতে বাঙ্গালীরা বিশেষ পশ্চাতে পতিত হইয়াছেন। এই হীনাবস্থা হইতে উত্থিত হইতে হইলে সন্তানোৎপাদন করিবার পক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবে আমরা আলোচনা করিয়াছি।

যে সকল বিজাতীয় ভাব হিন্দুভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, ক্রমে তাহা হইতে পরিমুক্তি লাভ করিতে হইবে। স্বাধীন চিন্তাবৃত্তি যাহাতে পূর্ণরূপে হিন্দু-মস্তিষ্কে পুনরায় কার্য্যকারী হইতে পারে, তদ্বিষয়েও মনোযোগী হইতে হইবে।

দাস্যবৃত্তি বা তৎসংক্রান্ত কোন কার্য্যের জন্য কাহাকেও সাধ্য মতে শিক্ষা দেওয়া হইবে না।

ধর্ম্মই জীবনের পূর্ণ উদ্দেশ্য, এই মর্ম্মে সমাজ-বন্ধন করিতে হইবে। কারণ, সংসারকে ধর্ম্ম-ভিত্তির উপর সংস্থাপন করাই হিন্দুজাতির বিশেষ চিহ্ন। এই নিমিত্ত ভোজনে জনার্দ্দন, যাত্রাকালে দুর্গা-শ্রীহরি, শয়নে পদ্মনাভ, অর্থাৎ

* আজ কাল হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দিয়া অনেকে আপনার ইচ্ছামত ভাবের কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা যে সকল হিন্দুশাস্ত্র ভাবান্তর করিতেছেন, তাহাতে নানাবিধ বিজাতীয় ভাব সন্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

খেতে, শুতে, যেতে ঈশ্বর-স্মরণ করিবার আজিও ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষায় আমাদের সে ভাব বিকৃত হইয়াছে। হিন্দু-ম্লেচ্ছেরা তাই কথায় কথায় কুসংস্কারক বলিয়া হিন্দুদিগকে বিদ্রূপ করেন। তাঁহারা যে সকল বিষয়ে হিন্দুদিগকে দোষী করিতে চাহেন, তাহার মর্ম্ম বুঝিলে আপনাকে আপনি ধিক্কার দিবেন। ফলে, এপ্রকার ঘটনাও সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

হিন্দুদিগের শাস্ত্রাদি অতি উচ্চ এবং পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। বর্ত্তমান কালে যদিও বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতি হইতেছে বলিয়া সকলে স্বীকার করেন, কিন্তু হিন্দুদিগের শাস্ত্রে যে প্রকার সামঞ্জস্য ভাব লক্ষিত হয়, অর্থাৎ মনুষ্যদেহের সহিত, তারা, নক্ষত্র, প্রভৃতি সকলের সম্বন্ধ ও তাহাদের কার্য্যের ফল, এই চূর্ণ বিচূর্ণিতাবস্থায় যে প্রকার প্রতীয়মান হইতেছে, তাহাও অদ্যাপি ম্লেচ্ছ-বৈজ্ঞানিকেরা অনুধাবন করিতে অশক্ত হইতেছেন। সামান্য হরণ পূরণ দ্বারা যে জাতি অদ্যাপি দুই বৎসর পূর্ব্বে, কবে, কোন্ স্থানে কিরূপে ধূমকেতু উঠিবে, সূর্য্যগ্রহণ কিরূপে হইবে, বলিয়া দিতেছেন ; সেই সকল গণনা শিক্ষার জন্য উন্নতিশীল জাতিরা গণিতবিদ্যায় মস্তক আলোড়িত করিয়া ফেলিতেছেন। যে জাতিরা কুম্ভকাদি যোগদ্বারা শ্বাসরুদ্ধ করিয়া যুগান্তর পর্য্যন্ত অনাহারে জীবিত থাকিবার প্রণালী বহির্গত করিয়াছিলেন, হিন্দু-ম্লেচ্ছেরা বলিতে পারেন, ইহার বিজ্ঞানশাস্ত্র কি উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারিয়াছেন? তাঁহাদের মতে না—ভূবায়ুর অক্সিজেন, ফুস্‌ফুস্ মধ্যে প্রবিষ্ট না হইলে দূষিত শোণিত পরিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারে না? কিন্তু হিন্দুরা কি বৈজ্ঞানিক কৌশলে এই স্বাভাবিক নিয়ম অতিক্রম করিতে পারিতেন, তাহার কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ করিতে পারেন? একথা বাস্তবিকই ঠাকুরমার গল্প নহে। ভূকৈলাসের রাজাবাবুরা যে সমাধিস্থ সাধুকে আনিয়াছিলেন, তাঁহার বৃত্তান্ত এ প্রদেশে অনেকেই অবগত আছেন। এক্ষণে এমন অনেক বৃদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতেরা কি ইহার গূঢ়রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ, না হিন্দুদিগের এই শক্তির পরিচয় পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়?

হিন্দুজাতি বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, দয়া বৃত্তিই হিন্দুদিগের একটী বিশেষ ধর্ম্ম ভাব। তাঁহাদের উপার্জ্জনের এক চতুর্থাংশ দরিদ্রকে দান করিবার

নিয়ম ছিল। হিন্দুর নিকটে ভিক্ষুক আসিলে আপনার মুখের আহারও তাহাকে দিয়া অতিথি সৎকার করিবেন। অতিথি বিমুখ করা অতি গর্হিত পাপ বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল।

ক্ষমার আশ্রয় স্থান হিন্দুজাতি। শরণাগত পালনের এমন আর দ্বিতীয় জাতি ছিল না। অতি প্রবল শত্রু শরণাগত হইলে তাহাকেও অব্যাহতি দিয়াছেন। এমন কি পালিত পশুকেও তাঁহারা হনন করা মহাপাতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ধর্ম্মের তুলনা নাই! হিন্দুজাতিরা ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন, তাঁহাকে তাঁহারা রূপ-বিশেষে লইয়া, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি ভাবে বিহার করিতেন। বর্ত্তমানকালে কোন্ জাতি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছেন? ঐ সকল কথা কেবল উচ্চহাস্যে উড়াইবার কর্ম্ম নহে।

উত্তরকেন্দ্রে যে কত বরফ জমিয়া আছে এবং তথাকার অবস্থাই বা কি প্রকার, কলিকাতায় বসিয়া মানচিত্র দেখিয়া কে তাহার জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে? ভগবানের রূপাদিও তদ্রূপ।

হিন্দুরা রাজভক্ত, তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বরের বিশেষ বিভূতি রাজদেহে বিরাজিত থাকে।

হিন্দুরা এই পবিত্র মহান্ ধর্ম্মশীল বৈজ্ঞানিক বংশধর। যাঁহারা সহস্র বৎসর কাল বিজাতীয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া অদ্যাপি একেবারে স্বভাবচ্যুত হইতে পারেন নাই। যে জাতির ধর্ম্মভাব অদ্যাপি কি যবন, কি ম্লেচ্ছ কাহার দ্বারা বিনষ্ট হইল না, সে জাতি যে কতদূর দৃঢ়মূল, তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? কত লোকে হিন্দুধর্ম্ম বিকৃত করিতে চেষ্টা পাইলেন, তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে হিন্দু নহেন বলিয়া নাম বাহির করিলেন, কিন্তু এমনই জাতীয় ভাব যে, তাঁহারাই হিন্দুদিগের সমুদয় ভাব নত শিরে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু দোষের মধ্যে এই ঘটিয়াছে যে, তাহার সহিত অন্যান্য বিজাতীয় ভাবের লক্ষণ দেখা গিয়াছে; তাহার কারণ মিশ্রণজাতি বলিয়া আমরা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি।

হিন্দুদিগের যে সকল ভাব বর্ণিত হইল, তাহাতে যে পর্য্যন্ত সকলে আবদ্ধ ছিলেন, তখনকার অবস্থা এবং তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় ভাব ধারণে যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে যে উপকার কিম্বা অপকার হইয়াছে, সে বিষয়

লইয়া বিচার করিয়া দেখা অতি প্রয়োজন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের সে বিচারের শক্তি নাই। আমরা সে অবস্থা দেখি নাই। তবে শাস্ত্রাদিতে যে প্রকার শ্রবণ করা যায়, তাহাতে আমরা অতি শোচনীয়াবস্থায় পতিত হইয়াছি বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। হিন্দুরাজত্ব সময়ের কোন কথা বলিবার উপায় নাই, যবনদিগের সময়ের যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত ইতিহাসে এবং পুরাতন পরিবারের বংশশ্রুতিক্রমে অবগত হওয়া যায়। তখনকার লোকেরা দীর্ঘজীবী ছিলেন, রীতিমত আহার করিতে পারিতেন। ব্যাধির আড়ম্বর ছিল না। সকলের গৃহেই অন্নের সংস্থান ছিল; সুতরাং তাঁহাদের সুখশান্তির অবিরাম স্রোত চলিত। রাজার অত্যাচার কিম্বা দস্যুর উৎপীড়ন সময়ের কার্য্য, তাহা অগত্যা সহ্য করিতে হইত, কিন্তু বর্ত্তমান কালে সুখস্বচ্ছন্দতা কি কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে? অন্নের সংস্থান কাহার আছে? বলিষ্ঠ কে? ৫০ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া কাহার ভাগ্যে ঘটে? ব্যাধির এমন বিচিত্র গতি হইয়াছে যে, শতকরা ৫ জন সুস্থকায় ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না; যাহাকে জিজ্ঞাসা কর, অন্ততঃ একটা ব্যাধির কথাও তিনি বলিবেন।

তখনকার হিন্দুরা একত্রে দলবদ্ধ হইয়া থাকিতেন। পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, কাহাকেও পর ভাবিতেন না। সকলের জন্য সকলেই দায়িত্ব স্বীকার করিতেন। সে ভাব আর এখন নাই, ইহা দ্বারা কি লোকের স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হইয়াছে, না অর্থ পক্ষে সাহায্য হইয়াছে? যাঁহারা অদ্যাপি একত্রে আছেন, তাঁহাদের সুখ শান্তি অপেক্ষা একাকী থাকায় যে কত সুখ, তাহাও অনেকের জ্ঞান আছে। সংসারে একাকী থাকিলে চলিতে পারে না। কারণ নির্ব্বাক হইয়া কেহ আসেন নাই, চিরদিন সমভাবে যাইবে এমন কাহার ভাগ্যে বিধাতা লেখেন নাই। সময় অসময় সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে, এই মনে করিয়া হিন্দুজাতি একত্রে থাকিতে ভালবাসিতেন, কিন্তু সেই হিন্দুভাব পরিত্যাগ করিয়া দাস দাসীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং দুরবস্থা ঘটিলে পুনরায় আত্মীয় স্বজাতির আশ্রয় ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে না।

অভাবই অশান্তির কারণ। হিন্দুরা এমন ভাবে সংসার গঠন করিতেন, যাহাতে অধিক অভাবের সম্ভাবনা থাকিত না, কিন্তু আমরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে অভাব হইবে কি, সর্ব্বদাই হইয়া রহিয়াছে। যিনি মাসে দশ সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করেন, তিনিও বলেন অভাব এবং যাঁহার

পাঁচ টাকার অধিক সংস্থান নাই, তাঁহার মুখেও অভাবই শুনিতে পাওয়া যায়। তবে সুখী কে? জাতিত্যাগ করিয়া লাভ হইল কি?

হিন্দুর ভাব দেখিবার এখনও অনেক মহাত্মা জীবিত আছেন। দয়া এবং পরোপকারের অবতার-স্বরূপ পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁহার অর্থের কি প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা বাঙ্গালা দেশে পরিচয়সাপেক্ষ নহে। তিনি এক সময়ে সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। মাসে আটশত মুদ্রা বেতন পাইয়াছেন কিন্তু তথাপি তিনি অভাব বৃদ্ধি করেন নাই। বেতন ব্যতীত তাঁহার প্রচুর আয় ছিল। তিনি মনে করিলে কি গাড়ি ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইতে পারিতেন না? ইচ্ছা করিলে কি গোলাপ জলে স্নান করিতে পারিতেন না? কিন্তু কেন তাহা করেন নাই?

তিনি জানিতেন যে, অর্থ ইথারের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী পদার্থ। এই আছে আর নাই, কিন্তু একবার শারীরিক কোন বিষয়ে আশক্তি জন্মাইলে তাহা চিরকাল থাকিবে এবং তজ্জন্য পরিণামে দুঃখের অবধি থাকিবে না। এইজন্য বলি যে, হিন্দুভাব পরিত্যাগ করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

হিন্দুদিগের যে সকল ভাব আছে, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। হিন্দু-স্থানে যাহা প্রয়োজন, তাহা সামঞ্জস্য রূপেই নির্দ্ধারিত আছে। বুঝিবার দোষে সময়ে সময়ে প্রকৃত ভাব লাভ করা যায় না।

হিন্দুদিগের বর্ত্তমান অবস্থা যে প্রকার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আশু প্রতিকার কামনা দ্বারা কোন ফল ফলিবে না, এবং প্রতিকার করিবারও উপায় নাই। আমরা দশজনে যদ্যপি বলি যে, শূকর গরু ভক্ষণ করিও না, দেবদেবী অমান্য করিও না, স্বজাতির কুৎসা করিও না, তাহা হইলে দশহাজার ব্যক্তি মিলিয়া আমাদের গ্রীবা ধারণ পূর্ব্বক সাতসমুদ্রের জলপান করাইয়া ছাড়িবেন। ম্লেচ্ছেরা যেরূপে অজ্ঞাতসারে আমাদের ভারত-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেইরূপ অজ্ঞাতসারে পুনরায় হিন্দুভাব প্রদান করিতে হইবে। এই কার্য্য সাধনের জন্য পূর্ব্বোক্ত মতে সমাজ সংগঠন করা অতীব প্রয়োজন।

যদ্যপি এই প্রস্তাব কাহার অনুমোদিত না হয়, যদ্যপি বর্ত্তমান ম্লেচ্ছ ভাব হিন্দু পরিবারে ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত করা যায়, তাহা হইলে যে দুর্ঘটনা ঘটিবে, তাহা ইতিমধ্যেই স্থানে স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে; অতএব আমাদের এক্ষণে দুইটী প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে আমরা যে প্রকার জাতি, মিশ্রণ জাতি, এবং যৌগিক জাতির বর্ণনা করিয়াছি, তাহাতে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা মিশ্রণ ভাবেই চলিতেছে বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়; অর্থাৎ দুই নৌকায় পা দিয়া দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছে। এইজন্য উপরোক্ত দুইটী প্রশ্ন মীমাংসা করা বিশেষ প্রয়োজন।

স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিতে যাইলে, হিন্দু-জাতিতে থাকাই সিদ্ধান্ত হইবে, তাহার কারণ আমরা বলিয়াছি; কিন্তু ম্লেচ্ছ ঢং কিয়ৎ পরিমাণে অভ্যাস হইয়া গিয়াছে বলিয়া যদ্যপি দ্বিতীয় পথে ধাবিত হওয়া যায়, তাহা হইলে মিশ্রণ ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক যৌগিক হইবার প্রয়াস পাওয়া উচিত! কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, উচ্চবংশীয় ম্লেচ্ছেরা তাহাতে সম্মত আছেন কি না? উচ্চবংশ বলিবার হেতু এই যে, ধোপা, কলু, মুচি শ্রেণীস্থ ম্লেচ্ছদিগের সহিত শোণিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলে অতি নিকৃষ্ট ধরণের সন্তানই জন্মিবে, কিন্তু সে আশা কতদূর ফলবতী হইবে, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যদ্যপি হিন্দুয়ানী রাখিতে হয়, তাহা হইলে বাস্তবিক হিন্দুয়ানী যাহা, তাহার মতে এবং বর্ত্তমান দেশ কাল পাত্র বিচার পূর্ব্বক সমাজ সংঘটিত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্যকলাপ প্রচলিত হউক, এ কথারও আমরা আভাস দিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এখন আমাদের অভিপ্রায় খুলিয়া বলিতেছি।

ম্লেচ্ছেরা আমাদের রাজা, সুতরাং তাঁহাদের সংসর্গে সর্ব্বদাই আসিতে হইবে, তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। যে প্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য সন্তানদিগকে ইউরোপ খণ্ডে পাঠাইতে হইবে। এই সন্তানেরা যখন দেশে প্রত্যাগমন করিবে, তখন তাহাদের সমাজচ্যুত করা হইবে না। কারণ, সংশ্রব দোষ এবং হিন্দু-নিষিদ্ধ ভোজ্য পদার্থ ভক্ষণাপরাধে যে দণ্ড বিধান করা হয়, তাহা স্বদেশে এক্ষণে গৃহে গৃহে চলিতেছে। যদ্যপি পুনরায় সমাজ বন্ধন করা হয়, তাহা হইলে এই হিন্দুধর্ম্ম বহির্গত গো শূকরাদি ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ হইবে। যে কেহ তাহা অমান্য করিবে, তাহাদের সমাজে স্থান দেওয়া যাইবে না। আমার ভরসা আছে, যদ্যপি হিন্দুধর্ম্মের গূঢ়ভাব ভাল করিয়া কার্য্যকারী হয়, তাহা হইলে কেশব বাবুর মত অনেকে ম্লেচ্ছদেশ পরিভ্রমণ করিয়াও হিন্দুচরিত্র রক্ষা করিতে পারিবেন। ম্লেচ্ছ আহারাদি করা যে ইউরোপে যাইয়াই শিক্ষা করে, তাহা

নহে, বাটীতেই তাহার হাতে খড়ি হইয়া থাকে। পিতা মাতা যদ্যপি সতর্ক হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তানেরাও সুসন্তান হইবেন।

হিন্দুসমাজকে এই পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইবে, তাহা না করায় অধিক অনিষ্টের হেতু হইয়া যাইতেছে। কারণ, যে ব্যক্তি ম্লেচ্ছদেশে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তিনি তখনই বুঝিয়া থাকেন যে, তাঁহার সহিত হিন্দুসমাজ সেই দিন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; সুতরাং অন্য সমাজের অন্তর্গত হইবার নিমিত্ত আপনাকে তদনুরূপ প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

বিদেশে গমন করিলেই যে জাতি বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এক্ষণে তাহার হেতু কিছুই নাই। কারণ যে সময়ে হিন্দুদিগের এই নিয়ম দেখা যায়, তখনকার ভারত স্বতন্ত্র ছিল। হিন্দুস্থানে ম্লেচ্ছের বাস ছিল না; পাছে ম্লেচ্ছদেশে গমন করিলে হিন্দুভাবের মলিনতা জন্মে, সেই জন্য তাঁহারা ম্লেচ্ছদিগের সহবাস করিতেন না, কিন্তু এক্ষণে কি আমাদের সেই অবস্থা আছে? স্থূল দেহের সকল বিষয়েই ম্লেচ্ছভাব অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কেবল ধর্ম্মভাবে ইতিপূর্ব্বে ততদূর প্রবেশ করিতে পারে নাই কিন্তু বেদাদি হিন্দুশাস্ত্র ম্লেচ্ছ-ভাষায় পরিণত হওয়াবধি সে পথও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তখন দুই এক বৎসর সন্তান দেশ ছাড়া হইয়া থাকিলে কতই বিকৃত হইবে। তাহার স্বভাব কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে বটে, কিন্তু শোণিত বিকৃত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। হিন্দু শোণিতে হিন্দু ভাবই আসিবে, তাহার সন্দেহ নাই। হিন্দু-সমাজের জ্ঞান থাকা আবশ্যক যে, বাটীর সন্তান-দিগকে বিদেশে গমনাপরাধে পরিত্যাগ করিতে থাকিলে জাতির উন্নতি না হইয়া ক্রমে অবনতি হইয়া যাইবে। আজকাল অনেকে ম্লেচ্ছদেশ হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক হিন্দুভাবে দিনযাপন করিতেছেন। তাঁহাদের প্রতি হিন্দু-সমাজ কিঞ্চিৎ সহানুভূতি করিলে, তাঁহারাও সমাজের নিকট করযোড়ে থাকিতে বাধ্য হইবেন।

ম্লেচ্ছেরা আপন দেশ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া অনেকে জীবনান্ত করিয়া যাইতেছেন, তাহারা কি তাই বলিয়া ভারতবাসীদিগের সহিত আদান প্রদান করিতেছেন? না বিশুদ্ধ-ম্লেচ্ছ যৌগিক-জাতির সহিত উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন? ইহাও দেখা যাইতেছে যে, কেহ স্বজাতি ত্যাগ করিয়া অন্য জাতির সহিত বিবাহাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাকে প্রায় পরোক্ষ সম্বন্ধে সমাজচ্যুত হইতে হয়। তাঁহাদের জাতিমর্য্যাদা এতদূর প্রবল

যে, বিশুদ্ধ-ম্লেচ্ছ পিতা মাতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিলেও স্থান মাহাত্ম্যের তারতম্যে মর্য্যাদার হানি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ম্লেচ্ছদিগের স্ত্রীলোকেরা অন্তঃসত্ত্বা হইলে স্বদেশে গমন করিয়া থাকেন। এই সামাজিক বৃত্তান্ত, যখন আমরা সকলে বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিব, তখন কে এমন মূর্খ থাকিবেন, যিনি আপন জাতি মর্য্যাদা পদদলিত করিয়া ম্লেচ্ছজাতির অতি হীন সম্প্রদায়-ভুক্ত হইতে অভিলাষ করিবেন?

ম্লেচ্ছেরা কখন ধর্ম্মের দ্বারা সমাজ গঠন করেন নাই, সুতরাং হিন্দুদিগের সহিত এই স্থানে মিলিবে না। তাঁহাদের পদমর্য্যাদা সকল বিষয়েরই নিদান।

যদ্যপি দেশের এবং স্বজাতির কল্যান সাধন করা বাস্তবিক অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষা-প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ভৃত্যের দলপুষ্টি করিলে কস্মিন্‌কালে জাতির উন্নতি হইবে না। ভৃত্যের স্বভাবই সর্ব্বদা আজ্ঞা পালন করা। সুচারুরূপে আজ্ঞাপালন শিক্ষায় যদ্যপি একজনের মস্তিষ্ক প্রস্তুত করা হয়, সে মস্তিষ্কে স্বাধীন চিন্তা আসিতে কখনই পারে না। তন্নিমিত্ত বর্ত্তমান কালের এই ভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া পুরাতন হিন্দুদিগের ন্যায় স্বাধীন চিন্তা শিক্ষা করিতে হইবে। দেশে যাঁহারা ধনী আছেন, তাঁহাদের ধনের সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া ঘরের টাকা বাহির করিয়া দিলে সে টাকার কার্য্য কিছুই হইবে না। সে টাকা যথায় থাকিবে, তথায় তাহার ফল ফলিবে।

এই টাকার দ্বারায় স্বদেশে শিল্প ও আপনাদের দৈনিক প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করা উচিত। সরকার বাহাদুরের এপক্ষে সাহায্য থাকুক আর নাই থাকুক, আপনারা একতা হারে গ্রথিত হইতে পারিলে কার্য্যের কোন বিঘ্ন বাধা না হইবারই সম্ভাবনা।

আমাদের দেখিতে হইবে, হিন্দুজাতির কতদূর হীনাবস্থা হইয়া যাইতেছে। ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সহরের ব্যবসায়ীদিগের দোকানে যে সকল দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রস্তুতকর্ত্তা কাহারা? কাহাদের দ্রব্য আমরা বিক্রয় করিতেছি? ব্যবসার মধ্যে আমরা পাটের কার্য্য খুব বুঝিয়াছি। পাট বেচিয়া ব্যবসায়ী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছি কিন্তু এ কথা কি কেহ বুঝিতে পারেন যে, আমাদের, দেশে পাট জন্মে, তাহা ম্লেচ্ছ দেশে লইয়া গিয়া বস্ত্রাদি রূপে পুনরায় আমাদের নিকটই প্রেরিত হইতেছে? কিন্তু পাটের প্রথমাবস্থা হইতে ইহার শেষাবস্থা পর্য্যন্ত যে সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ঘটে এবং

তদ্দ্বারা শত শত লোক কৃত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লইয়া থাকে, তাহা কি আমরা দেখিতেছি না? এই পাট লইয়া যদ্যপি আমরা বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারি, তাহা হইলে দেশের টাকা দেশেই থাকিতে পায় কিন্তু আমাদের এমনই হীনবুদ্ধি হইয়াছে, এমনই পরাধীন হইতে স্পৃহা জন্মিয়াছে যে, আপনার জন্য আপনাদিগকে কোন চিন্তা করিতে না হয়, এমন ভাবে জীবন গঠন করা হইতেছে; যদ্যপি হিন্দুজাতি পুনরায় স্ব-ভাব ধারণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিক্ষা কার্য্যাদির প্রতি মনোনিবেশ করাই প্রথম কার্য্য হইবে।

এতদ্ব্যতীত যাহার যে ব্যবসা বা কার্য্য আছে, তাহাকে তাহাই করিতে হইবে। ধোপা, কলু, মুচি, হাড়ি কখন আপনাপন বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। যে, যে কুলে জন্মিবে, সে তাহার কুলগত কার্য্যই রক্ষা করিতে বাধ্য হইবে। এ কথায় আজকাল অনেকের আপত্তি উঠিবে, তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের মধ্যে এই ভাবে বিশেষ কার্য্য হইতেছে। ম্লেচ্ছ দেশে অর্থ-করী বিদ্যায় সাধারণ জাতির অধিকার হওয়ায় কৃষকের ছেলে বা সূত্রধরের ছেলেও উচ্চপদাভিষিক্ত হইতেছে। সেই সকল ব্যক্তিদিগের পৈতৃকাবস্থায় ভদ্র সমাজে বসিবার আসন হইত না, কিন্তু বর্ত্তমান পদমর্য্যাদায় অনেক সদ্বংশ-সম্ভূত ব্যক্তির সহিত তাহাদের সর্ব্বদা সংস্রব হইয়া যাইতেছে। তাহারাই কুলমর্য্যাদা উঠাইবার গুরুমহাশয়। এই সকল ভাব এক্ষণে আমাদের দেশেও আসিয়াছে এবং অবিকল তদ্রূপ কার্য্যও হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি জাতিলোপ করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাহাদের জন্ম-বৃত্তান্ত দেখিলে কাহাকে ধোপা, কাহাকে কলু, কাহাকে নাপিত, কাহাকে জেলে এবং কাহাকে ঘরামী ও চাষাকুলোদ্ভব বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজে ইহাদের মর্য্যাদা কতদুর, তাহা সমাজের চক্ষেই নৃত্য করিতেছে। এই সকল লোকেরাই অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা ম্লেচ্ছের দাস্যবৃত্তি কার্য্যে সম্মানিত হইয়া হিন্দুসমাজের নেতা হইয়া যাবতীয় সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছে। ধোপা ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা কি বুঝিবে? মুচি, শুঁড়ি, কলু, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অবস্থা কিরূপে অবগত হইবে? তাহারা যদ্যপি ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইতে পারিত, তাহা হইলে জাতি লোপ করিবার কথা বলিত না। কে বলে ম্লেচ্ছদের জাতি বিভাগ নাই, পদ-মর্য্যাদা নাই? ভারতেশ্বরীর পারিবারিক ঘটনা স্মরণ করিয়া দেখুন। লর্ড

মহাত্মারা কাহাকে কন্যা দিয়া থাকেন এবং কাহার গৃহেই বা পাত্র পাতিয়া আহার করিয়া থাকেন? হিন্দুজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় তদ্রূপ সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়বিশেষ, কিন্তু পরাধীনতা বশতঃ ব্রাহ্মণকে ধোপা কলুর পদদলিত হইতে হইতেছে! নীচ জাতির মানসিক-শক্তি অতি নীচ, মহত্ত্বতা তাহাতে স্থান পায় না। এই মহানুভবতা পিতা মাতার গুণেই জন্মিয়া থাকে; অতএব মহৎবংশে সুসন্তানই জন্মিবার কথা। যদিও সময়ে সময়ে তাহার অন্যথাচরণ হইয়া থাকে, তাহার অন্যান্য কারণও আছে। সৌজন্যতার অনুরোধে তাহার প্রকাশ করা গেল না, সময়ান্তরে তাহার আভাস দেওয়া গিয়াছে।

ধোপা কলু প্রভৃতিকে সামাজিক নীচজাতি বলিয়া আমরা অবজ্ঞা করিতেছি না। হিন্দুশাস্ত্রের তাহা অভিপ্রায় নহে। ইহারা হিন্দুজাতির রূপান্তর মাত্র। জড়-জগতে কোন কোন রূঢ় পদার্থের (সকলের নহে) এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; অঙ্গার তাহার দৃষ্টান্ত। কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া যখন অঙ্গার প্রস্তুত করা হয়, তখন তাহার এক প্রকার অবয়ব, এক প্রকার কার্য্য ও এক প্রকার ধর্ম্ম; ভূষাও বিশুদ্ধ অঙ্গার, কিন্তু কাষ্ঠের অঙ্গারের ন্যায় কার্য্যকারী নহে। অস্থি দগ্ধ করিলে অঙ্গার প্রস্তুত হয়, তাহার ধর্ম্মও উক্ত দ্বিবিধ অঙ্গার হইতে স্বতন্ত্র। পাথুরিয়া কয়লা দগ্ধ করিলে যে কোক অবশিষ্ট থাকে, এবং গ্যাস প্রস্তুত করিবার সময়ে পাথুরিয়া কয়লা হইতে নলের অভ্যন্তরে আর এক প্রকার অঙ্গার প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহার ধর্ম্ম ও কার্য্য বিভিন্ন প্রকার। সীসকের পেন্সিল বলিয়া যাহা আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা গ্রাফাইট নামক আর এক প্রকার অঙ্গার। ইহার আকৃতি, প্রকৃতি এবং কার্য্য পূর্ব্বকথিত কোন অঙ্গারের ন্যায় নহে। হীরকও অঙ্গারের আর এক প্রকার রূপান্তর। ইহার ধর্ম্ম, আকৃতি এবং ব্যবহার যে কি, তাহা আমরা সকলেই বুঝিয়া থাকি। এই বিবিধ প্রকার অঙ্গারেরা এক জাতি, কিন্তু উপাধিবিশেষে তাহাদের কার্য্যের তারতম্য হইয়া থাকে। হীরকই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান। হীরক মহারাজাধিরাজের মস্তকের উপরে অবস্থিতি করে, গ্রাফাইটের মর্য্যাদা তাহার নিম্নে। ইহা পেন্সিলরূপে বক্ষঃদেশে শোভা পায়, এবং ভূষা পায়ের জুতায় আশ্রয় পাইয়া থাকে।

এক্ষণে বিচার করিয়া যদ্যপি অঙ্গার এক জাতি হিসাবে সকলের কার্য্যের

বিপর্য্যয় করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে কেহই ভূষাকে হীরকের আকারে পরিণত করিতে পারে না।

হিন্দুজাতির উপাধি ভেদও তদ্রূপ জানিতে হইবে। যেমন অঙ্গারের শ্রেষ্ঠ হীরক, তেমনি হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। গ্রাফাইটের স্থায় ক্ষত্রিয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণী পাইয়াছে। জান্তবাঙ্গার এবং অন্যান্য অঙ্গার ব্যবসার সহায়তা করে। উদ্ভিজ্জবর্ণ বিশিষ্ট পদার্থ বিবরণ করিবার নিমিত্ত জান্তবাঙ্গারের স্থায় কেহ উপযোগী নহে। বৈদ্যুতিক যন্ত্র (battery) উৎপাদন করিবার নিমিত্ত গ্যাসাঙ্গার অদ্বিতীয় বস্তু। এই নিমিত্ত ইহাদের বৈশ্যের সহিত তুলনা করা হইল। ভূষায় জুতার কালি হয় এবং কাষ্ঠের অঙ্গার দুর্গন্ধ যুক্ত বায়ু পরিষ্কারক বলিয়া দুর্গন্ধ স্থানে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। যাঁহারা মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালে গিয়াছেন, তাঁহারা কয়লার অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন। শূদ্রেরা এই হেতু নিকৃষ্ট উপাধিতে সম্বদ্ধ হইয়াছে।

এই স্থানে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, হীরক অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে সত্য, এবং ভূষা হীরকের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টা-বস্থায় পতিত, কিন্তু হীরকের দ্বারা কি ভূষার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে? হীরক তাহাতে একেবারে অশক্ত, সুতরাং হীরক আপনার উপাধিতে যে প্রকার অদ্বিতীয়, ভূষাও তাহার উপাধিতে তদ্রূপ অদ্বিতীয়; এই হিসাবে সকল উপাধি আপনাপন ভাবে শ্রেষ্ঠ।

হিন্দুজাতির উপাধিধারীরাও এই নিমিত্ত উপেক্ষা বা নিন্দার বিষয় হইতে পারে না। ব্রাহ্মণেরা আপনার ভাবে যেমন অদ্বিতীয়, শূদ্রেরাও তেমনই তাহাদের নিজ নিজ ভাবে অদ্বিতীয়। ব্রাহ্মণ ধোপা কলুর কার্য্য করিতে অযুক্ত; ধোপা কলুও ব্রাহ্মণের কার্য্য করিতে সমর্থ নহে; সুতরাং কার্য্য হিসাবে সকলেই আপনাপন ভাবে বড় হইয়া যাইল। তাই আমরা জাতি এবং উপাধি ভেদ রাখিয়া কাহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি নাই।

আমরা আর একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই উপাধি বিভাগ বুঝাইয়া দিতেছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা উপাধি আছে। যে কেহ তাহার যোগ্য হয়, তাহারাই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন—এম, ডি, উপাধি বিশিষ্ট ব্যক্তি—এল, সি, ই, কিম্বা—বি, এল, উপাধির যোগ্য নহে। তাহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রকার উপাধি রাজ্যে ভ্রমণ করিতে মনস্থ করিলে তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা; সেই প্রকার সমাজের উচ্চ উপাধি

প্রাপ্তিরও উপায় আছে। যেমন, বিদ্যা শিক্ষা করিলে পণ্ডিত হওয়া যায়, তেমনি নীচ উপাধি হইতে কর্ম্ম ফলে ব্রাহ্মণ উপাধি লাভ করিবার আশা আছে, কিন্তু কর্ম্ম ছাড়িলে হইবে না। এই কর্ম্মকে ধর্ম্ম পথ কহে, অর্থাৎ যে যে উপাধিতে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, ধর্ম্মের পথে ভ্রমণ করিতে থাকিলে সময়ে ব্রাহ্মণের নিকটে উপস্থিত হওয়া যায়; তথায় আর সে পূর্ব্ব উপাধি রাখিতে পারে না।

যেমন, উত্তাপ শক্তির বলে ভূষাকে হীরক করা যাইতেছে, তেমনই ধর্ম্ম বলেই উপাধি কি, জাতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। হিন্দুজাতি খৃষ্টান হইল; ধর্ম্মবলে জাত্যন্তর লাভ করিতেছে। যবন হিন্দু হইল, ধর্ম্ম বলেও ধোপা মুচি, ব্রাহ্মণ হয়। হিন্দুসমাজের উপাধিধারীর সহিত একাসনে উপবেশন, একত্রে পান ভোজন করিতে পারিতেছে। কিন্তু ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে তাহাদের উত্তোলন কিম্বা পরিবর্ত্তন করা কাহার সামর্থ্য হইবে না।

আর সময় নাই। আমাদের যেরূপ শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা সংঘটিত হইতেছে, ইহার সত্বর প্রতিবিধান করিতে প্রবৃত্ত না হইলে বোধ হয় অতি অল্পদিবসের মধ্যেই আমরা এক অদ্ভুত জানোয়ার শ্রেণীমধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইব। মনুষ্যত্ব একেবারেই লোপ হইয়া যাইবে। জীবমাত্রেই জন্তু শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু মনুষ্যেরা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরাক্রমে অন্যান্য জন্তু হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। সেই ধর্ম্ম আমাদের ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। যেমন চৈতন্যবিহীন জীব—জড়; তেমনই ধর্ম্ম বিহীন মনুষ্য—পশু। হিন্দুজাতির ধর্ম্মই জীবন, ধর্ম্মই কর্ম্ম, ধর্ম্মই কল্পনা এবং ধর্ম্মই প্রাণ। ম্লেচ্ছ বায়ু সেই ধর্ম্মভাব বিকৃত করিতে বসিয়াছে। অতএব এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম পুনরুত্থান করিয়া প্রত্যেক হিন্দুজীবনে আয়ত্ত করিতে পারিলে আবার বিশুদ্ধ হিন্দুজাতির জয় পতাকা পত্‌ পত্‌ করিয়া ভাবজগতে উড্ডীয়মান হইবে। আবার হিন্দুদিগের কার্য্য কলাপ দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে, আবার ভারতবর্ষের নবশ্রী হইবে।

হিন্দুগণ আপনাকে বিস্মৃত হইও না। আপনার জাতি ভুলিয়া যাইও না, আপনার কুল বিজাতির পাদুকায় দলিত করিও না। বাজীকরেরা যাদু বিদ্যায় দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি বিকৃত করিয়া এক পদার্থকে যেমন আর এক

ভাবে প্রদর্শন করিয়া থাকে, অভিনেতারা যেমন কৃত্রিম পদার্থ দ্বারা প্রকৃত ভাবের আভাস দেয়, তেমনই আমাদের বিজাতীয়দিগের নিকট বৈজাতিক-ভাব সুন্দর এবং আপনাদের অবস্থাসঙ্গত বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে। একবার বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করা হউক, একবার জ্ঞান শক্তির সহিত পরামর্শ করা হউক, একবার যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হউক, তখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আমরা কি কুহকেই পতিত হইয়াছিলাম, কি মায়াই দর্শন করিতেছিলাম, কি ভ্রম তিমিরেই আবৃত হইয়াছিলাম। ম্লেচ্ছের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের নিকট অতি স্থূল। কারণ হিন্দুরা ঈশ্বরকে পঞ্চভাবে উপাসনা করেন, কিন্তু ম্লেচ্ছেদিগের কেবল একটী ভাবে কার্য্য হইতেছে! সুতরাং ম্লেচ্ছভাব হিন্দু ভাবের নিকট লুকাইয়া রহিল। ঈশ্বরকে দর্শন, স্পর্শন, আলিঙ্গন, ম্লেচ্ছের অসম্ভব এবং মায়ার কথা মাত্র; কিন্তু হিন্দুর চক্ষে সর্ব্বশক্তিমানের নিকট সকলই সম্ভব এবং বাস্তবিক ঘটনার বিষয়। এ স্থানেও হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ হইল। হিন্দুদিগের যোগ-সাধন ম্লেচ্ছের কি, পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম-সাধন অপেক্ষা উন্নত। যেমন বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণী হইতে উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রত্যেক বালকের অবস্থাবিশেষে স্বতন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা আছে, হিন্দুধর্ম্ম মতেও অধিকারীভেদে ধর্ম্মের কার্য্যপদ্ধতি স্বতন্ত্র প্রকার নিরূপিত হইয়াছে, এ প্রকার বৈজ্ঞানিক বিভাগ ম্লেচ্ছ অথবা অন্য কোন জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। বালক, পৌগণ্ড, যুবা, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধের যেমন বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মভাব, তেমনই বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধারও ভিন্ন ভিন্ন ভাব লক্ষিত হয়। ফলে, যাহার যেমন প্রয়োজন, তাহার জন্য তেমনই আয়োজন রহিয়াছে। কেহ বলিতে পারেন না যে, আমার ঐ অভাব হিন্দুধর্ম্মে পূর্ণ হইল না; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, সময় গুণে তাহা কেউ চক্ষু খুলিয়া দেখিতেছেন না। একবার যদ্যপি হিন্দু জাতির কি আছে এবং কি নাই ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া জাতিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে এত দুঃখের কারণ হইত না। বালক বিদ্যালয় হইতে ম্লেচ্ছভাব শিক্ষা করিতে করিতে দুই দশখানি পুস্তক পাঠান্ত হইতে না হইতেই এই শিক্ষা করিল যে, হিন্দু-জাতির কিছুই ছিল না। মার্শমেন সাহেবের ন্যায় ম্লেচ্ছের মতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে সাঁওতাল ধাঙ্গড় বলিয়া ধারণা হইয়া গেল এবং অমনি হুট্ পাট্ করিয়া ব্রাহ্মণ দেবতা অমান্য করিতে আরম্ভ করিল, শাস্ত্র সকল কবির কল্পনাপ্রসূত, আকাশকুসুম বলিয়া অকুতোভয়ে প্রচার আরম্ভ করিল,

হিন্দুজাতি বিগর্হিত গো শূকর ভক্ষণ অবাধে চলিতে লাগিল; ক্রমে হিন্দুজাতি পরিত্যাগ হইয়া গেল।

যদ্যপি কেহ হিন্দুদিগের কিছু অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে অধুনা তাহা ম্লেচ্ছদের সাহায্যে, সুতরাং সে ক্ষেত্রে হিন্দুভাব যে কতদূর লাভ হইবে, তাহা হিন্দু ব্যতীত কে বুঝিবেন? এইজন্য বলি হিন্দুর ভাব না জানিয়া আমরা ভুলিয়া কি করিয়াছি এবং প্রলাপ বকিতেছি!

তাই সবিনয়ে আমাদের হিন্দুদিগকে বলিতেছি যে, আমাদের আর সময় নাই। আসুন, আমরা সকলে একত্রিত হইয়া হিন্দুর আচার ব্যবহার রীতি নীতি এবং ধর্ম্ম সমিতি সভা সংস্থাপন পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করা যাউক! আমাদের পথভ্রান্ত যুবকদিগের মোহতিমির বিদূরিত করিয়া হিন্দুজাতির জ্ঞানালোক প্রদর্শন করিয়া তাহাদের বিপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হিন্দুজাতির জয়পতাকা প্রোথিত পূর্ব্বক বিশ্বাধার, শ্রীহরির গুণ কীর্ত্তন করি।

২৩৫। সকলই নারায়ণ, নারায়ণ ছাড়া কিছুই নাই।

সকলই নারায়ণ, এই কথা এক গুরু শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। একদা তাঁহার জনৈক শিষ্য রাজপথে গমনকালীন একটী প্রকাণ্ড হস্তীর সম্মুখে উপস্থিত হন। মাহুত ঐ ব্যক্তিকে হস্তী সম্মুখ হইতে কিঞ্চিৎ পার্শ্বে গমন করিতে বার বার অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না, সুতরাং হস্তী কর্ত্তৃক তাঁহার বিশেষ নিগ্রহ হইল। শিষ্য অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গুরুকে কহিলেন যে, প্রভু! আপনি বলিয়াছিলেন যে, সকলই নারায়ণ, তবে হস্তী আমায় নিগ্রহ করিল কেন? গুরু কহিলেন; বাপু! মাহুত কি তোমায় কিছু বলে নাই? শিষ্য কহিলেন, আমাকে সরিয়া যাইতে কহিয়াছিল। গুরু কহিলেন, তবে তুমি "মাহুত—নারায়ণের" কথা শ্রবণ কর নাই কেন? এই উপদেশ সর্ব্ব বিষয়ে প্রয়োগ হইতে পারে। সাধারণ হিসাবে যাহার মঙ্গলেচ্ছায় যাহা বলিবেন, তাহার সে কথা শিরোধার্য্য করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য।

২৩৬। যেমন, সহস্র বৎসরের অন্ধকার ঘরে একবার প্রদীপ আনয়ন করিলেই ঘর আলোকিত হয়, তেমনি জীবের জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইলেই সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হইয়া যায়।

২৩৭। যেমন, চকমকির পাথরকে হাজার বৎসর জলে

ডুবাইয়া রাখিলে তাঁহার ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয় না। যখনই উত্তোলন করিয়া আঘাত করা যায়, তখনই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইয়া থাকে। তেমনি ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি কামিনী-কাঞ্চন রসে নিমগ্ন থাকিলেও তাহার আভ্যন্তরিক কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না।

২৩৮। সেই ব্যক্তিই ধন্য, যে নানাবিধ গুণে অলঙ্কৃত। সে যখন যে অবস্থায় পতিত হইবে, তখন তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারিবে। যথা, ভগবানের নিকট অকপটী বিশ্বাসী, বিষয়ে ঘোর বিষয়ী, পণ্ডিতমণ্ডলীতে পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান, ধর্ম্মালোচনায় সূক্ষ্মদর্শী, পিতা মাতার নিকট আজ্ঞাকারী, ভাই বন্ধুর নিকট মিষ্টভাষী, প্রতিবাসীর নিকট শিষ্টাচারী এবং স্ত্রীর নিকট রসিকরাজ, ইহাকেই সুচতুর বলে।

২৩৯। ঘোড়ার চক্ষের দুই পার্শ্বে ঢাকা না দিলে সে ঠিক সোজা যায় না, সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সংসার পথে চলিতে শিখিলে দিক্‌ভ্রম বা কুপথ-গামী হয় না।

২৪০। যেমন, জুতা পরিধান করিয়া লোকে স্বচ্ছন্দে কণ্টকাদিসঙ্কুল পথে চলিয়া যাইতে পারে, তেমনি তত্ত্ব-জ্ঞান-রূপ আবরণ দ্বারা সংসারে মন সংরক্ষিত হইয়া থাকে।

২৪১। যে ব্যক্তির স্বভাব যেমন, তাহার কার্য্য কলাপ ও পরিচ্ছদাদি দেখিলেই জানা যায়।

২৪২। যাহার যে স্বভাব, তাহা কিছুতেই পরিবর্ত্তন করা যায় না, এই নিমিত্ত পাত্রগত মত প্রচলিত আছে।

২৪৩। যাহার যাহাতে আসক্তি বা মনের বাসনা আছে,

তাহাতে তাহার বিচার করা কর্ত্তব্য; কিন্তু যে বস্তুর জন্য সময়ে সময়ে অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, তাহার তাহা সম্ভোগ করা কর্ত্তব্য; কারণ ভোগ বাসনা ক্ষয় না হইলে, কাহার তত্ত্ব-বোধ হইতে পারে না।

২৪৪। মানুষ দুই প্রকার; মানুষ এবং মানহুস। সাধারণ নর নারীরা মানুষ, আর ভগবানের জন্য যাহারা লালায়িত, তাহাদের মানহুস কহে; কারণ তাহাদের হুঁস অর্থাৎ জ্ঞান জন্মিয়াছে।

২৪৫। সত্যকথা কহা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সত্য বলিতে শিক্ষা না করিলে কস্মিন্‌কালেও সত্যস্বরূপকে লাভ করা যায় না।

২৪৬। বিষয়ী লোকেরা কুম্ভীরের ন্যায়। কুম্ভীরের গাত্র এত কঠিন যে, কোন স্থানে অস্ত্রের আঘাত লাগে না, কিন্তু তাহার পেটে আঘাত করিতে পারিলেই তাহাকে সংহার করা যায়। তদ্রূপ বিষয়ীদিগকে উপদেশই দাও কিম্বা লাঞ্ছনাই কর, কিছুতেই চৈতন্যোদয় হয় না; কারণ তাহাকে বিষয়চ্যুত না করিতে পারিলে কোন ফল হইবে না।

২৪৭। সংসারের সার—হরি, অসার—কামিনী-কাঞ্চন। হরিই নিত্য—তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন; কামিনী-কাঞ্চন ছিল না, থাকৃচেও না এবং থাকিবেও না।

২৪৮। সাধু কাহারা? যাহারা প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অতীত। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে অসাধু বলে।

২৪৯। তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে পাওয়া যায়, তাহাকে শাস্ত্র বলে, তত্ত্বজ্ঞান বিরোধী গ্রন্থ অশাস্ত্র শ্রেণীর অন্তর্গত।

২৫০। যেমন, পিতল কি সোনা, সোনা কি পিতল

এই বলিয়া সোণায় ভ্রম হয়, জীবও তদ্রূপ মায়ায় আপনাকে বিস্মৃত হইয়া থাকে।

২৫১। কষ্টিপাথরে যেমন পিতল কি সোনা সাব্যস্থ হয়, তেমনি ভগবানের নিকট সরল কিম্বা কপট সাধুর পরীক্ষা হইয়া থাকে।

২৫২। সিদ্ধ হইলে কি হয় বেগুণ আলু সিদ্ধ হইলে যেমন নরম হয়, তেমনি অভিমান যাইলে লোকে নরম হইয়া থাকে।

২৫৩। যাহাকে অনেকে জানে, মানে, গণে, তাহাতে ভগবানের বিভূ বা শক্তি অধিক আছে।

২৫৪। স্ত্রী মাত্রেই ভগবতীর অংশ।

২৫৫। অবিদ্যাই হউক আর বিদ্যাই হউক, সকলকেই মা আনন্দরূপিণী বলিয়া জানিতে হইবে।

২৫৬। যেমন, সাপ দেখিলে লোকে বলে, " মা মনসা মুখটী লুকিয়ে লেজটী দেখিয়ে যেও," তেমনি কামিনীর সম্মুখে কখন যাওয়া কর্ত্তব্য নহে; কারণ কামিনীর ন্যায় প্রলোভনের পদার্থ আর নাই। প্রলোভনে পতিত হইয়া শিক্ষা করা অপেক্ষা তাহার সংস্রবে না আসাই কর্ত্তব্য।

২৫৭। অনেকে কামিনী-ত্যাগী হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাকে প্রকৃত ত্যাগী বলা যায় না। যে জনশূন্য মাঠের মধ্যস্থলে ষোড়শী যুবতীকে মা বলিয়া চলিয়া যাইতে পারে, তাহাকেই প্রকৃত-ত্যাগী কহা যায়।

২৫৮। বেশ্যা এবং স্ত্রীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, একস্থানে গোটাকতক ফুল দেওয়া হইয়াছে এবং আর এক স্থানে তাহা

দেওয়া হয় নাই, অতএব বেশ্যা বলিয়া তাঁহাদের অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া চিরকালই বিশেষ হুল স্থূল পড়িয়া আছে। তাহাদিগকে দেশের অবনতির কারণ সাব্যস্থ পূর্ব্বক সকলেই কুবাক্যবাণ বরিষণ দ্বারা সমাজ হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকে।

প্রস্তাবটীর বহির্দ্দিক দর্শন করিলে যারপরনাই সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক মঙ্গলপ্রদ বলিয়া বোধ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই, এবং যাঁহারা এ প্রকার প্রস্তাব করেন, তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না।

কিন্তু আমরা যে কোন বিষয় আন্দোলন করিতে যাই, তাহার বাহ্যদৃষ্টিতে তৃপ্তিসাধন হয় না। আমরা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ অর্থাৎ কার্য্যকারণ সকল এই রাজ-সূত্র দ্বারা মিলাইয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকি। সেইজন্য বহির্দ্রষ্টা অর্থাৎ যাঁহারা স্থূলের কার্য্যই করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ অনৈক্য হইয়া যায়। আমরা সেইজন্য বারাঙ্গনা সম্বন্ধে যাহা বলিব, তাহা স্থূলের কথা নহে।

বারাঙ্গনাদিগকে স্থূলচক্ষে দর্শন করিলে প্রস্তাবকর্ত্তারা যাহা বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ জগৎ বিনষ্ট করিবার একমাত্র নিদান, তাহার ভুল নাই; কারণ, তাঁহারা সুসাজে সজ্জিত হইয়া কটাক্ষবাণ নিক্ষেপণে সরল সুকুমারমতি যুবকের প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভুজাশ্রয়ে যে একবার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাদের প্রেমকূপে যে একবার নিমজ্জিত হইয়াছে, তাহার আর ইহজীবনে নিস্তার নাই, বরং পরকাল পর্য্যন্ত সেই সংক্রামকতায় প্রবাহমান থাকিতেও দেখা যায়।

বারাঙ্গনার স্থূলভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে বেশ্যাবৃত্তি অর্থাৎ যে ভাব দ্বারা বারাঙ্গনারা পরিচালিত হইয়া থাকেন, তাহাই আলোচ্য হইবার কথা। কিজন্য তাঁহারা বেশাভূষায় বিভূষিতা হইয়া থাকেন? অবশ্য পুরুষদিগকে বিমুগ্ধ করিবার জন্য।

যে পদার্থ অনবরত অযথা ব্যবহৃত হয়, তাহার লাবণ্য কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং স্বাভাবিক অবস্থান্তর জনিতও অবস্থাসঙ্গত দৃশ্য কটু জন্মিয়া

থাকে, সুতরাং বারাঙ্গনাদিগের এই সূত্র প্রমাণ লাবণ্যের হ্রাসতা প্রযুক্ত তাঁহারা নানাবিধ কৌশল এবং উপায় অগত্যা উদ্ভাবন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন; সেইজন্য ইহাকে আমরা সূক্ষ্মভাব বলিলাম।

তৃতীয়াবস্থা কারণ। কি জন্য তাঁহারা পুরুষদিগকে বিমুগ্ধ করিবার প্রায়স পাইয়া থাকেন? তাহার কারণ অর্থোপার্জ্জন এবং মনোবৃত্তির তৃপ্তি সাধন।

জগতের অতি কীটাণুকীট হইতে বৃহোত্তম জীব জন্তু প্রভৃতি উদরান্ন বা শারীরিক পুষ্টি প্রাপ্ত ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে না। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সহিত জীবকে বিশেষতঃ মনুষ্যদিগকে ঈশ্বর কর্ত্তৃক অন্যান্য বিবিধ মনোবৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে। সেই বৃত্তি দ্বারা সকলেই অভিভূত এবং পরিচালিত হইয়া থাকেন। কি যোগী ঋষি, কি সাধু, কি অসাধু সকলেই ন্যূনাধিক্য পরিমাণে তাহাদের আয়ত্তাধীন। তবে সিদ্ধ পুরুষদিগের কথা কাহার সহিত তুলনীয় নহে।

ঈশ্বর প্রদত্ত বা স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি বা মনের স্পৃহাসমূহ চরিতার্থ করা সেইজন্য কারণের অন্তর্গত গণনা করিতে হইবে।

চতুর্থ বিচারে মহাকারণ আসিতেছে; অর্থাৎ বারাঙ্গনাদিগের উৎপত্তি কোথায়?

এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত রাজকীয় বিভাগ দ্বারা তাহা সাধিত করা কর্ত্তব্য। যথা,—মহাকারণ সম্বন্ধীয় স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং মহাকারণ। স্থূলভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, বারাঙ্গনার কন্যার দ্বারা বারাঙ্গনার কার্য্য হইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে গৃহস্থ রমণীরাও তাঁহাদের সহিত যোগ দান করিয়া দলপুষ্টি করিয়া থাকেন।

সূক্ষ্ম দৃষ্টি সঞ্চালন দ্বারা তাঁহাদের সেই অবস্থায় আনয়ন করিবার হেতু বহির্গত করিলে, বারাঙ্গনার কন্যা সম্বন্ধে এই নির্ণয় হয় যে, তাঁহাদের কেহ না কেহ, কোন সময়ে কুলকামিনী ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। যেমন, এক্ষণে যাঁহারা গৃহ ত্যাগ করিয়া বারবিলাসিনী হইতেছেন, তাঁহাদের ভাবী বংশ চিন্তা করিয়া দেখিলে, বর্ত্তমানকালের পুরাতন বারাঙ্গনাদের অবস্থা এককালে বুঝিতে পারা যাইবে।

তৃতীয়, কারণ, অর্থাৎ গৃহস্থ কুলমহিলাগণ কি জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দুর্ভাগ্য শ্রেণীতে প্রবেশ করেন? চরিত্র-দোষ সংঘটনাই তাহার প্রত্যুত্তর।

যে সকল সদ্‌গুণ-সম্পন্না হইলে কুলকামিনী কুলের বিমল ছায়ায় অবস্থিতি করিতে পারেন, তাহা ভ্রষ্ট না হইলে, তাহা হইতে বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই।

চতুর্থ, মহাকারণ। স্বভাব ভ্রষ্ট হইবার হেতু কি?

এক্ষণে বিষম সমস্যা উপস্থিত। কেন যে কুলাঙ্গনাদিগের চরিত্র দোষ ঘটে, কেনই বা তাঁহারা কুলে জলাঞ্জলি দিয়া ইচ্ছাক্রমে বা কার্য্যানুরোধে কিম্বা পরিজন কর্ত্তৃক বিদূরিত হওয়ায় সমাজ তাড়িত, লোক ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহার তাৎপর্য্য কি?

ইহার প্রত্যুত্তর সংসারে দেখিতে হইবে। প্রত্যেক গৃহে না হউক, প্রত্যেক পল্লিতে তাহার দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বলিতে কি, পুরুষেরাই তাহার মূল। অতি পুরাতন কাল হইতে বর্ত্তমান সময়ে যত স্ত্রীর সতীত্ব ধন অপহৃত হইয়াছে, অপহারক অনুসন্ধান করিলে এই বর্ব্বর পিশাচ-রূপী পুরুষদিগের প্রাপ্ত হওয়া যায়। গুরুপত্নী হরণ করিয়াছিল কে? ভ্রাতৃজায়ায় গমন করিয়াছিল কে? ধীবর কন্যার ধর্ম্মনষ্ঠ হইয়াছিল কাহার অপরাধে? এবং অবিকল ঐপ্রকার পৈশাচিক বৃত্তির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ এক্ষণেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ভগ্নি বিচার নাই, ভাগ্নি জ্ঞান নাই, কন্যা বা পুত্রবধূর এবং কখন কখন গুরুপত্নীবিশেষ স্বল্পবয়স্কা বিমাতা, মাশি, পিসি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া এবং খুড়ী জেঠাই প্রভৃতির ধর্ম্মনাশ করিয়া, নরাকৃতি পাষণ্ড কুলাঙ্গারেরা নির্ব্বিবাদে দিন যাপন করিতেছে। একথা আমরা নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে কিন্তু সত্যের অনুরোধে এবং প্রস্তাবিত অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ কারণ বহির্গত করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় লেখনী কলঙ্কিত করিতে বাধ্য হইলাম।

যখন কোন পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই প্রকার ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকেন, তখন তাঁহার গতিরোধ করিবার অধিকার কাহার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সপরিবার মধ্যেই. বেশ্যাবৃত্তি শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

বাটীর কর্ত্তা যে প্রণালীতে চলিবেন, তাঁহার অধীনস্থেরা অবশ্যই তাহাই শিক্ষা করিবে। দুই একটী নিয়মাতীত দৃষ্টান্ত হইতেও পারে, উহা গণনীয় নহে।

ক্রমে সংসার ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইতে থাকিলে সেই বাটীর সকলেই সেই

সংক্রামকতায় আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তখন সম্বন্ধ বিচার একেবারে অন্তর্হিত হইয়া কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি ধারণ করে।

এই পরিবারের সহিত যখন আদান প্রদান সংঘটিত হয়, তখনই বেশ্যাবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অকলঙ্ক পবিত্র বংশসমূহ সর্ব্বদাই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাকে।

গৃহের দৃষ্টান্ত দেখিয়া এবং কুস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ঔরসজাত বিধায় যাহাদের অবস্থাক্রমে চরিত্র দোষ ঘটিবার উপক্রম হয়, তখন তাহাদের সেই কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পক্ষে কোন বিঘ্ন হইলে কাজেই গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই নিয়ম উভয় পক্ষদের মধ্যে একই প্রকার।

বারাঙ্গনা শ্রেণীর উৎপত্তি যেরূপে প্রদর্শিত হইল, তাহার দৃষ্টান্ত অন্বেষণ পূর্ব্বক বহির্গত করিতে হইবে না। আমরা বলিয়াছি যে, সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং অনেকেরই দ্বারা সময়বিশেষে এই কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। যদ্যপি পুরুষেরাই বারাঙ্গনা শ্রেণীর বিশ্বকর্ম্মা হন, তাহা হইলে কোন্ বিচারে অসহায়া অনাথিনীদিগকে তিরস্কার করিয়া থাকি। যাঁহাদের নাম ভাগ্যহীনা, তাঁহাদের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ব্যথা উপস্থিত হয় না ?

একদিন এক তরুণ বালক কোন বারাঙ্গনাকে গভীর শীত-নিশীথে প্রস্তর-ভেদী হিমে আর্দ্র হইয়া রাজপথের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হ্যাগা তুমি দাঁড়ায়ে রয়েছ কেন ?" ভাগ্যহীনা বলিয়াছিলেন, "বাছা! তোমায় বলিলে কি হইবে, আমাদের দুঃখ তোমায় কি বলিব ?" এইরূপ ঘটনা আমরা ভূরি ভূরি অবগত আছি। যাঁহারা বারাঙ্গনাদিগকে অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা কি জন্য মহাকারণের মহাকারণ সমূলে উৎপাটিত করিতে চেষ্টা না করেন ?

যেমন, কোন স্থানে বিসূচিকা রোগ উৎপত্তি হইলে কিরূপে সে স্থানে কার্য্য হইয়া থাকে ? প্রথমতঃ সুস্থ ব্যক্তিদিগকে (রোগীকে নহে) স্থানান্তর করিতে হয়, তদ্‌পরে সেই দূষিত স্থানে নানা প্রকার ঔষধাদি দ্বারা ক্রমে রোগ বীজ বিনষ্ট করা যায়, অথবা আগ্নের বিপত্তি কালে অগ্নিস্থল কেহ দূরে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না। তখন প্রাণরক্ষা করিতে হইলে স্থানান্তরে পলায়ন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তদনন্তর অগ্নি নির্ব্বাণের ব্যবস্থা।

বারাঙ্গনাদিগের গ্রাস হইতে যুবকদিগকে রক্ষা করিতে হইলে অবিকল

ঐ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। স্বাভাবিক নিয়মে যে সকল ঘটনা হইয়া থাকে, তাহারই অনুকরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

এক্ষণে যে প্রকার সমাজের অবস্থা, তাহাতে আশুমঙ্গল কামনা করা যায় না। যাহাদের অবস্থান্তর ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাদের তাহা সংশোধন করা সময়ের কার্য্য।

আমাদের বিবেচনায় বালকদিগকে যাহাতে ধর্ম্ম এবং নীতি শিক্ষা বিশেষ রূপে প্রদান করিতে পারা যায়, তাহার সদনুষ্ঠানের কালমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে। বিদ্যালয় সমূহে বর্ণপরিচয় কাল হইতে উর্দ্ধশ্রেণী পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও নীতিঘটিত শিক্ষা বিধান করা অতি আবশ্যক এবং শিক্ষকেরা নিজ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বদ্ধমূল করিয়া দিবেন। গৃহে পিতা মাতা বালকের ধর্ম্মনীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং আপনারা কার্য্যে তাহা দেখাইবেন। বালক বালিকা যাহা দেখিবে, তাহাই শিখিবে এবং যেমন ঔরসে * জন্মিবে, তাহারা তেমনই স্বভাব প্রাপ্ত হইবে। যদ্যপি বালক, বৃদ্ধ, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত অর্থাৎ সমগ্র মানবকুল ধর্ম্ম এবং নীতি দ্বারা সংগঠিত হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ দিন বারাঙ্গনা শ্রেণীর ভূমি শয্যা হইবে, কিন্তু সে আশা কতদূর লীলাসঙ্গত, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ত্রিবিধ পদার্থ অবলোকন করা যায়, যথা, উত্তম, মধ্যম এবং অধম। কি বিদ্যায়, কি ঐশ্বর্য্যে, কি রূপলাবণ্যে, কি ধর্ম্মে এবং কি অধর্ম্মে, মনুষ্যেরা তিন প্রকার অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। কি উপায়ে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উত্তম অবস্থা লাভ করা যাইতে পারে, তাহার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই মনে আকাঙ্ক্ষা থাকে। বালকেরা যখন বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়, তখন তাহাদের পিতা মাতা কিম্বা সেই পাঠার্থী বালকগণ ভবিষ্যৎ উচ্চাভিলাষবিরহিতচিত্তে কদাপি দিন যাপন করিয়া থাকে। সকলেই মনে করেন যে, আমার ছেলেটীকে হাইকোর্টের জজ্ করিব কিম্বা মহারাণীর সরকারে প্রতিষ্ঠান্বিত পদে প্রবিষ্ট করাইয়া দিব, কিন্তু সেই আশা বাস্তবিক কয়জনের সংসিদ্ধ হইয়া থাকে? বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণী হইতে উর্দ্ধশ্রেণী পর্য্যন্ত

যে ব্যক্তির যেরূপ স্বভাব এবং যে প্রকার মানসিক শক্তি, তাহার অপত্যদিগের প্রায় সেইপ্রকার স্বভাব হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বহুবিধ রোগে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় এবং সূক্ষ্মভাবে প্রত্যেক পরিবারের স্বভাব পরীক্ষা করিলে কুলগত স্বভাবের আধিক্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে মীমাংসা করিয়াছি।

ক্রমান্বয়ে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া থাকে। কেহ দুই বৎসর অধ্যয়ন করিতে পারিল, কেহ বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল এবং কেহ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম উপাধি প্রাপ্ত হইল। এ প্রকার ঘটনার তাৎপর্য্য কি? কেন প্রত্যেক বালক সমভাবে সুশিক্ষিত হয় না? কেন তাহারা এক শ্রেণীর উচ্চপদ লাভ করিতে অশক্ত?

এই প্রকার উত্তমাধম প্রত্যেক অবস্থায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কাহার্ ইচ্ছা নহে যে তিনি ধনী হন, কাহার্ ইচ্ছা নহে যে, তিনি সামাজিক উচ্চতম পদমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন, কিন্তু কার্য্যে পরিণত না হইবার হেতু কি?

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী দরিদ্রের অবস্থা গৃহীত হউক। স্থূল পরীক্ষায় তাহার দারিদ্র্যের হেতু, নিজ আলস্য এবং বিদ্যাদি শিক্ষা না করাই স্থির হইবে।

কি জন্য সে অশিক্ষিত হইল? ইহা সূক্ষ্ম বিচারের অন্তর্গত। এই স্থানে নানা কথা বহির্গত হইবে। হয় ত তাহার পিতার সহসা অবস্থান্তর কিম্বা বালকেরই কোন প্রকার পীড়া উপস্থিত জনিত পাঠ হইতে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

কোন সময়ে বা অন্য কারণও থাকিবার সম্ভাবনা। সে যাহা হউক, এই পর্য্যন্ত বিচার দ্বারাই আমাদের অভিপ্রেত প্রস্তাব সাধিত হইবে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, লোকের ইচ্ছা বা প্রয়াস ব্যতীত অন্য প্রকার কারণের দ্বারা অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সে কারণ কাহাকে নির্দ্দেশ করা যাইবে? আমরা ইহাকে লীলা বা ঈশ্বরের ক্রীড়া বলিয়া থাকি; সুতরাং মহাকারণ ঈশ্বর হইলেন।

এক্ষণে স্থূলদর্শী মহাশয়েরা চমকিত হইয়া বলিবেন, ঈশ্বর অশুভ কার্য্য করিয়া থাকেন? তিনি মঙ্গলময়, দয়াময়, সৎ-স্বরূপ, পবিত্র পুরুষ, তাঁহার দ্বারা কি অন্যায়, অধর্ম্ম এবং বিকৃত কার্য্য সম্পন্ন হওয়া ন্যায়সঙ্গত কথা?

আমাদের সৃজন করিয়াছেন কে? স্থূলে পিতা মাতা, সূক্ষ্মে স্পার্মেটেজুন (Spermatazoon) বীর্য্যস্থিত জীবিত পদার্থ এবং ওভিউল (ovule) স্ত্রী-জাতির গর্ভস্থ হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট ডিম্ববৎ পদার্থ। কারণে, জগদীশ্বরের শক্তি, মহাকারণে ঈশ্বর। আমরা যদ্যপি ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃজিত হইয়াই থাকি, তাহা হইলে আমরা সর্ব্ব বিষয়েই পবিত্র হইব; কারণ পবিত্র হইতে অপবিত্রের উৎপত্তি হওয়া সম্পূর্ণ ন্যায়বিরুদ্ধ কথা।

এক্ষণে আমাদের দেহ লইয়া বিচার করা যাইতেছে। দেহের মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট স্থান কোথায়? যদ্যপি দৈহিক বিবিধ যন্ত্রদিগের কার্য্যপরম্পরা তুলনা করা যায়, তাহা হইলে মুখ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও গুহ্যদেশ সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইবে। কিন্তু যদ্যপি গুহ্যদেশ কোন পীড়াবশতঃ অবরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে মুখ দিয়াই গুহ্যের কার্য্য হইয়া থাকে এবং কৃত্রিম গুহ্যদেশ না করিয়া দিলে তাহার জীবন নাশ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

এই জন্য মুখ কিম্বা গুহ্যদেশকে উত্তমাধম না বলিয়া প্রত্যেক যন্ত্রের স্ব স্ব কার্য্য বিচারে স্ব স্ব প্রধান বলিতে বাধ্য।

একটী কার্য্য করিতে হইলে তাহাতে যে সকল শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেককে স্ব স্ব প্রধান বলা যায়। সেনাপতির বিদ্যা-কৌশলই জয়লাভের স্থূল মীমাংসা; কিন্তু সূক্ষ্মাদি বিচার করিয়া দেখিলে সেনাগণ, তাহাদের ভৃত্য, আহার, আসবাব, শিবিকা বাহক, ঘোটক, ইত্যাদি প্রত্যেক পদার্থকেই গণনা করিতে হইবে। সেনাপতির নিজ কায়িক শক্তি দ্বারা তৎসমুদয় সম্ভবে না। তিনি সিপাহীদিগের সেবা শুশ্রূষা অথবা স্বীয় স্কন্ধে শিবিকা বহন করিয়া আহত ব্যক্তিদিগকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে কখনই সমর্থ নহেন।

সেইরূপ সমাজে যে সকল উত্তম এবং অধম কার্য্য বলিয়া পরিগণিত, তাহারা সমাজসঞ্চালন পক্ষে স্ব স্ব প্রধান, তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।

সমাজ বলিলে, উত্তম, মধ্যম এবং অধম, এই তিনের সমষ্টিকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কেবল উত্তম এবং কেবল অধম হইলে পূর্ণ সমাজ হইতে পারে না। মনুষ্য বলিলে মস্তকের কেশ হইতে পদের নখ পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। ইহার মধ্যে আধারবিশেষে, বিশেষ বিশেষ দ্রব্য সকলকেও গণনা করিতে হইবে। উদরে মল, মূত্র, কৃমী আছে বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করা যায় না।

সমাজে পণ্ডিত এবং মূর্খ চাই, ধনী এবং নির্ধন চাই, বৃদ্ধ এবং বালক চাই, রূপবান্ বা রূপবতী এবং কদাকার কিম্বা কুরূপা চাই, সতী এবং অসতী চাই, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম চাই, বিষ এবং অমৃত চাই, আলো এবং অন্ধকার চাই, ইহা আমাদের ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা দ্বারা সাধিত হইবার নহে; তাহা ভগবানের লীলা।

সমাজক্ষেত্রে যাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা যে কোন ঘটনা হয়, তাহাদেরই কার্য্যের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। তবে আমরা সকল কার্য্যের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে পারি নাই এবং সে শক্তিও হইবার নহে। সেই জন্য নানা প্রকার মতভেদের স্রোত চলিয়া থাকে। এই মর্ম্মের একটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, কলিকাতার অন্তঃপাতী নিমতলা ঘাটে অগ্নিদাহনে বিস্তর সেগুণ কাষ্ঠের কারখানা ভস্মীভূত হইয়া যায়। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা ঐ অগ্নিকাণ্ডের পরিণাম পর্য্যবেক্ষণ করিতে গমন করিয়াছিলাম। আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি যে, অনুমান শতাধিক বিঘাস্থিত গৃহাদি (ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী পর্য্যন্ত) অলন্ত অঙ্গারে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আনন্দময়ীর মন্দিরের অধিকাংশ স্থান ভূমিশায়ী হইয়াছে; কিন্তু সেই স্থানে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত শৌণ্ডিকালয় ছিল, তাহার পূর্ব্বদিকের একটী জান্‌লা ব্যতীত কোন স্থান অগ্নি সংস্পর্শিত হয় নাই। এমন কি পশ্চিমদিকের বারাণ্ডায় যে সমস্ত ফুলের গাছ ছিল, তাহাদের পত্রাদিও বিবর্ণ হয় নাই। আমরা এই ঘটনা দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম। আশ্চর্য্য হইবার কারণ এই যে, ঐ গৃহের তিন পার্শ্ব দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ইহার কোন ক্ষতি হয় নাই। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, কোন স্থানে একজন লালবাজারের গোরা একখানি অস্থি হস্তে লইয়া বিশেষ শ্রান্তভাবে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া তখন স্মরণ হইল যে, ইহারা অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে আসিয়াছিল এবং অগ্ন্যুত্তাপে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ চিন্তা মানসক্ষেত্রে আসিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শৌণ্ডিকালয় রক্ষা হইবার হেতু বুঝিতে পারিলাম।

যখন ঐ লালবাজারের গোরারা ভীষণ অগ্নির সহিত সম্মুখে যুদ্ধ করিয়াছিল, তখন তাহাদের দেহ মন উত্তেজিত রাখিয়া কার্য্যক্ষম করিবার জন্য সুরা ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থ জগতে প্রাপ্ত হইবার উপায় কিছুই ছিল না। সেই সময়ে সুরা অমৃতের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিল। আমরা পরে শুনিলাম যে, গোরারা একবার অগ্নি সংস্পর্শিত গৃহের কিয়দংশ ভঙ্গ করিয়া যখনই অবসাদ বোধ করিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ সুরা সেবন করিয়া পুনরায় পূর্ণশক্তিতে কার্য্য করিয়াছিল। এই স্থানে সুরার অপকর্ষ এবং ঘৃণিত লালবাজারের গোরা-দিগকে কোন্ শ্রেণীতে গণনা করা যাইবে? এই অগ্নিকুণ্ডে আমাদের সাধু-

প্রবরদিগকে কিবা মহাপণ্ডিত সুচরিত্র ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করি, গোরাদিগকে কোন্ শব্দ ব্যবহার করিতে পারা যায়? এ স্থানে কে শ্রেষ্ঠ? কে উত্তম মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে? তাহা পাঠক বুঝিয়া লউন!

বারাঙ্গনারাও সেই প্রকার তাহাদের কার্য্য সম্বন্ধে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যদ্যপি সমাজের পূর্ণক্রিয়া আবশ্যক থাকে, তাহা হইলে ইহাদের কার্য্যকেও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান না করিলে লীলা ছাড়া কথা হইবে।

এই স্থানে জিজ্ঞাস্য হইবে যে, বারাঙ্গনারা সামাজিক কি কল্যাণ সাধনের জন্য জগদীশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে?

প্রথমতঃ। সতী-স্ত্রীর সহিত উপমার জন্য। যদ্যপি তুলনা করিবার পদার্থ না থাকে, তাহা হইলে উত্তমের শ্রেষ্ঠত্ব থাকিতে পারে না। অন্ধকার না থাকিলে আলোকের মর্য্যাদা কি? মূর্খ না থাকিলে পণ্ডিতের সম্মান এক কপর্দ্দকও নহে, দরিদ্র ব্যতীত ধনীর শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? সেই প্রকার অসতী দ্বারা সতীর গৌরব বিস্তার হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ। আমোদপ্রিয় বিলাসী ব্যক্তিদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিবার একমাত্র উপায়। অনেকে এ প্রকার স্বভাবসম্পন্ন আছেন, যাঁহারা বার-বিলাসিনীদিগের নৃত্য-গীত দর্শনাদি দ্বারা সুখস্পৃহা চরিতার্থ করিয়া থাকেন। এ প্রকার ব্যক্তিদিগের অন্য কোন প্রকার সম্ভোগের অভিপ্রায় নহে। যদিও পুরুষেরা স্ত্রীর অভাবে তাহাদের বেশ ভূষায় আপনাদিগকে লুক্কায়িত করিয়া তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন, কিন্তু তাহা দ্বারা প্রকৃত তৃপ্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। কেহ এই স্থানে বলিতে পারেন যে, এইপ্রকার প্রবৃত্তিকে কুপ্রবৃত্তি বলে এবং ইহা যতই খর্ব্ব হইয়া যায়, ততই মঙ্গল। আমরা তাহা অস্বীকার করি, কারণ স্পৃহা চরিতার্থ করা সেই ব্যক্তির অবস্থার ফল; তাহা কাহার নিন্দা করিবার যোগ্যতা নাই। তাহাকে নিন্দা করিতে হইলে মহাকারণকে নিন্দা করিতে হইবে। আমরা এই কথা দ্বারা প্রত্যেককে বিলাসী হইতে বলিতেছি না, অথবা বলিলেই বা তাহা হইবে কেন?

সকলেই অবস্থার দাস, অর্থাৎ যখন যে প্রকার অবস্থা উপস্থিত হয়, মনুষ্যেরা সেই অবস্থাসঙ্গত কার্য্য করিতে তখন বাধ্য হইয়া থাকে। অবস্থা অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই। যদ্যপি এই কথা স্থির হয়, তাহা হইলে দোষের স্থান কোথায়? ব্যক্তিতে ত হইতে পারেই না, অবস্থায়ও নহে; কারণ তাহা স্বাভাবিক। তবে মন্দ শব্দটী কি জন্য প্রচলিত রহিয়াছে?

ইহার মীমাংসা পূর্ব্বেই করিয়াছি, যে উপমার জন্য; এই কথায় আপত্তি হইতে পারে, যে যাহা মন্দ বলিয়া সাব্যস্থ হইল, তাহা অপনীত করিবার চেষ্টা নিরর্থক নহে। আমরা বলি, কার্য্যের ফলাফল তুলনা করাই আমাদের কার্য্য; কারণ দূর করা স্বাভাবিক শক্তির অন্তর্গত। যাঁহারা এই কারণ পরিবর্ত্তনের জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের তাহা অস্বাভাবিক প্রয়াস বলিতে হইবে।

স্থূলদর্শীরা দেখিয়া থাকেন যে, বারাঙ্গনাদিগের নৃত্য গীত দ্বারা বিলাসীরা সময়ে সময়ে নানাবিধ বিভ্রাটে পতিত হইয়া থাকেন। যদ্যপি এই বিপত্তির কারণ বারাঙ্গনারা হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেস্থলে প্রবেশ করিতে নিষিদ্ধ হইলে, ভবিষ্যতে ওরূপ বিভ্রাটের আশঙ্কা থাকিবে না। আমরা ইহা অন্যদিক দিয়া বুঝিয়া থাকি। যাঁহারা বিপদে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা অন্য কারণেও ঐ দশা প্রাপ্ত হইতেন। ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে এবং তাঁহাদের সংক্রামকতা অনেকের অঙ্গে সংস্পর্শিত হয় নাই, তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

তৃতীয়তঃ। কামমূর্ত্তি নররাক্ষসদিগের হস্ত হইতে সতীর সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা পাইবার অদ্বিতীয় ব্যবস্থা।

সকলকে পারা যায় কিন্তু কামুকদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের নিকট সকলেই ভীত। কাহার্ স্ত্রী কন্যা কোন্ সময়ে বিকৃত হইয়া যাইবে, তাহার স্থির নাই। কামুকদিগের স্বভাবের নিকট সম্বন্ধবিচার নাই, ধর্ম্মবিচার নাই, কর্ত্তব্যবিচার নাই, এমন কি অগ্র পশ্চাৎ বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পূর্ণ অলক্ষিত রাখিয়া আপন মনোবৃত্তি তৃপ্তির জন্য, পরমাণু পরিমাণেও ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। এপ্রকার ব্যক্তিদিগের তালিকা করিলে শতকরা পঞ্চনবতী (৯৫) জন গণনায় আসিবে। যদ্যপি বারাঙ্গনাদিগকে দূর করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহাদের শান্তির স্থান কোথায় হইবে?

যাঁহারা বারাঙ্গনাদিগকে হেয় পদার্থ মধ্যে পরিগণিত করেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, সকলেই কর্ম্মের দাস। কর্ম্মফলে সাধু অসাধু হয় এবং অসাধু সাধু হয়, সতী অসতী হয় এবং অসতীও সতী হইয়া থাকেন। প্রভু কহিয়াছেন, একদা কোন সতী স্ত্রীর আসন্নকালে জাহ্নবী তীরে অন্তর্জলী করিবার সময় তাহার কটিদেশ গঙ্গার ঢেউ দ্বারা কয়েক বার আন্দোলিত হইয়াছিল, সেই জন্য তাহাকে বেশ্যাকুলে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

কর্ম্ম-সূত্র অতি সূক্ষ্মভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, কোন্ কর্ম্মের কোন্ ফল কিরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা কাহার্ গোচরাধীন? প্রভু বলিতেন যে,

তাঁহাদের দেশে একজন অতিশয় দুর্ব্বৃত্তা নাচাশয়া ব্যক্তি ছিলেন। সে কখন ধর্ম্মকর্ম্ম কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় কোন প্রকার অনুষ্ঠানে এমন কি যোগদানও করে নাই, তাহার যখন মৃত্যু হয়, সেই সময়ে সে কহিয়াছিল, "মা আমার! তোমায় এমন নৎটি কে দিলে মা?" ইত্যাকার কত কথাই বলিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিল। এমন স্থলে বেশ্যা বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করা যারপরনাই অবিবেচকের কার্য্য। তন্নিমিত্ত প্রভু বলিতেন যে, আমি দেখি কোথাও সচ্চিদানন্দময়ী মা গৃহস্থের বৌ এবং কখন তিনি মেছোবাজারের খানকী সাজিয়া খেলা করিতেছেন।

২৫৯। দেখ, সকলেই আপনাপন জমি প্রাচীর দিয়া ভাগ করিয়া লয়, কিন্তু কেহ আকাশকে খণ্ড খণ্ড করিতে পারে না; এক খণ্ড আকাশ সকলের উপরে বিরাজ করিতেছে। সেই প্রকার অজ্ঞানে আপনার ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলে, জ্ঞান হইলে সকল ধর্ম্মের উপরে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে দেখিতে পাওয়া যায়।

২৬০। যেমন গেড়ে ডোবায় দল বাঁধে, তেমনি যাহাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তাহারাই অপরকে নিন্দা করে এবং আপনার ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে। স্রোতস্বতী নদীতে কখন দল বাঁধিতে পারে না, তেমনি বিশুদ্ধ ঈশ্বরভাবে দলাদলি নাই।

২৬১। পিঠের (পৃষ্ঠক) এঁথেল একপ্রকার কিন্তু পুরের প্রভেদ থাকে। কোন পিঠের ভিতর নারিকেলের পুর, কাহার ভিতর ক্ষীরের পুর এবং কাহার ভিতর চাঁচির পুর। সেইরূপ মানুষ একজাতি হইয়াও গুণে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে।

২৬২। সাধুসঙ্গ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

২৬৩। আহারাদির সঙ্গে যে মূলা খায়, তাহার মুলার ঢেকুরই উঠে; বিষয়ী সাধুদের তদ্রূপ সাধুপ্রসঙ্গেও বিষয়ের কথাই বেশী কহিতে দেখা যায়।

২৬৪। আলোর স্বভাব স্বপ্রকাশ থাকা। কেহ তাঁহাতে ভাগবৎ লিখে, কেহ কাহার বিষয় জাল করে। ভগবানের নাম লইলেই যে সকল সাধ পূর্ণ হইবে তাহাও নহে, তবে নিজের ভাবের দ্বারা বস্তু লাভ হইয়া থাকে।

২৬৫। অপরাধ নানাবিধ ; ভাবের ঘরে চুরি থাকিলেই অপরাধ হয়। সরলতায় যে—যে কার্য্য করে, তাহাতে তাহার অপরাধ হয় না।

২৬৬। বিশ্বাসীর বিশ্বাসে কথা কহাই মহাপরাধ। বিশ্বাস দিবার কর্ত্তা ঈশ্বর, সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হওয়া অপরাধ ভিন্ন আর কি হইবে?

২৬৭। কাহার মনে ব্যথা দেওয়াই অপরাধ। সত্য কথা বলিলে যদ্যপি কেহ ক্লেশ পায়, সে কথা না বলাই কর্ত্তব্য ; তবে মিথ্যা কথা ব'লে বেড়ানও উচিৎ নয়।

২৬৮। পরচর্চ্চা যত অল্প করিবে, ততই আপনার মঙ্গল হইবে। পরচর্চ্চায় পরমাত্ম-চর্চ্চা ভুল হয়।

২৬৯। মত্ত হাতীকে জব্দ করা সহজ কিন্তু মনকে জব্দ করা যায় না। ছাড়িয়া দিলেই হাড়িপাড়ায় (কামিনী-কাঞ্চনে) ছুটিয়া যায়, কিন্তু ধরিয়া রাখিলেও এমন ভাবে সরিয়া পালায় যে, তাহা কিছুতেই জানা যায় না।

২৭০। যেমন ঘুঁড়ী উড়াইবার সময় উহার সহিত সুতা বাঁধিয়া রাখিতে হয়, তাহা না করিলে ঘুঁড়ী কোথায় উড়িয়া যায়, আর তাহাকে ফিরিয়া পাওয়া যায় না ; সেইরূপ মন যখন কোন বিষয়ে ধাবিত হয়, তখন বিবেকরূপ সুতা তাহার সহিত যেন আবদ্ধ থাকে।

২৭১। লোক পোক্। অর্থাৎ লোকের ভয় করিয়া

কেহ ভাল করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারে না; এই নিমিত্ত লোককে পোকার ন্যায় জানিবে।

২৭২। মানুষে ভাল বলিতে যতক্ষণ, মন্দ বলিতেও ততক্ষণ, অতএব লোকের কথায় কান না দেওয়াই কর্ত্তব্য।

২৭৩। লজ্জা ঘৃণা, ভয়, তিন থাক্‌তে নয়।

২৭৪। দেহ লাভ করিয়া যে ঈশ্বরকে লাভ করিতে না পারে, তাহার জন্মই বৃথা।

২৭৫। ওরে পোদো! তোর বাগান গোণার কিসের জরুরি? দুটো আঁব খা, যে শরীর ঠাণ্ডা হোক। ধর্ম্মের তর্ক করা অপেক্ষা দুটো উপদেশ শুনে নিয়ে তাহা পালনে যত্ন করাই কর্ত্তব্য।

২৭৬। যেমন, চিকিৎসকেরা এক রকম ঔষধ খাওয়ায় এবং এক রকম ঔষধ মাখায়, তেমনি ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছু 'সাধন ভজন' করিতে হয়, এবং কিছু 'উপদেশ' শ্রবণ করিতে হয়।

২৭৭। যেমন, পদ্মের পাপড়ী কিম্বা সুপারী অথবা নারিকেলের পাতা খসিয়া যাইলেও সেই স্থানে একটা দাগ থাকে, তেমনি অহঙ্কার যাইলেও তাহাতে একটু দাগের চিহ্ন থাকিবেই থাকিবে, তবে সে অভিমানে কাহারও সর্ব্বনাশ করিতে পারে না।

২৭৮। যেমন লৌহের তরোয়াল পরেশ-মণি স্পর্শে সোনা হয় বটে, কিন্তু তাহার ঢংটা থাকে। সে তরোয়ালে আর জীবহিংসা চলে না। তদ্রূপ যে তত্ত্বজ্ঞানী হয়, তাহার যে অহঙ্কার থাকে, তাহা বালকের আমির ন্যায়। যথা,— আমি খাব, আমি শোবো, আমি বাহ্যে যাব, ইত্যাদি।

২৭৯। মাতালেরা যেমন নেশার ঝোঁকে পোঁদের কাপড় কখন মাথায় বাঁধে এবং কখন বগলে নিয়ে যায়, সিদ্ধ পুরুষদিগের অবস্থা প্রায় সেইরূপই হইয়া থাকে।

২৮০। আহাম্মক না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। হয় কিছু না জানিয়া শুনিয়াই মূর্খ হও, না হয় সর্ব্বশাস্ত্র পড়িয়া মূর্খ হও; যা'তে সুবিধা বিবেচনা কর।

শাস্ত্রের আংশিক শিক্ষাই প্রমাদের কারণ। সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তাহার অভিমান খর্ব্ব হয়, সুতরাং সে ব্যক্তি কোন বিষয়ে দৃঢ় সমর্থনকারী হইতে পারে না। একদা রাজবাটীতে বিবাদ হইয়াছিল যে, শিব বড় কি বিষ্ণু বড়; উভয় পক্ষে নানাবিধ মতামত লইয়া বিতণ্ডা হইলে সভাপতি এই বলিয়া মীমাংসা করিয়াছিলেন যে, এ পর্য্যন্ত হরিহরের সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, যদি কখন দেখা পাই, তাহা হইলে কে বড়, কে ছোট বলিব। এই কথায় সঙ্কীর্ণ মতাবলম্বীরা হেঁট মস্তক হইয়া বসিলেন। রাজার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

২৮১। মনের কার্য্য ভাব, প্রাণের কার্য্য উচ্ছ্বাস।

২৮২। কাচের উপর কোন বস্তুর দাগ পড়ে না, কিন্তু তাহাতে মসলা লাগাইলে দাগ পড়ে; যেমন ফটোগ্রাফি। সেইরূপ শুদ্ধ মনে ভক্তি মসলা লাগাইলে, ভগবানের প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়; কেবল শুদ্ধ মনে ভক্তি ব্যতীত রূপ ধরা যায় না।

২৮৩। ব্রহ্ম দর্শন হয় না, ঈশ্বর দর্শন হইয়া থাকে।

২৮৪। যেমন, সাঁকোর জল এ মাঠ হইতে ও মাঠে পড়ে, সাঁকোর ভিতর কিছু থাকে না। সাংসারিক নির্লিপ্ত সাধুর অবস্থাও তেমনি।

২৮৫। ফুলবাগানে যে সর্ব্বদা বাস করে, সে সর্ব্বদাই সুগন্ধিযুক্ত বায়ু আঘ্রাণ করিয়া থাকে, কিন্তু যে সময়ে

পাইখানায় যায়, তখন তথায় ফুলের গন্ধ পাওয়া যায় না। সেই প্রকার, সর্ব্বদা বিষয়ে ব্যস্ত থাকিলে মন বিচ্ছিন্ন হয়; তবে যতটুকু ঈশ্বরের কাছে থাকা যায়, ততটুকুই সুখ।

২৮৬। ভগবানের পাদপদ্মে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেই জীব বাঁচিয়া যায়।

২৮৭। ভগবানের কথায় যাহার গাত্রে রোমাঞ্চ হয় এবং চক্ষে ধারা পড়ে, তাহার সেইটী শেষ জন্ম জানিতে হইবে।

২৮৮। জীব ভগবান্‌কে বাস্তবিক চায় কি না, তাহা জানিবার জন্য বিষয়াদি নাশ করিয়া তিনি পরীক্ষা করিয়া থাকেন। বিষয়াদি নাশ হইলেও যে ব্যক্তি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকী রতিমতি রাখিতে পারে, সেই ভাগ্যবানই ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে।

কারণ—

"যে করে আমার আশ, করি তার সর্ব্বনাশ।
তবু যদি করে আশ, পুরাই তা'র অভিলাষ॥"

২৮৯। ভাবে বহু, কিন্তু উদ্দেশ্য এক।

২৯০। যে যেরূপ ভাবনা করে, তাহার পরিণাম তদ্রূপই হইয়া থাকে, যেমন আরসোলা কাঁচপোকাকে ভাবিয়া তদবস্থা লাভ করে।

কোন এক বিচক্ষণ রাজা ঋণগ্রস্ত হইয়া পাওনাদারদিগকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে বাতুলের ন্যায় ভাবাবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অবস্থা দর্শন পূর্ব্বক সকলেই ভীত হইয়া নানাবিধ চিকিৎসাদি করাইতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, বরং তাঁহার রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পরিশেষে জনৈক সুচতুর বৈদ্য রাজাকে কহিয়াছিলেন, "মহারাজ! নকল কর্‌তে কর্‌তে আসল হ'য়ে যে দাঁড়াবে? এখনও আপনি

ঠিক্ পাগল হন নাই, অতঃপর আপনি একটু সাবধান হউন, কেন না ইতি-মধ্যেই কিঞ্চিৎ ছিট ধরিয়াছে, বিশেষ সতর্ক না হইলে একেবারে পূর্ণ উন্মাদ হইয়া যাইবেন।" রাজা তখন বিশেষ বুঝিয়া সতর্ক হইলেন।

২৯১। ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিদের ভোগাবসান হয় বলিয়া পাপের ফল হাতে হাতেই ফলে; ঈশ্বর বিমুখ ব্যক্তিদের তাহা হয় না, কারণ তাহাদের দীর্ঘকাল সংসার-ক্ষেত্রে ঘুরিয়া মরিতে হয়।

২৯২। যেমন, বাজারের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিলে কেবল একটা শব্দ শুনা যায়, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে সেই এক শব্দই নানা ভাবে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে; যথা, কেহ মাছ খরিদ করিতেছে, কেহ বা অন্যান্য বস্তু খরিদ করিতেছে, ইত্যাদি। তেমনি দূর হইতে ঈশ্বর-ভাব সর্ব্বত্রেই এক বলিয়া বুঝা যায় কিন্তু ভাবের ঘরে বহু হইয়া যায়।

২৯৩। ভ্রমর যতক্ষণ পদ্মের মধু খাইতে না পায়, ততক্ষণ ভ্যান্ ভ্যান্ করিয়া বেড়ায়; মধু পানের সময় চুপ্ করিয়া থাকে; মধুপানান্তে যখন উড়িয়া যায়, সে আবার ভ্যান ভ্যান করিয়া থাকে। তদ্রূপ জীবগণ যে পর্য্যন্ত হরিপাদপদ্মের মকরন্দ পান করিতে না পায়, সে পর্য্যন্ত নানাবিধ তর্ক ও যুক্তি প্রয়োগ করিয়া কত কথাই কহিয়া থাকে, কিন্তু যখন তাহারা বাস্তবিকই হরিনামামৃত পান করে, তখন তাহারা চুপ করিয়া যায়, অর্থাৎ আপনাপনি আনন্দ ভোগ করে। আবার উপদেশ কালে নামোন্মত্ততা উপস্থিত হইলে, তাহারা পুনরায় পূর্ব্ববৎ কোলাহল করিয়া থাকে।

২৯৪। পল্লিগ্রামে ব্রাহ্মণেরা যখন ছোট ছোট ছেলে-দের সমভিব্যাহারে লইয়া মাঠের আলের উপর দিয়া গ্রামান্তরে ফলার করিতে যায়, তখন কোন ছেলে বাপের হাত ধরিয়া এবং কোন ছেলের হাত বাপে ধরিয়া থাকে। ছেলে-দের স্বভাবই চঞ্চল, মাঠে যাইতে যাইতে কোন স্থানে পক্ষী কিম্বা অন্য কোন জীবজন্তু দেখিয়া তাহারা আনন্দে করতালী দিয়া উঠে, যে ছেলেরা বাপের হাত ধরিয়া থাকে, তাহারা অনায়াসে হাত ছাড়িয়া দেয় এবং আলের রাস্তা সঙ্কীর্ণ বিধায় পড়িয়া যায়, কিন্তু যা'দের হাত বাপ ধরিয়া থাকে, তাহারা পড়িয়া যায় না। সেই প্রকার ভগবানের প্রতি যাহারা সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাহাদের কোন আশঙ্কাই থাকে না, কিন্তু যাহারা আপনার কার্য্যের উপর আস্থা স্থাপন করে, তাহাদের কার্য্যের অবস্থানুসারে ফললাভ করিতে হয়।

২৯৫। কাদা ঘাঁটাই ছেলের স্বভাব-সিদ্ধ, কিন্তু মা বাপ কাহাকেও অপরিষ্কার রাখেন না। সেইরূপ জীব যতই পাপপঙ্কে পড়ুক না কেন, ভগবান্ তাহাদের অবশ্যই উপায় করিয়া থাকেন।

২৯৬। আপনাকে অধিক চতুর মনে করাই দোষ; যেমন কাক বিষ্ঠা খাইয়া মরে; তেমনি কার্যাক্ষেত্রে যাহারা অধিক চালাকি করিতে যায়, তাহারাই অগ্রে ঠকিয়া থাকে। অতএব বাজারে কেনাবেচা করিতে হইলে এক কথায় ধর্ম্মভার দিয়া কার্যস্যম্পন্ন করাই উচিত।

২৯৭। গ্রীষ্মকালে কূপ, খাৎ, নালা, ডোবা, পুষ্করিণী শুকাইয়া যায় কিন্তু বর্ষাকালে তৎসমুদয় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, এমন কি উচ্চ জমি পর্য্যন্তও জলে ডুবিয়া একাকার হইয়া

যায়; তদ্রূপ পৃথিবীতে যখন কূপ-খাৎ-রূপ সম্প্রদায়বিশেষে পাপের দোর্দ্দণ্ড উত্তাপে ধর্ম্মবারি শুষ্ক হইয়া যায়, সেই সময়ে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম-বারি দ্বারা সমুদায় বর্ষাকালের মত ভাসাইয়া দিয়া থাকেন।

২৯৮। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা সকলেই মানুষ, মানুষ না হইলে মানুষের ধারণা সম্পাদন করা যায় না।

২৯৯। যখন যিনি অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার আদিষ্ট মতে পরিচালিত হইলে আশু মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা। ফলে, সকলেই মঙ্গলেচ্ছায় সাধ্য হইয়া থাকে।

৩০০। হরিষে লাগি রহোরে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই।
[তেরা ঘষড়া-ফষড়া মিট যাই।
তেরা বিগড়ি বাৎ বনি যাই॥]
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে, তারে সুজন কসাই।
সুগা পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মীরাবাই॥
দৌলত দুনিয়া মাল্‌খাজনা, বেনিয়া বয়েল্ চরাই।
এক বাৎসে ঠাণ্ডা পড়েগা, খোঁজ খপর না পাই।
য্যাসি ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই।
সেবা বন্দি আওর্ অধীনতা সহজে মিলি রঘুরাই॥

সমাপ্ত।